বীরভূমি

ষষ্ঠ খণ্ড।

১৩৩১

সম্পাদক শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ আছে।

১। আত্মশক্তি ও কৃপাবাদ
২। ধর্ম্মের গ্লানি ও দেবজন্ম
৩। সঙ্কর্ষণ প্রসঙ্গ
৪। শ্রীমদ্ভাগবতের ধারণা ও ধ্যান
৫। গীতার ধর্ম্ম ও তাহার অধিকার
৬। গীতার ধর্ম্ম ও তাঁহার সাধন
৭। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধা প্রসঙ্গ
৮। শ্রীরাধাতত্ত্ব
৯। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও শ্রীরাধা
১০। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা
১১। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধা
১২। ললিতমাধবে শ্রীরাধা

প্রাপ্তিস্থান—সিউড়ী পোঃ বীরভূম

মূল্য তিন টাকা চারি আনা মাত্র।

কৃপাবাদ ও আত্মশক্তি

কলিযুগে ধর্ম্মসাধনার সুপ্রশস্ত পথ শুদ্ধা ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, বিশেষ করিয়া এই পথের আগাগোড়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য এই পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি-পথের পথিক বলিতেছেন—"কৃপাহি কেবলম্।" সকলি তাঁহার কৃপা;—সেই তিনি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্; সেই তিনি—শ্রীগোবিন্দ, হরি; তিনি পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; তিনি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ। আর কেহ নাই, আর কিছু নাই, আপনার বলিবার এ-কূলে ও-কূলে আর কেহ নাই—অতএব, "শীতল বলিয়া শরণ লইনু, ওদুটি কমল পায়।" ইহাই আত্মনিবেদন, ভক্তি-সাধনার ইহাই শেষ কথা।

কথাটা খুব সহজ, কিন্তু ভারি কঠিন। শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে বিচার করিতে হইবে, একথার অর্থ কি এবং সাধন কি? সত্য করিয়া একথা কে বলিতে পারে, আর কখনই বা বলিতে পারে? মুখে বলাই তো সত্য করিয়া বলা নয়, সুতরাং বিচার আবশ্যক। যদি কেহ বলেন—আবার বিচার কেন? 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু' বিশ্বাস কর। আমরা বলি—বিশ্বাসই তো করিতে চাই, কিন্তু বিশ্বাস কি এতই সুলভ জিনিস, বিশ্বাস করিব বলিলেই কি বিশ্বাস করা যায়? যাঁহারা তাহা পারেন তাঁহারা আত্মজয়ী, তাঁহাদের চরণে দূর হইতে প্রণাম করিতেছি, তাঁহাদের নিকটে যাইবারও আমাদের অধিকার নাই—আমাদের শাস্ত্র লইয়া বিচার করা সাধন, এই সাধনের ফলে বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে। যাঁহারা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংশয় নাই, জানিবারও কিছু নাই, বিচার করিবারও কিছু নাই।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিতে পাইতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি, তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া ও বুঝিয়া, মানুষের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় লইয়া, ধীরে ধীরে

সতর্কভাবে শাস্ত্রানুগত, সুযুক্তি-পূত ও প্রণালীবদ্ধ বিচারণায় প্রবেশ করিতে হইবে, ক্লান্ত হইলে চলিবে না।

আমরা, আমাদের চারিদিকে প্রতিনিয়ত যে হাজার হাজার মানুষ—পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিতেছি—ইহারা কোথায় ? মানবাত্মার ক্রমবিকাশের যে সোপানশ্রেণী, সুপ্রাচীন ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ইহারা বা ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই, সেই সোপানমালার কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রারম্ভেই প্রয়োজন কারণ, অধিকার নির্ণয় না করিয়া কোন কথা বলিলে, সে কথার কোন মূল্য থাকিবে না, সে কথায় লাভ হইবে না, ক্ষতি হইবে। অনধিকার-চর্চ্চা বড় রকমের পাপ, এই পাপে মানবজাতি শীঘ্র শীঘ্র অধঃপাতিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় !

মানুষ, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের মানুষ, অধিকাংশই তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া শোক, মোহ, ভয়, নৈরাশ্য এবং অবসাদে ডুবিয়া রহিয়াছে। চারিদিকেই জড়তা, সর্ব্বত্রই নিশ্চেষ্টতা ও নিরুদ্যম। ইহা কি সত্য নহে ? একথায় কি কাহারও সন্দেহ আছে ? একথায় কি কেহ আপত্তি করিবেন ? আশা করি, কেহ আপত্তি করিবেন না। চিরদিন এমন ছিল না। কেন এমন হইল, তাহা লইয়া অকারণ বিতণ্ডা-সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। আমরা তমোগুণে ডুবিয়া গিয়াছি, ইহার কিছু ঔষধ আছে কি না, তাহাই এখন আলোচনার বিষয়।

অনেকেই জানে না, বোঝে না এবং বুঝিতে চেষ্টাও করে না যে—সে তমোগুণে আচ্ছন্ন, অন্তমুখী হইয়া ত্রিগুণের তত্ত্ব প্রত্যেককে আজ আলোচনা করিতে হইবে, প্রত্যেককে অবধারণ করিতে হইবে—তাহার প্রকৃতিতে এই তমোগুণ, কোথায় এবং কি প্রকারেই বা তাহা কার্য্য করিতেছে, আরও বুঝিতে হইবে—এই তমোগুণের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করা আবশ্যক। এই কথা প্রত্যেক নরনারীকে বুঝাইয়া দেওয়া আচার্য্যগণের উচিত। তমোগুণের স্বভাব এই যে, তমোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তি বুঝিতেই পারে না যে, সে তমোগুণে ডুবিয়া রহিয়াছে—তমোগুণের ধর্ম্ম, আবরণ ও মোহ। তাহাকে বুঝাইতে গেলে সে রাগ করে এবং অধীর হইয়া উঠে।

তমোগুণাচ্ছন্ন মানুষ মনে করে যে, সে একেবারে অসহায় ও শক্তিহীন। মনে করে; নিজের শক্তির দ্বারা সে কিছুই করিতে পারে না। আত্মশক্তির মহিমা ভুলাইয়া দেওয়াই

তমোগুণের প্রধান কার্য্য, ইহাই তমোগুণের বিশেষ লক্ষণ। বাহিরের জগতে অর্থাৎ অনাত্মের মধ্যে যাহা চলিতেছে বা যাহা রহিয়াছে, তামসিক মানুষ কোনরূপে চিন্তা না করিয়া; অবনতমস্তকে তাহা মানিয়া লইয়া চলিতে চায়—তাহার চিন্তা করিবার সাহসও নাই, সামর্থ্যও নাই। এই প্রকারে গতানুগতিকের ভিতর পড়িয়া অলস কল্পনার মধ্যেই সে আরাম পায়। প্রবলের তোষামোদ করিয়া, ধনবানের গুণগান করিয়া সে অনায়াসে ইহলোকে উত্তম অন্নের সংস্থান করে এবং পরলোকের জন্য কোন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ঐন্দ্রজালিকের অনুসন্ধান করে। ইহলোকে যখন তাহারা সুবিধা ভোগ করে, তখন আর, তাহাদিগকে কে বুঝাইবে? মূর্খ যদি বড় চাকুরী করে বা বেশী পয়সা রোজগার করে, তখন তাহাকে মূর্খ বলা বিড়ম্বনা। শুধু তাই নয়, অন্যকে সেই মূর্খের দল হইতে বাহির করিয়া আনাও কঠিন।

সংসারে যিনি প্রবল তিনি যতই অন্যায় করুন, যতই অত্যাচার করুন, তাহার বিপক্ষতাচরণ করা উচিত নহে, বরং তাঁহার পোষকতা করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লওয়াই সঙ্গত,—ইহাই তমোগুণের পরামর্শ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রথম ও প্রধান উপদেশ— "উত্তম হইবে" অর্থাৎ নিজের প্রকৃতি হইতে তমোগুণ যাহাতে উদ্গত হয় বা চলিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। তমোগুণ উদ্গত না হইলে বা উত্তম না হইলে, কিছুই হইবে না।

"উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।"

এই তমোগুণ কি, এবং ইহার হস্তে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ই বা কি?

তমোগুণ কাহাকে বলে? শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জন্মায়—অর্থাৎ আবরণ শক্তি-প্রধান যে প্রকৃতির অংশ, তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। উহা সকল জীবের ভ্রান্তি উৎপাদন করে এবং জীবকে অনবধান, অনুদ্যম, এবং চিত্তের অবসাদের দ্বারা আবদ্ধ করে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেকভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্যকার্য্যে অনুসন্ধানরাহিত্য এবং মোহ জন্মিয়া থাকে।

"অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্"—তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।

তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।

জঘন্য গুণের বৃত্তিতে অবস্থিত তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয়।

এই যে তমোগুণ, ইহার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করাই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

প্রচলিত ধর্ম্ম অনেক স্থলেই শাস্ত্রানুমোদিত নহে, বরং শাস্ত্রের বা সত্য-ধর্ম্মের বিপরীত। প্রচলিত ধর্ম্ম, বিশেষ বিশেষ মণ্ডলীর দ্বারা ব্যবস্থাপিত, মণ্ডলী সাধারণ মনুষ্যের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত, সুবিধাভোগী লোকেরা ইহার পৃষ্ঠপোষক। তমোগুণাচ্ছন্ন মানুষ; অবশ্য মণ্ডলীর বা সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা, শাস্ত্র ও সদ্‌যুক্তিসঙ্গত কিনা, তাহা বিচার করিতে সাহস করিবে না। আবার এরূপ বিচার করিতে গেলে পার্থিব স্বার্থেরও হানি হইবার আশঙ্কা আছে। তাহারা অন্ধভাবে প্রবল ব্যক্তির কথা শুনিয়া ভয়ের দ্বারা, লোভের দ্বারা, কলের মত বা নিরীহ মেষপালের মত, চালিত হইতেই ভালবাসে। মণ্ডলী প্রথমাবস্থায় মানুষকে কতকগুলি চিহ্ন ধারণ করিতে এবং নির্বিচারে কতকগুলি বিধি প্রতিপালন করিতে বলে। চিত্তের অবসাদ দূর করিয়া, উদ্যমশীল হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে উপদেশ দেয় না। সম্প্রদায় যখন একটি পার্থিব মণ্ডলী মাত্র এবং এই মণ্ডলীর সহিত যখন অনেক বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চতুর ও প্রবল লোকের পার্থিব স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে, তখন এই প্রকারের আধ্যাত্মিক নরহত্যা মণ্ডলীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য-ধর্ম্ম অন্যরূপ। আমরা ভগবদ্‌গীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই সত্য-ধর্ম্মের পরিচয় পাইব।

তমোগুণের লক্ষণ ভগবদ্‌গীতা হইতে পাওয়া গেল, এইবার তমোগুণের সহিত সংগ্রাম কিরূপ, তাহার পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতে অতি উত্তমরূপেই পাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম কথা, মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। ব্রাহ্মণ কুমার শৃঙ্গী শাপ দিয়াছেন—সাতদিন পরে তক্ষক আসিয়া মহারাজকে দংশন করিবে, আর সেই

তক্ষকদংশনে মহারাজের মৃত্যু হইবে। শাপের কথা জানিতে পারিয়া মহারাজা উদ্বিগ্নচিত্তে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন এবং নির্ব্বিণ্ণচিত্তে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়াছেন। মহারাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও সাধু আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাও বিশেষ উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত। আর সাত দিন মাত্র পরমায়ু আছে,—এখন কি করা যায়? নানাজনে নানারূপ পরামর্শ দিতেছেন। কেহ বলিতেছেন প্রায়শ্চিত্ত করুন, কেহ বলিতেছেন যজ্ঞ করুন, কেহ বলিতেছেন দান করুন, কেহ বলিতেছেন প্রাণায়াম করুন, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথার মিল হইতেছে না, আর মহারাজা পরীক্ষিতের কোন কথা বেশ মনঃপূত হইতেছে না। ক্রমশঃ তর্কের ঝড় আরম্ভ হইল। মহারাজ পরীক্ষিতের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। এমন সময়ে, ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীশুকদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তর্কের ঝড় থামিয়া গেল, সকলেই সসম্ভ্রমে শ্রীশুকদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজার চিন্তা দূর হইল। এখন শ্রীশুকদেব যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। তাঁহার কথায় কেহ আপত্তি করিবেন না।

শ্রীশুকদেব দেখিলেন, মহারাজা পরীক্ষিতের মনে ভয়, উদ্বেগ ও অবসাদ আসিয়াছে, অর্থাৎ মহারাজা তমোগুণে ডুবিয়া গিয়াছেন। তিনি মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন— "মহারাজ, ভীত হইবেন না, উদ্বিগ্ন হইবেন না। চিত্তের অবসাদ ত্যাগ করুন, কারণ নৈরাশ্যের ও অনুদ্যমের কোনই কারণ নাই।"

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ॥
খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষি র্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিং॥
তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।
উপকল্পয় তৎসর্ব্বং তাবদ্যৎ সাম্পরায়িকং॥
অন্তকালেতু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহে হনু যেচ তং॥

"আমার আর অধিক দিন পরমায়ু নাই, হায় হায় এই অল্প সময়ের মধ্যে কি আর করিব?"—এরূপ চিন্তা করিয়া শোক করিবেন না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষের বহু বহু বৎসর

বৃথা কাটিয়া যায়, তাহাতে কি ফল হয়? মুহূর্ত্ত কালের জন্যও যদি মানুষের জ্ঞান হয় যে সময় বৃথা যাইতেছে, তাহা হইলেও খুব লাভ। কারণ, এইটুকু জানিতে পারিলেই মানুষ কল্যাণের জন্য যত্নবান্ হয়। খট্বাঙ্গ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দেবগণের পক্ষ হইয়া দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন ও জয়লাভ করেন। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া খট্বাঙ্গ রাজর্ষিকে বলেন—"মহরাজ! আমরা বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, আপনি আমাদের নিকট আপনার ইচ্ছামত বরগ্রহণ করুন।" রাজর্ষি খট্বাঙ্গ দেবগণকে বলেন—"আমি আর কতদিন বাঁচিব দয়া করিয়া বলিয়া দিউন"। দেবতারা বলেন—"রাজন, আপনার আর মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ু অবশিষ্ট আছে।" তখন রাজর্ষি খট্বাঙ্গ, অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত রথে চড়িয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক অভয়-স্বরূপ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেন। তিনি বিচলিত হন নাই এবং তাঁহার জীবনও অধন্য হয় নাই। আপনার এখনও এক সপ্তাহ পরমায়ু আছে; অতএব আপনি আপনার পারমার্থিক কল্যাণ যথেষ্টরূপে সাধন করিতে পারিবেন। অন্তকাল উপস্থিত হইলে মানুষের উচিত মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করা। মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা, দৈহিক সুখেচ্ছা ও পুত্র কলত্রাদির প্রতি স্নেহবন্ধন ছেদন করিতে হইবে।

তাহার পর শ্রীশুকদেব, মহারাজা পরীক্ষিৎকে অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করিলেন এবং ভগবানের স্থূলরূপে মনের ধারণা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। এই স্থূলরূপে মনের ধারণা হইলেই, মানুষ মনকে জয় করিতে পারে। এই স্থূলরূপে মনের ধারণা করিয়াই ব্রহ্মা, প্রলয়কালে তাঁহার যে স্মৃতি নষ্ট হইয়াছিল, সেই স্মৃতি পুনর্ব্বার লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার যে সৃষ্টি করিবার শক্তি, তাহাও এই ধারণার দ্বারাই হইয়াছিল। এই ধারণার দ্বারা বিশ্বসৃজন সামর্থ্যও হইতে পারে, ইহা শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন। ভগবানের স্থূলরূপে মনের ধারণা সিদ্ধ হইলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্ কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়োহর্থো ভগবাননন্তঃ
তং নির্বৃতঃ সন্নিয়তার্থো ভজেত সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র ॥
কস্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তামৃতে পশূনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যন্ জনং পতিতং বৈতরণ্যাং স্বকর্ম্মজান পরিতাপাঞ্জুষাণং

পৃথিবী সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই শয়ন করা যায়, সুতরাং শুইবার জন্য শয্যার প্রয়াসের প্রয়োজন কি? স্বতঃসিদ্ধ দুইটি বাহু রহিয়াছে, তাহাতে মাথা রাখিয়া অনায়াসেই ঘুমাইতে পারা যায়, অতএব অন্য বালিশের প্রয়োজন কি? অঞ্জলি রহিয়াছে তাহাতে করিয়া বেশ খাইতে পারা যায়, অতএব ভোজনপাত্রের চেষ্টায় আবশ্যক কি? দিক্ ও বৃক্ষত্বক্ অনায়াস-লভ্য—এ সকল থাকিতে পট্টবস্ত্রের আবশ্যক কি? অবশ্য দিগ্বসন হওয়া কিছুই নহে, ইচ্ছা করিলেই পারা যায়, কিন্তু বল্কল, অন্নজল, বাসস্থান প্রভৃতি না চাহিলে পাওয়া যায় না। একথা সত্য, কিন্তু এ সকলের জন্য ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণের সেবার প্রয়োজন কি? পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষসকল কি ফলদান করিয়া অন্যের পোষণ করে না? তাহাদের নিকট চাহিলে কি তাহারা ভিক্ষা দেয় না? সকল নদীই কি শুকাইয়া গিয়াছে? সকল পর্ব্বতেরই গুহা কি রুদ্ধ হইয়াছে? এ সকলও যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলেও ভগবান্ হরি কি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন না? এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মানুষকে বিষয়মাত্রেই বিরক্ত হইতে হইবে, এবং নিজের চিত্তে যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাতে মনের ধারণা করিতে হইবে। সেই আত্মাই সত্য, অন্যান্য অনাত্মপদার্থের তুল্য মিথ্যা নহেন। উপাস্যের যত গুণ থাকা আবশ্যক, এই আত্মায় তাহা সমস্তই আছে। তিনি অনন্ত ও নিত্যস্বরূপ। তাঁহাতে মনের ধারণা হইলে, তাঁহার অনুভবজাত যে আনন্দ, সেই আনন্দে মানব আত্মহারা হইবে এবং সংসারের হেতুরূপা অবিদ্যার উপরতি হইবে। পশু অর্থাৎ কর্ম্মজড় ভিন্ন অন্য কোন্ লোক ঐ প্রকার ভগবান্ হরির আরাধনায় অনাদর করিয়া বিষয় চিন্তা করিবে? বিষয় চিন্তায় রত হইলে সংসৃতিরূপ ভয়ানক বৈতরণী অর্থাৎ যমদ্বারস্থ নদীতে পতিত হইয়া নিজের কর্ম্মের জন্য আধ্যাত্মিকাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ইহা দেখিলে কোন ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশগুলি ধীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। একজন আপত্তি

করিতে পারেন, এই উপদেশ বড়ই ভয়ঙ্কর এবং নিতান্তই সেকালের কথা। মানবজাতির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে। তাহার ফলে নূতন নূতন ভোগের জিনিস আবিষ্কৃত হইতেছে এবং মানুষের সুখ সুবিধাও, দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেছে। যাহারা কৃতী মানুষ, যাহারা কর্ম্মবীর, যাহারা মানবের হিতকারী ও সভ্যতার পতাকাবাহী, তাহারা মানবজাতির এই উন্নতির রথ সজোরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত যে শিক্ষা দিলেন, লোকে যদি সেই শিক্ষা অনুসারে চলে—অর্থাৎ বিছানায় শুইব না, মাটিতে শুইব, বালিশ মাথায় দিব না, হাতের উপর মাথা রাখিব, পাত্রে খাইব না, অঞ্জলিতে খাইব, কাপড় পরার দরকার নাই, বল্কল পরিলেই চলিবে—এই নীতি যদি সকলেই অবলম্বন করে, তাহা হইলে কি হইবে? মানুষ সেকালে যেমন অসভ্য ছিল, বর্ব্বর ছিল, আবার সেইরূপ অসভ্য ও বর্ব্বর হইবে—তাহা হইলে বিকাশ বা উন্নতি হইল কি? সুতরাং, এ প্রকারের উপদেশকে যুগধর্ম্ম বলিয়া কেমন করিয়া গ্রহণ করিব?

এই আপত্তি যাঁহারা করেন, তাঁহারা অবশ্য চিন্তা করিয়াই করেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে ইহার প্রথম ও প্রধান উত্তরটি রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

"কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্"

যাঁহারা কবি অর্থাৎ সত্যের ও ন্যায়ের আলোক যাঁহাদের চক্ষুতে লাগিয়াছে, তাঁহারা "ধনদুর্ম্মদান্ধ" ব্যক্তির কেন উপাসনা করিবেন?

কলি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে—কলি-নিগ্রহই ভাগবত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কলির এত প্রতাপ কেন? "ধনদুর্ম্মদান্ধ" ব্যক্তির সকলেই ভজনা করে, ইহাই কলির প্রবলতার কারণ। সঞ্চিত ও সদ্ব্যয়হীন বিপুলধন, যাহা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, যে ধনের অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই, এই ধন ন্যায়ার্জ্জিত কিনা, সেই ধন কতকগুলি মানুষকে এক দুষ্ট অহঙ্কারে অতিমাত্রায় উদ্ধত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য করিয়াছে। তাহারাই জগতে প্রধান। "সংসারটা কার? সংসার টাকার"—ইহাই হইল নিয়ম। সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, লোকহিতৈষী—সকলেই গরু বাছুরের দামে আত্মবিক্রয় করিতেছেন, "ধনদুর্ম্মদান্ধ" ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে নিলামে ডাকিয়া খরিদ করিতেছে, ইহা কি সত্য নহে? এই যে অবস্থা, ইহার পরিণামই বা কি, আর প্রতিকারই বা কি? পরিণাম কি, তাহা বেশ

দেখা যাইতেছে ও বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমরা ভারতবর্ষে বসিয়া ও সকলের অপেক্ষা ভাল করিয়া এই কলির প্রভাব বুঝিতেছি, আর পরিণাম সম্বন্ধেও অনেকেই চিন্তা ও আলোচনা করিতেছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আপাততঃ আমরা না হয়, মৌন রহিলাম। প্রতিকার কি ? শাস্ত্রের সাহায্যে, সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়া, তাহাই আলোচনা করিতে হইবে।

চারিদিকেই শুনিতেছি—"উন্নতি উন্নতি।" কাহার উন্নতি, কিসের উন্নতি ? একটু ভাল করিয়া ভাবিয়াই দেখা যাউক না কেন ? সকলেই যাহা বলে ও যাহা ভাবে, তাহার স্রোতে গা ভাসাইয়া লাভ কি ? একটি একটি করিয়া মানুষ ধরিয়া হিসাব করিলে বলিতে হইবে, উন্নতি নহে, অবনতি—অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় অবনতি। আমার কি উন্নতি হইয়াছে ? আমি ভাল ভাল জামা গায়ে দিই, মোজা পায়ে দিই। কিন্তু যদি কোন দিন দু'এক ঘণ্টা এই মোজা ও জামা না জোটে, কার্ত্তিকের শিশির বা মাঘের শীত যদি দু'এক ঘণ্টা খোলা গায়ে, খোলা পায়ে, খোলা মাথায় সহিতে হয়, তাহা হইলে আমি কোথায় ? তাহা হইলে আমি গিয়াছি—একেবারে সোজাসুজি যমের বাড়ীই গিয়াছি ; কেবল যে সর্দ্দিজ্বরে প্রাণে মরিয়া গিয়াছি তাহা নহে, চিকিৎসকের দর্শনীতে আর ঔষধের দামে, ধনেও গিয়াছি। ভাবুন, আমি কত দুর্ব্বল, কত শক্তিহীন ও কত অসহায় ! প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য যে আমি একেবারেই হারাইয়াছি ! জামা, জুতা বা মোজায় আপত্তি নাই, কিন্তু আমি যে দুর্ব্বল হইয়া আত্মঘাতী হইলাম ! সুতরাং—উন্নতি না অবনতি !!

উন্নতি হইয়াছে, সকালে উঠিয়াই দেখিতেছি, খাবার প্রস্তুত—অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য—নানাদেশের নানা জিনিস রসনার সুতৃপ্তি, দেহেরও পুষ্টি। কিন্তু যদি কোন দিন এই খাবার না জোটে—তাহা হইলেই চক্ষু স্থির, একেবারেই অকর্ম্মণ্য, উপবাস করিবার শক্তি নাই—অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিবার সামর্থ্য নাই। ইহার নাম—উন্নতি, না অবনতি !

উন্নতি হইয়াছে—সর্ব্বত্রই গাড়ী ঘোড়া—কষ্ট করিয়া হাঁটিতে হয় না—আর "ছয় দণ্ডে চলে যাই ছ' মাসের পথ"। কিন্তু যদি না জোটে, তাহা হইলে যে এক পদও চলিতে পারি না—উন্নতি না অবনতি !

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটি একটি করিয়া মানুষ ধরিয়া হিসাব করিলে বলিতে হইবে,

উন্নতি নহে, অবনতি—অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় অবনতি—বিশেষ করিয়া আমাদের ভারতবর্ষে। নানা প্রকারের আলোচনার দ্বারা এই সত্য, প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কিন্তু আর কথা বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই। যাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন বা ধর্ম্ম-কথা বা শাস্ত্রকথা বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহারা ভাবিবেন—উন্নতি মিথ্যা নহে এবং যাহাকে লোকে উন্নতি বলিতেছে, তাহাও হয়ত সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় নহে, কিন্তু বিচার করিতে হইবে,—কাহার উন্নতি, কিসের উন্নতি!

অনাত্মের দ্বারা অনাত্মকে বহুল পরিমাণে আয়ত্ত করা হইয়াছে, ইহারই নাম উন্নতি, ইহারই নাম সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি। ইহা যে মন্দ, তাহা নহে; কিন্তু মানুষ যে আত্মবস্তু, সুতরাং এই উন্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতি নহে। মানবের প্রকৃত উন্নতি অন্য প্রকারের ব্যাপার। এই উন্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতির সহায়কও হইতে পারে, প্রতিবন্ধকও হইতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে, এই বাহ্য উন্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতির সহায়ক না হইয়া প্রতিবন্ধক হইয়াছে। পুরাণের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পব্যাপী ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এই প্রকারের অবস্থা যে এই প্রথম হইল তাহা নহে, পূর্ব্বেও অনেক বার হইয়াছে। এই অবস্থা বড়ই ভয়ানক অবস্থা—দেবাসুর সংগ্রামের প্রকট অবস্থা। এই অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাই শিখাইতেছেন। সুতরাং, শ্রীমদ্ভাগবত যুগ-ধর্ম্মের প্রচারক।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধ হইতে যে স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য কি? শ্রীশুকদেব, নিরাশ-হৃদয় ও অবসাদগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের হৃদয়, নবীন আশায় আলোকিত করিয়া শ্রীভগবানের স্থূলরূপে বা বিরাট্‌রূপে মনোধারণ করিতে বলিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যতদূর পর্য্যন্ত মানুষ ভাবিতে পারে, তাহা সেই পুরুষের দেহ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, দূর ও নিকট, চেতন ও অচেতন, স্থূল ও সূক্ষ্ম—সমস্তই এক মহান্ ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সুমহান্ ঐক্য কল্পনামাত্র নহে, একটা বিরাট জড় বা অচেতন সত্ত্বাও নহে। ইহা মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তমের স্থূলমূর্ত্তি। সেখানে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, ও জ্ঞানশক্তি আছে মানুষ আত্মা. এই মানবাত্মাও অসীম, সেইজন্যই তাহার পক্ষে অসীমের ধরণা সম্ভব। এই অসীমের ধারণা বা উপলব্ধি লইয়া মানবকে সাধনপথে বা নিজের প্রকৃত উন্নতি বিধানের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইবে। এই উন্নতি কি?

চৈতন্যের দ্বারা জড়কে, আত্মার প্রবুদ্ধশক্তির দ্বারা এই বিশাল অনাত্মকে পরাজিত করিতে হইবে—আয়ত্ত করিতে হইবে।

অনন্তের ধারণায় যাঁহারা চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাঁহারাই ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিবেন ; নতুবা ছলধর্ম্ম বা ধর্ম্মাভাস লইয়া বঞ্চিত হইবেন—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়। অনন্তে মনোধারণা যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা কবি। তাঁহারা যে সংসার ছাড়িয়া বনে চলিয়া যাইবেন, তাহা একেবারেই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় নহে। সংসার কিছুই নহে বলিয়া ইহা ছাড়িয়া যাওয়া লীলাবাদীর ধর্ম্ম নহে—এই বিশ্বকেই শ্রীকৃষ্ণের লীলায় পরিণত করাই লীলাবাদ বা ভাগবতধর্ম্ম। তাই শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—অনন্তে যাঁহারা মনোধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কবি। তাঁহারা প্রথমতঃ এক কার্য্য করুন, তাঁহারা ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণের ভজনা একেবারে পরিত্যাগ করুন। নতুবা ভাগবতধর্ম্মের সাধনা বা কলিনিগ্রহ একেবারেই অসম্ভব। এই কথা শুনিয়া ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তি বলিবেন—আমার হাতে পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য বস্তু রহিয়াছে—আমার ভজনা না করিলে তোমার পৃথিবীতে প্রাণধারণ করাই অসম্ভব। তুমি খাইবে কি ? তুমি পরিবে কি ? তোমার অন্নবস্ত্র শয্যাগৃহ প্রভৃতি সমস্তই আমার করায়ত্ত—সুতরাং যতই সাধু হও আর যতই পণ্ডিত হও, আমার দুয়ারে তোমাকে আসিতেই হইবে, আমার জয়গান তোমাকে করিতেই হইবে—ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তি ইহাই বলিবে। বলিবে কেন, যদি চোখ থাকে, চাহিয়া দেখুন, তাহাই বলিতেছে, আর অমনি কবি কাতর হইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিতেছেন। এ অবস্থায় উপায় কি ? যাঁহারা ভাগবতধর্ম্মের উপাসক, তাঁহারা যে শ্রীভগবানের সৈনিক, তাঁহারা যে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ভার লইয়াছেন—তাঁহারা যাহা করিবেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ পালন করিলে, অনাত্মের বাধ্যতা যাহা তমোগুণ হইতে জন্মায়, যাহা মানুষকে সর্ব্বদাই বাহিরের সাহায্য অন্বেষণে নিযুক্ত করে, সেই বাধ্যতা অপগত হইবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন —"এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মানুষকে বিষয়মাত্রেই বিরক্ত হইতে হইবে এবং নিজের চিত্তে যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা করিতে হইবে।" এক কথায় বলিলে এই দাঁড়ায় যে, আত্মশক্তিতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই—এই আত্মশক্তির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই প্রথম কথা। এই প্রসঙ্গে

শ্রীমদ্ভাগবত আর একটি কথা বলিয়াছেন, সেই কথাটির অর্থ জানিলেই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। আত্মশক্তির মহিমা যে এই প্রকারে বুঝিতে পারে নাই, সে পশু। শ্রীধরস্বামী এই 'পশু'-কথার অর্থ করিয়াছেন—কর্ম্মজড়। পশু কি, তাহা বুঝাইবার জন্য পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"পশুরেব স দেবানামিতি শ্রুতেঃ"—অর্থাৎ বেদে আছে সে দেবগণের পশু মাত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ও স্বামীপাদের উদ্ধৃত এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং, এই শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম নির্ণয় করা আবশ্যক।

সুখের বিষয়, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়, তাঁহার বেদান্তের গোবিন্দ ভাষ্যে, এই শ্রুতি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা সেই ব্যাখ্যারই আলোচনা করিতেছি। (বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের সপ্তমসূত্রের গোবিন্দ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)

অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যো ঽহস্মীতি
ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানামিতি বৃহদারণ্যকে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, এবং উপাস্য দেবতা, বা নিজের তত্ত্ব অবগত নহে সে উপাস্য দেবের পশু।" আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে চন্দ্রলোক-গত জীব 'সোমরাজ' নামে খ্যাত এবং ঐ জীব দেবগণের খাদ্য, দেবতারা ঐ জীবগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রুতির মীমাংসা করিয়া গোবিন্দভাষ্যে কথিত হইয়াছে—অন্ন যেরূপ ভোজনের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ ভাবে ভক্ষিত হওয়া অবশ্য জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহার অর্থ, অন্ন যেরূপ ভোগের বস্তু, জীবও সেইরূপ দেবতাদিগের ভোগের বস্তু। গোবিন্দভাষ্য আরও ভাল করিয়া বুঝাইলেন—

"বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশামিত্যৌপচারিক প্রয়োগদর্শনাচ্চ।"

রাজার সম্বন্ধে প্রজা যেরূপ অন্ন, এবং প্রজার সম্বন্ধে পশু যেরূপ অন্ন বলিয়া কথিত হয়, জীবও দেবগণের সম্বন্ধে সেইরূপ।

"অন্নবৎ তদ্ ভোগহেতুত্বাদুপচরিতমিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুত্বং তৎসেবকত্বাৎ। হচ্চানাত্মবিত্ত্বাৎ। শ্রুতিরপ্যনাত্মজ্ঞস্য দেবসেবকতাং দর্শয়তি।"

দেবগণের ভোগের হেতু বলিয়াই জীবগণ অন্ন বলিয়া কথিত হয়। দেবগণের সেবক

বলিয়াই জীবকে অন্ন বলা হইয়াছে। যখন জীবের আত্মজ্ঞান না থাকে, তখন জীব দেবগণের সেবক— শ্রুতি আত্মজ্ঞানশূন্য জীবকে দেবসেবক বলিয়াছেন।

"পশু"-কথাটি, শ্রীমদ্ভাগবত কেন ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল। যে মানুষের নিজত্ব বিকশিত হয় নাই, 'আমি, আমি' এই বোধে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, আমার হৃদয়-দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্বপাত হয়, আমি অনন্তের, আমার নিজের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে—এই অনন্ত দেশ, অনন্ত কাল ও অনন্ত বৈচিত্র্যকে আয়ত্ত করিতে পারি—এই বোধ এখনও যাহার হয় নাই, বৈদিক ঋষির মতানুসারে, সে মানুষ এখনও মানুষ হয় নাই, সে এখনও পশু হইয়া রহিয়াছে। এই পশু, দেবতাদের সেবক অর্থাৎ যেখানে ভয়ের কারণ আছে বা লোভের কারণ আছে, সেইখানেই সে মাথা নোয়াইয়া যুক্তকরে তোষামোদ করিতেছে।

ভাগবত-ধর্ম্ম যাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহার শেষ কথা জীবকে বুঝিতে হইবে—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।" প্রশ্ন এই, এই জীব, যিনি 'নিত্য কৃষ্ণদাস' বলিয়া নিজেকে বুঝিবেন, তিনি কোন্ জীব? আত্মজ্ঞানহীন ও তমোগুণাচ্ছন্ন পশু-জীবের কথা বলা হইল, সেই কি কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য? যাহার আত্মজ্ঞান হয় নাই, আত্মজ্ঞানের সাহায্যে যাহার পশুত্ব এখনও মোচন হয় নাই, সে কি ভাগবত-ধর্ম্মের অধিকারী? ইহার উত্তর,—সে একেবারেই অধিকারী নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের যে শ্লোকগুলি আলোচিত হইল তাহা ভাগবত-ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহার সাহায্যে ইহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা গেল।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ কথা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই "ব্রজেশতনয়" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীবৃন্দাবন-লীলার প্রধান কথা—দেবতাদিগের পরাজয়। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মদন একে একে বৃন্দাবনে পরাজিত হইয়াছেন। গোবর্দ্ধন যজ্ঞে ইন্দ্রপূজা নিবারণের জন্য, নন্দকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আলোচনা করিলে, পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রপূজা উঠাইয়া দিতে বলিলেন কেন, ইহা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সেখানকার শ্লোকগুলি অতিশয় স্পষ্ট—আত্মজ্ঞানহীন মানব দেবতাদিগের

খাছ—সেই মানুষ, পশু-মানুষ। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ—যিনি আজ বাহিরে প্রকট হইয়াছেন, কিন্তু স্বরূপে আত্মার আত্মা, তাঁহার আরাধনা করিবার অধিকার এই পশু-মানুষের নাই। পশু-মানুষ যদি দলে মিলিয়া এই আরাধনা করে, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা যে কেবল নিষ্ফল হইবে তাহা নহে, অনধিকার-চর্চ্চার জন্য সে ব্যক্তি অধঃপাতিত হইবে। বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোবিন্দের আরাধনা আত্মজ্ঞানহীন পশুর ধর্ম্ম নহে, ইহা আত্মজ্ঞানের পরিপক্কতার ধর্ম্ম। এসম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য এতই সুস্পষ্ট যে, কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই।

এইবার আলোচনা করুন—"কৃপাহি কেবলম্"—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই মূল। শ্রীমদ্ভাগবতের ইহাই শেষ কথা এবং ইহাই মর্ম্মকথা। এখন ভাবিতে হইবে, এই 'কৃষ্ণ কৃপা' বস্তুই বা কিরূপ এবং ইহা কার্য্যই বা করে কিরূপে? আরও বুঝিতে হইবে জীবের আত্মশক্তি, যাহার কথা এতক্ষণ বলা হইল, সেই আত্মশক্তি স্ফুরণের সহিত এই কৃপার সম্বন্ধই বা কিরূপ।

শেষের দিক্ হইতেই বিষয়টির আলোচনা করা যাউক।

"ভগবানের কৃপা" ও "মানবের আত্মশক্তি"—ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? প্রশ্নটি মোটেই কঠিন নহে। 'ভগবান্'-সম্বন্ধে একটা সঠিক্ ধারণা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিলে, আপনা হইতেই এই প্রশ্নের সুমীমাংসা হইয়া যাইবে। ভগবান্ আছেন, এবং যাহা কিছু হইতেছে, সমস্তই তিনি করিতেছেন। কিন্তু ভগবান্ যে আছেন, কি প্রকারে তিনি আছেন? তুমি যে প্রকারে আছ, আমি যে প্রকারে আছি, ঐ পাহাড়, নদী, সমুদ্র বা সূর্য্য চন্দ্র তারকা যে প্রকারে, একটি অন্যটি হইতে পৃথক্ হইয়া, প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায় এবং নিজের জায়গায় অন্য কাহাকেও থাকিতে না দিয়া যে প্রকারে আছে, ভগবান্ও কি সেই প্রকারে দূরে বা নিকটে, কোন একটি স্থান জুড়িয়া দাঁড়াইয়া, বসিয়া বা শুইয়া আছেন?

ভগবান্কে কর্ত্তা করিয়া, তাহার পর 'আছেন' এই ক্রিয়াটি আমরা সকল সময়েই ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু উপনিষদ্ ভাগবতাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে চিন্তা করিতে হইবে, ভগবানের এই থাকাটা কি প্রকারের থাকা, তাঁহার সত্ত্বার লক্ষণ কি, বৈশিষ্ট্য কি? আমি, (আত্মা-আমি নহে, দেহ-আমি) আছি। কি প্রকারে

আছি, তাহা আমি মোটামুটি বুঝি বা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারি। অন্য সকলের সত্বা হইতে পৃথক্ হইয়া, একটি নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে আমি আছি—সে স্থানে আর কেহ আসিতে পারে না। ভগবানের থাকা, এ প্রকারের থাকা নহে। তিনি আছেন, তিনিই আছেন,—অন্য কাহারও থাকার প্রতিবন্ধক হইয়া নহে, অন্য কাহারও সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া নহে, তিনি আছেন, তিনিই আছেন,—সকল দেশ ও সকল কাল জুড়িয়া একমাত্র তিনিই আছেন। আমি মনে করিতেছি আমি আছি, তুমি মনে করিতেছ তুমি আছ, এই যে আমার ও তোমার থাকা, ইহা একটা মনে করা মাত্র অর্থাৎ প্রতীতি। আমাদের সকলের এই যে 'আছি' বলিয়া মনে করা, এই মনে করার মূলে, এই মনে করাকে সম্ভব করিয়া, সত্য করিয়া, অর্থাৎ এই প্রতীতির অধিষ্ঠানরূপে তিনিই একমাত্র আছেন। আমরা সকলেই তাঁহার সত্বায় সত্বাবান্, তাঁহার চেতনায় চৈতন্যবান্, তাঁহার আনন্দে আনন্দবান্। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অভিপ্রায়।

তাঁহার থাকাও যেমন, তাঁহার করাও তেমন। তিনিই করিতেছেন, সকলই তিনিই করিতেছেন, তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। কিন্তু আমাদের করার ব্যাঘাত করিয়া নহে, আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য, নিশ্চেষ্ট ও জড়ভাবাপন্ন করিয়া নহে,—পরন্তু আমাদিগের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া, আমাদিগের কর্ম্মশক্তি স্ফুরিত করিয়া, আমার এই যে 'আমি করি' বলিয়া মনে করা, এই মনে করার মূলে সত্য করিয়া তিনিই করেন। তাঁহার করাতে আমাদের প্রত্যেকের মনে হইতেছে—'আমি করিতেছি।'

প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। আমরা নানাস্থানে নানাআকারে এই কথা বলিয়া থাকি। তরঙ্গ ও সমুদ্রের উদাহরণ, যাত্রাদলের অধিকারীর উদাহরণ প্রভৃতি বলিয়া বলিয়া পুরাতন হইয়া গিয়াছে—আসল কথা, একটু গভীরভাবে চিন্তা না করিলে, এই তত্ত্বটুকু সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু ধর্ম্মসাধনার প্রারম্ভে, এই তত্ত্বটি বেশ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই তত্ত্বটি না বুঝিলে, শ্রীমদ্ভাগবতের বা শ্রীভগবানের লীলার কিছুই বুঝিবেন না, যাহা বুঝিবেন তাহা একেবারে ভুল বুঝা হইবে। আমরা এইবার সুবোধ্য উদাহরণের দ্বারা তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

কৃপা বড়ই পবিত্র জিনিস। মহাকবির উক্তি আছে, যিনি কৃপা করেন, তিনিও ধন্য,

আর যিনি কৃপা গ্রহণ করেন, তিনিও ধন্য। কৃপা একটি দৈবী সম্পৎ। কিন্তু এই কৃপা যে বড়ই দুর্লভ। আমরা আমাদের সংসারে যে কৃপা দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃত কৃপা-পদবাচ্য নহে। আত্মশক্তির মহিমা সম্বন্ধে যাহারা একেবারে অজ্ঞ, নিজের শক্তির স্ফুরণের জন্য যাহাদের চেষ্টাও নাই, ইচ্ছাও নাই, তাহারা কৃপাবাদী অর্থাৎ তাহারা বাহিরে কোন একজন প্রবল ব্যক্তির কৃপার প্রত্যাশায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিয়াছে। এই প্রকারের কৃপা-অন্বেষণ আত্মহত্যা। ভগবান্ কৃপা করেন এবং তাঁহার কৃপাই জীবের একমাত্র সম্বল। একথায় কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি কি প্রকারে কৃপা করিবেন? তিনি কি আমাকে নিশ্চেষ্ট ও জড়ভাবাপন্ন করিয়া আমার বাহির হইতে আমাকে কৃপা করিবেন? উত্তর—না, তিনি আমার ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি আমার কর্ণের কর্ণ, চক্ষুর চক্ষু প্রাণের প্রাণ, মনের মন, তিনি হৃষীকেশ অর্থাৎ আমার এই ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক ও অধিষ্ঠাতা, তিনি আত্মার অন্তর্যামী। অতএব, ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিবার সময় আমাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে থাকিবে না, ভিতরের দিকে থাকিবে। আমরা অন্তর্মুখী হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিব এবং তিনি আমার ভিতর হইতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, আমার আত্মশক্তি স্ফুরিত করিয়া, আমাকে প্রকৃত বিজয়ে লইয়া যাইবেন। ইহাই ভগবানের কৃপার রহস্য। অতএব কৃপা-বাদীর নিশ্চেষ্ট হইবার উপায় নাই, ভগবানের দেওয়া দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণ লইয়া, তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের সেবায় পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার বিশ্রাম নাই, বিশ্রাম করিবার আকাঙ্ক্ষাও নাই, তিনি সর্ব্বদাই অতন্দ্রিতভাবে পরিশ্রম করিতেছেন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে আমরা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কিরূপ, তাহার অতি সুন্দর পরিচয় পাই। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক অর্ব্বুদ সশস্ত্র নারায়ণী-সেনা পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন—আর অর্জ্জুন পাইলেন একা শ্রীকৃষ্ণকে, তাও আবার তিনি নিরস্ত্র এবং যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু অর্জ্জুনও অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন সৈন্য লইয়া চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, তুমি জান যে আমি যুদ্ধ করিব না, তথাপি তুমি আমাকে বরণ করিলে কেন?" অর্জ্জুন বলিলেন—"ভগবন্! আপনি সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিতে সমর্থ, আপনার কীর্ত্তি ত্রিলোকবিখ্যাত। কিন্তু আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশোলাভ করিব, এই বাসনায় আপনাকে সমর-পরাঙ্মুখ জানিয়াও বরণ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, আপনি আমার রথে সারথী হইবেন।"

এই অংশের প্রকৃত তাৎপর্য্য—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়াছেন, সেই কারণে তাঁহার আত্মশক্তি বা আত্মনির্ভরতা জাগিয়া উঠিয়াছে, দুর্যোধন সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

অজামিলের উপাখ্যান অনেকেরই পরিচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে এই উপাখ্যান সুবিস্তৃত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপাখ্যান বলিবার পূর্ব্বে আমরা, 'শ্রীশ্রীভক্ত-মাল'-গ্রন্থ হইতে অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছি। ভক্তমালের বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা একবার তুলনা করিয়া দেখা দরকার। তুলনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, ভাগবতের কথা ভক্তমালে আসিয়া বদলাইয়া গিয়াছে। যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা অবশ্য চিন্তা করিবেন, কেন বদলাইয়া গেল—আর যাঁহারা সত্য ধর্ম্মের সেবক, অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে বাজার চলতি যাহা হয় একটা কিছু লইয়া যাঁহারা জগৎকে ও নিজেকে ভুলাইতে চাহেন না, যাঁহারা সত্য সত্য ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে চাহেন, তাঁহারা আলোচনা করিবেন, উপাখ্যানাংশ এই প্রকারে বদলাইয়া যাওয়ায় জগতের কিরূপ কল্যাণ বা অকল্যাণ হইয়াছে বা হইতে পারে।

'ভক্তমাল'-গ্রন্থের বর্ণনা এইরূপ। অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল না, কেবল পাপাচরণ করিত। সে গোব্রাহ্মণদ্রোহী, মদ্যপায়ী ও মাংসাশী ছিল, ব্যাধের আচার, রাশি রাশি হত্যা করিত। গৃহত্যাগী ও স্ত্রীত্যাগী হইয়া সে বেশ্যার সহিত বনে বাস করিত। বেশ্যার গর্ভে তাহার চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দৈবযোগে এক সাধু আসিয়া তাহার গৃহে অতিথি হইলেন। অজামিলের রক্ষিতা বেশ্যা ভক্তিভাবে অতিথির সেবা করায় সাধু দয়ার্দ্র হইলেন। তিনি ভাবিলেন ইহারা ঘোর পাপী, ইহাদিগকে কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে না। তখন সাধু এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বেশ্যাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে ভোজন করাইয়া তুষ্ট করিয়াছ, আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। তোমার গর্ভে এইবার একটি পুত্র জন্মিবে, তুমি তাহার নাম রাখিও—নারায়ণ"। সাধুর কথায় ছেলের নাম রাখা হইল—"নারায়ণ"। তাহার পর অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত। অজামিল পাপিষ্ঠ, কাজেই যমদূতেরা দণ্ডপাশ লইয়া মুমূর্ষু অজামিলের নিকট উপস্থিত হইল। যমদূত দেখিয়া অজামিল ভয় পাইয়া নিজের পুত্রকে "নারায়ণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ফেলিল। যেই "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছে, অমনি—

"সর্ব্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন।

আর দুইজন শ্যামলসুন্দর বৈকুণ্ঠের দূত—"হায় হায় যমদূতগণ হরিভক্তকে দণ্ড দিতেছে!"—এই কথা বলিতে বলিতে অজামিলের মৃত্যুশয্যার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৈকুণ্ঠের দূতেরা গদার প্রহারে যমদূতদিগকে প্রহার করিয়া তাহাদের হাত পা ভাঙ্গিয়া দিল এবং তাড়না ও ভৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল—

"নিষ্পাপ নির্গুণ অজামিল মহামতি।
এহেন জনেরে দণ্ড! কি তোর শকতি?"

গদার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া যমদূতেরা বলিতেছে,—"আমরা ধর্ম্মরাজের দূত, তোমরা কে? আমাদের অপমান করিতেছ কেন? আর পাপীকে কাড়িয়াই বা লইতেছ কেন"?

বিষ্ণুদূতেরা বলিলেন—"তোমাদের ধর্ম্মরাজ বেশ ধর্ম্ম জানে দেখিতেছি। তাহার বড় অহঙ্কার হইয়াছে। যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সমগ্র জীবনে একবার 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকে, সে কদাচ পাপী নহে। ধর্ম্মরাজ যখন তাহাকেই পাপী বলে, তখন সে ধর্ম্মের কিছুই জানে না।"

যমদূতগণ পরাজিত, অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া যমালয়ে ফিরিয়া গেল এবং যমরাজের সম্মুখে অভিমান সহকারে দণ্ড ও পাশ আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

"কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার।
ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর॥"

ধর্ম্মরাজ বিস্মিত হইয়া দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি এমন অন্যায় কার্য্য হইয়াছে"? দূতেরা বলিল—"আমাদের নাক কাটা গিয়াছে। অজামিল মহাপাপী, তাহার পুণ্যের লেশমাত্র ছিল না। তাহার মৃত্যুকাল, আমরা তাহাকে আনিতে গিয়াছিলাম। কাহার নাম "নারায়ণ," আমরা তাহা জানিনা। সে ব্যক্তি তাহার পুত্রকে এই নামে ডাকিয়াছিল। যেমন ডাকা, আর অমনি দুইজন মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন মেঘের তুল্য তাঁহাদের অঙ্গকান্তি. তাঁহারা কমলনয়ন। তাঁহারা আসিয়াই অজামিলের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। আর আমাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব, এই প্রত্যক্ষ দর্শন করুন।"

দূতগণের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজের মনে যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অঙ্গে অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য, স্বরভেদ প্রভৃতি প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার জাগিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি দূতগণকে কহিলেন,—"বৎসগণ, তোমরা করিয়াছ কি! তোমরা কোথায় গিয়াছিলে? তোমরা আমার মাথা খাইয়া একি কার্য্য করিয়া আসিলে! শুন, অতিশয় গুহ্য কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। সে ব্যক্তি আমার প্রভুর নাম লইয়াছিল,—তোমরা সেখানে কেন গিয়াছিলে?

"ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিবাস।
তাঁর নাম লৈল সেই, মুক্তি যাঁর দাস॥
কোটি কোটি মহাপাপ অতিপাপ হয়।
অগ্নি-কণে তুলারাশি যৈছে ভস্ম হয়॥"

ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া দূতগণ অতিশয় বিস্মিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভো, এই সব কথা আমাদিগকে পূর্ব্বে কেন বলেন নাই?"

তাহার পর যমরাজ দূতগণকে বলিয়া দিলেন—

"হরিনাম গুণ কথা যথায় শুনিবে।
তুলসীর মালা, ভালে তিলক দেখিবে॥"

সেখানে নমস্কার করিয়া দূরে অন্য পথে চলিয়া যাইবে। আমার একথা না শুনিলে অনুতাপ করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া "দূত কহে বুঝিলাম আর নারে বাপ!"

'ভক্তমাল'-গ্রন্থে অজামিলের পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই—এইখানেই উপাখ্যানের শেষ। গ্রন্থকার উপাখ্যানের উপসংহারে ভক্তগণের চরণ স্মরণ করিয়াছেন।

এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা আলোচনা করা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও উপাখ্যান আলোচনা করিতে হইলে, সেই আলোচনার একটি রীতি আছে। সেই রীতি আমাদের অন্যস্থান হইতে শিখিতে হইবে না, মূল ভাগবতে এবং পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকাতেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের যষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ স্কন্ধের আলোচ্য বিষয়ের নাম—পোষণ। 'পোষণ' কথার অর্থ—শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। পঞ্চম স্কন্ধে 'স্থান' বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—জীব-সমূহ বিসর্গ-সম্ভূত। এই জীব নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত

থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, আর বিষ্ণু তাঁহার বিবিধ রূপের দ্বারা তাহা-দিগকে রক্ষা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহারই নাম—'স্থান'। পঞ্চম স্কন্ধে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জীব সকল সময়ে নিজ নিজ মর্য্যাদা পালন করিয়া চলে না। অনেক সময়েই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে। যাহারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহারা অধোগামী ও নরকস্থ হয়। *তাহাদের মধ্যে যাহারা ভক্তিপথ প্রাপ্ত হয়, ভগবান তাহাদিগকে* রক্ষা করেন। ইহারই নাম—'পোষণ'। অজামিল মনুষ্যদিগের মধ্যে মহাপাপী,—আবার বিশ্বরূপ প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রও পাপ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ স্কন্ধে প্রথমে অজামিলের কথা—তাহার পর ইন্দ্রের কথা, বৃত্রবধ ও মরুদ্গণের উপাখ্যান আলোচিত হইয়াছে। এই পোষণ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামীর মতে অজামিলের উপাখ্যানের প্রারম্ভে ভূমিকারূপে এই কথাটি জানা আবশ্যক।

এইবার প্রসঙ্গের আরম্ভ। ধর্ম্মাচরণের দুই পথ—নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গে অর্চ্চিরাদি লোকের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ, আর প্রবৃত্তিমার্গে স্বর্গাদি প্রাপ্তি ও পুনঃ পুনঃ ভোগসাধন দেহলাভ। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে এই সব কথা আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর অধর্ম্ম, অধর্ম্মের ফলে নরক-যন্ত্রণা। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। এখন মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—নরক হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? মানুষ পাপ করিয়া শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করে, কিন্তু তাহাতে পাপের মূল উৎপাটিত হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার পাপাচরণ করে। সুতরাং উপায় কি?

শ্রীশুকদেব বলিলেন—চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত, অবিদ্বান্ ব্যক্তির জন্য। উহাতে পাপের মূলোচ্ছেদ হয় না। মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত—জ্ঞান। নিয়ম করিয়া প্রতিনিয়ত যত্ন করিলে এই জ্ঞান লাভ হয়। আবার ভক্তিমার্গ, জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ করিয়া ভক্তের সেবা করিলে যে পবিত্রতা জন্মায়, তপস্যাদি দ্বারা তাহা জন্মায় না। ভক্তি পথে বিঘ্ন নাই, অভাব নাই, ভয় নাই। ভক্তিপথের সাধন অল্পমাত্র করিলে পবিত্রতা জন্মায়।

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে একবার মাত্র নিজের মন নিবেশিত করেন, তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট মাত্রই হয়, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান সম্পন্ন হয় না। কিন্তু তাহারই ফলে যম ও পাশহস্ত যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি শ্রীভগবানে একবার মনোনিবেশ করেন, তাঁহার তদ্দ্বারা সমুদয় প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হয়।

এই শ্লোকটির পরেই অজামিলের উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। অজামিলের কথা একটি পুরাতন কথা, এই কথার দ্বারা উদ্ধৃত শ্লোকের যাহা তাৎপর্য্য তাহাই উদাহৃত হইয়াছে। সুতরাং, অজামিলের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য বেশ ভালরূপ চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে একবার মাত্র মন নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন—এইপ্রকারে একবার মনোনিবেশ কি প্রকারে হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হওয়া চাই। অবশ্য এই প্রকারে আকৃষ্ট বা অনুরাগযুক্ত বলিলে যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন বুঝায় তাহা নহে। জ্ঞান তাহার পর হইতে পারে। হইতে পারে কেন, নিশ্চয়ই হইবে। তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে একবার মাত্র মন নিবেশিত হইলে, সে মন আর শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া বিপথগামী বা পতিত হইবে না—তাহারও প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানেই আছে। এইবার অজামিলের উপাখ্যান।

কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণকুমার ছিল। সৎ ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম, প্রথম বয়সে অজামিল বেদবিদ্যায় পারদর্শী, মৃদু, সৎস্বভাব, সদাচার-সম্পন্ন ও ক্ষমাশীল। সে সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক ব্রতধারী হইয়া থাকিত, তাহার তুল্য সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও শুচি আর কেহ ছিল না। সে অহঙ্কারশূন্য হইয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি, বৃদ্ধ প্রভৃতির সেবা করিত, সকল প্রাণীতে তাহার সৌহার্দ্দ ছিল, অতি সাধু ও পরিমিতভাষী, অসূয়া কাহাকে বলে তাহা জানিত না, কখনও কাহারও নিন্দা করিত না। এই প্রকারের চরিত্রের লোক ছিল অজামিল—প্রথম যৌবনে তাহার বিবাহ হয়।

বিবাহের পর যৌবন কালে অজামিল, তাহার পিতার আদেশে বনে গিয়াছিল, বন হইতে ফুল, যজ্ঞের কাষ্ঠ ও কুশ সংগ্রহ করিয়া বাড়ী আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে দেখিল—একটি নিম্নশ্রেণীর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মদ্যপান করিয়াছে, মত্ততা-প্রযুক্ত তাহার চক্ষু আরক্ত

ও ঘৃণিত। আর একজন নিম্নজাতীয় পুরুষ, সুরাপান নিবন্ধন লজ্জাহীন হইয়া, প্রকাশ্যেই সেই দাসীকে আলিঙ্গন করিতেছিল ও কাম-ক্রীড়া করিতেছিল। তরুণ ও সরলমতি ব্রাহ্মণ-কুমার অজামিল* এই দৃশ্য দেখিল। দেখিবামাত্র তাহার মনে মোহের সঞ্চার হইল এবং হৃদয়মধ্যে কুচিন্তা জাগিয়া উঠিল। প্রথমাবস্থায় হতভাগ্য যুবক, এই মোহ ও কন্দর্পপীড়ার সহিত ধৈর্য্য ও জ্ঞানের দ্বারা সংগ্রাম করিল, কিন্তু সংগ্রামে পারিল না। হতভাগ্য যুবক অজামিল পরাজিত ও পাপের পিচ্ছিলপথে লুণ্ঠিত হইল। হায়, হায়, একটি সাধু আত্মা বিনষ্ট হইল। কিন্তু বাহিরে বা তাহার চারিদিকে তাহাকে সাহায্য করিতে কেহই ছিল না। সে সময়ে কেহ আসিয়া তাহাকে সুদুপদেশ ও সৎসঙ্গ দিয়া এই অনভিজ্ঞ যুবককে সংশোধন করিতে চেষ্টা করে নাই। সমাজ, সামাজিক মানুষ, দুর্ব্বলকে ঘৃণা করিয়া, পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারে, দুর্ব্বল ও অনভিজ্ঞ জনের একগুণ ত্রুটি শতগুণ করিয়া বাড়াইয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে পারে, তাহাকে ধিক্কার দিতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বলকে বল দিয়া তুলিয়া লয় কে? অন্ধকে হাতে ধরিয়া সুপথ-গামী করে কে?

অজামিল অধঃপাতিত হইল, অজামিল স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইল। এই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকটি তাহার চিত্ত অধিকার করিল—সেই কামিনীকে কেমন করিয়া সন্তুষ্ট করিব, ইহাই অজামিলের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। পৈতৃক ধন দিয়া, নানারূপ ভোগের সামগ্রী দিয়া অজামিল এই স্ত্রীলোকের সেবা করিতে লাগিল। অজামিলের আর সব গেল, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিল না, বেদমন্ত্রে যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, সেই পতিব্রতা সৎকুলজাতা অবলা যুবতী সতীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিল না। কোথায় কুলধর্ম্ম, কোথায় লোকাচার, কোথায় বেদবিদ্যা, আর কোথায় সদাচার!—অল্পদিনের মধ্যেই অজামিলের সব গেল। সেই দাসীর গৃহে বাস করে, দাসীর কুটুম্বদিগের ভরণ করে, দাসীর অন্ন ভোজন করে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চরম সীমায় আসিয়া অজামিল অচিরে উপনীত হইল। সে সর্ব্বদাই অশুচি অবস্থায় থাকিত। পণ রাখিয়া পাশ-ক্রীড়া, বঞ্চনা, চৌর্য্য প্রভৃতি গর্হিত কার্য্য, তাহার জীবিকার উপায় হইল।

এই প্রকারে অধঃপতিত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত অজামিল, সমগ্র যৌবনকাল অসৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়াছে। যৌবন চিরস্থায়ী নহে। যৌবন চলিয়া গেল,

ইন্দ্রিয়ের আর সে সবলতা নাই. দেহের আর সে স্বাস্থ্য ও লাবণ্য নাই, নানারূপ ব্যাধি আসিয়া দেহকে আক্রমণ করিতেছে কিন্তু অজামিলের চৈতন্যোদয় হইল না। প্রৌঢ়কাল আসিল, কিন্তু অজামিল সেই অসৎপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। প্রৌঢ়কাল চলিয়া গেল, আজ অজামিল বৃদ্ধ—তাহার বয়স আশি বৎসর। সে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ঐ দাসীর গর্ভে অজামিলের দশটি পুত্র জন্মাইয়াছে—জরা আসিয়া দেহ আশ্রয় করিয়াছে, তথাপি অজামিল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অন্বেষণে সেই পাপভবনে, সেই দুষ্কৃতি ও অসৎসংসর্গের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। শৈশবের আত্মীয় স্বজনেরা কেহই আর নাই, জ্ঞাতি কুটুম্ব, যাহারা ছিল, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। পাপীর পরিচয়ে আর কে নিজের পরিচয় দিবে? এই প্রকারে পদাহত, বিতাড়িত ও উপেক্ষিত অজামিল, পাপপঙ্কে একাকী পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই দাসীর গর্ভে অজামিলের দশটি পুত্র জন্মাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যেটি সকলের কনিষ্ঠ, অজামিল তাহার নাম রাখিয়াছিল—নারায়ণ। শিশু বলিয়া পিতা মাতা উভয়েই, এই ছেলেটিকে বড় ভালবাসিত ও আদর করিত। এই ছেলেটি বৃদ্ধ অজামিলের একমাত্র আনন্দের বস্তু ছিল। শিশুটিও বড় মধুরভাষী, পাপভবনে এমন শিশু বড়ই দুর্লভ। অজামিলের হৃদয় ক্রমশঃ এই শিশুটিতে আসক্ত হইল—এই ছেলেটিকে দেখিতে, তাহার শিশুসুলভ ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে, অজামিলকে বড়ই ভাল লাগিত, এই ছেলেটিকে লইয়া এতই আনন্দ পাইত যে আপনাকে ভুলিয়া যাইত। খাইবার সময় ছেলেটিকে লইয়া একত্রে খাইত, তাহাকে না খাওয়াইলে অজামিলের যেন নিজের খাইয়া তৃপ্তি হইত না। সকল সময়েই অজামিল এই ছেলেটিকেই লইয়া থাকিত।

এই প্রকারে অজামিলের দিন কাটিতেছে, ক্রমশঃ তাহার অন্তকাল উপস্থিত হইল।

> স এবং বর্ত্তমানোহজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে।
>
> মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে॥

অজ্ঞ অজামিল এই প্রকারে জীবন যাপন করিতেছিল, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও 'নারায়ণ' নামক সেই বালকেই আপনার মন নিবেশিত করিল।

আজ মহাপাপী অজামিল মরিতেছে। সমগ্র জীবন অসৎসংসর্গের, অসৎ চিন্তায় ও

অসৎকার্য্যে যে যাপন করিয়াছে, জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া অশেষ উন্নতিলাভ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াও যে একেবারেই তাহার সদ্ব্যবহার করে নাই—হেলায় সব হারাইয়াছে—সমগ্র জীবন ধরিয়া যে কেবলই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়াছে—সেই পাপী, মহাপাপী অজামিল আজ মরিতেছে। পাপীর মরণ কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! পৃথিবীর আলোক একে একে নিভিয়া যাইতেছে, অতি ভীষণ অতি গভীর আঁধার দশদিশ ঘেরিয়াছে, জগতের শব্দ একে একে থামিয়া যাইতেছে, এ কি বিভীষিকাময় স্তব্ধতা! পিপাসা, দারুণ দুর্ব্বিষহ পিপাসা, জিহ্বা, কণ্ঠ, বক্ষ, উদর—সব যেন শুকাইয়া গিয়া আগুণে জ্বলিতেছে—আর যাতনা, একেবারে অনির্ব্বচনীয় যাতনা, কে যেন লোমকূপে লোমকূপে কালকূট বিষ ঢালিয়া দিতেছে! অতি মলিন, দীন ছিন্ন শয্যা, সেই শয্যায় জরাগ্রস্ত শীর্ণদেহ অজামিল—আজ মরিতেছে। নিকটে কেহ নাই যে, এক বিন্দু জল মুখে দিয়া পিপাসার উপশম করে। মধ্যে মধ্যে নরকের চিত্র দেখিতে পাইতেছে—তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নরকে ঘোর অন্ধকারে কত পাপী মূর্চ্ছিত অবস্থায় বিকট যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও দণ্ডিত হইতেছে। রৌরব ও মহারৌরব নরকে হিংস্র পাতকিগণ, অতিশয় ক্রূর সর্পগণ কর্ত্তৃক অসহায়ভাবে দংশিত হইতেছে। তাহার পর কুম্ভীপাকে তপ্ত তৈলে, কালসূত্রে তাম্রময় অতি উষ্ণ সমভূমির উপর পাতকিগণ নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। পর পর নরকের শ্রেণী—শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সংদংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টক, শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দ্দম রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন, সূচীমুখ। এই সকল নরক দেখিয়া, নরকে পতিত ও পথভ্রষ্ট নরনারীর যাতনাভোগ দেখিয়া অজামিল ভয়ে কম্পিত হইতেছে, নিজেরও অতীত জীবন-কথা ক্রমে ক্রমে মনে জাগিয়া উঠিতেছে; হায়, সকলি মলিন সকলি কদর্য্য। পাপ, কেবলি পাপ! সে যাতনার সীমা নাই। সে অন্ধকার ও যাতনার মধ্যে পাপী দেখে—তিন জন যমদূত, অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি, বক্রবদন, ঊর্দ্ধরোমাঞ্চিত, হস্তে পাশ, অজামিলের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। মানুষ দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা পাপাচরণ করে বলিয়াই তিনজন যমদূত আসিয়া উপস্থিত। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া অজামিলের হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইল। এমন সময়ে, কি তাহার সুকৃতি ছিল, কেহই জানে না—পৃথিবীর আলো, যাহা তাহার নিকটে একেবারেই নিভিয়া গিয়াছিল, সেই আলো আবার ক্ষণেকের জন্য প্রকাশিত

হইল, অজামিল সেই আলোকে চক্ষু খুলিয়া দেখিল—তাহার সেই প্রিয় শিশু পুত্র, আদর করিয়া যাহার নাম রাখিয়াছিল—'নারায়ণ', সেই পুত্রটি খেলনা লইয়া খেলা করিতেছে। সেই ছেলেটিকে দেখিয়া ভীত, যাতনাকাতর ও কম্পিত অজামিল, তাহাকে ডাকিবার জন্য ডাকিয়া উঠিল—"নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ"।

যেই চতুরক্ষর নাম উচ্চারিত হইল, অমনি সে গভীর আঁধার কোথায় দূরে চলিয়া গেল। কোথা লাগে শত পূর্ণিমার চাঁদের কিরণ, এমন বিমল ও স্নিগ্ধ আলোকে সেই গৃহতল পরিপূর্ণ হইল। নন্দনবনের বিকশিত ফুলে যে সৌরভ আছে, তাহা অপেক্ষাও মধুর অপূর্ব্ব ফুল-গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইল, আর সেই আলোক ও সৌরভের মধ্যে বিষ্ণুদূত, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল সুন্দর সুস্নিগ্ধ কোমল তনু, গলদেশে পদ্মমালা, পরিধান সুপীত বসন, প্রত্যেকেরই চারি চারি বাহু, পদ্মপলাশের তুল্য আঁখি, সে আঁখিতে করুণা-লহরী, আর বদনে মধুর হাসি,—"মাভৈঃ মাভৈঃ, ভয় নাই ভয় নাই" বলিতে বলিতে পাপীর শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন!

তখন যমদূতগণ, দাসীপতি অজামিলের আত্মাকে হৃদয়ের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিল, বিষ্ণুদূতেরা আসিয়াই যমদূতগণকে নিবারণ করিলেন।

যমদূতগণ স্বকার্য্য সাধনে এই প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বলিল—'মহাশয়গণ, আপনারা কে, ধর্ম্মরাজের আদেশ পালনে নিষেধ করেন কেন? আপনারা কাহার লোক? আমরা দুরাচার পাপীকে যমপুরে লইয়া যাইতেছি, আপনারা তাহাতে বাধা দিতেছেন কেন? আপনারা কি দেবতা, না উপদেবতা, না সিদ্ধপুরুষ'?

তাহার পর যমদূতেরা, বিষ্ণুদূতগণের সুন্দর মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তরে ভক্তির উদয় হইল, এবং আরও বিনীতভাবে বলিলেন—'আমাদের কথায় রাগ করিবেন না, আমরা ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর, তাহারই আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি। আপনাদের আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনারা পরম শিষ্ট, কিন্তু আপনাদের কার্য্য অশিষ্টের মত বোধ হইতেছে। আপনারা আমাদিগকে কর্ত্তব্যপালনে বাধা দিতেছেন, এরূপ কার্য্য আপনাদের উপযুক্ত নহে'।

এইখানে একটি কথা ভাবিতে হইবে। এখন অজামিলের অবস্থা কি? ইতঃপূর্ব্ব অর্থাৎ বিষ্ণুদূতগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অকথ্য যন্ত্রণায় একান্ত কাতর ও প্রায় সংজ্ঞাহীন

অবস্থায় অজামিল পড়িয়াছিল, বিষ্ণুদূতেরা যেমন আসিলেন, অমনি তাহার অবস্থা বদলাইয়া গেল। বিষ্ণুদূতগণের অঙ্গের ছটায় যেমন বাহিরের অন্ধকার দূর হইয়া গেল, তেমনি তাহার ভিতরের মোহের অন্ধকারও দূরগত হইল। দারুণ গ্রীষ্মে রুদ্ধ ঘরের ভিতরে ঘামে ও তৃষ্ণায় শ্বাস বন্ধ হইয়া একটি লোক যেন মরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দক্ষিণের জানালা যদি হঠাৎ খুলিয়া যায়, আর সেই জানালা দিয়া যদি স্নিগ্ধ শীতল মলয় হিল্লোল আসিয়া পীড়িতের অঙ্গে লাগে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা যেমন হয়, অজামিলের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের ঠিক্ সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদূতগণের গায়ের হাওয়া গায়ে লাগায় অজামিল নবজীবন লাভ করিলেন,—শান্তি, শান্তি, শান্তি। নববল, নবীন হর্ষ, আবার নবীন আশা—দুঃখক্লেশ একেবারে দূর হইয়া গেল। অজামিল, আনন্দ-পরিপ্লুত নয়নে বিষ্ণুদূতগণের সেই অভয়দায়ী শান্তি ও করুণা দিয়া গঠিত অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, আর বিষ্ণুদূত ও যমদূতগণের মধ্যে যে কথোপকথন হইতেছে, তাহা শুনিতেছেন। অতীত জীবন-কথা—একে একে সব মনে পড়িয়া যাইতেছে। সেই সুপবিত্র ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণের গৃহ, সেই নিত্য হোম, দেবপূজা, নিত্য বেদপাঠ, সেই নিয়ত অতিথি-সেবা। পুণ্যের সংসার, তপস্যার শান্ত মূর্ত্তি সেই পিতা মাতা, সেই সব অতীতের কথা—একে একে অজামিলের অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছে। শৈশবে ও প্রথম যৌবনে যে সব শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, তাহাও সব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। এতদিন মোহাচ্ছন্ন হইয়া এ সব কথা ভুলিয়াছিলেন। তাহার পর সেই পতনের দশা, মোহ, ভ্রান্তি, পরাজয়, পাপ, মহাপাপ, একেবারে মলিন, অতিশয় মলিন। তার পর অনুতাপ, দারুণ, অতি ভীষণ! হায়, করিয়াছি কি! এত সুযোগ হেলায় হারাইলাম! যাতনার সীমা নাই। তার পর, বিষ্ণুদূতদের দেখিতেছেন, নবীন আশার রশ্মি, হৃদয়ভরা গভীর আঁধারের ভিতর জ্বলিয়া উঠিতেছে—কি কৃপা! নিখিল বিশ্ব করুণার অমৃতসাগরে ভাসিতেছে। সুনীল গগন সেই করুণায় চিরদিন উচ্ছ্বসিত, এ বায়ুমণ্ডল সেই করুণার রসে সরস, শীতল। আসিতেছেন, সেই অনন্ত করুণাময়, চির জোয়ারে উচ্ছ্বসিত মহাসমুদ্রের মত, আপন আনন্দে আপনি বিহ্বল, ঢেউ তুলিয়া অবিরাম নাচিতে নাচিতে আসিতেছেন। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, হায় আমি করিয়াছি কি? এমন জগৎ, করুণার ধাম, এমন জীবন, ভারতবর্ষে দুর্লভ মানব জীবন, অতীতের শত শত ঋষি, সাধু, তপস্বীর সাধন-

স্মৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া, জগতে আসিয়া এমন সুযোগ একেবারে হেলায় হারাইলাম,—হায়, করিয়াছি কি ? আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই করুণার সাক্ষ্য দিতে, এই করুণার উপযুক্ত হইবার জন্য আবার বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোথা আমি দুরাচার, পাপী, মহাপাপী,—আর কোথা করুণাঘন-মূর্ত্তি এই নীলেন্দিবরশ্যাম বিষ্ণুদূতগণ! অজামিল বিস্ময় বিস্ফারিত ও আনন্দালোকপূর্ণ নয়নে এই বিষ্ণুদূতগণকে দেখিতেছেন ও এই সব কথা ভাবিতেছেন।

এই গেল একদিক্, অজামিলের ভিতরের কথা অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রকারে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই—কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা এই প্রকারেই বুঝিতে হইবে।

এইবার দ্বিতীয় কথা। যমদূতেরা আসিলেন, অজামিলের মুখে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারিত হইল, আর অমনি "মাভৈঃ—মাভৈঃ" বলিতে বলিতে বিষ্ণুদূতেরা আসিলেন, তাহার পর যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে কথোপকথন হইল—অজামিল এই সব দেখিলেন, শুনিলেন। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে, ইহা কেবল অজামিলই দেখিলেন ও শুনিলেন—সেখানে অবশ্য আরও লোক ছিল। অজামিল তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখিয়াছিল, অন্যান্য লোক বা অন্যান্য পুত্র প্রভৃতি যে সেখানে ছিল, তাহা একরূপ নিশ্চয়। কিন্তু এই যমদূত ও বিষ্ণুদূত অন্য কেহ দেখিতে পায় নাই, ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। পুরাণের কোন ঘটনা ঠিক্‌মত অর্থাৎ 'তত্ত্বতঃ' বুঝিতে হইলে, সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—এই ঘটনার সাক্ষী কে ? অর্থাৎ, কাহার জ্ঞানের নিকট এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই প্রশ্নটি সকল সময়েই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—এই প্রশ্নের উত্তর না পাইলে পুরাণের রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

এইবার যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে কথোপকথন—অজামিল এই সব কথা শুনিতেছেন। বিষ্ণুদূতগণ প্রশ্ন কর্ত্তা : তাঁহারা নিম্নের প্রশ্নগুলি যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১। ধর্ম্মের স্বরূপ কি ?

২। ধর্ম্মের প্রমাণ কি ?

৩। কি প্রকারে দণ্ড ধারণ করিতে হয় ?

৪। দণ্ডের ঈপ্সিত স্থান কি ?

৫। যাহারা দণ্ডনীয় তাহাদের কর্ম্ম কি ?

৬। কর্ম্মিমনুষ্যদের মধ্যে কে কে দণ্ডনীয় ?

ব্রূত ধর্ম্মস্য নস্তত্বং যচ্চ ধর্ম্মস্য লক্ষণং।
কথং স্বিদ্ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতং।
দণ্ড্যাঃ কিং কারিণঃ সর্ব্বে আহোস্বিৎ কতিচিন্নৃণাং॥

যমদূতগণের উত্তর—

১। বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম, আর বেদে যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া, নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই অধর্ম্ম। ইহাই ধর্ম্মের স্বরূপ।

২। বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ। যদি বলেন, বেদের প্রামাণ্য কি ? তাহার উত্তর—বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ। বেদ স্বয়ম্ভু পরমেশ্বরের নিশ্বাস মাত্রে স্বয়ং উদ্ভূত। যদি বলেন নারায়ণ কে ? তাহার উত্তর—

যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃ সত্ব তমোময়াঃ।
গুণ নাম ক্রিয়ারূপৈ র্বিভাব্যন্তে যথাতথং॥

যিনি আপনার স্বরূপে সত্ব, রজঃ ও তমোময় প্রাণিসকলকে শান্তত্বাদি গুণ, ব্রাহ্মণাদি নাম, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ দ্বারা ব্যক্ত করেন, তিনিই নারায়ণ।

৩। মানুষ অধর্ম্ম করিল, ইহা কিরূপে জানা যায় ? উত্তর—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, পবন, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্‌, পৃথিবী, জল এবং ধর্ম্ম, ইঁহারা জীব সকলের আচরণের সাক্ষী। ইঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, উভয়ই জানা যায়।

৪। অধর্ম্মই দণ্ডের স্থান।

৫। দণ্ডার্হ কর্ম্মী লোক, যাহার যেমন পাপ সে সেইরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

৬। যাঁহার গুণসঙ্গ আছে, অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণে যিনি বদ্ধ, তাঁহাকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে গেলেই ভদ্র ও অভদ্র, উভয়ই সম্ভব। কর্ম্মশূন্য হইলে অভদ্র হয় না। কর্ম্মশূন্য জীব নাই, সকলেই কর্ম্মকর্ত্তা। কর্ম্মিদের পাপ অবশ্যই হয়; অতএব সকল কর্ম্মীই দণ্ডার্হ।

কেবল সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিই যে কর্ম্মের সাক্ষী তাহা নহে, জীবকে দেখিয়া যুক্তির দ্বারাও তাহার কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বেশ অনুমান করা যায়। অনুমানের দ্বারা কিছু কিছু নির্দ্ধারণ

করিবার সামর্থ্য অল্প বিস্তর পরিমাণে সকলেরই আছে। আমাদের যিনি রাজা, ধর্ম্মরাজ যম—তাঁহাতে এই শক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে। তিনি আপন পুরী সংযমনীতে বসিয়া মনের দ্বারা যাবতীয় জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষরূপে অবলোকন করেন এবং অপূর্ব্বরূপে যথাযথ বিচার করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মারই তুল্য।

তাহার পর যমদূতগণ অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—জীব প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে প্রাপ্ত এই বর্ত্তমান দেহকেই 'আমি' বলিয়া বিবেচনা করে—তাহার জন্মান্তরীয় স্মৃতি নাই। প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ জীবের এই বিপর্য্যয় ঘটে—যদি সে ঈশ-সঙ্গ করে, তাহা হইলেই পরিত্রাণ পায়। অতঃপর যতদূতগণ অজামিলের জীবন-কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন—

অত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষং।
নেষ্যামোঽকৃতনির্ব্বেশং যত্র দণ্ডেন শুদ্ধ্যতি॥

এই কারণে এই দুরাত্মাকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব। এ ব্যক্তি পাপ করিয়া তাহার নিষ্কৃতি নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। দণ্ডিত হইলেই এ ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ করিবে।

যমদূতগণের এই সকল কথা শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ যাহা বলিলেন, পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মহোদয় তাহার সারমর্ম্ম নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবৈর্নামমাহাত্ম্যমদ্ভুতং।
শ্রাবয়িত্বা দ্বিজো বিষ্ণুলোকং নীত ইতীর্য্যতে॥

ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিষ্ণুদূতগণ যমদূতদিগকে অদ্ভুত নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইলেন, দ্বিজ (অজামিল) বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুলোকে নীত হইলেন, ইহাই কথিত হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামীর এই কথাগুলি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিধানানুসারে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে দেখিতে পাইবেন, বিষ্ণুদূতেরা তখনই অজামিলকে রথে তুলিয়া ত্রিশূন্যে অবস্থিত বিষ্ণুলোক নামক একটা স্থানে লইয়া যান নাই। সুতরাং 'বিষ্ণুলোকে লইয়া যাওয়া' বলিয়া যে একটা ব্যাপার, তাহা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে 'লইয়া যাওয়া'র অনুরূপ নহে। আমরা 'লইয়া যাওয়া' বলিতে, কোন সীমাবদ্ধ স্থূল পদার্থকে দেশের এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে অপসারণ বুঝি।

এ প্রকারে অজামিলের দেহ অপস্মারিত হয় নাই এবং অজামিল তখন মরিয়াও যান নাই। তাহা হইলে কি হইল ? বিষ্ণুলোকে লইয়া যাওয়া হইল,—ইহার অর্থ কি ? শ্রীধরস্বামীর শ্লোকে "দ্বিজ" এই পদটি রহিয়াছে। অজামিল ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কারও হইয়াছিল, সুতরাং সামাজিক 'দ্বিজত্ব' তাঁহার ছিল, কিন্তু তিনি নিজের কর্ম্মদোষে এই 'দ্বিজত্ব' হারাইয়াছিলেন। এখন, বিষ্ণুদূত ও যমদূতগণের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহার মধ্যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই 'নির্ব্বেদ' কথাটি, এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন) সুতরাং এবারে কেবল সামাজিক নহে, অজামিল পারমার্থিক দ্বিজত্ব লাভ করিলেন। এই দ্বিজত্ব লাভই, অজামিলকে বিষ্ণুলোকে গ্রহণ। ইহা পরে আমরা বুঝিতে পারিব।

ভাগবতধর্ম্ম ও নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুদূতগণ যাহা বলিলেন, প্রাচীন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা-সহ আমরা তাহা প্রবন্ধান্তরে বর্ণনা করিব। আপাততঃ কি হইল ? বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। যমদূতেরাও চলিয়া গেলেন, বিষ্ণু-দূতেরাও চলিয়া গেলেন। অজামিল গতভয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিলেন, তাঁহার কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু বলিবার সময় পাইলেন না—বিষ্ণুদূতগণ অন্তর্হিত হইলেন।

এইবার বাহির হইতে, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভূমি হইতে, ঘটনাটি আলোচনা করুন। বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত অজামিল, কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, তাহার আর বাঁচিবার আশা নাই; অসৎসংসর্গী দরিদ্র ও পাপী, তেমন চিকিৎসাও নাই, শুশ্রূষাও নাই। সকলেই জানে, এবার সে নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু মরিল না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার শিশু পুত্রের নাম ধরিয়া "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহার পর আর কোন কথা কহে নাই, চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর এ কি হইল ! একেবারে অঘটন ঘটিল, অজামিলের রোগ সারিয়া উঠিল,—বাহিরের লোক যাহারা দেখিল, একেবারে অবাক্ হইয়া গেল ! এ কি হইল, চক্ষুতে দেখিয়াও যে বিশ্বাস হয় না ! অজামিলের বেশ জ্ঞান হইয়াছে, শরীরে বেশ স্বাস্থ্য যেন ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার যেন পুনর্জ্জন্ম হইল। কিন্তু এ কি, সে কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না ! চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, আর শরীর পুলকিত ও কম্পিত হইতেছে। এ কি হইল ! কেহই কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

অজামিলের ভিতরের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। যমদূতগণের মুখে আনুপূর্ব্বিক বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য সগুণধর্ম্ম, আর বিষ্ণুদূতগণের মুখে ভগবৎ-প্রণীত বিশুদ্ধ নির্গুণ ধর্ম্ম অজামিল জানিতে পারিয়াছে। শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাহার শ্রীভগবানে ভক্তি জন্মিল। সুতরাং, পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিয়া তাহার অন্তরে দারুণ অনুতাপের উদয় হইল। "ইন্দ্রিয়-জয় করিতে না পারিয়া কি মহাপাতকই করিয়াছি! আমি নরকে যাইতেছিলাম। হঠাৎ কি হইল? কি দেখিলাম! শুধু আভাসে "নারায়ণ" বলিয়াছিলাম, তাহাতেই এই হইল! ভগবান্, দয়াময়, পতিতপাবন! সময় দাও, সুবিধা দাও, প্রাণমন ও ইন্দ্রিয়-সংযমন পূর্ব্বক তোমার সেবা করিব, আর যেন অন্ধকারে না পতিত হই"।

ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ॥
স তস্মিন্ দেবসদনে আসীনো যোগমাস্থিতঃ।
প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি॥
ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা।
যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি॥

অজামিলের ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। অজামিল পুত্রস্নেহাদি সমুদয় বন্ধন মোচন করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। তথায় এক দেবমন্দিরে আসন করিয়া যোগ ধারণা করিলেন। প্রথম, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে তুলিয়া লইলেন, তাহার পর আত্মাতে মনসংযোগ করিলেন। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে আত্মাকে বিশেষরূপে শোধন করিয়া, চিত্ত একাগ্র করিয়া জ্ঞানময় পরব্রহ্মস্বরূপ যে ভগবান্, তাহাতে আত্মার সংযোগ করিলেন।

তখন অজামিল সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণকে আবার দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিলেন। অজামিলের দেহ গঙ্গায় পড়িয়া রহিল, আর অজামিল ভগবৎপার্ষদদিগের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুদূতগণের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে ভগবানের সমীপে গমন করিলেন। এতক্ষণে অজামিল বিষ্ণুলোকে গেলেন,—সঙ্গে সঙ্গে নহে।

তাহার পরের অধ্যায়ে যমরাজ তাঁহার দূতগণের মুখে সমুদয় কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে ভাগবত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইলেন, ও বলিয়া দিলেন—তোমরা বৈষ্ণবজনের কিঙ্কর। এই অধ্যায়ও আমরা পরে আলোচনা করিব। ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম তিন অধ্যায়ে অজামিলের এই বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। ইহা একটি প্রাচীন ইতিহাস, পূর্ব্বকালে কোন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য মলয়াচলে বসিয়া একাগ্রমনে ভগবানের পাদপদ্ম পূজা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য, ভগবানের চরণ স্পর্শ করিয়া এই গুহ্য ইতিহাস বলিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী অজামিলের উপাখ্যান আলোচিত হইল। 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে অতিশয় সংক্ষেপে এই ঘটনা বিবরিত হইয়াছে। অবশ্য 'ভক্তমাল'-গ্রন্থের কোন দোষ নাই—কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহারা অনেকেই অজামিলের উপাখ্যান একটু অন্যরূপে বুঝিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ এমনভাবে বুঝেন, যাহাতে "নামবলে পাপ প্রবৃত্তি" রূপ নামাপরাধের সম্ভাবনা। আবার অনেকে এমনভাবে বুঝেন বা বুঝাইয়া থাকেন, যাহাতে মানুষ নিজের চরিত্রাদি সংশোধনের চেষ্টা করার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ বুঝিয়া কেবল নিয়ম করিয়া নাম করেন এবং এই প্রকারে ঠাকুর মহাশয়কে কিছু উৎকোচ দিয়া যমকে ঠকাইবার চেষ্টা করেন। উভয়তই ভাগবতধর্ম্মের অপলাপ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবানের কৃপা, জীবের আত্মশক্তিকে সঙ্কুচিত বা ধ্বংশ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে না, আত্মশক্তির স্ফুরণের মধ্য দিয়াই কৃপা কার্য্য করে, তমোগুণাচ্ছন্ন ও ভীরু ব্যক্তি এই কৃপাবাদ-ধর্ম্মের অধিকারী নহে। কৃপাবাদের সাধন সকলেই গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ইহার তত্ত্ব জানা আবশ্যক। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, আত্মশক্তির ভূমি নির্ণয় করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে, নতুবা মানুষ পশু হইয়া যাইবে। ইহসংসারে চতুর তোষামোদকারী যেমন প্রবলকে তোষামোদের দ্বারা তুষ্ট করিয়া আইনকে ফাঁকি দিয়া অন্যায় সুবিধা লাভ করে, পরমার্থ-রাজ্যে তাহা হইবার উপায় নাই—ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য.

একশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য যেরূপ উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই সাহিত্য এখন আয়তনে বিপুল ও সৌষ্ঠবে সুন্দর। বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও মন বিচিত্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। এক সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলোচনা করিতেন না। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য তাঁহারা এবং পাশ্চাত্য-বিদ্যায় যাঁহারা যশস্বী তাঁহারা, উভয়েই বাঙ্গলা-সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এখন আর সে দিন নাই। মাতৃভাষার ও সাহিত্যের গৌরবে আমরা সকলেই এখন গৌরবান্বিত। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা ও অনুসন্ধান বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। গদ্য-সাহিত্যের যাবতীয় বিভাগে উপযুক্ত লেখকগণ পরিশ্রম করিতেছেন। এই নবযুগে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা বিস্ময়াবহ ও অতীব প্রশংসনীয়।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের যে মূর্ত্তি ছিল, এখন আর সে মূর্ত্তি নাই। রচনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে আসিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও যাঁহারা সুলেখক, তাঁহাদের সকলের রচনা-পদ্ধতি একরূপ নহে। কথ্য-ভাষার সাহিত্য যখন বিপুলায়তন হয়, বহু শিল্পী বহু দিক্ হইতে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী যখন রচনাকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তখন সাহিত্য নানা মূর্ত্তি ধারণ করে —ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্য যে মূর্ত্তিই ধারণ করুক, প্রত্যেক মূর্ত্তি-বিকাশেরই ইতিহাস আছে। ক্রমে ক্রমে সুনির্দ্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করিয়া সে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। গদ্য-সাহিত্যের এই মূর্ত্তি-বিকাশের ইতিহাস বিশেষরূপে আলোচনার বিষয়।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এবং রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, অনেকেই বাঙ্গলা গদ্য লিখিয়াছিলেন। এই গদ্যগ্রন্থগুলি প্রধানতঃ বিদেশীয়দিগকে বাঙ্গলা-ভাষা শিখাইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। দুই শ্রেণীর কর্ম্মী এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা। আমাদের দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য যে-সকল বিদেশীয় যুবক এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা-ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতেরা এই যুবকগণকে কার্য্যোপযোগী বাঙ্গলাভাষা শিখাইবার জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই-প্রকারের সীমাবদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ

উদ্দেশ্য লইয়া বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব। তবে, লেখকগণ সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজেই, মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যের রস-সৃষ্টি যে একবারেই হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই রস-সৃষ্টি আনুসঙ্গিক রূপেই হইয়াছিল।

জনসাধারণের উন্নয়ন ও উন্নততর রসাস্বাদনের জন্য যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তাহাই প্রাণময় সাহিত্য। ফোর্ট্ উইলিয়মের পণ্ডিতী-সাহিত্যের সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীরামপুরের 'খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের' বাঙ্গলা-ভাষায় গ্রন্থরচনার দুই-প্রকারের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা একদিকে বিদেশীয়দিগকে, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগকে এ-দেশীয় ভাষা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন; আর একদিকে দেশের লোককে তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী ভাব, চিন্তা ও ধর্ম্মের দ্বারা উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। জনসাধারণের উন্নয়ন-চেষ্টা 'খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের' উদ্দেশ্যের ভিতর ছিল। সাহিত্য-সাধনার এই দুইটি ধারা যে সময়ে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে মহামনা রাজা রামমোহন রায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশবাসী-গণের উন্নয়ন-চেষ্টাই তাঁহারও মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশের যাহা কিছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে; দেশবাসিগণের চিত্তে বিবিধ কারণে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জড়তা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে; নবযুগের যে গৌরবময় আদর্শ, প্রতীচ্য-জগতের সাধনা আশ্রয় করিয়া আমাদের পুরোদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই আদর্শের অভিমুখে দেশকে চালাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য অন্ধ অনুকরণ মাত্র নহে। দেশীয় সাধনার ভূমিতে দাঁড়াইয়া অতীতের সাহায্যে ভারতের স্বপ্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া, সেই প্রকৃতির অনুবর্ত্তনে মাতৃভাষার সাহায্যে এই কার্য্য করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় ভারতের আত্ম-প্রকৃতি নির্দ্ধারণে ভুল করিয়াছিলেন কি না, বৈদেশিক ভাবের দ্বারা কিছু বেশী রকম বাহিত হইয়াছিলেন কি না, সে কথার আলোচনা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত। কারণ, আমরা সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি। দেশবাসিগণের উন্নয়নই যে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই-প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়া যে সাধনা, সেই সাধনাই সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। ইহা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা প্রমাণী-কৃত হইবে।

অন্য দেশের গদ্য-সাহিত্যের সহিত, বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের তুলনা করিলে দুইটি কথা স্বভাবতঃ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রথমতঃ, এই সাহিত্য তাহার উদ্ভবের প্রথমাবস্থা হইতেই উন্নততর ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি সুস্পষ্ট মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিত বাঙ্গলা-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ইহার হেতু। বাঙ্গলা-ভাষার অবশ্য একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের শব্দ-বৈভব, ভাব-সম্পদ্, রচনারীতি প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিপদে পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইবার যে সুযোগ পাইয়াছে, সে সুযোগ অন্য কোন ভাষা ও সাহিত্য এত অধিক পরিমাণে পায় নাই।

তাহার পর গদ্য-সাহিত্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, বাঙ্গলার পদ্য-সাহিত্য অতিশয় সমুন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতার ভাষা প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ, ও অলঙ্কার-বৈভবে আজিও অতুলনীয়। বৈষ্ণব-কবিতার প্রাণময়তা, স্বচ্ছতা ও মাধুর্য্য বিশ্বসাহিত্যের গৌরবের বস্তু। তাহার পর এই বাঙ্গালী জাতি, সংস্কৃত-ভাষার সাহায্যে কাব্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি উন্নততর চিন্তারাজ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশের মনীষার জ্যোতি সমগ্র ভারতবর্ষকে চমৎকৃত ও উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভক্তিতত্ত্বের রসসৃষ্টি, রসশাস্ত্রের অতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, নব্যন্যায়ের বিচারকুশলতা, স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মীমাংসা-কৌশল—এই সকলের মধ্য দিয়া যে জাতীয় চিত্ত বিকশিত হইতেছিল, সেই চিত্তই বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতবড় সুবিধা আর কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে?

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতি যেরূপ দ্রুতবেগে সাধিত হইয়াছে, অল্পকালের মধ্যে এই সাহিত্য যেরূপ শক্তিশালী ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও বিস্ময়াবহ। পূর্ব্বোক্ত কারণ ব্যতীত, আর-একটি কারণ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে, আধুনিক উন্নতিশীল জগতের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে উৎঘাটিত হইল। সে এক সুবিপুল বন্যার মত! পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক জাতি, তাহাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা লইয়া ভারতের পুণ্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইল। আদান-প্রদান, আলাপ-আলোচনা, বাদানুবাদ, চিন্তারাজ্যে বিবিধ প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত—এই সংঘর্ষের মধ্যে নব্যভারতের জন্ম হইল। বাঙ্গালায় রামমোহন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পতাকা হস্তে, এই নব্যভারতের অগ্রদূত হইলেন এবং বাঙ্গালী জাতি নব্যভারতের গুরুর আসন লাভ করিল। আমরা রাজা রামমোহন রায়কেই, বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যর সৃষ্টিকর্ত্তা না হউন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রূপে গ্রহণ করিলাম।

আমাদের সাহিত্যালোচনার প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজা রামমোহন রায়ের উপযুক্ত পূজা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রাজা রামমোহন রায়, ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারক রূপে, তাঁহার যুগে বহু আক্রমণ সহ্য করিয়াছিলেন। সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যের উদার মিলন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, সে দিনের সেই বিরোধের স্মৃতি একবারে মুছিয়া ফেলা আবশ্যক এবং তাঁহার সাধনার প্রকৃত মূল্য নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। সুদূর প্রবাসে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ করার পর নব্বই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সংস্কারক রামমোহনকে লইয়া যে বিতণ্ডাময় আলোচনা তাঁহার জীবিতকালে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই আলোচনার বিতণ্ডার অংশ এখন অপসৃত হইয়াছে। তাহার পর এই সুদীর্ঘকালে সমগ্র পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের জ্ঞান-রাজ্যে ও কর্ম্মরাজ্যে বহুপ্রকারের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, সেদিন অনেকে যে-চক্ষুতে রামমোহনকে দেখিয়াছিলেন এবং যে-ভাবে তাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন, আজ আর সে বিরোধীভাবের কোন

সার্থকতা নাই। এখন আমরা নিরপেক্ষভাবে নানা দিক্ হইতে রাজা রামমোহন রায়ের স্বরূপ এবং তাঁহার সাধনার প্রভাব আলোচনা করিতে পারি।

রাজা রামমোহন রায় মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিলে, রাজা রামমোহন রায় ঔৎসুক্য ও আহ্লাদের সহিত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেন এবং তাহাদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ইংরেজ জাতির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধার কারণ, তিনি এই ইংরেজকে স্বাধীনতার পরিপোষক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মানবের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু এই স্বাধীনতার মহামন্ত্রের সাধনায় রাজা রামমোহন রায় যে-দিন উদ্বোধিত হইয়াছিলেন, তাহার পর এই এক শতাব্দীকালের নানারূপ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের দ্বারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের কেবল জনসাধারণ নহে, বিজ্ঞব্যক্তিগণও সে দিন যে-স্বাধীনতার কথা শুনিয়া ভীত হইতেন, আজ সেই স্বাধীনতার জন্য তাঁহারাও বা তাঁহাদের বংশধরেরাও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমগ্র মানব জাতির চিন্তার সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধীয় চিন্তা ও আলোচনা, আজ আমাদের এক নূতন-প্রকারের অনুরাগ লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা-কামী মানব কোন বিশেষ মতের দ্বারা বাহিত হইবে না—সকল-প্রকারের মতই সে আলোচনা করিবে। কিন্তু জীবনের পথে চলিবার সময় সে নিজের মতের দ্বারা নিজের ভিতর যে অন্তর্য্যামী ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়া বীরের মত নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইবে—এই-প্রকারের আত্মসংস্থ মানব গঠন করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিধানের উদ্দেশ্য। এই বিধানের নাম—'উদার শিক্ষা-বিধান' (Liberal culture)। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের কোন বিশেষ মত সম্বন্ধে দেশের বহু বহু মানবের যদি আপত্তি থাকে, তাহা হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ, তাঁহার ঐ মতের আলোচনা করিতে বঞ্চিত হইবে না, এ কথাটিও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

পরবর্ত্তী গদ্য-সাহিত্যে যে চেষ্টাকৃত ও সাধনালব্ধ শিল্পচাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রামমোহন রায়ের রচনায় তাহা না থাকিলেও, তিনি একজন স্বাভাবিক সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন। এখনকার উচ্চ-শ্রেণীর উপন্যাস বা প্রবন্ধ-পুস্তক যে-ধরণে লিখিত হয়, তাহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের রচনার ভঙ্গী বা রীতির (Style) প্রভেদ অনেক। কিন্তু, এখনকার মাপকাঠি দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের শিল্পনৈপুণ্যের পরীক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে রাজা রামমোহন রায়, গদ্য-সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, গদ্য-সাহিত্য কেমন করিয়া পড়িতে হয়, পাঠকগণকে তাহা শিখাইয়া লই য়, সেই সাহিত্যের সাহায্যে দেশবাসিগণকে তাঁহার ভাব ও চিন্তা দান করিয়াছেন। রাজা

রামমোহন রায় ঔপন্যাসিক, নাট্যকার বা ললিতপ্রবন্ধ-লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারক। দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি প্রভৃতির দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি লোকশিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক তর্কবিতর্ক করিয়া উপদেষ্টার কার্য্য করিয়াছেন।

আমরা একালে যাঁহাদিগকে সাহিত্য-শিল্পী বলি, তাঁহারা যে সংস্কারক বা উপদেষ্টা নহেন, তাহা নহে। তবে তাঁহারা এই কার্য্য গৌণভাবে করিয়া থাকেন। মুখ্যভাবে তাঁহারা আনন্দদায়ক বন্ধু, হৃদয় ও মনের সাথী—তাঁহারা সৌন্দর্য্য ও রসের স্রষ্টা।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-সাহিত্যে দেখিতে পাই—বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের দুইটি বিভিন্ন ধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সুন্দর ও স্বাভাবিক সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি ধারা সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের ভাষা—আর-একটি ধারা কথোপকথনের ভাষা। এই দ্বিতীয় প্রকারের ভাষাতে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতুম পেঁচার নক্সা' লিখিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সময়ে এই দুইটি ধারা বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার গৌরব এই যে, তাঁহার ভাষাতে এই উভয় ধারার একটি প্রাথমিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের পর এই দুইটি ধারা বিভক্ত হইয়া দুই মুখে অগ্রসর হইল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া আবার একটি উন্নততর সামঞ্জস্য (higher synthesis) লাভ করিয়াছে—
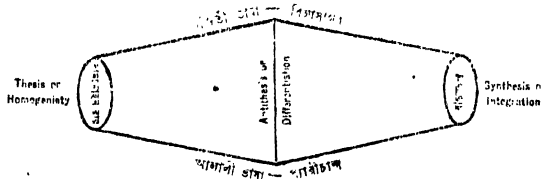
বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ আকার গ্রহণ করিবে, সে সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। তাহাতেও এই দুই ধারার সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যের গতি—মানবীয় চিন্তা ও সাধনার যাবতীয় গতির ন্যায়—এই সনাতন পথে ক্রমবিকাশের অভিমুখী।

রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্য-রচনার রীতিতে যেমন বিচ্ছিন্নতা বা শ্রেণীবিভাগ (differentiation) হয় নাই, তাঁহার চিন্তাতেও ঠিক্ তাহাই। তিনি শাস্ত্রসর্ব্বস্ব জাতিকে শাস্ত্রের বিচার দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিচারের ভিতর সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে। তখনও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সুস্পষ্ট বিভিন্নতা সাধিত হয় নাই। এই বিভিন্নতা-সাধন (specialization) পরবর্ত্তী কালে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গলা-ভাষায় বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তৎসম্পাদিত

সংবাদপত্রগুলি পাওয়া যায় না। সেগুলি পাইলে হয়ত তাঁহার রাজনীতিক রচনা কিছু কিছু পাওয়া যাইত। তাঁহার ইংরেজী রচনায় অতি উচ্চাঙ্গের রাজনীতিক আলোচনা রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র মনীষা শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়াই পরিব্যক্ত হয় নাই। সে সময়ে বাঙ্গলা ভাষায়, ইংরেজী-অনভিজ্ঞ জনশ্রেণীর নিকট, রাজনীতিক আলোচনার কোন সার্থকতা ছিল না বলিয়াই মনে হয়। আজিকার অবস্থার সহিত তুলনা করিলে সে-দিন রাজা রামমোহন রায়কে কত অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্য-রচনার ও সাধনার বিশিষ্টতা এই যে পরবর্ত্তী সময়ে যে-সমুদয় বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্য-সেবক ও কর্ম্মিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যে-সমুদয় বিভাগে তাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় তাহার সকল বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যতের কর্ম্মিগণের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—ইহা তাঁহার অসাধারণতার পরিচায়ক।

রাজা রামমোহন রায়ের মানস-জীবনের ইতিহাস, বিশেষরূপে আলোচনার বিষয়। নব্যভারতের আকজ্ক্ষার ও তপস্যার মূল-প্রেরণা, এই ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। প্রাচীনযুগের যে-সমুদয় চিন্তাপ্রণালী ও শাস্ত্র রাজা রামমোহন রায় আলোচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে-সময়ের লোক, সে-সময়ে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাক্ষেত্র যে-সমুদয় নেতা শাসন করিতেছিলেন, তাহার একটি স্থূল পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান—এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের সাহিত্যের ও সভ্যতার ধারা, ত্রিবেণী-সঙ্গমের ন্যায়, রাজা রামমোহনের মানস-জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের পিতার বংশ বৈষ্ণব, আর মাতার বংশ শাক্ত। উভয় বংশই শাস্ত্র-আলোচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন দেশীয় ও বিদেশীয় জীবনচরিত-লেখক, শাক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে বিবাহবন্ধন দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন! ইহার কারণ, তাঁহারা হিন্দুসমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। শাক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে বিবাহ হিন্দুসমাজে একটি নিতান্ত প্রচলিত ব্যাপার।

যাহা হউক, এই দুই প্রকারের মত ও সাধন-পথ, রাজা রামমোহন রায়ের চিত্তকে যে তুলনামূলক সমালোচনা কার্য্যে জীবনের প্রথম অবস্থাতেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুলনা-মূলক ধর্ম্মালোচনা ও বিভিন্নপ্রকারের ধর্ম্মমতের সমন্বয়-সাধনের প্রেরণা, রাজা রামমোহন রায় বাহিরের বা বিদেশের কোন শিক্ষা হইতে যে প্রাপ্ত হন নাই, তাহা তুলনা ও সমন্বয়-মূলক 'কালিকাবিলাস,' 'সারদাতিলক' ও 'প্রপঞ্চসার' প্রভৃতি তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষ চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের তুলনা ও সমন্বয় করিয়াছে; সুতরাং, রাজা রামমোহন রায়ের এই প্রবৃত্তির বা উদ্যমের বৈদেশিক বা বিজাতীয় প্রভাবের অন্বেষণ করার প্রয়োজন নাই। তবে মুসলমান ধর্ম্মের আলোচনা, তিব্বতযাত্রা, তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী, এই চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী যুবকের চিত্তের উপর ক্রিয়া করিয়াছিল। তন্ত্র ও স্মৃতি লইয়া বাঙ্গলার

ব্রাহ্মণসমাজ যে সময়ে অভিভূত, সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের আলোক এবং বৈদান্তিক মত ও উপনিষদের সারসত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহার পর খৃষ্টীয় সমাজের নানাবিধ মতের সহিত পরিচয়, ডিগ্‌বী সাহেবের সংসর্গে তৎকালীন ইউরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ,—এতগুলি শক্তি, রাজা রামমোহন রায়ের চিত্তের উপর ক্রিয়া করিয়াছে।

ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণের চিন্তা ও তাহার বিবিধরূপ সমালোচনা দ্বারা ইউরোপের চিত্ত উন্মথিত হইতেছিল। এই চিন্তা-সংঘর্ষের প্রভাব, রাজা রামমোহন রায়ের মানস-জীবনে ও সাহিত্য-সাধনায় সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রুসো ভল্‌টেয়ারের সহিত একটা বিশেষ-রকমের প্রভেদও আলোচনার বিষয়। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণ, মানবতার যে গৌরব-গীতি গাহিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় উল্লাসের সহিত তাহা শুনিয়াছিলেন এবং তাহার ভিতর যে সংস্কারমুক্ত সংযত স্বাধীনতার বার্ত্তা ছিল, তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ধভাবে গ্রহণ করেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণ যখন অতীতকে ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে অনাদর করিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় সেই যুগে, তাঁহাদের চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াও, শাস্ত্র এবং অতীতকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া নবযুগের প্রয়োজনীয় উন্নতিশীল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে এবং তাঁহার জাতির পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে! অবশ্য এ কার্য্যেও মনীষী বার্কের সংরক্ষণ ও সংস্কার নীতির (conservation and reform) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এখন কোন জাতি বা কোন দেশ বিভিন্ন নহে। মনোজগতে সকলেই মিলিয়া গিয়াছে। এই মহামিলনের প্রথম সুর আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায়ের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিতে হইলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—অথবা প্রাচীন বা আধুনিক—এই উভয় প্রকারের চিন্তার ও সাধনার সংঘর্ষ ও সমন্বয় আলোচনা করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বদেশের বিশিষ্টতার ভূমিতে দাঁড়াইয়া বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিশিষ্টতা ভারতের ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক জীবন। এই আধ্যাত্মিক জীবনের উপলব্ধিতে ভারতবর্ষ তাহার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই ভারতবর্ষকে নবযুগে সগৌরবে জাগিয়া উঠিতে হইবে। ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার মর্ম্মকথা বলিয়া মনে হয়। বেদান্তে তিনি ভারতের এই আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোত্তম পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

ধর্ম্ম ও সাহিত্য সাধারণতঃ পৃথক্ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ঠিক প্রাচীন জগতের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। এই ধর্ম্ম সর্ব্বজনীন এবং এই ধর্ম্মে যুক্তি-প্রয়োগ ও স্বাধীন চিন্তা নিরঙ্কুশ ও অক্ষুণ্ণ। রাজা রামমোহন রায়ের সাধনায় সাহিত্যের ও ধর্ম্মের বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সম্মিলিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন—কেবল হিন্দুশাস্ত্র নহে, হিন্দু, মুসলমান, ও খ্রীষ্টানের শাস্ত্র

স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র স্বীকার করিয়াও মানবের স্বাধীন-চিন্তার অধিকার সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম ঠিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, তাহার আলোচনা আমাদের অধিকার বহির্ভূত। কিন্তু একথা অতিশয় সত্য যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, মানুষকে এক সুদূরবর্ত্তী ও অজ্ঞাত পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই উদ্বুদ্ধ করে না—সংসারের সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রকে এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে এবং মানবের সর্ব্বতোমুখ উন্নতিসাধন এই ধর্ম্মের লক্ষণ। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম, সাহিত্যসাধনা হইতে একবারে বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা নহে।

ভারতের প্রাচীনতম ও উন্নততম জ্ঞানভাণ্ডার বেদান্তশাস্ত্র। এই বেদান্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই রাজা রামমোহন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন ভাবে মানুষ যাহাতে চিন্তা করিতে পারে, নিজেদের দেশীয় সাধনার যাহা প্রাণপ্রদ তাহা রক্ষা করিয়া, বাহিরের পুষ্টিকর ও কল্যাণপ্রদ ভাবসমূহ এই প্রাচীন জাতি যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, নিজের বক্তব্য বিষয় সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারের সহিত যাহাতে তাহাদের পরিচয় হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য রামমোহন রায়, গদ্য-সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার আরম্ভ করিলেন।

বিশুদ্ধ সাহিত্য কি, সাহিত্যকে কত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কোন্ শ্রেণীর কি লক্ষণ—এ-সমুদয় নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নহে। আমরা এই স্থানে বিশুদ্ধ সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতেছি। মানুষ নানা প্রকারে মানুষ হইতে পৃথক্। জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, আবার এমন কি, গায়ের বর্ণ পর্য্যন্ত মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবহারিক জগতে এই পার্থক্য ছাড়াইয়া উঠা যায় না। কিন্তু মানব-চৈতন্যের বা মানবহৃদয়ের এমন একটি জাগরণের অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ তাহার এই স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডিগুলি সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠে এবং ভাবে, চিন্তায়, কল্পনায়, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, সুখে-দুঃখে, সৌন্দর্য্য-বোধে ও রসাস্বাদনে অতীত অনাগত, দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী যাবতীয় মানবের সহিত এক হইয়া যায়। মহামানব বা নিত্যমানবের জীবন, ক্ষুদ্র মানবের জীবনে সেই সময়ে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থার যে শব্দময় ও রসবৎ-প্রকাশ—গদ্য বা পদ্য যাহাতেই হউক—তাহাই বিশুদ্ধ-সাহিত্য-পদবাচ্য। সাহিত্যের ভূমি, মহামিলনের ভূমি। যাহা নিত্য সত্য ও নিত্য সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের আত্মা।

সাহিত্যের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিলে, দর্শন ও ধর্ম্মের সহিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রভেদ অতি অল্পই থাকে। কাজেই সেই প্রভেদটুকু সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই জাগরণ যদি বিচারমূলক জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহা উচ্চতম দর্শনশাস্ত্র। আর, এই জাগরণ যদি মানবের জীবনের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা হইলে

তাহা ধর্ম। আর, এই জাগরণ যদি প্রধানতঃ হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করিয়া রসাস্বাদনের সাহায্যে সুবিশুদ্ধ আনন্দ দানের সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহা সাহিত্যপদবাচ্য। প্রভেদ অতিশয় অল্প; কিন্তু বাঙ্গলা দেশে একদিন, অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিদের যুগে, ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রায় এক হইয়া গিয়াছিল। কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায় এই প্রকারের উদারতত্ত্বমূলক সংজ্ঞা-নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞার সাহায্যে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এই নিত্যসত্য ও নিত্যসুন্দর যে রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই বিশুদ্ধ সাহিত্য বা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য। অন্যান্য শ্রেণীতে বিচার-পূর্ব্বক দেখিতে হইবে, এই সত্য ও সুন্দর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ না করিলেও, মানবহৃদয় সেই রচনার দ্বারা, ঐ সত্য ও সুন্দরের অভিমুখে কি পরিমাণে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ ও বাধাহীন যুক্তিপ্রয়োগ—যাহা মানবহৃদয়কে সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন করিয়া মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে লইয়া আইসে, তাহাও—সাহিত্যপদবাচ্য। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিক্ষা যদি এরূপভাবে ব্যাখ্যাত হয় যে, এতদিন যাহা দেশ-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি বলিয়া মনে হইত, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সার্ব্বজনীন, তাহা হইলে ঐ ব্যাখ্যাও সাহিত্যপদবাচ্য হইবে। এই-প্রকারে দেশ-বিশেষে প্রচলিত আচার, নিয়ম, অনুষ্ঠান এমন কি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, যদি মানবহৃদয়ের কোন সনাতন ও বিশ্বজনীন মহাসত্যের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলেও ঐ বর্ণনাও সাহিত্য-পদবাচ্য। এক কথায়, মানবতাই সাহিত্যের পরিচায়ক এবং মানবতার প্রতিষ্ঠা ও মানবতার অভিমুখীনতা, সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের অভ্রান্ত লক্ষণ।

সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইল, উহা একেবারে আধুনিক যুগের চিন্তা ও ধারণার উপযোগী। পূর্ব্বে সাহিত্য, পণ্ডিতগণের সামাজিক সম্মেলনে আনন্দভোগের সামগ্রী ছিল। রাজসভার সাহিত্য, বেশভূষা ও অলঙ্কার-পারিপাট্যের দ্বারা এবং কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী বিস্তার করিয়া, ধনী মানী ও পদস্থ ব্যক্তি-গণের সেবা করিত। আবার সাহিত্য, কখনও নিম্নশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল মানবের ইন্দ্রিয়ভোগের স্থূল উপকরণও জোগাইয়াছে। কিন্তু এখন আর মানবসমাজে শ্রেণীবিভাগ নাই। এখনকার সাহিত্য সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব নহে। মানবতার গৌরব ও মানব আত্মার অসীম মহিমা সকলেই বুঝিবার অধিকারী। এই বোধের উপর মানবের মহামিলন হইবে। রাজা রামমোহন রায়ের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা হইয়াছে। তবে তখন গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন ছিল না। বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই আদিম প্রাণপ্রতিষ্ঠার কালে এই মানবতার গৌরব এবং প্রত্যেক নরনারীর উচ্চতম পরমার্থ বস্তুতে সমান অধিকার সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছিল। সেই অভয়দান ও অমৃতবিতরণের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে বিশিষ্টতা, তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। বৈষ্ণব কবিতা অতি প্রাঞ্জল, সরল এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত শব্দেই রচিত। কোন কোন কবির রচনায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে সত্য। কিন্তু কীর্ত্তনের গানের দ্বারা এই পদাবলী ব্যাখ্যাত ও আস্বাদিত হইয়া

আপামর সাধারণের দ্বারে দ্বারে তাহার অমৃত বিতরণ করিয়াছে। সুতরাং এই সাহিত্য জনসাধারণের মহামিলনের সাহিত্য।

সাহিত্যকে যথার্থরূপে জাতীয় সাহিত্য করিতে হইলে, অতীতের সাধকগণের সাধনার সহিত একটি জীবন্ত যোগ রক্ষা করিয়া, পরবর্ত্তী কর্ম্মিগণের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। রাজা রামমোহন রায় কি কি সমস্যা অনুভব করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তৎসমুদয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় যিনি লাভ করেন নাই, নব্যবঙ্গের জাগরণ ও সাধনার মূল সূত্র তিনি ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। কাজেই রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে, সাহিত্যসভায় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে নানা দিক্ হইতে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার দ্বারা এই মহাপুরুষকে যাঁহারা ভীত চিত্তে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা স্বদেশের প্রতি বড়ই অবিচার করেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলী হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ নির্ব্বাচিত করিয়া সেই অংশগুলি উচ্চশিক্ষার্থিগণ যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, সেজন্য দেশের তৎকালীন অবস্থা, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের সাধনা ও তৎকালীন বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সহ প্রকাশিত করিয়া, পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃত আলোচনা, এই কার্য্যের দ্বারাই আরব্ধ হইবে।

রচনা-ভঙ্গী বা রচনা-রীতি (style), শব্দ বা পদবিন্যাসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে। কোন বিশিষ্ট লেখকের রচনা রীতির আলোচনায়, শব্দের ব্যাকরণ-শুদ্ধি বা অলঙ্কারাদির বিশুদ্ধতার হিসাব করিলেই চলিবে না। এই হিসাবের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু উহা গৌণ। সাহিত্যের রচনারীতি, তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, লেখকের মানসিক প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং, রচনা-রীতির উন্নততর ও গভীরতর আলোচনা আবশ্যক।

একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত এই রচনা-রীতিকে Organology of writing বলিয়াছেন। ভিতরের প্রয়োজনের তাড়নায় বা বাহ্যপ্রকৃতির সহিত নিত্যসমুত্থিত সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক প্রেরণায়, জীব-জীবনে নব নব কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে গড়িয়া উঠে। ইহাই অভিব্যক্তিবাদের মত। কোন কোন জীব-জীবনের কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে, সেই জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। কোন সাহিত্যের রচনা-রীতির পারম্পর্য্য বা ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে, আমরা বাহিরের দিকে যেমন শব্দবিজ্ঞানের ও অলঙ্কারশাস্ত্রের কতকগুলি সঙ্কেত বা সন্ধান পাই, তেমনি ভিতরের দিকে সেই সাহিত্য যে জাতির, সেই জাতির মানসজীবনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের পরিচয় পাই। অতএব রচনা-রীতি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে, লেখকের ভাব ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, তাঁহার মানসিক প্রকৃতির স্থায়ী সুর এবং সেই স্থায়ীভাবের উপর নানারূপ সঞ্চারীভাবের বিলাস-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। মানস-ক্ষেত্রে নব নব চিন্তার তরঙ্গ

জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে, শব্দের সাহায্যে তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মানসিক জীবনের উপর আবার ক্রিয়া করিতেছে—বাহিরের সহিত ভিতরের এই প্রকারের আদান প্রদান ও ঘাত প্রতিঘাত, রচনা-রীতির মধ্যে পরিব্যক্ত হয়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অনুভব শক্তির অনুশীলন ব্যতিরেকে রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।

যাঁহারা প্রকৃত সাহিত্যিক, বা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া যান, তাঁহাদের প্রত্যেকের একটি নিজত্ব থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজত্ব আছে—তবে, কাহারও বিকশিত হয়, কাহারও হয় না। এই নিজত্বকে বিকশিত ও পরিস্ফুট করিয়া যিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহা দান করিতে পারেন, তিনিই ধন্য—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই বরেণ্য। এই নিজত্ব যেমন ভাব, চিন্তা ও অনুভব বৈচিত্র্য বা কল্পনার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়, তেমনি যে ভাষায় ঐ ভাব পরিব্যক্ত হয়, সেই ভাষার ছন্দ, ভঙ্গী বা রচনা রীতির মধ্য দিয়াও তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করে। ইহাকে আমরা সাহিত্যিক চরিত্র বা মানসিক প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বলিতে পারি। রচনা-রীতির নির্দ্ধারণ, বাক্যবিশেষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের বিচারণা বা বিশ্লেষণের দ্বারা হইবার নহে। রচনা-রীতির প্রাণ আছে। সমগ্র অখণ্ড অনুভবের দ্বারা সেই প্রাণের উপলব্ধি করিতে হইবে। রচনা-রীতির মধ্যে নিজের মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত করা, সাহিত্যসেবক মাত্রেরই সাধনার বিষয় হওয়া উচিত। সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-রীতির পর্য্যালোচনার সময়, এই সত্যটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-রীতি বুঝিবার জন্য, তাঁহার জীবন ও সাধনা বুঝিতে হইবে। তাঁহার সাধনায় ধ্বংস ও গঠন—এই দুই প্রকারের উপকরণ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে—'খণ্ডন' ও 'মণ্ডন' বলে। এই ভাঙ্গাগড়া সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা, সেকালের রক্ষণশীল পণ্ডিত ও সমাজপতিগণের নেতৃত্বে, রাজা রামমোহন রায়ের সুমহৎ সাধনার এই ধ্বংসের দিকই দেখিয়াছিলেন—গঠনের দিক্ অধিকাংশ লোকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার সুবিধা পায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নততর আলোচনার প্রারম্ভে, শিক্ষার্থিগণের সমক্ষে এই সুবিধা আনিয়া দেওয়া আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায় ধ্বংসকামী বিপ্লববাদী ছিলেন না। ইহা তাঁহার রচনা-রীতির দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। তিনি যাহা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কারণ, তাঁহার রচনার গতি একেবারেই সরল ও স্বচ্ছন্দ নহে। মানুষকে উত্তেজিত করিয়া ক্ষিপ্রবেগে কোনও সিদ্ধান্ত বিশেষে লইয়া যাইবার উগ্রতা, রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়ে ছিল না। তাঁহার মানসিক চরিত্রের ধৈর্য্য ও সর্ব্বতোমুখীনতা ও সকলের প্রতি সুবিচার করিবার প্রয়াস, তাঁহার রচনা-রীতি আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রতিপক্ষকে তিনি সর্ব্বদাই অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মানুষের উপর তাঁহার অটল শ্রদ্ধা ছিল। মানবজাতির

অতীতের সাধনা যে অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী, তাহা তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-রীতি হইতে এই সত্যগুলি অনায়াসে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এক শ্রেণীর লেখকের মানসিক উষ্ণতা বা উগ্রতা খুব বেশী। তাঁহারা বিহ্বলভাবে একটি বিশেষ মত প্রতিষ্ঠার জন্য সবেগে ধাবমান হন। ঐ মতের বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে, বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সেগুলিকে ওজন করিয়া তাহাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে তাঁহারা অসম্মত। এই শ্রেণীর লেখকগণের ভাষার গতি স্বভাবতঃ স্বচ্ছন্দ ও সরল হইয়া থাকে। গভীরভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত পাঠকগণ ভাষার প্রবাহের দ্বারা বাহিত হইয়া যান। রাজা রামমোহন রায়ের মানসিক চরিত্র যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই প্রকারের স্বচ্ছন্দ ও প্রবাহময় ভাষা, তাঁহার রচনায় আশা করিতে পারেন না। চিন্তার প্রত্যেক পদক্ষেপে, তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অপর পক্ষে কি বলা যাইতে বা ভাবা যাইতে পারে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতেছেন, এবং তাহাদের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া তাহাদের প্রতি সুবিচার করিয়া, ধীর মন্থর গতিতে বহু প্রকারের চিন্তা ও মতবাদপরিপূর্ণ পথহীন অরণ্যের মধ্য দিয়া নিজের চিন্তার রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। এই কারণে চিন্তার গতি হঠাৎ থামিয়া যাইতেছে, সর্ব্বদাই বক্র ও বন্ধুর পথে আলোড়িত হইতেছে। তিনি একটি প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ কাল সেই নূতন প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিতেছেন। এই নূতন প্রসঙ্গের অবতারণাই বা কেন হইল, আর ইহার আলোচনা দ্বারা মূল প্রসঙ্গের পুষ্টিই বা কিরূপে হইল, সাধারণ পাঠক অনেক সময়ে তাহা ধরিতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক যদি সঠিকরূপে তাহা ধরিতে চাহেন, তাহা হইলে রাজা যাঁহাদের জন্য গ্রন্থ লিখিতেছেন, বা যাঁহাদের সহিত তর্ক করিতেছেন, তাঁহাদের সংস্কার ও মানসিক প্রকৃতি উত্তমরূপে অনুভব করা প্রয়োজন হইবে। পাঠক যদি ধৈর্য্যের সহিত, তাঁহার চিন্তার গতি এই-প্রকারে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে কিছুক্ষণ ক্লান্তভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত ঋজু পথে আসিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিবেন। ভাষার এই জটিল ও বঙ্কিম গতি, রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে যে স্বাভাবিক তাহা, তাঁহার মানসিক চরিত্র অনুভব না করিলে, হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

ভাষা ভাবানুযায়ী হইলে যাঁহারা ভাবগ্রাহী তাঁহাদের তৃপ্তিপ্রদ হয়। লেখক যে ভাব পরিস্ফুরণ বা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, সেই ভাব পরিস্ফুরণের একটি পথ বা প্রণালী আছে। এই পথ সকল সময় ঋজু পথ নহে। আবার এই পথে অগ্রসর হইবার কালে সকল সময় ক্ষিপ্রবেগে যাওয়া যায় না। সুতরাং ভাবস্ফুরণের প্রণালীর অনুরোধেই, ভাষা অনেক সময় জটিল ও মন্থরগতি হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখক যদি নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হন, তাহা হইলে ভাষার জটিলতা সহৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর না হইয়া সুখদায়ক হইয়া থাকে।

রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র বিশ্বাস করিতেন এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার এই শাস্ত্র-বিশ্বাস, কি প্রকারের বিশ্বাস তাহা বলা বড়ই কঠিন। তিনি যাঁহাদের সহিত

ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা নিজেদের শাস্ত্রবিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রামমোহন রায় প্রতিপক্ষগণের এই শাস্ত্রবিশ্বাস স্বীকার করিয়া লইলেন এবং আলোচনা-রাজ্যে প্রতি পদক্ষেপেই শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় মীমাংসার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই কারণেই, তাঁহার রচনা অতিশয় দুরূহ ও বক্রগতিবিশিষ্ট বা অসরল হইল। নিজের যাহা বক্তব্য, তাহা বুঝাইবার জন্য, যদি পদে পদে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিতে হয়, এবং নানা শাস্ত্রের বিরোধী বচনসমূহের সমন্বয় মীমাংসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে ঐ রচনা স্বভাবতঃই অত্যন্ত গুরুভার হইয়া পড়ে। দুরারোহ ও দুর্গম পথে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিবার সময় পথিকের যেরূপ অবস্থা হয়, এই প্রকারের রচনা পাঠ করিতে পাঠকেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃগণ, অতীতকে ও মানবের সুবদ্ধ সংস্কারসমূহকে উপেক্ষা ও উপহাস করিয়া যে ভাবে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় যদি সেরূপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা সুগম ও সুবোধ্য হইত; এবং বর্ত্তমান যুগের আরামপ্রিয় পাঠকেরাও তাঁহার গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন। রাজা রামমোহন রায় যদি মানুষের জ্ঞান ও বিচারশক্তির নিকট শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ নিজের সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত না করিয়া, তাহাদের নিম্নতর রিপুসমূহকে উত্তেজিত করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল চিত্রাবলীর সাহায্যে অনাদর ও উপহাসের ভাষায় পাঠকগণকে চালাইয়া লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তেজস্বী অশ্বের আরোহী যেমন কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী মানব, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতিকে চরণে দলন করিয়া সজোরে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়, রাজা রামমোহন রায়ের রচনাও পাঠককে ঠিক্ সেই প্রকারে আপন সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়া দিতে পারিত। এই প্রকারের সাহিত্য রচনা করিবার যাহা উপকরণ, রাজা রামমোহন রায়ের অধিকারে তাহা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। বিরোধী শাস্ত্রের বিবিধ প্রকারের বচন প্রমাণ তিনি এত জানিতেন যে, সেগুলিকে লইয়া তিনি ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস প্রচুর পরিমাণেই সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু এই প্রকারের ভাবোচ্ছ্বাসময় ঝটিকা সৃষ্টি, রাজা রামমোহন রায়ের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। ইংরেজ লেখক লর্ড মেকলের রচনা পাঠ করিলে, এই ঝটিকা-সৃষ্টি বা তেজস্বী অশ্বারোহণ যে কি প্রকারের ব্যাপার, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের পর, আমাদের বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের রচনায় ও বক্তৃতায়, এই প্রকারের চঞ্চল ও মসৃণ গতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। রচনারীতি যে মানসিক চরিত্রের অভিব্যক্তি, ইহাই তাহার প্রমাণ।

রাজা রামমোহন রায়কে যে কিরূপ দুর্গম, সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা আজ বেশ ভাল করিয়াই আমাদের জানা আবশ্যক। পৃথিবীর দুইটি অংশে পূর্ব্বদেশ ও পশ্চিম দেশ— ইহারা উভয়ে সাধনপথে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বদেশ দেশ যেন ভগবানের কৃপায় সুগম পথে ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, আর পশ্চিম দেশ নানা অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে

চলিল। কিন্তু পূর্ব্বদেশের এই সৌভাগ্যই, তাহার দুর্দ্দশার হেতু হইল। সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, নিশ্চেষ্টভাবে আরামে নিদ্রাগত হইয়া কেবল স্বপ্ন দেখিতে লাগিল! পশ্চিম তখন উদ্যমশীল, এখন সে পূর্ব্বদেশের ঘাড়ের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদেশের নিদ্রাভঙ্গের প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায়ের উপর, এই ঘুম ভাঙ্গাইবার ভার পড়িয়া ছিল। সুদীর্ঘকালের নিদ্রার পর মানুষ যখন প্রথম জাগিয়া উঠে তখন তাহাদের যেরূপ অবস্থা, রাজা রামমোহন রায়ের সময় আমাদের দেশের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে সময়ের ইংলণ্ড্ বা ফরাসী দেশ কি বাহিরের জগতে, কি ভিতরের জগতে, অমিত উল্লাস ও উৎসাহের সহিত নানাদিকে সংগ্রাম করিয়া উন্নতিপথে সবেগে ছুটিতেছিল। কিন্তু সুপ্তোত্থিত মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ যেরূপ সম্মুখবর্ত্তী বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন কিছু দেখিয়াও দেখিতে পায় না, এবং দেখিলেও বুঝিতে পারে না, নিজের ভিতরের আলস্যের টানে ও সুপ্তাবস্থার স্বপ্নের ঝোঁকে নিশ্চেষ্টবৎ পরিলক্ষিত হয়, রাজা রামমোহন রায়ের যুগে বাঙ্গালা ভাষার পাঠকগণের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়। এই কারণে তাঁহার রচনায় সমসাময়িক ইউরোপের সমাজ, সাহিত্য বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংগ্রামের কথা এত অল্প। একমাত্র 'সংবাদ-কৌমুদী'তে সরল ভাষায় লিখিত ছোট ছোট প্রবন্ধের সাহায্যে, তিনি দেশের লোককে বাহিরের অধ্যবসায়শীল ও উন্নতিমুখ জগতের সহিত পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দেশের লোক তখন শাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই জানিত না। আবার এই শাস্ত্র নিতান্ত আংশিকরূপে জানিত। নব্যন্যায়ের আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রতিভা যতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক, পরবর্ত্তী সময়ে এই নব্যন্যায়ের আলোচনায় যে এই 'বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপ-ব্যবহার' করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ন্যায়দর্শনে—বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প—এই তিন প্রকার তর্ক বা আলোচনার কথা আছে। উভয় পক্ষ যেখানে সত্য জানিতে উৎসুক, কেহ কাহাকেও তর্কে পরাস্ত করিতে চাহে না, সেই অবস্থার যে আলোচনা বা বিচার, তাহার নাম—'বাদ'। আর, অপরের মত না শুনিয়া ও না বুঝিয়া, কেবল তর্কনৈপুণ্য ও বাক্‌চাতুরীর দ্বারা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করিবার যে চেষ্টা তাহার নাম—'জল্প'। আর, প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করিয়া অপদস্থ করিবার যে অবস্থা, তাহার নাম—'বিতণ্ডা'।

নবদ্বীপের নব্যন্যায় প্রধানতঃ এই জল্প, ও বিতণ্ডার উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চরিত্রের যে অধোগতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এযুগে বলিলাম—মানসিক চরিত্রের অধোগতি; কিন্তু রাজা রামমোহন রায় সে কথা বলেন নাই। সে সময়ের পণ্ডিতদিগের মানসিক অবস্থার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংস্কার ও বিশ্বাস মানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদেরই প্রণালী অনুসারে তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কারণেই রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনায় শাস্ত্রীয় আলোচনার বাহুল্য ঘটিয়াছে। কেবল শাস্ত্রের বাক্য ও শাস্ত্রের মীমাংসা লইয়া যদি রাজা রামমোহন রায়কে বিব্রত হইতে না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান

সময়ে স্বচ্ছ ও সুপাঠ্য অনেক সামগ্রী তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে দিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া, জনসংঘের চিন্তা-গত মুক্তিপথ নির্ম্মাণ করিবার জন্য, তাঁহার গদ্য-রচনাকে দুরূহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা-রীতি, তাঁহার মানসিক প্রকৃতিরই পরিচায়ক।

ভাষা বা সাহিত্য ভাবগোপনের জন্য নহে—ভাব প্রকাশের জন্য। কিন্তু যখন জাতিবিশেষের জীবন ভাবহীন নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সাহিত্যের যাহা লক্ষ্য, তাহার প্রতি মনোযোগ থাকে না, কেবল ভাষার মূর্ত্তি লইয়াই লেখকেরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও অকারণ বাদানুবাদ করেন। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় এবং তাহার অনুকরণে রচিত অনেক বাঙ্গলা কবিতায় এই দুর্দ্দশা পরিলক্ষিত হয়: পণ্ডিতেরা এমন একটি শ্লোক রচনা করিলেন, যাহার পাঁচ বা সাত প্রকার অর্থ হয়। এই-প্রকারের রচনায় শব্দ-শাস্ত্রের উপর অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই রচনা ভাবসংক্রমণের উপযোগী নহে। সুতরাং এই প্রকারের রচনাকে প্রকৃত প্রাণময় সাহিত্য বলা যায় না। রাজা রামমোহন রায় পণ্ডিতদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্য করিলেন—বড় বড় *পণ্ডিতদের সহিত বিচার করা বড়ই কঠিন। তাঁহারা ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির সাহায্যে একটি শব্দ বা একটি বাক্যকে নানা সময়ে নানারূপে ব্যাখ্যা করেন।* সুতরাং কথা লইয়াই মারামারি হয়—কথার যে কি অর্থ, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই প্রকারের নিষ্ফল তর্কের ঝটিকা, মানবের মনোবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের একেবারেই অনুপযোগী। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকাতেই রাজা রামমোহন রায়, এই-প্রকারের তর্কপ্রিয় ও শব্দসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণকে এমনি ভাবে শব্দ লইয়া ব্যায়ামচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং ব্যবহৃত বাক্য মাত্রেরই একটি সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিচিত অর্থ গ্রহণ করিয়া শব্দের আবরণ ভেদ পূর্ব্বক, অর্থরাজ্যে বা ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। সৎ-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই সূত্রপাত।

রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতগণের সহিত অতীব নিপুণভাবে শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিচার মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত এই অতি প্রাচীন দেশে, মানবের অধিকার ও রুচিভেদে নানা যুগে নানা শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের শাস্ত্রেরই চর্চ্চা করেন। প্রয়োজন-মত অপর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তর্ক বা বিতণ্ডা করেন বটে, কিন্তু অপরের যাহা যুক্তি, তাহা শ্রদ্ধার সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেন না। অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপনাদিগকে বেদানুগত বলিয়া স্বীকার করেন। এই-প্রকারের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কারণ, ইহাতে বিরোধ ও দলাদলির নিষ্পত্তি হইবার উপায় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিভার নিদর্শন এই যে, তিনি অনেকটা অপক্ষপাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র লইয়া বিচার করিতে

পারিতেন; সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে মৈত্রী হয়, প্রত্যেক সম্প্রদায় সাধুভাবে নিজেদের শাস্ত্রীয় ও সম্প্রদায়িক উপদেশ অনুসারে চলিয়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিদ্বেষসম্পন্ন না হইয়া, অপরের সহিত তাঁহাদের যে মিলনের ভূমি রহিয়াছে, সেই ভূমি যাহাতে দেখিতে পান, রাজা রামমোহন রায় সেজন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল যে হিন্দুসমাজের সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে তিনি এই মিলনের ভূমি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে, খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা খৃষ্টীয়ানদিগকেও এই উদার মতসহিষ্ণুতায় ও মৈত্রীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার ভাবজীবনে কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রচলিত মত অনুকরণও করেন নাই। সমগ্র মানবজাতিকে তিনি আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রকৃতিসিদ্ধ পথে অগ্রসর হইয়া, কি প্রকারে অপরের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইতে পারে, রাজা রামমোহন রায় তাহারই সাধনা করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমাদের দেশে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এখন আর পক্ষাপক্ষের দিন নাই। আমরা স্বীকার করি বা না করি, তিনি বহুল পরিমাণে আমাদের ভাব-জীবনের ও কর্ম্মজীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্য এবং বিচারপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া লাভবান্ হইবার জন্য, এখন বিচারণার সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। প্রণালী নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে আলোচনা ফলপ্রদ হইবে না। রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টীয় বা বিদেশীয়গণের সহিত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম ও সাধনা লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, এখনকার দিনে আমরা যদি সেই আলোচনাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব তিনি আমাদের কে। এই ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকারে গৌরবান্বিত করিবার জন্য, এই ভারতবর্ষকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে উচ্চতম সিংহাসনে বসাইবার জন্য, তিনি কিরূপ আগ্রহান্বিত ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিলে, আমরা রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরতম প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারিব। রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার এই নিগূঢ় মর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইলে, তাঁহার অন্যান্য আলোচনা ও মতামত আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে এবং আমরা রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত আদর্শ বুঝিতে পারিব।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ গ্রন্থ ছাপাইয়া ও বক্তৃতা করিয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মের নিন্দা প্রচার করিতেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি মানবের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে বিচারপূর্ব্বক নিজ নিজ ধর্ম্মমত গঠন করিবার অধিকারী, ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের মত ছিল। ইংরেজ জাতির উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম বিশ্বাস ছিল। তিনি বিবেচনা করিতেন,—ইংরেজ সকল সময়েই নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতী। তিনি খৃষ্টীয় প্রচারকগণের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু খৃষ্টীয় প্রচারকগণ বিচারে আসিলেন না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন যে, হিন্দু বা মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিষয়ক ধারণায় যে-সমুদয় ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তদপেক্ষা ভীষণতর ভ্রান্তি তাঁহাদের নিজেদেরই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যে রহিয়াছে। যদি সংশোধন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মমণ্ডলীরই সংশোধন আবশ্যক। কেবল নিন্দা করিয়া বা লোক দেখাইয়া, একজন লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্‌লাইয়া দেওয়া বা এক ধর্ম্ম হইতে অপরধর্ম্মে দীক্ষিত করা, কিছুতেই সঙ্গত নহে। নিরপেক্ষভাবে ও বন্ধুর ন্যায় সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করুন, জন-সাধারণ এই আলোচনার সহিত পরিচিত হউক ; এই প্রকারের আলোচনা করিতে করিতে মানবমাত্রেরই হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইবে এবং তাহারা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের মতামত গঠন করিতে পারিবে। রাজা রামমোহন রায় এই মত, সজোরে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাজা হিন্দুদের প্রাচীনতম উন্নততম বেদান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে, এই মত সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়া কাহাকেও তাঁহার মতে আসিয়া দল বাঁধিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যাহা বলিতেছেন, সকলে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনুক ও শুনিয়া চিন্তা করুক—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি নিজেকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। প্রতিপক্ষের মত, সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন এবং আশা করিতেন—অন্যে তাঁহার মত, সুযুক্তির দ্বারা খণ্ডন করুক। কিন্তু কি দেশীয় পণ্ডিতগণ, কি বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ, কেহই তাঁহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। দেশীয় পণ্ডিতগণ বাক্‌ছল, জল্প ও বিতণ্ডায় অতিমাত্র অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার পর যে কারণেই হউক, রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত অভিপ্রায় তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না—সর্ব্বদাই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বার্থহানীর আশঙ্কাও যে ছিল না, তাহা নহে।

এখন, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব, জ্ঞানহীন অথচ শক্তিশালী বৈদেশিকগণ, আমাদের দেশের সামগ্রীর প্রতি যখন অবিচার করিতেন, তখন রাজা রামমোহন রায়, কিরূপ সিংহ-বিক্রমে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। তাঁহারা অবশ্য, রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তির দ্বারা নিরস্ত হন নাই ; কিন্তু দেশের যাঁহারা তখনকার বা ভবিষ্যতের শ্রদ্ধালু লোক, তাঁহারা নব্যভারতের সমস্যা কি, এবং এই দারুণ সমস্যার মধ্যে, আমাদিগকে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র ও পরাজিত— অতএব তাহার ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য সমস্তই উপেক্ষণীয়—এই ধারণার বশবর্ত্তী বৈদেশিকগণ, রাজা রামমোহনের দ্বারা বহুল পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মত, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণকে অভিভূত করিতে পারে নাই ; তাহার প্রধান কারণ, রাজা রামমোহন রায়ের সাধনা ও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বৈদেশিকগণের সহিত বিচার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজা রামমোহন রায় দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন—ভাসাইয়া দেন নাই।

বৈদেশিক চিন্তা ও সাধনার তরঙ্গসমূহ, বিপুল ও প্রচণ্ডবেগে যে সময় ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষ-নিবন্ধন যে সুবিপুল ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হইল, রাজা রামমোহন রায়, সেই সংঘর্ষ-তরঙ্গের শীর্ষদেশে অকুতোভয়ে বীরের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ, ভারতবর্ষকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। আত্ম-প্রকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় না পাইলে, এই সংঘর্ষে আত্মরক্ষা অসম্ভব। ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম কার্য্য। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে, বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান জীবনে ও সমাজে অনেক অবাঞ্ছনীয় আবর্জ্জনা জমিয়াছে, যাহা অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা দূর করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনায় দেখা যায় যে, দেশের ধর্ম্ম বা সমাজ-সংস্কারকার্য্যে তিনি বিদেশের শাস্ত্র-অভিজ্ঞতা বা সাধনার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেশীয় পদ্ধতিতে, দেশীয় শাস্ত্রের সাহায্যে এবং দেশীয় বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই সংস্কারকার্য্যে দেশবাসিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বৈদেশিক সাহিত্য, ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু দেশীয় জনসাধারণকে সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারে আহ্বান করিবার সময়, তিনি ঐ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। আমাদের ব্যাধি, আমরাই তাহার নিদান নির্ণয় করিব—আমাদেরই নিজেদের ঔষধের দ্বারা, আমরাই তাহার আরোগ্য বিধান করিব। বৈদেশিকগণকে তিনি যেন বলিলেন—'বন্ধুগণ, আমাদের ব্যাধি আমরা বুঝিতেছি, তোমাদের ব্যাধি তোমরা নির্ণয় কর। নিজেদের ব্যধির খবর না লইয়া, সময়ে অসময়ে অজ্ঞতাবশে আমাদের হিতৈষণা করিও না। যদি তেমনভাবে মিশিতে পার, সকলেরই মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও প্রত্যেক সমাজ, নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।"

তবেই দেখিতেছি, রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেন নাই—অন্ধভাবে প্রাচ্যকেও গ্রহণ করেন নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—উভয়েরই উর্দ্ধে এক সুনির্ম্মল শাশ্বত কল্যাণ, তিনি তাঁহার মানস-নেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। বেদান্তের শিক্ষার দ্বারা তিনি এই আদর্শ সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং দেশীয় ও বিদেশীয়গণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক স্বদেশপ্রেমিক ও পণ্ডিতগণ সে সময়ে যদি রাজা রামমোহন রায়কে যথার্থরূপে বুঝিতেন, তাহা হইলে নব্যভারতের সাধন-পথ হয়ত অন্যরূপ হইত। কিন্তু সেজন্য এখন বৃথা আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই।

নব্য-ভারতের আদিগুরু রাজা রামমোহন রায়, কেবল ভারতবর্ষের সাধন-ক্ষেত্রে নহে—সমগ্র মানবজাতির সাধন-রাজ্যে কত উচ্চস্থানের অধিকারী তাহা না বুঝিলে, এ কালের লোকে তাঁহার বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবার কষ্ট স্বীকারে সম্মত হইবে না। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য-রচনায় অতি গভীর রস আছে এবং এমন আলোক আছে, যাহা পাইলে আমরা বিশেষরূপে ধন্য ও লাভবান্ হইব। কিন্তু পরিশ্রম না করিলে, একটু বিশেষ রকমের কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইলে, এই রসের আস্বাদন হইবে না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সহিত অতি উত্তম রূপে

পরিচিত হওয়া আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন। কি করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর বিস্তৃতরূপ পঠন পাঠন প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে, সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। তাঁহার রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি সিদ্ধান্ত পৃথক্ করিয়া, সেই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিগুলি এবং প্রতিপক্ষের আপত্তি ও তাহার খণ্ডনসমূহ যদি উত্তমরূপে সাজাইয়া শিক্ষার্থিগণের নিকট ধরিতে পারা যায়, এবং বর্ত্তমানযুগের চিন্তা ও চেষ্টার সহিত তাঁহার সিদ্ধান্ত ও যুক্তিপ্রয়োগের সম্বন্ধ, যদি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের ও বঙ্গ দেশের অভাবনীয় উপকার হয়।

গতানুগতিকতা বর্জ্জন করিয়া, সমাজের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তির সূত্র অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রানুগ যুক্তির সাহায্যে, প্রত্যেক নরনারী সংযত ও স্বাধীনভাবে আত্মোপলব্ধি করিবে—ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মেলন, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদ্‌গত মৈত্রী স্থাপন, রামমোহনের সাধ্য বিষয় ছিল। মানবতার উন্নততম উদারবার্ত্তা, রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই বঙ্গদেশে ঘোষিত হইয়াছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি, সে সময়ের উপযোগী আকারে এই-সকল কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহার কথা গ্রহণ করিবার ও সম্যক্‌রূপে বুঝিবার সামর্থ্য কেবল ভারতের নহে, মানবজাতিরই ভালরূপ ছিল না। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। আজ মহামানবের এই অভাবনীয় জাগরণের দিনে জগৎবাসী ও রাজার স্বদেশবাসিগণ, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। তাহাতে সমগ্র জগতেরই কল্যাণ হইবে এবং নব্যভারতও তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে।*

শ্রীশিবরতন মিত্র

---

* লেখকের—'মোহন-সুধা' (রাজা রামমোহন রায়ের রচনা সংগ্রহ) নামক গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত। ১৩২৯ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত।

আমাদের লক্ষ্য

মাসিক পত্রিকার যাহা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—জ্ঞান-প্রচারের যে অংশ, মাসিক পত্রিকার দ্বারা সাধিত হয় বা সাধিত হওয়া আবশ্যক, তাহা ছাড়া 'বীরভূমি'র একটী বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পুরাতন লেখা হইতে, সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হইল।

প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'বীরভূমি'তে দুইটী বিশেষ কথা লিখিত হইয়াছিল। সেই দুইটী কথা দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যায় উদ্ধৃত করা হয়। সেই অংশ দুইটী এবারেও উদ্ধৃত করিলাম।

"নব্য বঙ্গের জাতীয় সাধনা, সাহিত্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সময়ে এমন একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সব নূতনতর প্রয়োজন আমাদের পুরোবর্ত্তী হইয়াছে, যে এখন রাজধানীর বাহিরে মফঃস্বলে স্বাধীন সাহিত্যানুশীলনের কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এখন এককে বহু হইতে হইবে,—ভবিষ্যতে বহুর মধ্য দিয়া এক, আপনার সত্তা পূর্ণতররূপে বুঝিতে পারিবেন। চেতন জীবের সমষ্টির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি, অংশী বা সমষ্টির ধর্ম্ম, চেতনভাবে উপলব্ধি করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণায় তাহার অনুবর্ত্তন করে। বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ইহা সত্ত্বগুণাত্মক। আমাদের দেশকে এই সাম্যে লইয়া যাইতে হইলে, প্রত্যেক জেলাকে এখন স্বাধীন-ভাবে আত্ম-উপলব্ধি করিতে হইবে'।

আর একটী কথা বলিয়াছিলাম, তাহাও পুনরায় বলা প্রয়োজন। "এখনও সাহিত্যের যে অবস্থা, তাহাতে ব্যবসায়ের উপকরণ স্বরূপে সাহিত্যকে ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। * * এখনও আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহিত মাতৃভাষার যে সম্বন্ধ, তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যকে লইয়া দীর্ঘকাল যাচকভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করিতে হইবে।"

পূর্ব্বের উদ্ধৃত অংশ দুইটীর বিশদ ব্যাখ্যা এবং বর্ত্তমান সময়ের দেশের অধিকাংশ লোক যাহা প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই প্রয়োজন সাধনে উহাদের প্রয়োগ কোথায়, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে আলোচনা পরে করা যাইবে।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় "আমাদের লক্ষ্য" সম্বন্ধে আরও যাহা বলা হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। এই অংশটুকুর সাহায্যেই আমাদের উদ্দেশ্য অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

"পৃথিবীর ইতিহাসে এখন এক অভিনব যুগ আরম্ভ হইয়াছে—নিজেকে লইয়া নিশ্চিন্তভাবে কাহারও বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—অন্যান্য সমস্ত জাতি যে সাধনার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে—ঠিক সেই স্রোতে অন্ধভাবে তাহাদের যে অনুবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা নহে, তবে এই সাধনার স্রোতে

যে স্বাস্থ্যকর বেগ ও পুষ্টি আছে, তাহা সকল জাতিকেই; অবশ্য, আত্মপ্রকৃতি বজায় রাখিয়া, গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগত আজ মিলিত হইয়াছে—ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মের, আত্মার সহিত দেহের, অন্তর্নিমগ্নতার সহিত বাহ্য পটুতার এই সম্মিলন উৎসব—মানব জাতির ইতিহাসে এক অভাবনীয় ব্যাপার! প্রতীচ্য জগতের আদর্শে জাপান পার্থিব মহত্ত্বের উন্নত শিখরে উঠিয়াছে, চীন ও পারস্য বিক্ষুব্ধ, তুরস্কও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতির সাহিত্যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাহারা যেন বিশ্বমানবের সভ্যতার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা দেশের নানা জাতি যাহা কিছু করিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যে সমস্তই পাওয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবী—তাহাদের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত—তাই তাহাদের কবি, তাহাদের দার্শনিক, তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণ কেমন নির্ভয়ে নব নব তত্ত্বের অমৃতরসে স্বদেশবাসী জনগণের হৃদয় ও মনের পুষ্টিসাধন করিতেছে—নব নব উদ্দীপনা জাগাইয়া, নব নব আশার স্বপ্ন উদ্বোধিত করিয়া, স্বদেশবাসিগণকে নব নব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে। আবার নিজের দেশ সম্বন্ধেই বা তাহাদের আলোচনা কত! তাহারা স্বদেশকে ভাল বাসিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের এই স্বদেশপ্রাণতাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য, কত বড় বিরাট ও শক্তিশালী সাহিত্য কার্য্য করিতেছে, সে সংবাদটাও রাখা দরকার। এই সমস্ত উন্নত জাতির সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতেছি—কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, কি অনির্ব্বচনীয় অধ্যবসায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত শত সাহিত্য-সেবক, নিজের হৃদয়ের রক্ত দিয়া এই সাহিত্যেরর পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রাণদান করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। তাঁহারা কত অভাব, কত উপেক্ষা, কত অনাদর, দারিদ্র্যের কত তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। আজ যাহাদের সাহিত্য উন্নত, সাহিত্য-সেবকগণ সম্মানিত ও বৈভবশালী, তাহাদের এই সার্থকতার পশ্চাতে, প্রতিবন্ধকতার সহিত যে প্রচণ্ড সংগ্রামের স্মৃতি পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদিগকে যত্নের সহিত এখন তাহারই সংবাদ রাখিতে হইবে।

"আমাদের সাহিত্যে এখন সেই নীরব ও আপাতঅবজ্ঞাত সাধনার প্রয়োজন। আমাদের দেশের সহিত, দেশবাসিগণের সহিত আমাদের পরিচয় কত অল্প! আমরা বলিয়া থাকি আমাদের অতীত খুব গৌরবময়, কিন্তু কৈ সে অতীত? তাহার সহিত আমাদের পরিচয় কতখানি? তাহার শোণিত আমাদের ভাব-জীবনের শিরা উপশিরায় কতটুকু প্রবাহিত হয়? বোধ হয় নব্য জার্ম্মাণের চিন্তায় ও সাধনায় ভারতের দর্শন ও সাহিত্য যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, আমাদের নিজের সাহিত্যে তাহার কিছুই করে নাই। মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু—এই তিনটি মহতী সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণ আজ গঙ্গার এই পবিত্র উপত্যকায়, একটা মহামিলনের স্বপ্ন দেখিতেছে—বিধাতার কৃপায় এ স্বপ্ন সফল হউক, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এই তিনটী সাধন-প্রবাহের ত্রিবেণী সঙ্গম হইল কৈ?

"আমরা ব্রাউনিং সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, হেগেল দর্শনের অনুবাদ করিতেছি, কিন্তু ঐ যে

দরিদ্র কৃষক হলকর্ষণ করিতেছে, দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, মহাজনের ঋণে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে,—সে এই সাহিত্যের নিকট তাহার অন্তর্জীবনের কতটুকু উপজীব্য পাইতেছে? তাহার কি জীবনের এমন একটা দিন নাই, সাহিত্য যাহা স্পর্শ করিতে পারে? এক দিন কি এই দেশেরই প্রাচীন সভ্যতা তাহার জীবনে সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করে নাই? সে কি গান গাহে না, সে কি কবি, পাঁচালি, মনসামঙ্গল, যাত্রা, কথকতা শোনে না, সে কি তর্ক করে না, উপদেশ দেয় না, বৃহত্তর জীবনের একটা ছায়াপাত কি তাহার হৃদয়ে হয় না? আমরা জানি বা না জানি, সেখানেও সাহিত্য আছে, তাহার চর্চ্চা আছে, সাহিত্যিকও আছে। সেখানে আমরা যাই না, যাইতে পারি না, যাইবার চেষ্টাও করিনা। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে দেশের বৃহত্তর অংশটারই স্থান নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যে "সাধারণের কৌতূহলের যুগ" আসিতেছে, সাহিত্য সবল হইবে, জাতীয় চিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এখন দেখিতেছি চক্র বুঝি বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে; "পৃষ্ঠপোষকতার যুগ" বুঝি আর শেষ হয় না। হায় আমাদের দুর্ভাগ্য!

"সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত, তাহার প্রতিষ্ঠারও একটা বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে হইতেছে না, তাহা নহে, কিন্তু এই চেষ্টার মূলে ব্যবসায়-বুদ্ধি অপেক্ষা একটা উন্নততর বৃত্তির প্রয়োজন। দেশের সকল লোককে স্বল্লাধিক পরিমাণে সাহিত্যের উন্নতিমুখী গতির সহিত বাঁধিতে হইবে। দেশে কত লোক যথার্থ ও স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ লইয়া আসিতেছে, কিন্তু শিক্ষা, সদুপদেশ, সাহায্য ও সৎসংসর্গের অভাবে, অথবা চাতুর্য্যের অসৎ প্রতিযোগিতায়, তাহাদের শক্তি বীজ বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত অজ্ঞাত কুসুমের অর্ঘ্য আহরণ করিয়া, বঙ্গবাণীর পূজার ডালায় উপস্থিত করা প্রয়োজন।

"সাধু সাহিত্য-সেবক চাই, যথার্থ ত্যাগশীল ও পরার্থপর লোককে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনিতে হইবে। নগরের অসৎ প্রতিযোগিতার মধ্যে তাঁহাদের যাইতে দেওয়া হইবে না, তাঁহারা গ্রামে বসিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিবেন—অথচ দেশের ও জগতের উন্নতিমুখী গতির সহিত অসংশ্লিষ্ট থাকিবেন না—গ্রামবাসিগণ এই সমস্ত সাহিত্যিকগণের পুণ্য-প্রভাব অনুভব করিবে। এই জন্যই গত বৎসর বলিয়াছিলাম—"বীরভূমেও সাহিত্যিক শক্তি বলিয়া একটা পদার্থ আছে, আজ তাহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত; সেই শক্তি এই 'বীরভূমি'তে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হউক, এই 'বীরভূমি' বিশ্বসাহিত্য ও সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের সহিত, বীরভূমবাসীর সম্মিলিত সাহিত্য-সাধনার প্রবাহের মিলন-ক্ষেত্র হইয়া, পুণ্য-প্রয়াগে পরিণত হউক, তাহা হইলেই আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।" কিন্তু এই সমস্ত পল্লীবাসী সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবে কে? তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি? এই কার্য্যের জন্যই মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপনার প্রয়াস।"

বিজ্ঞাপন

"বীরভূমি" মাসিক পত্রিকা, পূর্ব্বে চারি বৎসর ছয় মাস কাল পরিচালনা করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। শেষ বৎসরের ছয় খানি বাহির হওয়ার পর কাগজ বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কোনও গ্রাহকের নিকট শেষ বৎসরের মূল্য লওয়া হয় নাই। পরিচিত গ্রাহকগণের নিকট অগ্রিম মূল্য লওয়ার নিয়ম ছিল না; প্রয়োজন মত বৎসরের যে কোন সময়ে মূল্য চাহিয়া লওয়া হইত। শেষ বৎসরের প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম, অন্যান্য কার্য্যের ভার যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কাগজ বাহির করিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। এই কারণে, শেষ বৎসর গ্রাহকগণের নিকট মূল্য লওয়া হয় নাই। আমি এখন অন্যান্য কর্ম্ম হইতে বহুল পরিমাণে অবসর লইয়া, সিউড়ী হইতে পুনর্ব্বার 'বীরভূমি' প্রচার আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বে যাঁহারা 'বীরভূমি'তে লিখিতেন, তাঁহারা অনেকেই এখন জ্ঞানরাজ্যে স্বদেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহারাও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত ভাবে লিখিবেন। সিউড়ীর 'রতন-লাইব্রেরী'তে অসংখ্য প্রাচীন ও অপ্রকাশিত মূল্যবান বাঙ্গালা পুঁথি আছে। সেই পুঁথিগুলি ক্রমে ক্রমে এই কাগজে প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ের যাবতীয় সমস্যা এই কাগজে আলোচিত হইবে। কাগজখানি যাহাতে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হয়, তাহা করিতে চেষ্টার ক্রটী হইবে না। বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইবে। গত বৎসর 'বীরভূমি' বাহির করিব বলিয়া, পর পর ছয় খানি পুস্তিকা বাহির করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যা ষষ্ঠ ভাগ প্রথম সংখ্যারূপে বিবেচিত হইবে। বার্ষিক মূল্য—ডাক মাশুল সহ তিন টাকা মাত্র। পূর্ব্বে 'বীরভূমি'র যাহা লক্ষ্য ছিল, এখনও তাহাই লক্ষ্য। সহৃদয় বন্ধুগণ সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন ইতি।

সিউড়ী—বীরভূম।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

———

ধর্ম্মের গ্লানি ও দেবজন্ম

পৌরাণিকগণ মানব জাতিকে এই আশা দিয়া গিয়াছেন যে যখনই যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হইবে, তখনই দেবজন্মের দ্বারা এই গ্লানি দূরীভূত হইবে। ধর্ম্মের গ্লানি কি, তাহা পুরাণের সাহায্যে আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে দেবজন্মের রহস্যও বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের কোন বাহ্য কারণ নাই এবং থাকিতেও পারে না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে, তাঁহার আবির্ভাবের কারণ বলিয়া যাহা পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ বা জনসমাজে পরিচিত, সেই কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। দৈত্য বা অসুরের দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। এই গ্লানি, বিশ্বব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক নিয়ম অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্লানি মধ্যে মধ্যে হইবে। বিশ্বব্যবস্থায় অসুর বা দৈত্যদিগের একটী সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। অসুরেরা যে সময় তাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করে, সে সময় সমুদয় ব্যাপার সুশৃঙ্খলায় চলিয়া যায়। নিজের স্থান পরিত্যাগ করিয়া অসুরেরা যে সময় অন্যের অধিকার কাড়িয়া লয়, সেই সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। সকল যুগেই ধর্ম্মের গ্লানি হয়। কিন্তু এক এক যুগের গ্লানি এক এক প্রকার। দৈত্যেরা বা অসুরেরা বিনষ্ট হইয়াও বিনষ্ট হয় না। তাহারা রূপান্তর গ্রহণ করে। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সংহার, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ও বিবিধরূপ সংমিশ্রণের ফলে বিশ্বব্যাপার চলিতেছে। সত্বগুণের শাসন বহির্ভূত অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অসুর ও দৈত্যের জন্ম। পাতাল ইহাদের স্বস্থান। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই, দেবী অসুরদিগকে বলিলেন,—তোমরা যদি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, পাতালে চলিয়া যাও।

কোনও যুগে, পৃথিবীর সমস্ত লোক যে ধার্ম্মিক ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। দেহসর্ব্বস্ব ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব লোক সকল যুগেই আছে। এই সমুদয় লোক যখন অনাদৃত অবস্থায় সমাজের নিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকে

যাঁহারা ত্যাগী, সাধু ও ব্রহ্মবিৎ—তাঁহারা যে সময়ে সমাজে পূজ্য ও তাঁহাদেরই শক্তিতে সমাজ পরিচালিত হয়, সেই সময় সমাজের প্রকৃত কল্যাণের যুগ বা সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত হয়। পুরাণের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি, ত্রেতাযুগেই সামাজিক জীবনের ভারকেন্দ্র কম্পিত ও বিচলিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য; কিন্তু এই প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য, অন্যেও লুব্ধ এবং চেষ্টান্বিত হইয়াছে। বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্ব ত্রেতাযুগের ঘটনা। পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় বিনাশ এবং তাহার হেতুভূত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যুদ্ধ—ইহাও ত্রেতাযুগের ঘটনা। শূদ্র তপস্যা করিতেছে, রাজা রামচন্দ্র তাহার মস্তক ছেদন করিলেন—ইহাও ত্রেতাযুগে ঘটিয়াছিল। সুতরাং, যদিও ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং ত্রেতাযুগের আদর্শ নরপতি শ্রীরামচন্দ্র, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি একথা সত্য যে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য খর্ব্ব করার জন্য সমাজের ভিতরে একটা চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ত্রেতাযুগের অসুর বা ধর্ম্মনাশক রাক্ষস রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরই পুত্র।

দ্বাপর যুগ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের যুগ। ত্রেতাযুগে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, আর দ্বাপর যুগে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থমা—ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ্যকামী শূদ্রের মস্তক, শ্রীরামচন্দ্র ছেদন করিয়াছিলেন; আর দ্বাপর যুগে ক্ষাত্র্যকামী একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ, দ্রোণাচার্য্য গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিযুগ বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সকলেই বৈশ্যের নিকট এই যুগে আত্মবিক্রয় করিবে। শূদ্রগণ বৈশ্যের সেবা করিয়া বৈশ্যের পুষ্টিসাধন করিবে। কলিযুগ যখন শেষ হইয়া আসিবে, তখন বৈশ্যের সহিত শূদ্রের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। এই সংঘর্ষের পর শূদ্র-প্রাধান্য। শূদ্র-প্রাধান্যের পরেই আবার সত্যযুগ আসিবে। পুরাণের আলোচনায়, সমাজ-বিজ্ঞানের এই নিয়মগুলির ক্রিয়া, বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বাপরযুগে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ সমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এই কারণে সে সময়ে অসুরেরা ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজা হইয়া সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের যাহা প্রসিদ্ধ কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—"দৃপ্ত নৃপতির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসংখ্য দৈত্য পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পৃথিবী তাহাদের ভার বহনে অক্ষম হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইল।"

ভূমের্দৃপ্ত নৃপব্যাজ দৈত্যানীক শতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরি ভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥

এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য প্রাচীন আচার্য্যেরা যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপে বুঝিয়া লইলে আমরা অনেক কথা জানিতে পারিব। মানবকে যিনি পালন করেন ও রক্ষা করেন, তিনিই 'নৃপ'। নৃপের যাহা কার্য্য অর্থাৎ ন্যায়তঃ দণ্ড ধারণ করিয়া মানব সমাজকে প্রকৃত উন্নতির অভিমুখে পরিচালনা, তাহা ব্রহ্মবিৎ ব্যতীত অন্য কেহ করিতে পারে না,—একথা প্রাচীন শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছেন—কাম. ক্রোধ, লালসা প্রভৃতি যাঁহার প্রকৃতিতে নাই, তিনিই দণ্ড ধারণের অধিকারী। অষ্টদিক্‌পালের অংশে তাঁহার জন্ম, তিনিই 'নৃপ' বা প্রকৃত রাজা। দৈত্যেরা শক্তিমান এবং প্রবল। কিন্তু তাহারা রাজা হইতে পারে না। কারণ তাহারা দেহাত্মবাদী। বেদে ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে বলা হইয়াছে, দেহাত্মবাদীরাই অসুর। দেহাত্ম-বাদ কি, তাহা কংশের চরিত্র আলোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। দৈত্যেরা নৃপ বা রাজা হইতে পারে না। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলিলেন,—"নৃপ-ব্যাজ" অর্থাৎ দৈত্যেরা রাজা হইবার যোগ্য নহে, কিন্তু জোর করিয়াই হউক, কাল প্রভাবেই হউক, অথবা মানব-সমাজের সমষ্টি-কর্ম্মের ফলেই হউক, কিম্বা ভগবানের কোনও বিশেষ লীলা অভিনয়ের জন্যই হউক দৈত্যেরা রাজা হইয়া বসিল। তাহারা প্রকৃত রাজা নহে। "নৃপব্যাজ" অর্থাৎ রাজাগিরি তাহাদের ছদ্মবেশ বা ছলনা। তাহারা নিজেদের ভোগ, সুখ ও স্বার্থ চাহে, রাজাসন দখল করিয়া সেই স্বার্থ সাধনে তাহারা নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা রাজা নহে, ছল-রাজা ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য "দৃপ্ত" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব তোষণী টীকায় "দৃপ্ত" কথাটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "দর্পস্বভাব নির্দ্দেশাৎ স্থানাস্থান বিবেকাভাবেন সদবমানাদিজ্ঞাপকত্বং দৈত্যানাং লক্ষণং।" ইহার অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে দৃপ্ত বা অহঙ্কারী তাহার বিবেক নাই, সে স্থান অস্থান বুঝিতে পারে না। কে সাধু কে অসাধু, কে সত্যবাদী, ত্যাগশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরোপকারী তাহা বুঝিতে পারে না, বা বুঝিতে পারিলেও নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে তাঁহাদিগকে বুঝিতে চাহে না, ফলে সজ্জনের অপমান হয়। দৈত্য যখন রাজা হইবে তখন ইহাই স্বাভাবিক। এই অবস্থার নাম ধর্ম্মের গ্লানি। অন্য যুগে অন্যরূপে ধর্ম্মের গ্লানি হইতে পারে, তাহা আমরা

পরে দেখাইব। দ্বাপর যুগে এই প্রকারে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল। ধর্ম্মের গ্লানি কি প্রকারে নিবারণ হইল, তাহাও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "দৈত্য নৃপতিগণের ভারে পৃথিবী আক্রান্তা হইলেন,"—ইহার অর্থ কি? পৃথিবী বুঝিলেন যে তিনি আক্রান্তা হইয়াছেন। পৃথিবীর এই বোধ, আমাদের আলোচনার বিষয়। অনেক সময়ে দৈত্যের উদ্ভব হয়, দৈত্যেরা এবং দৈত্যের আশ্রিত ও অনুগত লোকেরা, চারিদিকে দর্প করিয়া লম্ফ ঝম্ফ করে। যদিও তাহারা নিন্দিত ও ঘৃণিত, সর্ব্বদাই জঘন্য পাপকর্ম্ম করিতেছে এবং পাপাচরণের দ্বারা বিলাস ব্যসনে দিন যাপন করিতেছে—কিন্তু সে কথা বোঝে কে এবং বলেই বা কে? তাহারাই যে সমাজে প্রধান! মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে; যাহাদের কিঞ্চিৎ ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, তাহারা ভীরু, শক্তিহীন ও অসহায়। যাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি মলিন বা লুপ্ত, তাহারা পাপাচরণকে পাপ বলিয়া বুঝিতেই পারে না এবং পার্থিব স্বার্থের অনুরোধে বুঝিতে চেষ্টাও করে না। কেহ বুঝাইলে, শুনিয়াও শোনে না। যাহারা কিছু কিছু বোঝে, তাহারা সাহসহীন ও ভীরু। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণের কোনই উপায় নাই। পৃথিবী বুঝিলেন যে, তিনি দৈত্যভারে পীড়িতা হইয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে—একদিকে যেমন দৈত্যগণ ও তাহাদের অনুচরগণ, রাজপদ অধিকার করিয়া ধর্ম্মতঃ রাজ্য পালন না করিয়া, নিজেদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতেছে, সেইরূপ আর একদিকে কতকগুলি সাধু, তাঁহাদের সুনির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে দৈত্যদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন, তাহাদের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছেন এবং সমাজের এই দুরবস্থা ও ধর্ম্মহীনতা দর্শন করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহারা দুর্ব্বল ও নিরুপায় হইলেও আশাহীন বা উদ্যমহীন নহেন। তাহাদের যাহা বোধ অর্থাৎ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের যাহা ধারণা, তাহা সকলের ভিতর জাগাইবার জন্য তপস্যা করিতেছেন। ইহাই পৃথিবীর ভার-বোধ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—মানুষ কর্ম্মের দ্বারা দৈত্য হয়। ক্ষত্রিয়েরা অনেকদিন রাজ্য শাসন করিয়াছেন। শক্তি বড় কঠিন জিনিস। ইহা লাভ করিতে যে তপস্যার প্রয়োজন, ইহা রক্ষা করিতেও তদপেক্ষা অধিক তপস্যার প্রয়োজন। যাহার শক্তি নাই সে বুঝিতে পারে, শক্তিশালী লোকেরা শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। সে শক্তিলাভের জন্য তপস্যা করে। তপস্যার ফলে শক্তি লাভ করিয়া হয়ত কিছুদিন

সে শক্তির সদ্ব্যবহার করে, কিন্তু আবার অপব্যবহার আরম্ভ হয়। সামাজিক সমস্যার একটা চরম নিষ্পত্তি নাই। যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে, আর যুগে যুগে নূতন নূতন মীমাংসারও আবশ্যক হয়। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—পৃথিবী সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে লইয়া সভা করিয়া বসিয়াছিলেন। পৃথিবী, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিয়া করুণ-ভাষায় বলিলেন—অগ্নি সুবর্ণের গুরু, সূর্য্য গো-সমূহের পরম গুরু, আর নারায়ণ আমার ও লোক সমূহের পরম গুরু। নারায়ণ প্রজাপতিগণেরও পতি, আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ হইতে সমুদ্ভূত। আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, বসু, অশ্বী, বহ্নি, পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তৃগণ সেই অপ্রমেয় বিষ্ণুরই রূপ। যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ—সকলেই বিষ্ণুর রূপ; সমগ্র জগত বিষ্ণুময়।

তথাপ্যনেকরূপস্য তস্য রূপাণ্যহর্নিশম্।
বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে॥

বিষ্ণু বহুরূপ। কিন্তু এই বহুরূপের মধ্যে কাহারও যথেচ্ছাচারের পথে যাইবার অধিকার নাই। সমুদ্র বক্ষে নিত্য-সমুত্থিত তরঙ্গসমূহ যেমন, বাধ্য-বাধকতা সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ নিজ নিজ মর্য্যাদা পালনে বাধ্য, বিষ্ণুর বা স্থিতিশক্তির সাধনে এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই সেইরূপ নিজ নিজ স্থানে থাকিতে বাধ্য।

আমরা পূর্ব্বে, "দৃপ্ত" এই কথাটার ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছি, বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটীর দ্বারা তাহাই সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইল। প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এই সনাতন বাধ্য-বাধকতার বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজী ভাষায় এই নিয়মকে The Law Eternal Interdependence বলা যায়। নারায়ণ কথার অর্থ সূত্রান্তর্যামী বিরাট্। সূত্রে যেমন মনিগণ বদ্ধ থাকে, সেইরূপ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই সেই নারায়ণে বদ্ধ। মানব সমাজে এই বিধানের প্রতিচ্ছবি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম পুরুষের দেহ,—এই কথা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। দেহের একটা অঙ্গ যেমন অপরকে উপেক্ষা করিয়া বা ঘৃণা করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় কেহই স্বতন্ত্র নহে। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক। ব্রাহ্মণ যদি বলেন, আমি শূদ্রকে চাহি না, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অবস্থা কবন্ধের মস্তকের ন্যায় হইবে। ক্ষত্রিয় বাহু। বৈশ্য উদর, আর শূদ্র চরণ। যে যাহাই হউক,

প্রত্যেককেই নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা সমগ্র দেহের সেবা করিতে হইবে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায়, কোন বর্ণ বা কোন আশ্রম মনে করিবে না যে, সে সেব্য অর্থাৎ তাহার সুবিধার জন্য অন্যান্য বর্ণ ও আশ্রম রহিয়াছে। প্রত্যেকেই ভাবিবে—আমি সেবক। ব্রাহ্মণ তাহার তপস্যা ও জ্ঞানের দ্বারা, ক্ষত্রিয় তাহার বাহুবল ও বীর্য্যের দ্বারা, বৈশ্য তাহার সঞ্চিত ধনের দ্বারা, আর শূদ্র তাহার দৈহিক সামর্থ্যের দ্বারা, সেই পুরুষের বা নারায়ণের অর্থাৎ সমাজ-দেহের সেবা করিবে। ইহাই বর্ণাশ্রম। অন্তর্মুখী হইয়া প্রত্যেকেই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে। বহির্মুখ হইয়া অধিকারের দাবী করিবে না। অধিকারের দাবী করিলেই বর্ণাশ্রমের বিপর্য্যয় বা ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ভারতবর্ষ বাধ্য-বাধকতার যে সনাতন বিধি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বিধির উপর আমাদের সামাজিক জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই বিধানে দর্পের স্থান নাই। দৈত্য-ভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ যে সময়ে দৃপ্ত হইলেন, সেই সময়ে দ্বাপরযুগের শেষে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কলিযুগের শেষে বৈশ্য ও শূদ্রের সংঘর্ষ হইবে এবং এই সংঘর্ষে শূদ্র-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রকৃত শূদ্র-প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠায় এত প্রকারের বিঘ্ন আছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; সুতরাং অনেক সংগ্রাম হইবে। কিন্তু শূদ্র-প্রাধান্য যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিবে। কারণ, *পূর্ণাঙ্গ শূদ্র-প্রাধান্যের যুগে,* প্রত্যেকেই অনুভব করিতে বাধ্য হইবে যে, সে সেব্য *নহে সেবক!* এই বোধই বর্ণাশ্রমের প্রাণ। সুতরাং প্রেম, ভক্তি বা নিষ্কাম সেবা-ধর্ম্ম কলির যুগধর্ম্ম।

বিষ্ণুপুরাণে পৃথিবীর কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে দ্বাপর যুগের গ্লানির পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ অনেকেই বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পৃথিবী বলিলেন,—

তৎসাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরোগমাঃ।
মর্ত্ত্যলোকং সমাক্রম্য বাধন্তেঽহর্নিশং প্রজাঃ॥
কালনেমির্হতো যোঽসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
উগ্রসেন সুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ স মহাসুরঃ॥

অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা।
সুন্দোঽসুরস্তথাত্যুগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ ॥
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে।
সমুৎপন্না দুরাত্মানস্তান্ ন সংখ্যাতুমুৎসহে ॥
অক্ষৌহিণ্যোঽত্র বহুলা দিব্যমূর্ত্তিধৃতাং সুরাঃ।
মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মমোপরি ॥
তদ্ভূরিভার পীড়ার্ত্তান শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।
বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ॥
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মিতি বিহ্বলা ॥

সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ পৃথিবী অধিকার করিয়া সর্ব্বদাই প্রজা পীড়ন করিতেছে। কালনেমী পূর্ব্বে প্রভাবশীল বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। সে এখন উগ্রসেনের পুত্র কংশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ এবং বলির পুত্র অতি ভয়ঙ্কর বাণাসুর ও অন্যান্য সুপ্রবল দুষ্টগণ, রাজাদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহাদের সংখ্যা গণনা করিতে অক্ষম। দিব্যমূর্ত্তিধর ও মহাবলদৃপ্ত দৈত্যপতিগণের বহু বহু অক্ষৌহিণী সেনা, আমার বক্ষে বিরাজ করিতেছে। আমি তাহাদিগের গুরুভারে পীড়িতা হইয়া আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছি। আপনারা ভারাবতরণ করুন, নতুবা হে মহাভাগগণ, আমি বিহ্বলা হইয়া রসাতলে গমন করিব।

যে সমুদয় দৈত্য বা অসুরের নাম কথিত হইয়াছে, তাহাদিগের পৌরাণিক বিবরণ আলোচনা করিলে আমরা অসুর-প্রকৃতির রহস্য কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিব। কিন্তু সে আলোচনা পরে হইবে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। সে সময়েও ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল। সেই গ্লানি কিরূপ তাহারই আলোচনা করিতেছি। যুগভেদে ধর্ম্মগ্লানির কিরূপ মূর্ত্তিভেদ হয়, বা অসুরগণের কিরূপ রূপান্তর হয়, এই আলোচনার সাহায্যে তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।

কলিশব্দের অর্থ কলহ। স্বতন্ত্র-বুদ্ধি হইতেই কলহের উৎপত্তি। সুতরাং কলিযুগকে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ বলা যায়। প্রথম যুগের নাম ব্রাহ্মণের যুগ, দ্বিতীয় যুগ

ক্ষত্রিয়ের যুগ। দ্বাপর যুগের শেষে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে, ক্ষত্রিয় রাজাদের আধিপত্য ও প্রাধান্য নষ্ট হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের পর ক্ষত্রিয়েরাই রাজা হইয়াছিলেন সত্য, ব্রাহ্মণদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন তাহাও সত্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়গণ, পূর্ব্বে অন্যান্য জনসাধারণের হৃদয় ও মনের উপর যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কলিযুগ আরম্ভ হইলে তাহা কমিতে আরম্ভ হইলে। অবশ্য, কলিযুগের যাহা বিশিষ্টতা, তাহার সম্পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠা সময় সাপেক্ষ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ সমূহের পুঞ্জীভূত কর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কার ও ধারণা, এক দিনে বা দুই চারি শতাব্দীতে ক্ষয় হইবার নহে। সুতরাং সংগ্রাম সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহা লক্ষ্য, তাহার অন্যথা হইবে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হইবেই হইবে। ঐতিহাসিক প্রাক্তন (Historical antecedents) আমাদের হৃদয়বৃত্তির ও মনোবৃত্তির গঠন করিয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমরা সকল সময়ে পছন্দ করিতে পারি না। কিন্তু যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা হইবেই। আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কলিযুগ এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। কাজেই, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যখন কলিযুগের ধর্ম্মগ্লানি বর্ণনা করিলেন, তখন রাজাদের কথা বিশেষ কিছু বলিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে রাজা, রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাজকর্ম্মচারীদের কথা মধ্যে মধ্যে কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা গৌণরূপে—মুখ্যরূপে নহে। কলিযুগের ধর্ম্মগ্লানি বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত, নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ, পণ্ডিত সমাজের প্রতিপালক ও পৃষ্ঠপোষক জন সাধারণের কথাই বর্ণনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে, দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। দেশ অতিশয় সুসমৃদ্ধ, প্রচুর অন্ন, লক্ষ্মীর কৃপায় সকলেই সুখে বাস করিতেছে। শাস্ত্রচর্চ্চাও যথেষ্ট। বাহির হইতে দেখিলে, সে সময় বেশ উন্নতি ও মঙ্গলের সময়। অথচ, সেই সময়ে অতি ভয়ঙ্কর ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। অসংখ্য ছাত্র, অসংখ্য অধ্যাপক, লক্ষ্মীর কৃপা যথেষ্ট, কিন্তু—

ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।

ইহার অর্থ কি? ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা, যাহা আর্য্য ঋষিগণের সাধনায় তপোবনে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তা না জানিলে ইহার অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। ব্যবহার ও পরমার্থ, জড় ও চেতন—ইহা লইয়াই সংসার। এক দিকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন, আর এক দিকে বুদ্ধি

ও আত্মা। এই দুইএর মধ্যে মানুষ তাহার কর্ম্ম লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মানুষ যখন আত্মার কথা ভুলিয়া যায়, মানুষ অনন্তের অংশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বাঁধা হইয়া রহিয়াছে, একথা যখন তাহার মনে থাকে না, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুখকে একমাত্র সত্য ভাবিয়া মানুষ যখন তাহাতেই ডুবিয়া যায়, তখনই বলা হয় যে মানুষ ব্যবহাররসে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহারই নাম ধর্ম্মের গ্লানি। দ্বাপর যুগে ক্ষত্রিয় রাজারা দৃপ্ত হইয়া বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার অন্যথা করিয়াছিলেন, আর কলিযুগে অধিকাংশ নরনারী ব্যবহার-রসে নিমগ্ন হইয়া পরমার্থ ভুলিয়া ধর্ম্মের গ্লানি ও সামাজিক দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে। অসুরেরা দেহাত্মবাদী। সুতরাং, মানুষ ব্যবহার-রসে ডুবিয়া গেলে আসুরিক ভাবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পারমার্থিক ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর লইয়া আমোদ প্রমোদে অতি হীনভাবে দিন যাপন করে।

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাহো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কলিযুগ জনসাধারণের যুগ বা পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। কিন্তু ইহার প্রথমাবস্থা বৈশ্যযুগ বা কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগ। অর্থই পরমার্থ হইয়াছে। যে প্রকারে হউক অর্থ সঞ্চয় কর। সকলেই অর্থের পূজা করিতেছে ধর্ম্মও যেন অর্থের দাস হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে ধনবান্ ব্যক্তিরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিষহরির পূজা করিতেছেন। এই পূজায় ভক্তি বা চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন নাই গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিয়া কতকগুলি লোক লইয়া রাত্রি জাগরণ আর অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের বৈভব প্রদর্শন। সুতরাং ধর্ম্ম প্রাণহীণ হইয়াছে। যাহাদের ধন আছে তাহাদের দম্ভের সীমা নাই। তাহারা ভাবিতেছে টাকা খরচ করিলেই ধর্ম্ম করা হইল। প্রকাণ্ড মন্দির করিলাম, মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লিখিলাম, গান হইল, বাজনা হইল,

অনেক টাকা খরচ হইল, যথেষ্ট ধর্ম্ম করা হইল। এই প্রকারের অসদ্ব্যয়ে দাম্ভিক ধনশালী ব্যক্তিগণ দিন যাপন করিতেছে। কে তাহাদিগকে শাসন করে? রাজা বৈদেশিক ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই। সমাজ তখনও ভিতরের শাসনে শাসিত ছিল। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজা তখন সমাজের বাহিরে। সুতরাং সমাজ-শাসনের ভার ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীগণের উপর ছিল। কিন্তু ভট্টচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র প্রভৃতি শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন, ব্যাখ্যাও করিতেন কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিবার শক্তি ছিল না। শাস্ত্রের সাহায্যে যুগ-ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইবে। সমাজ গতিশীল। পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মানবসমাজ অগ্রসর হইতেছে। মানবের অধিকার ও কর্ত্তব্য সকল যুগে ঠিক একরূপ নহে। কালের প্রভাবে ও পরিবর্ত্তনের ফলে মানবের হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম সনাতন; অর্থাৎ ধর্ম্মের যাহা মূলীভূত ও অন্তরতম সিদ্ধান্ত তাহা চিরকালই একরূপ। কিন্তু সাধনক্ষেত্রে যুগ-ধর্ম্মের সাহায্যে সেই সনাতনের অনুশীলন করিতে হইবে। যুগে যুগে মানুষ যেমন বদ্‌লাইতেছে, যুগধর্ম্মও সেইরূপ বদ্‌লাইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অনুভব যাঁহাদের আছে তাঁহারাই যুগধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। যুগের লক্ষণ ও প্রয়োজন বুঝিবার শক্তি যাঁহার নাই, শাস্ত্রচর্চ্চা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা ও পণ্ডশ্রম। ধর্ম্মাচার্য্যগণ এতদিন সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, এবারে তাঁহারাও কিছু করিতে পারিলেন না তাঁহারা শাস্ত্রের কুব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তাহার ফলে

শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে বান্ধি মরে॥

এই প্রকারে সমাজ দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। মানুষের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর।

দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন।

যে সমাজে মানুষ মাত্রেই পরের নিন্দা করে, বৃথা তর্ক করিবার ও সমালোচনা করিবার শক্তি যে সমাজে মানুষের অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায়, সে সমাজের আর কল্যাণ নাই। এই প্রকারের চরিত্রসম্পন্ন লোক দুই জনে একযোগে কোনও কাজ করিতে পারে না। উহারা কেবল ঝগড়া করে। একে অপরের নিন্দা করে ও দোষ কীর্ত্তন করে। ইহার

ফল অনৈক্য ও দলাদলি। সে দিনও দেশে অন্ন ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, অর্থ ছিল—কিন্তু বৈদেশিকের আগমন হইয়াছে। বৈদেশিকগণ আসিয়াছে, আসুক তাহাতে ক্ষতি নাই লাভ আছে, কিন্তু আমাদিগকে সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালে যে মহাসত্য পাইয়াছিলেন, যে মহাসত্যের ভিত্তির উপর আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই মহাসত্যের আলোক উজ্জ্বলভাবে রক্ষা করিতে হইবে। আমরা যদি তাহা করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী উপকৃত হইবে। অসুরভাবাপন্ন লোকেরা লোভের তাড়নায় এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া তাহাদের আসুরভাব পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু আমাদিগকে আত্মপ্রকৃতি রক্ষা করিয়া গৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—সংঘশক্তি কলিযুগে বিশেষভাবে প্রয়োজন। উন্নততর উদ্দেশ্য লইয়া বহুমানবের মধ্যে যে একতাবন্ধন তাহারই নাম সংঘশক্তি। কলিতে এই সংঘশক্তির প্রয়োজন। এখন একা একা পৃথক হইয়া ধার্ম্মিক হইলে চলিবে না। সকলকে লইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু যাহারা পরের দোষ ছাড়া গুণ দেখিতে পায় না, তাহারা অন্যের সহিত মিলিয়া চলিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত আর এক কথা বলিয়াছেন—

নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।

কোনও সমাজে প্রত্যেক লোক যদি নিজের প্রশংসা করে বা পয়সা দিয়া লোক ভাড়া করিয়া নিজের গুণগান করায়, সকলেই যদি বলে আমার ন্যায় বিদ্বান্ কেহ নাই, আমার ন্যায় বংশগৌরব কাহারও নাই, তাহা হইলে সে সমাজে কি হয়! সে সমাজে ঐক্য থাকিতে পারে না। সে সমাজ দলাদলিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষক তাঁহারা যুগধর্ম্ম অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং সমাজের নেতৃত্ব করিবার তাঁহাদের যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের নেতৃত্বপদ কাড়িয়া লয় কে? আর, বহুদিন হইতে যাঁহারা সমাজের উচ্চাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা কোনও সময়ে দরকার হইলে নিজেদের অযোগ্যতা বুঝিয়া যদি ঐ স্থান পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে সংঘর্ষময় বিপ্লব ব্যতীত সংশোধন অসম্ভব। ধর্ম্মাচার্য্যেরা যুগধর্ম্ম বুঝিতেন না। দাম্ভিক বিষয়ীর আনুগত্য করিয়া নিজের ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থ

যাহাতে সিদ্ধ হয় নিরন্তর তাহারই চেষ্টা করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মের নামে দম্ভ, কাপট্য, ভোগবিলাস ও নানারূপ ব্যাভিচার অবাধে সমাজ বক্ষে প্রবাহিত হইতেছিল।

বাশুলি পূজয়ে কেহো নানা-উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে কলিযুগের ধর্ম্মগ্লানি এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ কবিকর্ণপুর, তাঁহার শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকে এই ধর্ম্ম-গ্লানি ও সমাজ-বিপ্লব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সেদিনের অবস্থা দেখিয়া অনুভব করিলেন বৈরাগ্যই ভারতবর্ষীয় সমাজের গৌরবের ও কল্যাণের ভিত্তি। বর্ণাশ্রমরূপ আদর্শ সমাজ ভারতবর্ষের ঋষিগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ প্রকারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। কিন্তু ঐ ব্যবস্থার ভিত্তি কি? বৈরাগ্যই ঐ ব্যবস্থার ভিত্তি। একদিন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই বৈরাগ্য পথের পথিক ছিলেন। তাঁহারা যে সংসার করিতেন না, তাহা নহে, খুব জোরের সঙ্গেই সংসার করিতেন। কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরে একটা অনাসক্ত পরার্থপরতার ভাব ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের দৈনিক জীবন এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন যে, সংসারে থাকিয়া বিষয় ভোগ করিতে করিতে ভোগবাসনার দ্বারা জড়াইয়া পড়িতেন না। ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আসিত। সেকালের শিক্ষাপদ্ধতি মানুষের জীবনকে কর্ম্ম ও ভোগের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্য ও ত্যাগে লইয়া যাইত। অতএব বৈরাগ্যই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার বা ভারতবর্ষীয় সাধনার প্রাণ। মানব সমাজের যাবতীয় ব্যাধি, এই বৈরাগ্যের দ্বারাই আরোগ্য হয়।

এই কারণে নাট্যকার কবিকর্ণপূর, সেদিনের ধর্ম্মগ্লানি বুঝাইবার জন্য প্রথমেই বৈরাগ্যকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বৈরাগ্য আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বহির্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ বাহিরের সুখ ও সুবিধা, ইহাই সকলের কামনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। নিজের ভিতরে কেহই দৃষ্টিপাত করে না, মানব-জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য মানুষ যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

ন শৌচং ন সত্যং নচ শমদমৌ নাপি নিয়মো।
ন শান্তি র্নক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী নচ দয়া॥
অহো মে নিৰ্ব্যাজপ্রণয়ি সুহৃদোহমী কিল জনৈঃ।
কিমুন্মাদী ভূতো বিদধতি কিমজ্ঞাতবসতিং॥

শৌচ নাই, সত্য নাই, শম, দম, নিয়ম নাই। শান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই, হায় হায় মৈত্রী নাই. দয়া নাই। আমার সুহৃদগণ কোথায় গেলেন। কলিকালের মানুষেরা তাহাদের উন্মূলিত করিয়াছে। তাহারা কোথায় অজ্ঞাত বাস করিতেছে।

সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৈরাগ্য বলিতেছেন,

> ষষ্ঠে কর্ম্মাণি কেবলং কৃতধিয়ঃ স্বৈরেকাচল্লা দ্বিজাঃ।
> সংজ্ঞামাত্র বিশেষতো ভুজভুবো বৈশ্যাস্ত বৌদ্ধাইব॥
> শূদ্রাঃ পণ্ডিত মানিনো গুরুভয়া ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা।
> বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হাহন্ত সম্পাদিতা॥

ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীত চিহ্ন ধারণ করিয়া কি করিয়া দান পাইব, তাহারই জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ক্ষত্রিয়গণ কেবলমাত্র নামেই ক্ষত্রিয়, রাজ্য-পালনাদি কার্য্য তাঁহাদের হাতে নাই। বৈশ্যগণ বৌদ্ধের ন্যায়। ফলে শূদ্রেরা পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছে। কলির প্রবেশে জগতের এই দুর্দ্দশা।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাচীনকালের সামাজিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণের ছয়টী কর্ম্ম স্বাভাবিক। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। এই ছয়টি কর্ম্মের মধ্যে তিনটী আত্ম-মুখী অর্থাৎ কর্ত্তব্য. আর তিনটী সমাজমুখী অর্থাৎ অধিকার। কর্ত্তব্য পালন না করিলে কাহারও অধিকার থাকে না আমি কিছু করিব না, আর লোকে আমায় অকারণ সম্মান করিবে, এ প্রকারের আশা নিতান্তই অসঙ্গত। ব্রাহ্মণ নিজে যজ্ঞাদি করিতেন কাজেই অন্যে তাঁহাকে যাজকত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিত। নিজে যজ্ঞ না করিলে পরের বাড়ীতে পুরোহিত হইয়া দক্ষিণা লইবার অধিকার থাকে না। ব্রাহ্মণ সারাজীবন বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যুগধর্ম্ম অনুভব করিবার তাঁহাদের শক্তি ছিল। কাজেই লোকে তাঁহাদের নিকট আদর করিয়া পড়িত এবং তাঁহারা অধ্যাপক-রূপে সমাজের নেতৃত্ব করিতেন। ব্রাহ্মণ নিজের জন্য কখনই ধন সঞ্চয় করিতেন না। কাজেই লোকে তাঁহাকে দান করিত। ব্রাহ্মণের এই যে দান গ্রহণ—ইহার নাম প্রতিগ্রহ। সেকালে মানবের তেজস্বিতা ও আত্মসম্মানবোধ কিরূপ ছিল তাহা যাহারা জানে না, তাহারা মনে করে যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। অসহায় দুর্ব্বল

লোক যাহা ভিক্ষা করিয়া লয়, তাহার নাম ভরণ দান। ব্রাহ্মণ ভরণদান লইতেন না। দাতা দান করিয়া কৃতার্থ হন, এই প্রকারের দানের যে গ্রহণ তাহারই নাম প্রতিগ্রহ। শাস্ত্রে আছে, যে ব্রাহ্মণ সঞ্চয় করে তাহাকে দান করিলে দাতার পাপ হয়। পূর্ব্বের শ্লোকে বলিলেন, ব্রাহ্মণেরা বষ্ঠকর্ম্মে অর্থাৎ দান গ্রহণেই নিপুণ। কলিযুগে চারিবর্ণ যখন নিজ নিজ কর্ত্তব্য পরিভ্রষ্ট হইল, তখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে, বৈশ্যগণ বৌদ্ধের মত হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ চিন্তা করা উচিত। প্রাচীন সমাজে এমন ব্যবস্থা ছিল, ধর্ম্মানুষ্ঠানের এমন প্রণালী ছিল, যে প্রত্যেককেই সমাজের অন্যান্য সকলের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইত। নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য অবৈধ ও অনিয়মিত ধন-সঞ্চয় একেবারেই অসম্ভব ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নীতিমূলক ও জ্ঞানমূলক। যাহারা ধনসঞ্চয় করে তাহারা কৃপণ। অর্থব্যয় করিতে তাহারা কুণ্ঠিত; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে চলিলে তাহারা অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য। এই জন্য কৃপণ ও ধনলিপ্সু ব্যক্তিগণ ব্যয়সাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে অর্থ-ব্যয় না হয়, এই প্রকারের ছল-ধর্ম্ম অবলম্বন করে। কিন্তু ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে। ইহা ছলধর্ম্ম।

বর্ণচতুষ্টয়ের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া আশ্রমচতুষ্টয়ের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা বিবাহ করিতে অক্ষম তাহারা ব্রহ্মচারী সাজিয়াছে। গৃহস্থগণ ধর্ম্মহীন, স্ত্রী পুত্রের উদর ভরণ ব্যতীত তাহাদের অন্য কর্ম্ম নাই। বাণপ্রস্থাশ্রম একেবারেই লুপ্ত। সন্ন্যাসীর কেবল বেশভূষাই আছে। পণ্ডিতেরা কেবল তর্ক করিতেই পারেন, কল্পনাই তাঁহাদের শাস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা মায়াবাদী তাহারা ভগবানের বিগ্রহ বিশ্বাস করে না এবং শ্রীবিগ্রহে তাহাদের অনুরাগ নাই। কপিল, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতির মত লইয়া নিষ্ফল তর্ক করাই পাণ্ডিত্য। জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি নানারূপ বিরোধী মতে সমাজ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কতলোক সাধু সাজিয়া কামিনীকাঞ্চন সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি বলিয়া শত শত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি লোক ঠকাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। যাহারা তপস্বী বলিয়া পরিচিত, তাহারা কেবল বাহ্য আড়ম্বরের দ্বারা সরলচিত্ত নর নারীকে বঞ্চনা করিতেছে। ধারণা, ধ্যান, একাগ্রচিত্ততা, শাস্ত্রাভ্যাসে পরিশ্রম, জপ, তপস্যা ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি নাট্যশিক্ষা প্রণালীর ন্যায়

উদর পূরণের উপায় মাত্র হইয়াছে। কবিকর্ণপূর এই প্রকারে সে দিনের ধর্ম্মগ্লানি বর্ণন করিয়াছেন।

এইবার দেখা যাউক, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার কি প্রকারে হইয়া থাকে। দ্বাপরযুগের ধর্ম্মগ্লানি কি প্রকারে নিবারিত বা সংশোধিত হইয়াছিল? পৃথিবী পীড়িতা হইয়া গো-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন এবং আপনার দুঃখের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের গ্লানি যে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারাই, গ্লানি নিবারণের এবং দেবজন্মের প্রথম সোপান। পৃথিবীর বোধ, পৃথিবী-পৃষ্ঠের অধিবাসিগণের বা পৃথিবীমাতার সন্তানগণের বোধের দ্বারাই হইয়া থাকে। পৃথিবীর অধিবাসিগণের মধ্যে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং পৃথিবীর যাহা উন্নততর জ্ঞান, তাহা মানবশ্রেষ্ঠগণের জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। পৃথিবী যে অসুরভাবে পীড়িতা হইয়াছেন, মানবের যাহা উন্নততর স্বার্থ বা মহত্তর কল্যাণ, যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, সেই ধর্ম্ম যে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, ইহা সে সময়ের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। এই সাধুপুরুষেরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন, গভীরতর সত্য সমূহ তাঁহাদের নির্ম্মল জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। তাঁহারা বুঝিলেন সমাজ সুস্থ অবস্থায় নাই। সাধারণ জনশ্রেণী অজ্ঞান ও অসহায়। তাহারা নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে না। যাহা অহিতকর তাহাকে হিতকর বলিয়া বিবেচনা করে, যাহা হিতকর তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, সে সময়ে এই গ্লানি নিবারণ করিতে হইলে, প্রথমেই এমন একদল লোক চাই, যাঁহারা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিবেন যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত সাধু নিজেদের কোনরূপ পার্থিব স্বার্থ যাঁহারা চাহেন না, হৃদয় যাঁহাদের নির্ম্মল, সত্য নির্দ্ধারণ করিতে যাঁহাদের কখনও ভ্রান্তি হয় না, তাঁহারা যখন বুঝিবেন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমাজ না বুঝিয়া ধ্বংসের অভিমুখী হইয়াছে সেই সময়ে দেবজন্মের সূত্রপাত হইবে। পৃথিবী কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সত্য সত্যই ব্যথিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের গ্লানি যথার্থরূপে বুঝিয়া সাধু-প্রকৃতি সম্পন্ন একদল লোক যখন সত্য সত্যই ব্যথিত হইবেন, তখন নিশ্চয়ই জানিতে হইবে এই গ্লানি নিবারিত হইবে।

কলিযুগের ধর্ম্মগ্লানির প্রতিকার শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

তাহা আলোচনা করিলে আমরা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে পৃথিবীর গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে যাওয়া ও নিজের দুঃখ নিবারণ করার যে অর্থ বা তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বলা হইল, তাহাই পুরাণের প্রকৃত অর্থ। কলিযুগে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, যে সময়ে আমাদের দেশে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল, সেই সময়ে অল্প কয়েকজন নিঃস্বার্থ লোক সমাজের অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তাঁহাদের এই যে ব্যথা তাহার সহিত নিজেদের স্বার্থের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। এই লোকগুলি ভক্ত। তাঁহারা সংসারিক স্বার্থের সহিত একেবারে সম্বন্ধহীন। মানবের পারমার্থিক হিতসাধন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আর একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন, ভগবান্ কৃপা করুন। অদ্বৈত আচার্য্য নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই ভক্তগণের নেতা ছিলেন। তিনি দেখিলেন, ভক্তি-যোগের অভাবই এই ধর্ম্মগ্লানির হেতু। সকলের মধ্যে ভক্তিপথ প্রবর্ত্তিত হইলে মানবের কল্যাণ হইবে। অদ্বৈতাচার্য্য বড়ই দয়ালু। তিনি স্বীয় হৃদয়ে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছেন—কি প্রকারে জীবের উদ্ধার হইবে। তিনি বুঝিলেন এই সময়ে যদি ভগবানের অবতার হয়, তাহা হইলেই জীবের উদ্ধার সম্ভব। সাধনার দ্বারা সকলই সম্ভব; তপস্যার প্রভাবে বৈকুণ্ঠনাথকেও জগতে আনিতে পারা যায় এবং তাঁহার দ্বারা জীবের উদ্ধারও করা যায়। অদ্বৈতাচার্য্য তপস্বী ব্রাহ্মণ। জীবের কল্যাণের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সঙ্কল্প করিয়া একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণের পূজা করিতেছেন, তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল দিয়া আশান্বিত হৃদয়ে কৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে, তাঁহার দেহে এক মহাশক্তির আবির্ভাব তিনি স্বয়ং বুঝিলেন, অপরেও অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আত্মহারা বা ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থায় তিনি হুঙ্কার করিতেন এবং সকলকেই বলিতেন, তোমরা অবসাদ ও নৈরাশ্য পরিত্যাগ কর। সুসময় আসিতেছে, অবিলম্বে ভগবান্ আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং মানবের দুঃখ ও সমাজের দুর্গতি দূরীভূত হইবে। অদ্বৈতের কথায় ভক্তগণ উৎসাহিত ও একতাবদ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল ভগবান্ আসিতেছেন, অচিরেই জগতের দুঃখ দূরীভূত হইবে। ইহাই দেবজন্মের বা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের সূচনা। অদ্বৈত প্রভুর হৃদয়েই তাহার প্রথম জন্ম। অদ্বৈতের হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সাধনশীল ভক্তগণের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া

ভাবরূপে তিনি পুষ্ট হইতে লাগিলেন। অদ্বৈতের তপস্যা ও বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের দ্বারা নির্ম্মল-চিত্ত ভক্তগণের গোষ্ঠিগঠন দেবজন্মের প্রথম স্তর।

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাস নবদ্বীপ। তাঁহারা চারি ভাই। তাঁহারা চারি জনেই এক মতাবলম্বী এবং অদ্বৈত প্রভুর ভক্ত-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা অপরাপর ভক্তের সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় যান এবং সেখান হইতে যথাকালে বাড়ী ফিরিয়া আসেন। একদিন তাঁহাদের মনে হইল—আমরা চারি ভাই রাত্রিকাল আলস্যে যাপন করি কেন? এইরূপ ভাবিয়া চারি ভাই একত্র হইয়া নিজেদের বাড়ীতে সারারাত্রি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ধর্ম্মের গ্লানি যখন উপস্থিত হয় তখন কয়েক জন লোকের সত্যরূপে বুঝা চাই যে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। কেবল গ্লানি বুঝিলেই হইবে না, এই গ্লানির প্রতিকার কি তাহাও বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নহে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ধর্ম্মের গ্লানি বুঝিয়াছিলেন, আর বুঝিয়াছিলেন এই গ্লানির প্রতিকার কি। হরিনাম সংকীর্ত্তনই এই প্রতিকার। অবশ্য সকল যুগে এই গ্লানি একরূপ নহে, প্রতিকারও একরূপ নহে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার যুগে যে গ্লানি দেখিয়াছিলেন হরিনাম-সংকীর্ত্তনের তাহার নিবারণ হইবে ইহা বুঝিয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উপদিষ্ট এই নাম-সংকীর্ত্তন অনলস ভাবে নিজেদের গৃহে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে রাত্রিকালে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন যেমন আরম্ভ হইয়াছে অমনই চারিদিক হইতে তাহার বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ হইল। যাহারা পাষণ্ডী বা বিপক্ষদল তাহারা শ্রীবাসকে ভয় দেখাইতে লাগিল। নবদ্বীপের ভক্তগণ তখনও দুর্ব্বল, কাজেই তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। অদ্বৈত প্রভু ইহা শুনিলেন, ভক্তগণকে ডাকিলেন ও ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তপস্বী ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,

> শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
> করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন গোচর॥
> সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
> বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
> যবে নাহি পারো তবে এই দেহ হৈতে।
> প্রকাশিয়া চারি ভুজ, চক্র লইমু হাতে॥

পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যখন ভক্তগণকে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি এতদূর বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার পরিধানের বস্ত্রখানি খসিয়া পড়িয়াছে সে জ্ঞানও তাঁহার নাই। অদ্বৈত প্রভুর কথায় ভক্তগণ আশান্বিত হইলেন এবং সকলেই কাতর প্রাণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কখন সেই শুভদিন আসিবে। সেই চিন্তায় ভক্তগণের এমন অবস্থা হইল যে তাঁহারা সর্ব্বদাই কাঁদিতে লাগিলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, আহার নিদ্রা দূর হইয়া গেল। ভক্তগণের আর কোনরূপ সুখভোগ থাকিল না ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইলেন। তাহার পর নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইলেন। ভক্তগণের এবং জগতের দুঃখ দূর হইল।

পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ধর্ম্মগ্লানি এবং সেই গ্লানি নিবারণের জন্য দেবজন্ম বা ভগবানের আবির্ভাব কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই সমুদয় প্রাচীন কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার সাহায্যে বুঝিতে হইবে। নতুবা আমরা ঐ সমুদয় কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিব না। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে পৃথিবীর গো-মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সভায় গমনের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। যাঁহারা পুরাণ ব্যাখ্যার পদ্ধতি না জানিয়া, গল্পরূপে পুরাণ বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা পড়িয়া বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া পড়িলে দেবজন্মের প্রণালী বুঝিতে পারিবেন। ঐ প্রণালীর দ্বারা ব্যাখ্যা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যাই যে প্রকৃত ও সঙ্গত ব্যাখ্যা তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না।

দ্বাপরযুগে কি প্রকারে আবির্ভাব হইল, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। গো-মূর্ত্তিধারিণী পৃথিবীর দুঃখের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, ত্রিলোচন, পৃথিবী ও অন্যান্য দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করিলেন। এই ক্ষীরোদ সাগরে শ্বেতদ্বীপ। তথায় ভগবান বিষ্ণুরূপে বিরাজমান। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের পালক। শ্বেতদ্বীপ যাওয়া বড়ই কঠিন। ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া ক্ষীরোদ সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পাদ্মোত্তর খণ্ডে এবং মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয় উপাখ্যানে এই

ক্ষীরোদ সাগর ও শ্বেতদ্বীপের কথা আছে। পরম গোলকাধিষ্ঠাতা, স্বয়ং ভগবান্ যাঁহার নাম বাসুদেব, তিনি প্রথম ব্যূহ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ। এই সঙ্কর্ষণের যিনি অংশের অংশ তিনি কারণার্ণবশায়ী। তিনি মহতের স্রষ্টা তাঁহারও নাম সঙ্কর্ষণ। তাঁহার চতুর্ব্যূহের অনিরুদ্ধের অংশ গর্ব্ভোদশায়ী। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় কারণার্ণবশায়ীর রোমবিবরে বিরাজমান। তাঁহারও নাম অনিরুদ্ধ। তাঁহার অংশ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। ইনিই ব্যষ্টির অন্তর্যামী সর্ব্বভূতস্থ পুরুষ। বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ক্ষীরোদশায়ীর এইরূপ পরিচয় আছে।

যাহা হউক, ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গিয়া বৈদিক পুরুষসুক্তের দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই দৈববাণী হইল। ব্রহ্মা সেই বাণী শুনিলেন ও দেবতাগণকে জানাইলেন। পৃথিবীর সন্তাপ হইয়াছে, ইহা আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, হে দেবগণ! তোমরা যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর, বসুদেবের গৃহে ভগবান্ আবির্ভূত হইবেন। দেব স্ত্রীগণও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করুক। বাসুদেবের অংশ সহস্রবদন অনন্তদেবও পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। যোগমায়াও আবির্ভূতা হইয়া দেবলীলার আয়োজন করিবেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়েও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লীলায় যাঁহারা লীলার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা সকলে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতারাও অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপই হইয়া থাকে। মানুষ কর্ম্মদোষে অসুর হইয়া যায়—রাক্ষস ও পশু হইয়া যায়। সেই সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। কোটী কোটী লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশু বা অসুরের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তাহারা সন্তুষ্ট। জীবনে কোনও উচ্চ আদর্শ নাই, কোনও মহৎ লক্ষ্য নাই, মানবাত্মার গৌরব ও মহিমা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। এই প্রকারে পৃথিবীর অনেক জাতি ও সমাজ ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এই প্রকারের দুর্দ্দশা অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও তাহার সনাতন ধর্ম্ম ধ্বংশ হয় নাই। যে সময়ে এইরূপ ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে, সেই সময়েই দেবজন্ম হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ দুর্দ্দশার অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার সৌভাগ্যের নবসূর্য্যালোকে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যে সময় লক্ষ লক্ষ লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট ও অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত, সেই সময়ে কয়েকজন লোকের নির্ম্মল হৃদয়ে চির আলোক-

রাজ্যের রশ্মিরেখা নিপতিত হইয়াছে। সেই আলোকে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহারা বীরের মত হুঙ্কার করিয়াছেন এবং বিশাল সমাজের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া সত্যের জন্য তপস্যা করিয়াছেন। তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথমে বুঝিয়াছেন মানুষ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহা মঙ্গলের অবস্থা নহে। অজ্ঞান মানুষ মনে করিতেছে তাহারা বেশ সুখে ও আরামে আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মনুষ্যত্বের গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোচনীয় ধ্বংশের পথে অন্ধভাবে ধাবিত হইতেছে। এই অজ্ঞানীদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে যে তাহারা অজ্ঞান? একথা তাহা-দিগকে বলিলে তাহারা দলবদ্ধ ভাবে বিরুদ্ধতাচরণ করিবে। কিন্তু একথা বলা আবশ্যক। বীরহৃদয় সাধু পুরুষ যিনি তপস্যার দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি ও তাহার প্রতিকার বুঝিয়াছেন, তিনি সাধারণ মানুষের মতামতের দিকে চাহেন না নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলেন এবং সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এই তপস্যার প্রভাবে দেবলোক আলোড়িত হয় এবং দেবতার অংশে নূতন রকমের মানুষ আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। আজ যে কথা কেহ শোনে না, শুনিলেও বোঝে না, সেই কথা শুনিবার ও বুঝিবার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। দেবজন্মের দ্বারা জনসমাজে এই প্রকারেই সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আমাদের বক্তব্য বিষয়ের প্রধান কথা এই যে, দেবজন্ম বা ভগবানের আবির্ভাব একটী আকস্মিক ব্যাপার নহে। ইহার নিয়ম ও প্রণালী আছে। যদিও মূলে সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু তথাপি দেবতাকে আনিয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে হইলে মানবের তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যার ভেক হইলে হইবে না, বিজ্ঞাপনের জয়ঢক্কা বাজাইয়া মূর্খ ও সরল-হৃদয় মানুষকে ঠকাইলে হইবে না। দেবতাকে কেহ ঠকাইতে পারে না। সুতরাং মানুষের নিন্দা বা প্রশংসা, অবজ্ঞা বা সমাদর, ইহলোকের সুবিধা বা অসুবিধা এসকলের প্রতি না চাহিয়া কেবলমাত্র আত্মার অন্তর্যামী পরম দেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। একজনও যদি এই তপস্যা করে, তাহা হইলে দেবজন্ম অবশ্যম্ভাবী। তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে সত্যজ্ঞান প্রয়োজন। অবশ্য তপস্যার দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জ্ঞান চাই। অজ্ঞান মানুষ নিজের হৃদয় জানে না। সে নিজের কাছে নিজেই বঞ্চিত। সে অনধিকার চর্চ্চা হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম। সুতরাং জ্ঞান চাই, হৃদয়ের নির্ম্মলতা চাই। এই জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি বুঝিতে হইবে।

অতীতের ঋষিগণের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই গ্লানির প্রতিকার কি তাহা বুঝিতে হইবে এবং অকপটভাবে তপস্যা করিতে হইবে। একজনও যদি এই কার্য্য করে, তাহা হইলে দেবজন্ম অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীতে দেবজন্ম হইবার পূর্ব্বে দেবলোকে ও নরলোকে জ্ঞাতসারে একটী আয়োজন হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে অবশ্য এই আয়োজন বুঝিতে পারে না। মর্ত্ত্যলোকে যাঁহারা সাধু ও তপস্বী, যাঁহারা বিশ্বকল্যাণ-ব্রতে ব্রতী, তাঁহারাই তপস্যার দ্বারা মহাশক্তি অবতারিত করেন। ইহারই নাম দেবজন্ম। মানবের তপস্যা ও মানবীয় শক্তির সহিত দেবশক্তির মিলনের দ্বারা ইহা হইয়া থাকে। ইহা একটী আকস্মিক ব্যাপার নহে। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমরা এই আয়োজনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। বাল্মিকি-রামায়ণের আদিকাণ্ড পঞ্চদশ সর্গে রাবণ বধের জন্য সুরগণের পরামর্শ বর্ণিত হইয়াছে। দেবতারা একত্র হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে বলিলেন, হে প্রভো লঙ্কার রাজা রাবণকে বর দিয়াছেন। আপনার বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছে। তাহার অত্যাচারে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তাহার এত অহঙ্কার যে সে ইন্দ্রকেও পরাস্ত করিতে চায়। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি, ব্রাহ্মণ, অসুর প্রভৃতি সকলেই তাহার দ্বারা পীড়িত। দেবতাদিগের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমরা চিন্তা করিও না; আমি সেই দুর্বৃত্তের বিনাশের ব্যবস্থা করিয়াছি। রাবণ যখন আমার নিকট বর প্রার্থনা করে তখন সে বলিয়াছিল, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে যেন আমার পরাজয় বা মৃত্যু না হয়। তাহার তপস্যার দ্বারা বাধ্য হইয়া আমি সেইরূপ বর দিয়াছিলাম। রাক্ষস রাবণ অতিশয় অহঙ্কারী। সে মানবকে নিতান্ত দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করে। এই কারণে বর লইবার সময় মানুষের নাম করে নাই। এই মানুষের হস্তেই যাহাতে তাহার মৃত্যু হয় আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। দেবতা ও মহর্ষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ঠিক এই সময়ে ভগবান কমলাপতি খগেন্দ্রবাহনে আরোহণ করিয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গদ্যুতি অপরূপ। হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা, পরিধান পীতবসন। দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনাকে মানুষ মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে। অংশ ক্রমে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া অযোধ্যার অধিপতি দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিতে হইবে। নিশাচর রাবণ ব্রহ্মার বরে অতিশয় উদ্ধত হইয়াছে। আপনি

দেবচক্রে সেই রাবণকে ধ্বংশ করিবার জন্য সংসারে মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হউন। ভগবান্ দেবগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে অভয় দান করিলেন।

ভগবানের সম্মতি-লাভ করিয়াই দেবগণ নিরস্ত হইলেন না। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে বলিলেন,—ভগবান বিষ্ণু যখন মানুষ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন তখন তোমাদের নিশ্চেস্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তোমরা মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী সহায় সকল সৃজন কর। তোমরা গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, অপ্সরা, বিদ্যাধরী, পন্নগী ও বানরিগণের গর্ভে বানর সকল সৃষ্টি করিতে থাক। আমি পূর্ব্বকালে জাম্বুবানকে সৃষ্টি করিয়াছি। ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে দেবগণ বানররূপধারী পুত্র সকল সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র হইতে বালি, সূর্য্য হইতে সুগ্রীব, বৃহস্পতি হইতে বুদ্ধিমান তার, কুবের হইতে গন্ধমাদন, বিশ্বকর্ম্মা হইতে নল এবং অগ্নি হইতে নীলের জন্ম হয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে মইন্দ ও দ্বিবিদ, বরুণ হইতে সুষেণ, পর্জন্য হইতে শরভ এবং বায়ু হইতে হনুমানের উৎপত্তি হয়। মানবরূপে ভগবানকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিবার জন্য, ব্রহ্মার নেতৃত্বাধীনে এই প্রকারে আয়োজন আরম্ভ হইল।

কিন্তু বাল্মিকির রামায়ণ পাঠ করিলে মনে হয়, দেবলোকে আয়োজন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে মহামনা মহর্ষিগণের মধ্যে এই আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল। দেবগণের সভাতে মহর্ষিগণও ছিলেন। ইহা রামায়ণে কথিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলে পর আমরা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে মহর্ষিগণের সাক্ষাৎকার লাভ করি। অতি প্রাচীন মহর্ষিগণ পূর্ব্ব হইতেই পুলস্তবংশীয় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার করিবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদেরই তপস্যার দ্বারা দেবগণ উদ্বোধিত হইয়াছিলেন। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলে পর তত্রস্থ মহর্ষিগণ পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহর্ষিরা যেন বহুদিন হইতে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং ভরসা করিতেছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া দুর্বৃত্ত ও ধর্ম্মদ্বেষী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবেন। এই কারণে তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, আপনি রাজা, দেবরাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশ হইয়া রাজা ইহলোকে প্রজাগণকে রক্ষা করেন। এই কারণেই তিনি সকলের পূজনীয়। আমরা তপস্যা করি। আমাদের দণ্ড নাই। ক্রুদ্ধ হওয়া আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। অতএব

আমরা আপনার রক্ষণীয়। বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রাচীন শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিয়া শরভঙ্গ ঋষির সহিত গোপনে কথোপকথন করিতেছিলেন। ইন্দ্রের সহিত শরভঙ্গঋষির কি কথা হইতেছিল, তাহা তখন জানিতে পারা গেল না। কিন্তু সুর্পনখার নাশাচ্ছেদ উপলক্ষে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও তাহাদের চৌদ্দহাজার রাক্ষসসৈন্য নিহত হইলে পর মহর্ষিরা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, ইন্দ্র শরভঙ্গ ঋষিকে জানাইতে আসিয়াছিলেন যে আর ভয় নাই, শ্রীরামচন্দ্র আসিতেছেন, রাক্ষসগণ অচিরেই বিনষ্ট হইবে। শরভঙ্গ ঋষি অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে মর্ত্তালোকে আনয়ন করিয়া রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করাই যেন তাঁহার এই কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য শরভঙ্গঋষি তাঁহার তপস্যার ফল শ্রীরামচন্দ্রকে দিতে চাহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবশ্য এই দান গ্রহণ করিলেন না। তিনি বিনীতভাবে ঋষিকে বলিলেন, আমি নিজের তপস্যার দ্বারা ঐ সমুদয় লোক অর্জ্জন করিব। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া শরভঙ্গ বুঝিলেন, তিনি ও অন্যান্য প্রাচীন ঋষিগণ যে উদ্দেশ্যে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রাক্ষস-উপদ্রুত ভীষণ বনপ্রদেশে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, সে উদ্দেশ্য এইবার সফল হইবে। সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আগমন। শ্রীরামচন্দ্রকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বৃদ্ধ তপস্বী শরভঙ্গ আনন্দিতচিত্তে অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হইল। তিনি প্রসন্ন-হৃদয়ে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিলেন।

শরভঙ্গ ঋষি এই প্রকারে স্বেচ্ছায় ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দণ্ডকবনবাসী মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া মিলিত হইলেন। অসংখ্য মুনি, সকলেই কঠোর তপস্বী, ভিন্ন ভিন্ন সাধন-পথ অবলম্বন করিয়া একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেছেন। রামায়ণে এই সমুদয় তাপসগণের নাম ও সাধন প্রণালী পাওয়া যায়। বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রপ, মরীচি, অশ্মকুট্ট, বহুপত্রাহারী তাপস, দন্তোলূখলী, উম্মাজক, গাত্রশয্য, অশয্য, অনবকাশিক, জলাহারী, বায়ুভোগী, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাহু, দান্ত, নিয়ত আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, সজপা, পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী,—এই সমুদয় ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন,—আপনি আমাদের রক্ষক, জম্পা ও গঙ্গা নদীর তীরবাসী এবং

চিত্রকূট নিবাসী বহুসংখ্যক মুনিগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা পীড়িত হইতেছেন। তপস্বীদিগের এই দুঃখ আমরা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

তাহার পর শ্রীরামচন্দ্র সূতীক্ষ্ণ নামক আর একজন প্রাচীন মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন। ইনিও শরভঙ্গের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষায় কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, হে বীর! আমি তোমার অপেক্ষায় এতদিন দেহত্যাগ করি নাই। সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট বিদায় হইয়া শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যঋষির আশ্রমে গমন করিলেন। যে সমুদয় প্রাচীন ঋষি রাক্ষসপীড়িত পৃথিবীর ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অগস্ত্যই প্রধান বলিয়া মনে হয়। ইল্বল ও বাতাপী নামক দুইজন পরম মায়াবী রাক্ষসকে অগস্ত্য বধ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত অগস্ত্যের আদেশে মস্তক নত করিয়া রহিয়াছেন। ঋষিসমাজে অগস্ত্যের প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করিলে অগস্ত্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে এই দিব্য ও মহৎ বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিয়াছেন। এই ধনু বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা স্বর্ণ ও বজ্রমণি দ্বারা বিভূষিত। তুমি এই ধনু গ্রহণ কর। এই তূণীর ব্রহ্মা আমাকে দিয়াছেন। ইহা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহা অগ্নিসদৃশ নিশিত শর সমূহে পরিপূর্ণ। আর এই স্বর্ণময় কোষবদ্ধ সুবর্ণালঙ্কৃত অসি, ইহাও আমাকে ব্রহ্মা দান করিয়াছেন। তুমি এই ধনু, শর, খড়্গ ও তূণীর গ্রহণ কর।

রামায়ণের এই সমুদয় বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রাচীন মহর্ষিগণ বহুদিন হইতে রাক্ষস বিনাশ করিয়া, ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিবার জন্য, তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার দ্বারা বহু বহু ঋষি এবং দেবগণ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষার জন্য যখন শ্রীরামলক্ষ্মণকে লইয়া যান, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্র দিবার সময় বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—এই মন্ত্রের প্রভাবে তোমার শ্রান্তিবোধ, জ্বর বা বৈরূপ্য হইবে না। তুমি ঘুমাইয়াই থাক আর অন্যমনস্ক হইয়াই থাক, রাক্ষসেরা তোমার পরাভূত করিতে পারিবে না। এই বিদ্যা

পাঠ করিলে তোমার ক্ষুৎপিপাসা দূর হইবে। এই দুইটী মন্ত্র ব্যতীত বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে নানারূপ অস্ত্র দণ্ড চক্রাদি প্রদান করেন। বিশ্বামিত্র রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য তপস্যার দ্বারা এই সমুদয় দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে এই অস্ত্রসমূহ দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। রামায়ণে এই অস্ত্র সমূহের নাম আছে। ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, বজ্র, শিবের শূল, ঈষীকাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নাম্নী গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক দুইটী অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির, ক্রৌঞ্চ, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, কাপাল, কিঙ্কিণী—এই সমুদয় অস্ত্র শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর, কামরূপী আরও অনেক অস্ত্র বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন।

এই সমুদয় হইতে আমরা বুঝিতে পারি—যাহারা অলস ও অকর্ম্মণ্য, উৎসাহহীন ও মিথ্যাচারী, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বা তাহাদিগের কাল্পনিক কোনরূপ দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য দেবজন্ম বা ভগবানের আবির্ভাব হয় না। তপস্বী মানব, যখন সত্য ও ধর্ম্মের জন্যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া সত্য সত্য তপস্যা করেন, তখনই তাঁহাদের তপস্যার প্রভাবে দেবলোক আলোড়িত হয় এবং মর্ত্ত্যলোকে ঐশীশক্তির প্রাকট্য হইয়া থাকে। তপস্যাই সকলের মূল। যাহারা তপস্যাহীন, তাহাদিগের জগতে বাঁচিয়া থাকিবার কোনই অধিকার নাই। অবশ্য সকল লোকে তপস্যা করিতে পারে না; কিন্তু কোনও সমাজে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা সকলের কল্যাণের জন্য যদি তপস্যা না করেন, তাহা হইলে সেই সমাজের বাঁচিয়া থাকিবারই আশা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে বামনদেবের আবির্ভাবের কথা আছে। বলি, দৈত্য বা অসুর। শুক্রাচার্য্য তাঁহার গুরু। এই বলি, গুরু কর্ত্তৃক বহ্বৃচ ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ মহাভিষেক দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া বিশ্বজিত যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞের ফলে, তিনি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবগণের দুঃখের সীমা নাই। তাঁহারা বিচ্ছিন্নভাবে মলিনবেশে মর্ত্ত্যলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দেবমাতা অদিতিপুত্রগণের দুঃখে ব্যথিতা হইয়া, তাঁহার পতি কশ্যপের উপদেশানুসারে পয়োব্রত নামক একটি ব্রত পালন করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ অদিতির পুত্ররূপে আগমন করিলেন, এবং বলির যজ্ঞে গমন করিয়া তাহার

নিকট ত্রিলোকের রাজ্য ভিক্ষা করিয়া লইলেন। বৃত্রাসুরের বধ উপলক্ষে ইন্দ্রের কঠোর তপস্যা শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং মানবকে, বা সমাজে যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। তপস্যার ফলে দেবজন্ম হইয়া থাকে।

উপসংহারে একটি কথা বলা আবশ্যক। ধর্ম্মের গ্লানি বলিতে ভারতবর্ষ চিরদিন কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের খাওয়া পরার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, ব্যাধিরও সীমা নাই। উদরান্নের জন্য মানুষ বাধ্য হইয়া সর্ব্বদাই অতি উৎকট রকমের পাপাচরণ করিতেছে। এখন যদি আমাদের এই অন্নসমস্যার মীমাংসা হয়, তাহা হইলেই কি আমরা সন্তুষ্ট হইব? তাহা হইলেই কি আমাদের ধর্ম্মগ্লানি দূরীভূত হইবে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় দেশে কোনও রূপ অন্নকষ্ট ছিল না। ইহলোকের ভোগ সুখ প্রচুর পরিমাণে সকলের করায়ত্ত ছিল। কিন্তু অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তখন ধর্ম্মগ্লানি হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে হিরণ্যকশিপুর শাসনকালে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সেই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে অন্নবস্ত্রের ও ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য ছিল। রাবণের রাজ্য স্বর্ণলঙ্কার ঐহিক গৌরব ও সমৃদ্ধি রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মের গ্লানি কি, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। যাহারা ভোগাসক্ত, বিলাসী ও ঐহিক সুখকামী, আত্মার আলোকে যাহারা জীবনের উন্নততর মহিমা বুঝিতে পারে নাই, যাহারা সংযম ও নিবৃত্তিমার্গের পথিক নহে, তাহারা ধর্ম্মের গ্লানি বুঝিতে পারে না। পেটের দায়ে অনেকে সাধু সাজে, অর্থাৎ সাধুর সাজ পরিয়া অনায়াসে বা অল্পায়াসে উদরান্ন সংগ্রহ করে। কিন্তু তাহারা সাধু নহে। পৃথিবীতে মান সম্ভ্রম পাইবার জন্য অনেকে ধার্ম্মিকতার ছদ্মবেশে গ্রহণ করে এবং সরলচিত্ত নরনারীকে বড় বড় কথার চোটে ভুলাইয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করে। ইহারাও সাধু নহে। এই প্রকারের ছল বড়ই বিপদজনক। সুতরাং সত্য সত্য ধার্ম্মিক হইয়া আত্মশক্তির ভূমিতে বসিয়া তপস্যা করিতে হইবে। ধর্ম্মগ্লানি কোথায়, ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তাহার প্রতিকার কি, অতীতের অভিজ্ঞতা দ্বারা সাধনবলে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি কিছু হইবার নহে। ধৈর্য্য ও তপস্যা উভয়েরই প্রয়োজন।

সাহিত্য-সাধনার আদর্শ

বীরভূম জেলার সাহিত্য-সেবকগণকে একত্র সম্মিলিত হইবার এই সুযোগের যাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি ও প্রার্থনা করি, আমাদের এই মিলন যেন একটি বাহ্য ও সাময়িক ব্যাপারে নিঃশেষিত না হয় এবং এই বার্ষিক সম্মেলনী যেন একটি হুজগ্ মাত্রে পর্য্যবসিত না হয়। আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে সত্যরূপে চিনিতে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে একটি ভাব-গত যোগসূত্র গড়িয়া তুলিতে চেষ্টান্বিত হই।

মানুষ মানুষের সহিত মিলিবে ও মিত্রতা করিবে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের উপলক্ষ্য নানারূপ। একবর্ণের লোক, একব্যবসায়ের লোক, এক প্রকারের সামাজিক বা রাজনীতিক স্বার্থ-সম্পন্ন লোক—নিজেদের মধ্যে, প্রীতির অনুশীলন জন্য, বা সমবেতভাবে স্বার্থরক্ষার জন্য একত্র হইয়া থাকে। এই সব সম্মেলনে, প্রীতির অনুশীলন অপেক্ষা, সমবেতভাবে স্বার্থরক্ষার চেষ্টা অধিকতর প্রবল। কিন্তু আমাদের এই যে মিলন, ইহার উপলক্ষ্য, সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা এখানে, যাঁহারা একত্র হইয়াছি, সকলেই বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুশীলন করিতে ভালবাসি। অনেকেই কিছু কিছু লেখেন, বা লিখিয়াছেন, বা লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন—আর সকলেই ইচ্ছা করি, বাঙ্গলাভাষার যে উন্নতিমুখী গতি, সেই গতির সহিত সংসৃষ্ট রহিয়া, নিজের ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন করি।

ইহাই আমাদের সকলের সাধারণ ভাব। এই সাধারণ ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া, আমরা সকলেই মিলিত হইয়াছি। মিলনের যত প্রকার উপলক্ষ্য হইতে পারে, এই উপলক্ষ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও সাত্ত্বিক। আমরা যদি ধর্ম্মের নামে একত্র হইতাম, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নানারূপ সঙ্কোচ থাকিত—অর্থাৎ, আমাদের সভা, হিন্দুসভা হইলে, মুসলমানকে ভ্রাতার ন্যায় বুকে টানিয়া লইতে পারিতাম না- বৈষ্ণব-সভা হইলে, শাক্তকে তেমন করিয়া আপনার করিবার সুযোগ পাইতাম না—আবার ব্রাহ্মণ-সভা হইলে কায়স্থকে এবং কায়স্থ-সভা হইলে ব্রাহ্মণকে, হয়ত আপনার করিতে পারিতাম না। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে, এ সব বালাই নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে দলাদলি আছে, কারণ উহা পার্থিব স্থূল স্বার্থের সহিত জড়িত। কিন্তু সাহিত্যের ভূমি মহামিলনের ভূমি। আবার, এই সাহিত্যের মিলন-মন্দিরে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, সমাজতত্ত্ববিৎ, রাজনীতিবিৎ, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা,—সকলেরই অধিকার আছে। সুতরাং আমাদের এই মিলন স্থায়িত্ব লাভ করুক—ভগবানের কৃপায় ইহা সফল হউক,

আমরা প্রত্যেকেই, সাহিত্যের মিলনভূমির এই অতুলনীয় গৌরব উপলব্ধি করিয়া, দেশের আপামর সাধারণকে ইহা বুঝাইতে সমর্থ হই—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

একটি খরস্রোতা, বিপুলকায়া, আবর্ত্ত ও কল্লোলময়ী নদী, প্রচণ্ডবেগে তরঙ্গ তুলিয়া যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যায়, মানবজাতির মানস-নদীও সেইরূপ, কালের বুকে বহিয়া যাইতেছে—ইহাই বিশ্ব-মানবের সাহিত্য-সাধনা। কবে কোথায় এই নদীর জন্ম, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন—তবে, নির্দ্দেশ করার চেষ্টায় আনন্দ আছে, লাভও আছে। কোথায় বা এই নদীর পরিণতি, কোন্ মহাসিন্ধুর বুকে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য এই নদী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাই বা কে বলিবে? কিন্তু সেই মহা-সিন্ধুর কল্পনায় আনন্দ আছে, লাভও আছে। ইহাই মানব জাতির সাহিত্য-সাধনা।

নদীর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। মানবের মানস-ক্ষেত্র উর্ব্বর হয়—সন্তপ্ত-হৃদয় শীতল হয়, মানবাত্মার পিপাসা নিবারিত হয়। সাহিত্যের গতি, নদীরই গতির মত। নানাদেশ—নানাভাষা—নানাসাহিত্য। কিন্তু বাহিরের ভেদ থাকিলেও, ভিতরে মহামিলন। এখনকার দিনে, বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত পরিচিত না হইলে, প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়া যায় না, গভীররূপে সাহিত্যের আস্বাদনও করা যায় না। বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে, আমাদের ভারতীয় সাহিত্য—তাহার ভিতর বঙ্গসাহিত্য।

বিগত দেড়শত বৎসর মধ্যে, এই বঙ্গ-সাহিত্য এক অভিনব পুষ্টি, গভীরতা ও গতিশীলতা লাভ করিয়াছে। ইহার বৈচিত্র্যও প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী জাতির উন্নতিমুখী সাধনা, বাঙ্গালী জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা—এই সাহিত্যে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। আমরা বাঙ্গালী—শরীরের দ্বারা, বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়া বাঙ্গালী হইয়াছি। কিন্তু মনের দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা বাঙ্গালী হইতে হইলে, সাহিত্যের অনুশীলন করা আবশ্যক। কারণ, আমাদের দেশের মানস-জীবন, এই সাহিত্যের মধ্যেই বিম্বিত ও স্পন্দিত। দেশীয় সাহিত্যের আলোচনার ইহাই হেতু।

আমরা প্রত্যেকে যেমন, এই সাহিত্য-সাধনায় যোগদান করিয়া, ইহার সহিত মিশিয়া, দিনের পর দিন অগ্রসর হইব, তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে, সাহিত্য প্রচারক হইয়া, আমাদের চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, এই প্রবাহের সহিত অগ্রসর হইতে সাহায্য করিব। সাহিত্যের জন্য এইটুকু করিতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বাধ্য।

সাহিত্য-সৃষ্টি অবশ্য সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহা জন-সমাজে প্রচার করা ভাল কাযও নহে। অনধিকারচর্চ্চা, সকল ক্ষেত্রেই পাপ। আত্মজ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি। আমি কতটুকু জানি, যাহা জানি বা জানি বলিয়া মনে করি, তাহার কতটুকুই বা আমার নিজের, আর কতটুকুই বা ধারকরা পোষাকী জিনিষ, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ইহাই অন্তর্দৃষ্টি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই অন্তর্দৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের শিখিবার বিষয় যতখানি, লিখিবার বা

বলিবার বিষয় ততখানি নাই। এই সুলভ ছাপাখানার দিনে, এই লিখিবার বা বই ছাপাইবার প্রলোভনের একটা বিকট উন্মাদনা, চারিদিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা প্রকৃত স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে।

আমরা, বীরভূমের এই মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক একত্র হইয়া, স্থানে স্থানে পাঠাগার ও বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যদি জেলার মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিতে পারি, তাহা হইলেই, আমাদের এই মিলন সফল হইবে। আর যদি, সাহিত্যের যাহা সুমহৎ আদর্শ, তাহার সহিত সকলের যাহাতে পরিচয় হয়, তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যে যে ব্যাধি দেখা দিয়াছে, সেই ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা-দেশে, কোন জেলাই এই আবশ্যকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। আসুন, আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, ইহা সম্ভব কি না।

বার বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে যখন সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের নিকট একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাই—এই প্রস্তাব। এ কথা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারা যায় যে, বীরভূম হইতে এই প্রস্তাব, দেশকে একদিন গ্রহণ করিতেই হইবে। গত বার বৎসরে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ সহরে, আমাদের জীবন ও সাধনা কেন্দ্রীভূত হওয়া হিতকর নহে—বরং বিশেষ-রূপে অহিতকর। ইহা সম্ভবতঃ আপনারা চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছেন। পেটেণ্ট ঔষধ যেমন বিজ্ঞাপনের দ্বারা দেশের মধ্যে কাটতি হয়, কলিকাতা হইতে সেইরূপ অনেক জিনিষ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা চলিয়া যায়। খবরের কাগজ এই বিজ্ঞাপনের বাহন। খবরের কাগজে কোন্‌টি বিজ্ঞাপন আর কোন্‌টি সম্পাদকীয় মন্তব্য, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মানুষ মানুষকে ঠকাইবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এই উপায়গুলি প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানী করা হইয়াছে। বিদেশী মাল, কলিকাতার ন্যায় সহর হইতেই গ্রামে আসিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে সাহিত্য, যদি গ্রামের দিকে আসে, তাহা হইলে ঐ মালের সহিত, আমাদের বিবিধরূপ বিড়ম্বনাও আসিবে- একথা দেশের সকলেই বোঝেন। কিন্তু, এই কথা অনুসারে কাব হয় না। তাহার কারণ, আমাদের দেশে মফঃস্বলে সকল বিভাগেই, কতক-গুলি দালালশ্রেণীর লোক আছে। কলিকাতার ব্যবসায়িগণকে সাহায্য করিয়া অনায়াসে নিজের নিজের উন্নতি করাই, এই দালালদিগের ব্যবসায়। সাহিত্যক্ষেত্রেও এইরূপ দালাল আছে। তাহারা নিজেরা সাহিত্য-রসিক নহে—তাহাদের প্রভাবে নিকটবর্ত্তী লোকেরা প্রভাবান্বিত হয় না—তাহারা যে বিশেষ লেখাপড়া জানে, বা অতি সাধারণ লোক অপেক্ষা কোন বিষয়ে উচ্চ, এরূপ মনে করিবার

কোন কারণ নাই। অথচ, খবরের কাগজে দেখিতে পাই, তাহারা কৃতবিদ্য ও যশস্বী। এই শ্রেণীর লোক, মফঃস্বলে বসিয়া, বড় বড় ব্যাপার লইয়া ব্যবসায় করে। তাহারা যদি সাহিত্যসেবা করে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে সাহিত্য প্রচার হউক, সে জন্য চেষ্টা করে না, কোন প্রকারে কিছু টাকা কড়ি তুলিয়া, একটা হুজুক করিয়া, কলিকাতা হইতে কতকগুলি লোক আনিয়া একটি আড়ম্বরের দ্বারা দেশের লোকের চক্ষে ধূলি দিতে চায়। ইহাতে ঐ দালালদিগের লাভ হয়—তাহারা ঐ উপলক্ষ্যে কতকগুলি নামজাদা লোকের সহিত পরিচিত হয়, খবরের কাগজে তাহাদের নাম জাহির হয়—এই প্রকারের একটা ফাঁকি, আমাদের দেশে চলিতেছে!

বড় বড় সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গেল—বহরমপুরে হইয়াছে, বর্দ্ধমানে হইয়াছে—সম্প্রতি মেদিনীপুরে হইয়া গেল। আপনারা কেহ ঐ সব স্থানে যাইয়া, নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন, বারইয়ারী আমোদ ছাড়া, ঐ সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা, কিছুই লাভ হয় নাই। অতিশয় ক্ষুদ্রচিত্ত লোক, নামের কাঙ্গাল, প্রশংসার জন্য লালায়িত, এতই তরল যে, নিজেকে চাপিয়া চলিতে জানে না—তাহারা আসিয়া বড় বড় সাহিত্যসম্মেলনে অযথা বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছে—ইহাই ত দেশের অবস্থা!

এই কারণে মফঃস্বলের লোকের উচিত, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা। কলিকাতার সহিত বিরোধ করিতে বলি না। কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাপারে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, বহু বহু বড় লোকের নামের জয়পতাকা উড়াইয়া যে সমুদয় আন্দোলন হয়, তাহা দ্বারা প্রকৃত কায খুব কমই হইয়া থাকে। খবরের কাগজে মিথ্যাকথা প্রচার করা হয়—কতকগুলি চতুর ও অযোগ্য লোক, ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সহায়তায়, নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ করে। স্বরূপে নগণ্য হইয়াও বিজ্ঞাপনের ডঙ্কানিনাদে গণ্যমান্য হইয়া উঠে।

এই সমুদয় কারণে, বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার স্বাধীনকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে মফঃস্বলে কায করিবে কে? সেরূপ স্বাধীনচিন্তা দেশে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। কোনরূপে যে চৌদ্দ অক্ষর মিল করিতে পারে, সে কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য, মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতেছে। যাহার সে শক্তি নাই, সে লোক ভাড়া করিয়া, সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশোলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতা দোকানদারের সহর—নালন্দা বা নবদ্বীপ নহে। সেখানকার জলবায়ুর গুণেই মানুষ ব্যবসাদার হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সব লোকের আনুকূল্যে মেকী চালাইয়া লওয়া বেশী কঠিন কায নহে। এই প্রকারের ফাঁকীও সাহিত্য রাজ্যে চলিতেছে! সাহিত্যের আন্দোলন করিয়া মফঃস্বল হইতে যদি এই ফাঁকি ও ব্যবসাদারী নিবারণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নাই।

আপনারা জানেন, বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা হইতে চাহে নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা সভার নিয়মাবলীতে লিখিত আছে যে, মফঃস্বলে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপিত হইতে পারিবে। আমরা নিয়মাবলীর এই ভাষা সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি যে—'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সফল করিতে হইলে, মফঃস্বলে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত ভাবে আবশ্যক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন।' আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, দেশের মনোযোগ ও সামর্থ্য কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—সুতরাং কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন—'আমরা কলিকাতায় যখন সভা করিয়াছি, তখন বাঙ্গলা সাহিত্যের আমরাই নিয়ামক; তোমরা মফঃস্বলের লোক,—আমরা দয়া করিয়া তোমাদিগকে অধিকার দিতেছি—তোমরাও সাহিত্য-পরিষৎ কর। অবশ্য আমাদের অধীন হইয়া থাকিবে—আমাদের কথা শুনিয়া চলিবে—এবং আমাদিগকে খাজনা দিবে।' ইহা যে একটা অত্যাচার! জানিনা, দেশের লোক, ইহার বিপক্ষে কেন কিছু বলেন না!

সাহিত্য পরিষদের উচিত ছিল, নিয়মিত-ভাবে সাহিত্য প্রচারক পাঠাইয়া মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপন করা। গাছ যেমন নিজের রস ও প্রাণশক্তি দিয়া, প্রথমাবস্থায় শাখা বিস্তার করে, চিরদিন সেই শাখাকে রস যোগায় এবং নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা ধারণ করে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে সেইরূপ শাখা বিস্তার করিতে হইত। শাখা অবশ্য, বাহিরের আলো ও অঙ্গারক বাষ্প দিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধনে অবহেলা করিত না। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহা করেন নাই। মফঃস্বলে স্বাধীনচিন্তা জাগরিত হইলেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ন্যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনকেই হয়ত, সংশোধিত বা নিঃশেষিত হইতে হইবে। আজিকার সম্মেলনে, আপনারা এই বিষয়টি চিন্তা করুন।

আজকাল আত্মনির্দ্ধারণ বলিয়া একটা খুব বড় কথা বিদ্বৎ-সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক মহাজাতি বা Raceকে, আত্মনির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, তাহার নিজস্ব সভ্যতার ও সাধনার বিশিষ্টতাটুকু বজায় রাখিয়া অন্যান্য মহাজাতির সহিত আদান প্রদানের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক মহাজাতির পক্ষে যাহা সত্য, প্রত্যেক ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেও তাহা সত্য। আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকেও নিজের বিশিষ্টতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এতদিন সে বিষয়ে আমরা মনোযোগী হই নাই। আমাদের রচনা-রীতি ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রচনা-রীতি চলিতেছে, তাহা আমাদের বিশিষ্টতার কতখানি পরিচায়ক তাহা বলা যায় না।

আত্মনির্দ্ধারণ

বর্ত্তমান বাঙ্গলায়, অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখকের লেখা, ইংরাজী ভাষায় অ-ভিজ্ঞ লোকে একেবারেই বুঝিতে পারে না। অথচ লেখক ও তাঁহার ভক্তেরা মনে করেন এবং প্রচারও করেন যে, ইহা সুবোধ্য "কথ্য"-ভাষায় লিখিত হইয়াছে! কিন্তু ভাল ইংরাজী-জানা লোক ছাড়া, সে ভাষা কেহই বুঝিতে পারে না। ইহা কি একটি বিসদৃশ ব্যাপার নহে? দেশের জনসাধারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পায় নাই। তাহারা ঠিক্ কিরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, গ্রামে বসিয়া, গ্রাম্যলোকের সহিত মিশিয়া ইহা যদি নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত সাধারণ জনশ্রেণীর যে বিষম ব্যবধান ঘটিয়াছে, তাহা দূর করিতে পারা যায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই কঠিন সাধন-পথ পড়িয়া রহিয়াছে। মফঃস্বল হইতে, এই সাধনা আরব্ধ হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির (Race) সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেক জাতির অনুভব করিবার, চিন্তা করিবার এবং সেই অনুভূতি ও চিন্তা, বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার পদ্ধতি ঠিক একরূপ নহে। একটি বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া, কে কোথায় বসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বক্তার মনে কোন্‌টির চিন্তা বেশী জোরে সর্ব্বপ্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধরিতে পারা যায়। যেমন, 'আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছি'—এই একটি বাক্য। আবার নাট্যসাহিত্যে (in dramatic mood) বলা হইল—'দেখেছি গো দেখেছি, বেশ ভাল করে দেখেছি—আমি নিজে দেখেছি'। এই দুই প্রকারের বাক্য-প্রয়োগের পশ্চাতে বক্তার হৃদয় বৃত্তির ক্রিয়ার বিশেষরূপ পার্থক্য রহিয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে কোন জাতির চিত্ত, ক্রিয়াকেই প্রধান রূপে দেখে, আবার কোন জাতির চিত্ত, স্বভাবতঃ কর্ত্তাকে প্রধানরূপে দেখে। কোনও জাতির ভাব-নিষ্ঠতা (subjectivism) অধিক, কোনও জাতির বস্তুনিষ্ঠতা (objectivism) বেশী। জাতীয় প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য, নানাবিধ কারণ-সমবায়ে গড়িয়া উঠে। সেই সমুদয় কারণের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য যে আছে, তাহা সাহিত্যের আলোচনায় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখা দরকার। বিশেষ করিয়া, আমাদের এই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐ বৈশিষ্ট্যের পরিচয়লাভ একান্ত আবশ্যক।

অনুভব-পদ্ধতি—জাতীয় বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষে উহা একান্তভাবে আবশ্যক কেন, তাহা আলোচনার বিষয়। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের ভারতবর্ষের যে কোনও সাহিত্যের তুলনা করুন। অবশ্য সাহিত্যের আলোচনা, সমগ্র জাতির জীবনেরই আলোচনা। ইংরাজ জাতির বা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস আমরা যতদূর জানি, তাহাতে দেখিতে পাই ইংরাজ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। নানাদেশের নানা জাতি, তাহাদের সাহিত্য, ধর্ম্ম ও আচার লইয়া ইংলণ্ডে

ইংরাজী সাহিত্য বনাম ভারতীয় সাহিত্য

আসিয়াছে, যুদ্ধ করিয়াছে এবং ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান ও শোণিত-সংমিশ্রণের দ্বারা একটি জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। রোমান্, কেল্ট, ডেন, এংগেল, নরম্যান, ফরাসী প্রভৃতি এই প্রকারে সংমিশ্রিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের সাহিত্যও ঠিক্ তাহাই। এই গঠন-কার্য্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার পর, ইংরাজের সম্প্রসারণ আরম্ভ হইল। এই সম্প্রসারণে ইংরাজের জাতীয় জীবন ও সাহিত্য, পৃথিবীর অতীতের ও বর্ত্তমানের, নিকটবর্ত্তী ও সুদূরবর্ত্তী যাবতীয় জাতির সাধনা ও চিন্তাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। গ্রীস, রোম, মিসর, ভারতবর্ষ, আরব, প্যালেস্তা, ব্যাবিলন ও চীন প্রভৃতি অতীতের সুসভ্য জাতিসমূহ ব্যতীত, ফিজি প্রভৃতি অসভ্য দেশও এই সম্প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে। ইংরাজ জাতির এই যে ইতিহাসের ধারা, এই ধারার মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে আসিয়া ইংরাজকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইয়াছিল—কিছু হারাইয়া ফেলিয়াছি, অতএব আর অগ্রবর্ত্তী না হইয়া, সেই হারানিধির অন্বেষণ করা প্রথম প্রয়োজন। এ প্রকার আন্দোলন যে ইংরাজী সাহিত্যে নাই, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এই প্রকারের আন্দোলন কখন প্রয়োজনও হয় নাই, স্থায়িত্ব লাভও করে নাই।

এইবার আমাদের সমস্যা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা, অর্থাৎ পূর্ব্ব দেশের যাবতীয় প্রাচীন জাতিরা, যাহারা এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছি এবং আত্মপ্রকৃতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আবার গৌরব-শিখরে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই সমুদয় জাতির বর্ত্তমান সময়ের প্রধান চিন্তাই এই যে, আমরা একটা বড় জিনিষ হারাইয়াছি—সেই হারানিধি সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ইহাই প্রথম কথা। পূর্ব্বদেশগুলি কিছু কাল, পশ্চিমের তাড়নায় বাহিত হইয়াছে, ইহা সত্য কথা। স্ব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও কিয়ৎ পরিমাণে হারাইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন এই সমুদয় দেশ, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আত্মনির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্যে এই চেষ্টা আবশ্যক। আমরা ইংরাজী লেখাপড়া বেশ ভাল রূপে শিখিয়া মাতৃভাষার অনুশীলন করিতেছি। ইংরাজী শব্দ ও বর্ণনা-প্রণালী প্রভৃতি আমাদের ভিতর অতিরিক্ত পরিমাণে রহিয়াছে। বিনা চেষ্টায় সেই সমুদয় জিনিষ বাঙ্গলা হরফে ও বাঙ্গলা কথায় বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু হরফ ও কথা বাঙ্গলা হইলেই, তাহার প্রাণটা যে বাঙ্গলা, তাহা নহে। এখন সাহিত্যে বাঙ্গলার যাহা প্রাণ, তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই আত্মনির্ণয় উন্নতিমুখী গতির বিরোধী নহে—ঐকান্তিক স্থিতিশীলতাও নহে। গতি চাই, অগ্রবর্ত্তিতা চাই, পুষ্টি চাই, সমগ্র বহির্জ্জগৎকে আয়ত্ত করিয়া আত্মসাৎ করা চাই। কিন্তু প্রাণ-শক্তির জোর না থাকিলে, এই সমুদয় ব্যাপারগুলি একটি অসম্ভব বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে। সুতরাং আমাদের বৈশিষ্ট্য-নির্দ্ধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে একান্ত ভাবে আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে এই বৈশিষ্ট্য

হারানিধির অন্বেষণ

অবধারণ করিয়া হারানিধির অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সাধন করিতে হইলে মফঃস্বলেই করিতে হইবে।

রচনারীতি বা style যে কত বড় জিনিষ, তাহা আমরা এখনও বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করি নাই। সম্প্রতি গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী',-পত্রে "রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য" প্রবন্ধে এবং আমার 'সাগর-সুধা' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়, এ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রবন্ধগুলিতে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নাই। আপনারা দয়া করিয়া যদি এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষরূপ উপকৃত ও বাধিত হইব।

রচনা-রীতি

এই প্রকারে রচনারীতি নিদ্ধারণ করিবার কার্য্যটী বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আবশ্যক। আত্ম-নিদ্ধারণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশের বা বাঙ্গলা ভাষার আত্মনির্দ্ধারণ যেরূপ আবশ্যক, তেমনি বাঙ্গলাদেশের এক একটি বিভাগেরও আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। বীরভূমে যখন সাহিত্য-পরিষৎ হয়, তখন আর একটি কথা খুব জোরে বলা হইয়াছিল, বোধ হয় আপনাদের কাহারও কাহারও স্মরণ থাকিতে পারে। এই বীরভূম জেলার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ছোটনাগপুরের লৌহ ও প্রস্তরময় ভূখণ্ড এবং গঙ্গার অধিত্যকা—এই দুই প্রকারের ভূমি এই বীরভূমে সম্মিলিত হইয়াছে। আর্য্য-সভ্যতার সম্প্রসারণের দিক হইতে দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গলা দেশে আর্য্য-সভ্যতার সম্প্রসারণে বীরভূমই আদি কেন্দ্র। হণ্টার সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

বিভাগীয় আত্ম-নিদ্ধারণ

বাঙ্গলা ভাষার আদি কবিগণ বীরভূমের লোক। বীরভূমই তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব-সাধনার আদি লীলা-স্থল। রাঢ়ের সভ্যতা এই বীরভূম হইতেই তাহার বিশিষ্ট মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই বীর-ভূমের আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক বিভা-গের আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। ইহা অবশ্য সাধনসাপেক্ষ এবং অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য এবং হয়ত এই কার্য্যের একটা চরম মীমাংসা নাই। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ হইতে এই কার্য্যের কথা বহুবার বহুভাবে বলিয়াছি, আপ-নাদের তাহাও স্মরণ থাকিতে পারে।

বীরভূমের আত্মনির্দ্ধারণ

বাঙ্গলা দেশের সমুদয় স্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশের আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তা প্রভৃতি যদি কেহ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে এক এক অংশের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা, তাঁহার মানসপটে জাগিয়া উঠিবে। আত্মনির্দ্ধারণের জন্য এই প্রকারের পর্য্যবেক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গের নদীপ্রধান স্থানের গ্রামসমূহ, আর বীরভূম জেলার গ্রামসমূহ এক রকমের নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সম্বন্ধও

একরূপ নহে। এমন কি, পল্লীবাসীর গ্রাম্য-সঙ্গীতের সুরও পৃথক ; পোষাক পরিচ্ছদের ত কথাই নাই। এই সবগুলি বেশ প্রণিধান করিয়া দেখিবার বিষয়। পর্য্যবেক্ষণ, সাহিত্য-সাধনায় অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা অধিক অগ্রসর হই নাই।

আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনী সংবাদ দেখিয়া বঞ্চিত হইবেন না। বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য জেলায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি কার্য্য হয় বা হইতেছে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের উপায়ও আমাদের আছে। আপনারা ভাবিবেন না যে, বীরভূম হইতে বর্ত্তমান যুগে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কোনও কায হয় না। প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি বীরভূম হইতে যত সংগৃহীত হইয়াছে, বাঁকুড়া ছাড়া অন্য কোনও জেলা হইতে তত হয় নাই। আমাদের 'রতন' লাইব্রেরীতে, ন্যূনাধিক চারি সহস্র হস্তলিখিত প্রাচীন বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এই পুঁথির বিবরণমূলক বিস্তৃত সূচীপত্র একখণ্ড ছাপাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনেকে বলেন—পুঁথিগুলি তাড়াতাড়ি ছাপাইয়া ফেলা আবশ্যক। আমরা ছাপাইবার পক্ষপাতী, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিবার পক্ষপাতী নহি। এত প্রাচীন পুঁথি রহিয়াছে—কিন্তু তাহা পড়েই বা কে, এবং পড়িতে চায়ই বা কে? আমরা মনে করি, সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষ প্রস্তুত করা প্রধান কার্য্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বহু অর্থব্যয় করিয়া, বহু প্রাচীন গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন—সেগুলির দ্বারা উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমুদয় গ্রন্থ-প্রচারে, আর্থিক হিসাবে সাহিত্য পরিষৎ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। প্রাচীন গ্রন্থ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের লোকের এই সমুদয় গ্রন্থ আস্বাদন করিবার শক্তিও যদি বাড়িয়া উঠিত, এই সমুদয় গ্রন্থের অনুশীলনের আবশ্যকতা যদি দেশের লোক বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে এই সমুদয় গ্রন্থ-প্রচারে, আর্থিক হিসাবে ক্ষতি হইবে কেন? অবশ্য এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যাহা অল্প লোকেই পড়িবার অধিকারী। সে সমুদয় গ্রন্থ প্রচারে আর্থিক ক্ষতি স্বাভাবিক। কিন্তু সমুদয় গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহা সত্য নহে। আমাদের এই গ্রন্থগুলি, আশা করি অচিরেই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই সমুদয় গ্রন্থের প্রতি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাহাতে অনুরাগ জন্মে, সেজন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। আমরা আশা করি, এই সম্মেলনের দ্বারা ক্রমশঃ অনুরাগ বাড়িয়া যাইবে। তখন এই সমস্ত গ্রন্থ-প্রচার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। সমুদয় কার্য্যই ভিতর হইতে, বা ভাবের দিক্ হইতে হওয়া আবশ্যক। আমরা সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি যে জীবনের উন্নতির একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, সে-কথা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। আমাদের সাহিত্যিক জীবনের উন্নতি হউক—আমাদের মানস-জীবন সম্প্রসারিত হউক—উন্নততর চিন্তারাজ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, আমরা প্রকৃত আত্মোন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করি—ইহাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত। নতুবা, সাহিত্য-ক্ষেত্রে

আমাদের কার্য্য
প্রাচীন পুথি

ব্যবসায় বুদ্ধি ও নানা রূপ কৃত্রিম চাতুরী প্রবেশ করিয়া দেশের উপকার না করিয়া, অপকার করিবে।

বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে যাহা বলিবার, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। এখন, আধুনিক নাগরিক-সাহিত্য বা ঔপন্যাসিক-সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিতে চাই।

যাঁহারা বর্তমান সাময়িক-সাহিত্যের বাদানুবাদের সহিত পরিচিত, তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন যে, কিছুদিন হইতে আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে।

উপন্যাস নারীচরিত্রই এই বাদানুবাদের বিষয়। বিলাতী স্বাধীন-প্রেম যেদিন হইতে আমাদের সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেইদিন হইতে বাদানুবাদের সৃষ্টি। যাঁহারা কলিকাতা সহরে থাকেন, প্রাচীন সমাজের বিধিব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন রকম করিয়া নিজেদের সমাজ গড়িয়াছেন, অথবা যাঁহারা ঐ প্রকারের নব্য-সমাজের সংসর্গে আসিয়া, ঐ প্রকারের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যাহাই বলুন,—আমরা গ্রামের লোক, গ্রাম্য-সমাজ ও গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, আমাদিগকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল যুগে গ্রামের লোকেরাই উচ্চতর চিন্তা করিয়া থাকে। নাগরিক জীবন, উন্নততর ও গভীরতর চিন্তার অনুকূল নহে—বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষে, তপোবনেই জ্ঞানের জন্ম হইয়াছে, আর সভ্যতা গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

আধুনিক উপন্যাসের প্রেমচিত্র সম্বন্ধে আমাদের গ্রাম্য-বুদ্ধিতে যাহা মনে হয়, তাহা নিবেদন করিতেছি। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ, মানব-জীবনে একটি অতি প্রধান ব্যাপার। এই সম্বন্ধের সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়া, মানুষ দেবত্বে আরোহণ করে; আর অপব্যবহার হইলে, মানুষ ক্রমে অসুর, রাক্ষস, পিশাচ ও পশু হইয়া যায়। ভারতবর্ষ এই অভিজ্ঞতা বহুযুগ পূর্ব্বে লাভ করিয়াছে। ইউরোপের জাতিসমূহ নিতান্তই আধুনিক। তাহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে দল বাঁধিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত। গৃহহীন ও অন্নহীন—সুতরাং সুসম্বদ্ধ গার্হস্থ্য জীবন তাহাদের ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমুদয় চঞ্চলমতি ও জীবিকান্বেষণে পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান নরনারীকে সুসম্বদ্ধ গার্হস্থ্যজীবনে ও সুশৃঙ্খলিত সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক ছিল।

পুরুষের নারীর প্রতি আকর্ষণ হয়—নারীরও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ হয়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। এই আকর্ষণ, নিম্নতম স্তরে সাময়িক সম্ভোগে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; ইহা কোনও স্থায়ী ফল উৎপাদন করে না। তাহার পর এই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থায়ীত্ব লাভ করে। তখন পুরুষ বা নারীর, সাময়িক দেহগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখ সম্ভোগই এই মিলনের ফল বলিয়া মনে হয় না—পুত্রকন্যা প্রতিপালন প্রভৃতি স্থায়ী কার্য্য অবলম্বন করিয়া এই মিলন বা সম্বন্ধ মার্জ্জিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে

Gradual Idealisation বলে। ক্রমশঃ এমন দিন আসিতে পারে যখন, দৈহিক লালসা একেবারেই থাকে না, অথচ, উভয়ের মিলন অতিশয় মধুর ও গভীর হইয়া থাকে। সহধর্ম্মিনীত্ব এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ইংরাজীর Transmutation। আমরা পুরাণাদির সাহায্যে আমাদের ভারতীয় সামাজিক অভিব্যক্তির বিবরণ যদি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, একদিন আমাদের দেশে পৈশাচিক, রাক্ষস, ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল। তখনও আমাদের সমাজ হয়ত সুব্যবস্থিত হয় নাই, অথবা অন্যান্য সমাজকে আত্মসাৎ করিবার জন্য এই প্রকারের কতকগুলি অব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু, সে বহু বহু অতীতের কথা। এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন প্রজাপতির আদেশেই হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী, সংযম অভ্যাস করিবে। যে সংযত নহে, সে ভদ্রলোকই নহে, অধিকন্তু সে মানুষই নহে। সংযত পুরুষ ও নারী, পরস্পর মিলিত হইবে ; কিন্তু নিজেদের দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখসাধনের জন্য নহে—বংশ রক্ষার জন্য, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ধারা রক্ষা করিবার জন্য।

ভারতবর্ষ, বহুযুগের বহু প্রকারের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, মানব-জীবনের এই চরম ও পরম শিক্ষা পাইয়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার হস্তেই বিবাহের ভার থাকিবে, মনোভবের উপর এ ভার থাকিবে না, ইহাই ভারতবর্ষের সাধনার শেষ কথা। ভারতের ও প্রতীচ্য জগতের ইতিহাস ও সমাজ তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব।

এইবার চিন্তা করুন—আমরা, আমাদের সাহিত্য সাধনায় কোন্ দিকে অগ্রসর হইব ? তরলমতি যুবক যুবতী, যাহারা শৈশব হইতে কোনরূপ সুশিক্ষা পায় নাই তাহারা ইন্দ্রিয়ভোগের যথেচ্ছাচার স্বভাবতঃ ভালবাসে। কিন্তু ইহা, কে ভালবাসে ? ভারতবর্ষের শাস্ত্র বলিবেন—যিনি প্রকৃত মানুষ, তিনি ইহা ভালবাসিতে পারেন না। মানুষের মধ্যে যে পশু রহিয়াছে, সেই পশু ইহা ভালবাসে। আমরা, আমাদের সাহিত্যদ্বারা, মানবপ্রকৃতির অন্তর্ভূত এই পশুগুলিকেই কি বলবান করিয়া যথেচ্ছাচারের পথে ছাড়িয়া দিব ? না, এইগুলিকে শাসন করিয়া, সংযত করিয়া, আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিয়া, ত্যাগ ও অহিংসার পথে অগ্রসর হইব ? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই প্রকৃত মীমাংসা রহিয়াছে।

আমাদের দেশে এখন ভোগবাদীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তাঁহারা বলিবেন—তোমরা ভোগের পথ বন্ধ করিয়া মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছ। সেই কারণেই তোমাদের এই দুর্গতি। এতদিন ভোগবাদীরা নির্ভয়ে একথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে,—এই বুদ্ধ চৈতন্যের দেশে, আবার নূতন আদর্শের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকের বিমল-জ্যোতিঃ, পৃথিবীর অন্যান্য ভোগসর্ব্বস্ব দেশেও আজ উপস্থিত। সুতরাং ভারতের এই তপস্যা, বৈরাগ্য ও আত্ম-শক্তির বার্ত্তা নষ্ট হইবার নহে।

উপন্যাসিকগণ এই কথা মনে রাখিলেই, সাহিত্যের আবর্জ্জনা দূরীভূত হইবে। কিন্তু দূরীভূত হওয়া কঠিন। কারণ, যাহারা গ্রন্থরচনা করেন. তাঁহারা সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেন কয়জন? তাঁহারা নাম চাহেন, অর্থ চাহেন। কাযেই মানবের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়া, তাঁহারা খ্যাতি ও অর্থ অন্বেষণ করেন। ইহাই এখন সাহিত্যের অবস্থা। সুতরাং এই আবর্জ্জনা দূর করা বড়ই কঠিন।

আর এক কথা। এখন সাহিত্যে মূলধনের প্রভাব (Capitalism in Literature) দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। যাহাদের টাকা আছে, তাহারা নিছক্ ব্যবসায় করিবার জন্য, ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য, সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। মূলধনীর সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটিয়া লেখকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বাজে ছবি, বাজে গল্প লিখিয়া সাধারণ তরলমতি পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহারা দেশও জানেনা, সমাজও জানে না, ধর্ম্ম, মানবতা, বা ঈশ্বর জানেও না—বা মানে না!

সাহিত্যে মূলধনের প্রভাব

কলিকাতা সাহিত্য সাধনার কেন্দ্র হওয়ায়, ও ক্রমে ক্রমে সাহিত্যক্ষেত্রে মূলধনের বিনিয়োগ হওয়ায়, আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইল! পূর্ব্বে যাহারা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র চালাইয়াছেন, তাঁহারা একটা বিশেষ রকমের আদর্শ বা প্রেরণা লইয়াই এইকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু এখন যে-কেহ, পয়সার জোরে কাগজ করিতেছেন। উৎকৃষ্ট লেখকের সংখ্যা বাড়িতেছে না, নবীন লেখকগণকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিবার কোন ব্যবস্থা নাই। একেবারে দায়িত্ববুদ্ধিহীন লোক, অর্থের জন্য বা নামের জন্য, সাহিত্যের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছে!

সাহিত্য ও ধর্ম্ম—ইহার মধ্যে প্রভেদ খুব কম;—প্রভেদ নাই বলিলেই ভাল হয়। যেমন, ধর্ম্মের নামে মঠ-মন্দির করিয়া লোক ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করা একটা পাপ, সেইরূপ সাহিত্যের নামে, মানুষের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন বা উত্তেজনা বিধান করিয়া, অর্থ ও খ্যাতি উপার্জ্জন করাও একটি পাপ; এবং এই দ্বিতীয় প্রকারের পাপকেই আমি গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করি। মফঃস্বলে যে সকল সাহিত্য সম্মেলন হইবে, সেখানে সাহিত্যিকগণ শান্তভাবে এই সমস্যার আলোচনা করিবেন—ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

এখন আমি যাহা বলিলাম তাহার সারমর্ম্ম এই—

সাহিত্য সাধনা মানবজীবনের পবিত্রতম সাধনা। ধর্ম্মসাধনার সহিত ইহার প্রভেদ নাই। সুতরাং, এই সাহিত্য-সাধনাকে উদ্দেশ্য বলিয়াই গ্রহণ করিব—অন্য কোন কিছুর উপায় বলিয়া নহে। সাহিত্যসেবীর চরিত্রই প্রথম ও প্রধান জিনিষ। ঋষি-জীবনের আদর্শ, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যসেবী মাত্রেরই পুরোদেশে অবিচলিত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক।

ধর্ম্মরাজ্যে যেমন আত্মশক্তির ভূমিতে দাঁড়াইয়া সাধন-পথে চলিতে হইবে, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি প্রত্যেক পদক্ষেপে ও প্রত্যেক উদ্যমে আত্মশক্তির ভূমি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং একালে যাহাকে ফ্যাশন বলে, অন্ধভাবে তাহার দ্বারা বাহিত হইলে চলিবে না। কলিকাতার লোকে কি বলে, কোন্ খবরের কাগজ কি বলে, বা নামজাদা লোকে কি বলে, সেদিকে চাহিলে চলিবে না। Idolাকে সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর গুরুরূপী ভগবান্ অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান্। তাঁহার প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া, সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। এই আদর্শ নূতন নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সাহিত্য-সাধনার এই আদর্শ বহু বহু যুগ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে।

সুতরাং সাহিত্যে ব্যবসাদারী, চাকুরী, কাপট্য ও হুজুগ পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যারূপিণী ব্রহ্মময়ী সরস্বতী দেবীর যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে, সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা বাণীর উপাসক, তাঁহাদের গোষ্ঠী যাহাতে বৃদ্ধি লাভ করে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মফঃস্বলে সাহিত্যানুশীলনের কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া এই শুভকার্য্য সাধন করিতে হইবে।

সাহিত্য সাধনার পথে যাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হউন। Lord Macaulay বলিতেন - আমি যে লিখি, তাহার কারণ আমার মাথা বোঝাই হইয়া রহিয়াছে, পকেট খালি বলিয়া লিখিনা। ("I write not because my pocket is empty but because my brain is full.") অতএব যশের জন্য, অর্থের জন্য লিখিব না। যিনি সত্য, শিব ও সুন্দর তাঁহাকে উপলব্ধি করিব এবং বাহিরে অন্যান্য সকলের হৃদয়ে, মনে ও বাক্যে, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্যের সাধনা করিব। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পূর্ব্বে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষকে জানিতে হইবে—বেশ ভাল করিয়া, ধ্যানযুক্ত হইয়া তাহার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য জানিতে হইবে। এই বহুজাতির মিলনের দিন, বহুপ্রকারের আদর্শ ও সাধনার ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের দিন, ভারতবর্ষের সেই সনাতনী বাণী, ধ্যানযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুনিতে হইবে। নিজেদের বৈশিষ্ট্য যথাযথ রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধ হইব না। অন্যান্য দেশ ও অন্যান্য জাতির অতীতে ও বর্ত্তমানে যাহা কিছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ, বিচার পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিব ও আয়ত্ত করিব। ইহাই সাহিত্য-সেবকের সাধনাদর্শ হইবে।

এই আদর্শ জয়যুক্ত হউক – বিশ্বমানবের উপাস্য পরমদেবতা যিনি শব্দ-মূর্ত্তিতে শাস্ত্ররূপে প্রত্যক্ষে অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতিকে পরিচালনা করিতেছেন, সেই বেদপুরুষ ব্রহ্মণ্যদেব আমাদের সহায় হউন। আমরা সকলে সমবেত ভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতেছি।

[২]

এখন আমরা, সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য কয়েকটী আবশ্যকীয় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৎসরে বৎসরে সাহিত্যিকগণ একত্র মিলিত হইয়া যখন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তাঁহাদের সেই আলোচনা পরিচালনা করিবার জন্য, একজনকে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন, তখন প্রথম চিন্তা করিতে হইবে—এই সভাপতির কার্য্য কি?—সভাপতিরূপে তিনি কি করিবেন?

সাহিত্য-সম্মেলন

আমাদের এই সম্মেলন, এখন একটি সামান্য ব্যাপার; কিন্তু সামান্য হইলেও আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহা পরিচালনা করিব। আমরা যতই অযোগ্য অক্ষম হইনা কেন, আমাদের লক্ষ্য উচ্চ হওয়া আবশ্যক, সুতরাং সভাপতির নিকট কি আশা করা উচিত, প্রারম্ভে তাহাই নির্দ্ধারণ করিতেছি।

আপনারা অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন কিছু দিন হইতে চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস। এই চারিটি বিভাগে চারিজন শাখা-সভাপতি কার্য্য করিয়া থাকেন। আমাদের অবশ্য জেলা-সম্মেলনে এখনও এই প্রকারের শাখা-বিভাগ প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কালে প্রয়োজন হইতে পারে।

সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনের যিনি সভাপতি হইবেন, তিনি যে বিভাগের সভাপতি, সেই বিভাগে বাঙ্গালী জাতি এক বৎসরের মধ্যে কি করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিবেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন কোনও দেশের সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধহীন একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। সুতরাং বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে—ইতিহাসে, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও বিশুদ্ধ সাহিত্যে—এক বৎসরে কি করিয়াছে, তাহা আলোচনা করার পর, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকে, এই এক বৎসরে বিশেষরূপে স্মরণীয় কি কি করিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ, আমাদিগকে যে বিশ্বমানবের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

সভাপতির কর্ত্তব্য

এই দুইটি কার্য্য ছাড়া আরও একটি বৃহৎ কার্য্য রহিয়াছে। আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি—আমাদের অতীত, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বর্ত্তমান পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বর্ত্তমানের উন্নতিমুখী চেষ্টা ও সাধনা, আমরা যেমন জানিবার জন্য চেষ্টা করিব, সেইরূপ আমরা আমাদের অতীতকেও জানিবার চেষ্টা করিব। কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন জাতির শাস্ত্র, সমাজ এবং সর্ব্ববিধ চেষ্টা ও উদ্যম উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া, পৃথিবীতে মনীষিগণের মধ্যে

একটি সুবিপুল চেষ্টা চলিতেছে'। জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতি ইহার পথ-প্রদর্শক। ইংলণ্ডের মনীষিগণও এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়াছেন—এখনও সেই চেষ্টার বিরাম নাই। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতবর্ষের অতীতকে জানিবার জন্য, এখন নবীন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ রামদাস সেন, ডাঃ ভাণ্ডারকার ও লোকমান্য তিলক হইতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক অনেক ভারতীয় মনীষী, এই বিভাগে পরিশ্রম করিয়াছেন।

আমাদের অতীতকে গত এক বৎসরের মধ্যে, আমরা নূতন করিয়া কতটুকু বুঝিলাম এবং আমাদের অতীতকে বুঝিতে গিয়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির অতীত বা কতখানি স্পষ্টীকৃত হইল, বৎসর বৎসর সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি কর্ত্তৃক তাহারও একটা হিসাব প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

সাধনার ত্রিধারা

তাহা হইলে আমরা এখন আমাদের সাধনার তিনটি ধারা পাইলাম। বর্ত্তমান এক বৎসরে আমরা কি করিলাম, বর্ত্তমান এক বৎসরে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি কি করিল, আর আমাদের বিস্মৃত ও উপেক্ষিত অতীতকেই বা আমরা কতখানি আপনার করিয়া বুঝিলাম—এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গমই ভারতবর্ষের সাহিত্য-সাধনার পুণ্যতীর্থ হইবে।

কিন্তু যিনি সভাপতি হইবেন, তিনি এই কার্য্য কি প্রকারে সাধন করিতে পারেন? তাঁহার অনুরাগ আছে, পরিশ্রম করিতেও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু উপকরণ কোথায়? সমবেত চেষ্টার এইখানে

সভাপতির কার্য্য-প্রণালী

প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক জেলার সদরে কি এমন একটি পুস্তকাগার ও পাঠাগার স্থাপনা করা যায় না, যেখানে এই প্রকারে সাহিত্য সাধনা করিবার উপকরণগুলি বৎসরের পর বৎসর সংগ্রহ করা যায়? আমরা অনেক সময় অনুভব করি যে ফরাসী, জার্ম্মান, গ্রীক ও এখনকার দিনে জাপানী ভাষায় অভিজ্ঞ লোক, প্রত্যেক সাহিত্য অনুশীলনের কেন্দ্রে দুই একজন করিয়া থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহে অভিজ্ঞ লোক থাকা যে দরকার, তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, আমাদের একটি বিশেষ উপকার হইয়াছে যে, প্রত্যেক বৎসরে কয়েকটি করিয়া যুবক তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, কেনেরিস, গুজরাটী, পালি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষা শিখিতেছেন। এই সমুদয় যুবকেরা যদি ঐ ঐ ভাষার চর্চ্চা রাখেন এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলায় কর্ম্মের অনুরোধে ছড়াইয়া পড়েন, তাহা হইলে আমাদের প্রভূত উপকার হইবে।

প্রত্যেক জেলারই সদরে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রহিয়াছেন। ইঁহাদের ভিতর হইতে এক একজন যদি ফরাসী, জার্ম্মান, গ্রীক প্রভৃতি এক একটী ভাষা কিছু কিছু চর্চ্চা করেন, আর প্রত্যেক সদরে, পূর্ব্বে যে আদর্শ বলিলাম, সেই আদর্শ অনুযায়ী এক একটি করিয়া পুস্তকাগার ও পাঠাগার হয়,

আর জেলার মধ্যে গ্রামে বা মফঃস্বলে যাঁহারা সাহিত্যানুরাগী এবং উন্নততর পদ্ধতিতে সাহিত্য রচনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যদি ঐ সহর হইতে গ্রন্থের ও শিক্ষকের সাহায্য পান, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যালোচনা সফলতা লাভ করিবে।

এই কার্য্যটী খুব কঠিন নহে। আমরা যখন বীরভূম সাহিত্যপরিষৎ করি, তখন অতি অনায়াসে বীরভূম টাউন হল লাইব্রেরীর নানারূপ সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে তথায় বাঙ্গলা পুস্তক একেবারেই ছিল না। সে সময়ে অতি সামান্য চেষ্টাতেই বহু বাঙ্গালা পুস্তক, টাউন হলে আমদানী করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া Theosophy ও New Thought এর অনেক পুস্তক আমদানী হইয়াছিল। অবশ্য এই চেষ্টা এখন আর কেন নাই, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আপনারা বৎসর বৎসর এই প্রকারের সাহিত্যসম্মেলন করিয়া, যদি চেষ্টান্বিত হন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য আবার উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে।

আসল কথা, এই সমুদয় কার্য্যে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আর সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে হইলে কেবল সমবেত হইলেই চলিবে না। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া কর্ম্মের আদর্শ ও চেষ্টা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমরা কি করিতে চাই, কি করা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে একটা সুমীমাংসায় যাঁহারা উপস্থিত হন নাই, তাঁহারা কেবল মাত্র সমবেত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না। এই প্রকারের সমবায়ের দ্বারা যাহা হয়, গীতা তাহাকে 'বিকর্ম্ম' বলিয়াছেন।

সমবেত চেষ্টা।

আমি সিউড়ী সহরে বসিয়া আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল, আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে ঝাড়ুদারি করিতেছি। আমাকে যে সমুদয় অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহা যদি বিস্তৃত রূপে কখনও বলিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বুঝিতে পারিবেন, মফঃস্বলে সত্য সত্য সাহিত্যপরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কি কি কার্য্য করা উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে উন্নততর পদ্ধতিতে সাহিত্যালোচনা করিতে হইলে, প্রতিদিন যে সমুদয় গ্রন্থের আবশ্যক হয়, তাহার মূল্য এতই বেশী যে, একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থ (Comparative Philology) তুলনামূলক পুরাণতত্ত্ব (Comparative Mythology) প্রভৃতির মূল্য কত! অথচ, এই সমুদয় গ্রন্থের আলোচনা না করিয়া, ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, তাহা একেবারে গ্রহণীয় হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, সে গুলিরই বা মূল্য কত! কলিকাতায় নানারূপ সুবিধা আছে। কিন্তু মফঃস্বলে বসিয়া যাঁহারা

সাহিত্যালোচনা করিবেন, তাঁহাদের উপায় কি? অথচ, আমরা ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছি এবং সাহিত্য-সাধনার আদর্শ-আলোচনায় আমি সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, মফঃস্বলে সাহিত্য-সাধনার স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং সাহিত্য-সেবকগণ বর্ত্তমান সময়ের নিম্ন ব্যবসায়-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, ত্যাগ ও সেবার পথে আসিয়া না দাঁড়াইলে, আমাদের প্রকৃত কল্যাণের আশা নাই।

মফঃস্বলে সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র

অতএব মফঃস্বলে যাহাতে এই প্রকারের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র অচিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই কেন্দ্র হইতে, আলোক ও স্বাস্থ্য, সমগ্র জেলার গ্রামে গ্রামে, পল্লীবাসী দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে সংক্রামিত হয়, আপনারা সমবেত ভাবে, তাহার ব্যবস্থা করুন। আমি অতি সামান্য লোক হইলেও, এই উপদেশ দিবার অধিকার আমার আছে। আমি আমার একক চেষ্টায়, একমাত্র ভগবানের প্রীতি চাহিয়া, নিজে দারিদ্র্য ক্লেশ যথেষ্ট পরিমাণে সহ্য করিয়াও, সিউড়ী সহরে একটা সামান্য পুস্তকাগার গড়িয়া তুলিয়াছি। যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে নানা জেলায় পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারা বলেন—এই প্রকারের পুস্তকালয় বাঙ্গলায় অধিক নাই।

লাইব্রেরী করা, অনেক জায়গায় ফ্যাশন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ফ্যাশন হইলে, প্রকৃত কার্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রথমে চাই মানুষ, তাহার পর কর্ম্ম। যেখানে মানুষ নাই, সেখানে কর্ম্ম করিয়া কি হইবে? উষর ক্ষেত্রে বীজ বপন ও ভস্মে ঘৃতাহুতি পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমাদের যেমন তেমন গ্রন্থাগার হইয়াছে। কিন্তু এখন পড়িবার লোক কৈ? বাজে গল্পের বহি বা নূতন ছবিওয়ালা মাসিক কাগজ লইয়া যাইবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু গভীর ভাবে কোন বিষয়-বিশেষের অনুশীলন করিবার মত লোক, একেবারেই দুর্ল্লভ। এই প্রকারের সাধু প্রকৃতি-সম্পন্ন পাঠক পাইলে আমরা কষ্ট করিয়াও গ্রন্থ সংগ্রহ করিতাম। কিন্তু সে প্রকারের পাঠকের বড়ই অভাব। গ্রামে গ্রামে সাহিত্য সম্মেলন করিয়া, গভীরভাবে সাহিত্যালোচনা করিতে ইচ্ছুক এবং কতকটা নিষ্কামভাবে এই পথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত—এই প্রকারের লোক যদি আপনারা দু'একজন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের অতি মহৎ উপকার হয়।

আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এই প্রকারের লোকের অভাব হইবে না। আমাদের বীরভূম জেলা অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও অনেক বিষয়ে ভাগ্যবান। আমরা অনেকেই এখনও গ্রামে বসিয়া মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট আছি। আধুনিক নাগরিক জীবনের বিলাস বাসন যদিও প্রচণ্ড বেগে নানা প্রকারে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তথাপি আমরা কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মত একেবারে 'পরাজিত' হই নাই। আমাদের গ্রাম্য জীবন এখনও রহিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই জীবন আমাদের চিরস্থায়ী হউক।

উচ্চ চিন্তা করিতে হইলে মোটামুটিভাবে দিন যাপন করা প্রয়োজন, ইহা আপনারা জানেন।

Plain living and high thinking আমাদের বালককালের মুখস্থ করা কথা। ভারতবর্ষ এই পথেই অমরতা লাভ করিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় আমাদের এই পথ অক্ষুণ্ণ থাকুক। কিন্তু আমরা স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, সাহিত্যালোচনায় সামান্য বাতাস পল্লীগ্রামের কোনও লোকের গায়ে লাগিলে, প্রথমেই তাহার চাল বিগড়াইয়া যায়। সে কলিকাতায় হাঁটাহাটি করে। কি করিয়া নাম বাহির হইবে, সেই জন্য মাথা খোঁড়াখুড়ি করে—তাহার পর দুই একজন কৃতীলোকের দুয়ার ধরিয়া, যদি একটু নাম হয়, তাহা হইলে চাঁদা তুলিয়া মোটর গাড়ী চড়িতে বা সিগারেট খাইতে শেখে।

সমবেত সাহিত্যান্দোলন করিয়া যদি মফঃস্বল হইতে এই প্রকারের লোক প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ মানুষের চরিত্রের উন্নতি হইল না—সামান্য কলমবাজী, আর তাহার সহিত লোক ঠকাইবার উপায় জ্ঞান—ইহাই যদি দেশের মধ্যে ছড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মেলনকে একটি সংক্রামক ব্যাধি বলিতে হইবে এবং এই সংক্রামক ব্যাধি আমাদের এই গরীব জেলায় না আসাই ভাল। অবশ্য এইরূপ যে হইবেই বা হইয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি না। তবে, একটা বড় কাজ করিতে গেলে অনেকদূর চিন্তা করিতে হয়। দেবতা পূজার মন্দির গড়িবার সময়, অপদেবতা বা উপদেবতার আক্রমণ হইতে মন্দির রক্ষা করিবার জন্যও ব্যবস্থা করিতে হয়।

মফঃস্বলে সাহিত্যের কেন্দ্র কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। বীরভূমে অনেক সাহিত্যানুরাগী লোক আছেন এবং বড় লোক না হইলেও, সাহিত্যের জন্য কিছু কিছু ব্যয় করিতে পারেন, এরূপ লোকের অভাব নাই। আমি আশা করি, আধুনিক ও আবশ্যক গ্রন্থ সমূহ যাহাতে সংগৃহীত হয়, এই সম্মেলন হইতে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

সভাপতির কার্য্য কি, তাহা বলিয়াছি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় মফঃস্বলে বসিয়া একটা বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হওয়া যে কিরূপ কঠিন কার্য্য তাহাও বলিয়াছি। আমি কিছুদিন সময় পাইলে হয়ত, অতি সামান্যভাবে একটা নমুনা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম। কিন্তু সময়াভাবে তাহাও পারি নাই।

বর্ত্তমান যুগে উচ্চশ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন যে, উপন্যাসই সর্ব্বোত্তম সাহিত্য; এখন উপন্যাসের যুগ চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে নাটকের যুগ, তাহার পূর্ব্বে মহাকাব্যের যুগ ছিল। সাহিত্যের এই যে যুগ-বিভাগ, ইহা অবশ্য বিদেশীয় সমালোচকগণের নিকট আমরা পাইয়াছি। সাহিত্যের যুগের সহিত সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তনেরও সম্বন্ধ আছে—একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

উপন্যাস বাহুল্যের অবাঞ্ছনীয়তা

ইংরাজী সমালোচক যখন বলিলেন—বর্ত্তমান যুগ উপন্যাসের যুগ, তখন আমাদিগকে যে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে। আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে—ইউরোপের সমাজের বা জন-

সাধারণের যে অবস্থা, আমাদের অবস্থা ঠিক্ সেই প্রকারের হইয়াছে কি না? হয়ত কেহ কেহ বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে সেই অবস্থা লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু জনসাধারণ ঠিক্ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়।

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের সাহিত্যের তুলনা করিলে প্রথমেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সমালোচনা করিয়া একটা জিনিষ বুঝিবার যে সামর্থ্য ইংরাজের হইয়াছে—সমালোচনা করিয়া নিজের স্বাধীন মত গঠন করিবার যে অভ্যাস সাধারণ ইংরাজের জন্মিয়াছে, আমাদের এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভের অসদ্ভাব বশতঃই, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও এই সমালোচনা-শক্তি ও স্বাধীন ভাবে মত গঠনের সামর্থ্য, আমাদের দেশে এখনও গড়িয়া উঠিল না! লর্ড মর্লের গ্রন্থাবলী যদি উত্তমরূপে আমাদের সাহিত্য-সংঘ সমূহে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে আমার কথা প্রমাণিত হইবে।

সমালোচনা-বৃত্তির অভাব

আজকাল অনেকে বাহিরের জিনিস লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—আমাদের কি কিছুই নাই যে বিদেশের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিয়া আমরা শিক্ষালাভ করিব? আমাদের যে কিছুই নাই তাহা নহে—যথেষ্টই ছিল, এবং যথেষ্টই আছে। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষেই হউক, আর ভগবদিচ্ছাতেই হউক, যাহা কিছু উচ্চ ও মঙ্গলকর, একদিন তাহা হারাইতে বসিয়াছিলাম। সেই জড়তার অবস্থায়, বাহির হইতে ধাক্কা আসিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। একটা সামান্য উদাহরণ দেখুন—রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যখন সহমরণ লইয়া আন্দোলন হয়, তখন পণ্ডিতেরা সহমরণের সমর্থনে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই মন্ত্রটিকে মানিয়া লইয়া তর্ক করিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে, আচার্য্য মোক্ষমূলারের চেষ্টায় যখন ঋগ্বেদীয় প্রাচীন পুঁথিসমূহ সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইল, তখন দেখা গেল যে ঐ মন্ত্রটির পাঠে ('অগ্রে' স্থলে 'অগ্নে') এমন ভাবে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল যে, তাহার যাহা প্রকৃত অর্থ, ঠিক্ তাহার বিপরীত অর্থ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মনীষী কোলব্রুকও ইহা ধরিতে পারেন নাই! কিন্তু ইহা এখন ধরা পড়িয়াছে।

প্রতীচ্যের সহায়তার আবশ্যকতা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চেষ্টায় বেদ প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার সমুদয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহাদের উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা না করিলে আমরা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব। মোক্ষমূলরের অনুবাদের ভুল অনেকেই দেখাইয়াছেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য ও তাহার ব্যাকরণ পাঠ করিয়া, তিনি যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বের আলোচনা করিয়া তিনি হিন্দু-আর্য্য (Indo-Aryan) জাতি সমূহের প্রচলিত ভাষার মৌলিক ধাতুগুলির যে রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কত জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ, তাহা বলিয়া

শেষ করা যায় না। সুতরাং প্রতীচ্যের সাহায্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদিগকে সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে আমাদের অপকার হইবে না—প্রত্যুত, বিশেষ উপকার হইবে।

যাঁহাদিগকে Orientalist বলে—অর্থাৎ যে সমুদয় পাশ্চাত্য মনীষী, পূর্ব্বদেশের শাস্ত্র সমূহ উত্তমরূপে আধুনিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের গবেষণার সহিত আমাদের উত্তমরূপ পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের মহাভারত বা বেদান্ত লইয়া নব্য জার্ম্মাণী যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছে, আমাদের তন্ত্র লইয়া মার্কিণদেশে যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার শতভাগের একভাগও আমরা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি নাই।

অনেকে বলেন—অর্থের অভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, আমাদের এই পরাজয়ের কারণ। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। সুতীব্র ইচ্ছা থাকিলে, সমবেত চেষ্টা থাকিলে, মানুষ কি না করিতে পারে? আজ যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা সম্ভব হইবে। স্বর্গীয় হরিনাথ দে'র মত বহুভাষাবিৎ বর্ত্তমান পৃথিবীতে কয়জন জন্মিয়াছেন? তিনি অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা আমাদের মহা দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁহার জীবনের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী জাতির যে প্রতিভা আছে, তাহার আলোকে কেবল বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র পৃথিবী উপকৃত ও আলোকিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বভারতী আমাদের জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা আমাদের অতীব সৌভাগ্যের কথা। বিশ্ব-ভারতীর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন আমরা প্রথম যৌবন হইতেই দেখিয়াছি। আজ রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই সুখস্বপ্ন সফল করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত এ কার্য্য করিবার যোগ্যতা বা আর কাহার আছে? আমাদের বীরভূমে—জয়দেব চণ্ডীদাস ও নিত্যানন্দের দেশে—বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যেন এই বিশ্বভারতীর সহিত সংসৃষ্ট হইয়া সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হই—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

বিশ্বভারতী

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সমালোচনীবৃত্তি সুবিকশিত না হইলে, মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য না জাগিলে, ঔপন্যাসিক সাহিত্যের বাহুল্য জাতির পক্ষে হিতকর নহে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এখন উপন্যাসেরই ছড়াছড়ি! তরলমতি যুবক আর অল্পশিক্ষিতা অলসস্বভাবা যুবতীরা এই সমুদয় গ্রন্থের গ্রাহক ও পাঠক। আমি ইহা বড়ই অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচনা করি। বিলাতে বা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে, উপন্যাস-সাহিত্যের বাহুল্য দেখাইয়া যাঁহারা আমাদের মতের প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আপনাদিগকে আমার মত মানিয়া লইতে হইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে দেশের ও সমাজের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আপনারা নিজ নিজ মত গঠন করিবেন—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

উপন্যাস-বাহুল্য

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-সম্মেলন চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। দার্শনিক শাখা ইহার মধ্যে অন্যতম। দার্শনিক শাখার যিনি সভাপতি হইবেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া, সম্বৎসরের দার্শনিকী চিন্তা কি পরিমাণে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাকে তাহার হিসাব দিতে হইবে। বর্ত্তমান পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের দার্শনিকী সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁহার নিকট আশা করি। ইংরাজী ভাষায় যে সমুদয় মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজ বাহির হয়, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া পড়িলেই গুণবান্ ব্যক্তি, এই কার্য্য অনায়াসেই করিতে পারেন। নীতিবিজ্ঞান বা Ethics সম্বন্ধে ত্রৈমাসিক কাগজ আছে—মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মাসিক কাগজ আছে। তাহা ছাড়া, হিবার্ট জর্ণ্যাল প্রভৃতি দার্শনিক পত্রিকা সকলেরই পরিচিত। মফঃস্বলে বসিয়া ঐ সমুদয় কাগজ নিয়মিতভাবে সংগৃহীত করা এক ব্যক্তির পক্ষে কঠিন। কিন্তু সমবেত চেষ্টা থাকিলে, একটা ব্যবস্থা বা organisation থাকিলে, ইহা সহজ হইয়া পড়ে। কেবল যে কাগজগুলিই আনা যায় তাহা নহে—দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া যাঁহারা ওকালতী বা শিক্ষকতা করিতেছেন, এবং দিনের পর দিন যাঁহাদের বিদ্যায় মরিচা পড়িয়া যাইতেছে, তাঁহাদিগকে খাটাইয়া এই সব জিনিষ পড়াইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে এই সকলের সারমর্ম্ম আমরাও মোটামুটি জানিয়া লইতে পারি।

সম্প্রতি দেখিলাম, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় মূল গ্রীক হইতে গ্রীসীয় সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি বা culture এর সহিত, গ্রীসীয় সংস্কৃতির সুনিপুণ তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা বড়ই প্রশংসার কার্য্য হইয়াছে। "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতেছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী। তিনি আধুনিক দর্শনশাস্ত্র সমূহ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং একালের লোক যাহাতে বুঝিতে পারে, ঠিক সেই ভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রচার করিতেছেন। পূর্ব্বে (অধুনা পরলোকগত) ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা নব্য বাঙ্গালীর দার্শনিকী প্রতিভার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তিনি ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিও নব্য বঙ্গের দার্শনিকী চিন্তায় উচ্চশ্রেণীর দান। যাহা হউক, পূর্ব্বতন মনীষিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমার সময়ও নাই, সামর্থ্যও নাই। বর্ত্তমান সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদ ও বিজ্ঞান' বিষয়ক প্রবন্ধ. শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপনিষদ্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ে দর্শন বলিতে অনেক জিনিষ বুঝায়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বা জন ষ্টুয়ার্ট মিলও দার্শনিক, আবার কেয়ার্ড, গ্রীণ প্রভৃতিও দার্শনিক। কিন্তু দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে ইঁহাদের সংজ্ঞাই বিভিন্ন

প্রকারের। আমরা কিন্তু কাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারি না। যিনি প্রত্যক্ষবাদ বা Positivism প্রচার করিতেছেন তিনিও দার্শনিক, আবার যিনি বাস্তব প্রয়োজনবাদ বা Pragmatism প্রচার করিতেছেন তিনিও দার্শনিক। যিনি পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের (Experimental Psychology) প্রচারক তিনিও দার্শনিক। কিন্তু আমরা আমাদের দেশে দর্শন শাস্ত্র বলিলেই, পরমার্থ তত্ত্বের আলোচনা বুঝিয়া থাকি। বর্ত্তমান কালে দর্শন বলিতে কি বুঝায়, তাহাও জানা দরকার। কেবল প্রাচীন দর্শনের স্বপক্ষে দুই চারিটি কথা বলিলেই, দার্শনিক বিভাগের সভাপতির কার্য্য করা হইবে না।

আমাদিগের সমবেত সাহিত্যান্দোলন, দার্শনিক বিভাগে যদি কিছু সত্য সত্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস, যাহা প্রতীচ্য জগতে নূতন নূতন মনীষী কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছে, সেই সমুদয় ইতিহাসের সহিত আমাদের দেশবাসিগণের যাহাতে পরিচয় হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ইংরাজী ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকেই উচ্চশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। অনেকে পরীক্ষা দিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া যশোলাভও করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যার দ্বারা, দেশের বিশেষ কোন কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। যদিই বা হইতেছে, তাহা এতই অল্প পরিমাণে হইতেছে যে ধর্ত্তব্য নহে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীত বিদ্যাকে পরিপূরণ করিবার চেষ্টা, আমাদের সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষায় মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সধারণ দর্শন, দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করেন। তাহা ছাড়া সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিরও আলোচনা হয়। হয়ত এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, এই সমুদয় বিষয়ের বাঙ্গালা ভাষায় পঠন পাঠন চলিবে। কিন্তু এতদিন তাহার সূচনা হওয়া উচিত ছিল। সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এই সমুদয় বিষয়ের কি বক্তৃতা করাইতে পারেন না? অবশ্য কলিকাতার সে প্রকার বক্তৃতা নহে—যাহার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, যাহা শুনিতে বড় কেহ যায় না এবং যদিই বা কেহ যায়, তাহা হইলে অধিকক্ষণ থাকে না—এবং থাকিলেও হয়ত কিছু পায় না। কিন্তু খবরের কাগজে যখন খবর বাহির হইয়াছে, তখন সেই বক্তৃতার যাঁহারা ব্যবস্থাপক, তাঁহারা অম্লানবদনে চাঁদার খাতা লইয়া বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তির দুয়ারে যাইতে পারেন। আমি এ-প্রকারের বক্তৃতার কথা বলিতেছি না! সত্যকার বক্তৃতা—যাহা হৃদ্য, শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষক—এই প্রকারের বক্তৃতার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে ছাত্রগণেরও উপকার হয়, আর দার্শনিকী চিন্তা দেশের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

আমাদের সাহিত্যান্দোলনের আর একটি লক্ষ্য থাকা উচিত। যাঁহারা আধুনিক উচ্চশিক্ষা

পাইতেছেন, তাঁহাদের সহিত সেকালের প্রাচীন বিদ্যায় যাঁহারা কৃতবিদ্য, সেই সমুদয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মানসিক ব্যবধান, দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। প্রাচীন বিদ্যার অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, উপাধিধারী পণ্ডিতের সংখ্যা বাড়িতেছে। অনেকে পাঁচটী বা সাতটী উপাধি লাভ করিতেছেন। সংস্কৃত বিদ্যার এই প্রসার অবশ্য সুখের বিষয় বটে। কিন্তু বিদ্যার গভীরতা ক্রমেই যেন লুপ্ত হইতেছে—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! আমাদের বীরভূমে এখনও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থের ন্যায় প্রাচীন পণ্ডিত রহিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন পণ্ডিতগণের শাস্ত্রজ্ঞান বিস্ময়াবহ। কিন্তু এই শ্রেণীর পণ্ডিত অধিক দিন আমাদের দেশে থাকিবেন না। এই প্রকারের পাণ্ডিত্য রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষক হিন্দুসমাজের কার্য্য, সাহিত্য-সম্মেলন বা সাহিত্য পরিষদের কার্য্য নহে। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদ বা সাহিত্য-সম্মেলন যদি সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের নিকট, একালের বিদ্যার আলোক কিয়ৎ পরিমাণে লইয়া যাইতে পারেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যবকগণের সমক্ষে সেকালের বিদ্যার কিরণ, যদি কিয়ৎপরিমাণে ছড়াইয়া দিতে পারেন—এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণকে যদি মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত হইবার ও সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভাবের আদান প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা অচিরেই তিরোহিত হয়। জাপানে এক সময়ে প্রাচীন-পন্থী ও নব্য-পন্থীর ভিতর এই প্রকারের ব্যবধান জন্মিয়াছিল এবং সেই ব্যবধান দূর করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। জাপানে নিদাঘ-বিদ্যালয়ের (Summer School) প্রবর্ত্তনের দ্বারা এই ব্যবধান দূরীকৃত হয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কালের বিদ্যা যে সমুদয় স্থানে আলোচিত হইয়া থাকে, সেই সমুদয় স্থানে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কিছুদিন করিয়া থাকিয়া যদি কিছু পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে উভয়দিকেই সুবিধা হয় এবং আমাদের জ্ঞানরাজ্যেও যথার্থ উন্নতি হয়।

প্রাচীন ও নব্যপন্থী শিক্ষার্থীর মিলন

এইবার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সমবেতভাবে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহারা অনেক সময়ে অসতর্ক ভাবে, নানারূপ হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য নির্ভয়ে ও নির্লজ্জভাবে প্রচার করিয়াছেন। অনেকে আমাদের সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞা করিবার জন্যই যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এ সমুদয় কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেক সাধুপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অতীব প্রশংসনীয়।

ইতিহাস-শাখা

এশিয়াটীক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতেই, আমাদের দেশে ইতিহাসের আলোচনা একরূপ চলিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদও এই বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা কিছুদিন হইতে আমাদের সাহিত্যালোচনার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের ইতিহাস

আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইয়া আমাদের এই হতভাগ্য দেশে, ইহারই মধ্যে দলাদলি ও গালাগালির সূত্রপাত হইয়াছে। সত্য নির্দ্ধারণ যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে মতভেদের জন্য মৈত্রীর অসদ্ভাব হইবে কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা বা ধনবান ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষকতা হইতেই, স্থায়ী দলাদলির জন্ম হয়। যেখানে পৃষ্ঠপোষকতার প্রত্যাশা নাই, সেখানে বোধ হয় দলাদলি হয় না।

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকল সময়েই যে একটা মীমাংসা পাওয়া যাইবে, তাহা নহে। মীমাংসার জন্য আলোচনা নহে—আলোচনার জন্যই আলোচনা। মানুষের মধ্যে অনেকগুলি বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিগুলির অনুশীলনের জন্যই মানুষ শাস্ত্রচর্চ্চা করে। মানুষের একটি বৃত্তির নাম—ঐতিহাসিকী বৃত্তি (Historical Sense)। এই বৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক। বর্ত্তমানের যে কোন সমস্যা যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে, এই বৃত্তির যথাযথ প্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু অনুশীলন না করিলে এই বৃত্তির বিকাশও হইবে না এবং আমরা ইহার যথাযথ প্রয়োগও করিতে পারিব না। অতীতের ইতিহাসে, মীমাংসার যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে; তবে এ জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। ইংরাজীতে যাহাকে উন্মুক্ত সমস্যা (বা Open question) বলে, তাহা সকল সময়েই থাকিবে। কাজেই ঐতিহাসিক আলোচনায় ধৈর্য্য ও মত-সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি সত্যনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করা বড়ই অহিতকর—সুতরাং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

বর্ত্তমানকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে বুঝিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা আমাদের জাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপে অগষ্ট কোঁৎ ও হেগেল যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—প্রথমেই সূত্রস্থাপন করিয়া সেই সূত্রানুসারে সত্য সমূহের আলোচনা, যাহাকে অবরোহ-পদ্ধতি বলে, আমরা অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকেরা স্বভাবতঃই সেই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। বর্ত্তমান যুগে কিন্তু আরোহ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। মনীষী মোক্ষমূলর যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি সুষ্ঠুরূপে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা এই আরোহ-পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ। আমাদের দেশের মনীষী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ক্রম-বিকাশের সূত্র-সম্বলিত তুলনামূলক ঐতিহাসিক পদ্ধতির কথা, ইউরোপের বিদ্বৎসমাজে ব্যাখ্যা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন—ইহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার পদ্ধতির ইংরাজী নাম—Historico Comparative method, supplemented by the Theory of Evolution। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহারা মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" পাঠ করিলে দেখিবেন যে, তিনি পূর্ব্বেই এই পদ্ধতির সূত্র স্থাপনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই মূল্যবান। আমার বলিবার কথা এই যে, দেশের লোকের ভিতর যাহাতে ঐতিহাসিকী বৃত্তির যথাযথ অনুশীলন হয়, সে জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বহু কর্ম্মী বহু কার্য্য করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নেতৃত্বে যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গৌরবের কথা। আমাদের বীরভূমের 'বীরভূম বিবরণ' যে দুই খণ্ডে বাহির হইয়াছে, তাহাও অতি প্রশংসার বিষয়। আমরা আশা করি, 'বীরভূম বিবরণে'র অবশিষ্ট অংশগুলি সত্বর বাহির হইবে।

কিছুদিন হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতেছি। এসম্বন্ধে আধুনিক গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে, F. E. Pargiter M. A মহাশয়ের Ancient Historical Tradition নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্র ইহার প্রকাশক। পার্জ্জিটার সাহেব, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন আমাদের বেদ ও পুরাণ আলোচনা করিয়াছেন। অতীত ভারতের ইতিহাস রচনায় বৈদিক ও পৌরাণিক—এই উভয় শ্রেণীর উপকরণের মধ্যে প্রভেদ কি, সে সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে J. F. Blackier প্রণীত The A B C of Indian Art নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় শিল্পকলা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। Lionel D. Barnett সাহেবের Antiquities of India আধুনিক গ্রন্থ, মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা প্রচারিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে ভারতীয় সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে, এই গ্রন্থখানি বিশেষ সাহায্য করিবে। এই সমুদয় গ্রন্থ আমাদের লাইব্রেরীর জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রকার মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহে আমরা দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য করিয়াও অর্থব্যয় করি। কিন্তু এসব বিষয়ের আলোচনা করে কে? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বা কলিকাতার ধনবান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বহু বহু লাইব্রেরীতেও যে সকল প্রাচীন অথচ মূল্যবান মাসিক পত্র নাই, আমরা তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে দুই একজন সাহিত্যিক দূরদেশ হইতে আসিয়া পদধূলি দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। কিন্তু বীরভূম জেলার, এবং এমন কি সদর সিউড়ীর কেহ তাহা জানেন কি না সন্দেহ! আমি বীরভূমের নিন্দা করিতেছি না—দেশের সাধারণ অবস্থাই এইরূপ!

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনেক সভ্য আছেন। কিন্তু সভ্য সংখ্যা দেখিয়া কেহ বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যানুরাগী লোকের সংখ্যার হিসাব করিবেন না। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী যখন যেখানে কর্ম্মসূত্রে বদলী হইয়া যান, সেখান হইতে পরিষদের সভ্য যোগাড় করিয়া দেন। এই প্রকারে অনেকেই সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এই প্রকারে সংগৃহীত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্য-পরিষদকে সাহিত্য 'পারিষদ' বলেন। সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধেও আমরা অনেক কথা শুনিতে পাই। এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, কোন স্থানে সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে জমীদারেরা প্রজাদের উপর কিছু

কিছু 'থাব' আদায় করিয়াছেন! আশা করি ইহা সত্য নহে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের বিস্তার ও সাহিত্যিকগণের জীবনের উন্নতিই, সাহিত্যান্দোলনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই আন্দোলন যেন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন মাত্রে পরিণত না হয়।

কতকগুলি সুদক্ষ সাহিত্যপ্রচারক যদি দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া, নিয়মিতভাবে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে অনেক কার্য্য হইত। সাহিত্য-সম্মেলন প্রভৃতি করিয়া নবদ্বীপপরিক্রমা, ব্রজপরিক্রমা প্রভৃতি গ্রন্থ ছাপাইয়া যে অর্থ হয়, সেই অর্থের দ্বারা এই প্রকারের প্রচার কার্য্য রক্ষা করা অসম্ভব নহে। কয়েক মাস পূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রে সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে আলোচনায় আমি এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমরা মফঃস্বলের লোক, আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, সাহিত্য-রাজ্যে আমাদের প্রকৃত অভাব কি? এবং সেই অভাব কি প্রকারেই বা পূরণ করিতে পারি?

অনেক দিন সাহিত্যের আন্দোলন চলিতেছে। এখন আমাদের বুঝিতে পারা উচিত, কলিকাতার প্রতি চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। যাঁহারা সহৃদয় তাঁহারা সাহায্য করুন—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিব। কিন্তু আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, আমাদের গ্রামের কাজ গ্রাম হইতেই করিতে হইবে। আমরা দরিদ্র; দিন দিন আমাদের দারিদ্র্য বাড়িয়া যাইতেছে। নূতন নূতন ব্যাধি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিতেছে। গ্রাম্য দলাদলিতে আমরা জীর্ণ; দেশের ধন বন্যার স্রোতের ন্যায় রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে—আমরা অসহায় হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া সাহিত্য ও সচ্চিন্তার সাহায্যে আমাদের এই দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বীণাপাণির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, নরনারী সকলেই জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বাণীর মন্দিরে সম্মিলিত হউক।

দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলিতে চাই। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বব্যাপার বুঝিবার অভ্যাস যদি দেশের লোকের না হয়, তাহা

বিজ্ঞান-শাখা

হইলে, কেবল বিজ্ঞানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিলেই কাজ হইবে না। এই কথাগুলি আমি পুনঃ পুনঃ কেন বলিতেছি, তাহার হেতু নির্দ্দেশ আবশ্যক। আমরা সমস্ত ব্যাপার বাহির হইতে দেখিতে শিখিয়াছি। সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইবে, আসুন চাঁদা তুলিয়া কতকগুলি বড় বড় বই ছাপাইয়া ফেলা যাউক। ইহা বহির্মুখী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। যেমন বলা হইল—বিদ্যালয় করা যাউক, অমনি বড় বড় বাড়ি, চেয়ার, টেবল প্রভৃতি সরঞ্জাম আমাদের মানস নেত্রের পুরোভাগে জাগিয়া উঠিল। বিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থা যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই হওয়া উচিত—পড়াইবে কে এবং কি পড়াইবে? অর্থাৎ প্রত্যেক প্রচেষ্টা, মানুষকে মূল করিয়া আরম্ভ করিলে, প্রাণশক্তির সাহায্যে বা আত্মার ভূমিতে কার্য্য করা হয়। ভারতবর্ষের ইহাই নিজস্ব পদ্ধতি।

বিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে একটি কথা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি। আমাদের দেশে কিছুদিন হইতে নূতন নূতন অবতার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং নূতন নূতন ধর্ম্মমণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছে। এই সব ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক অসংখ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। সেই সমুদয় গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা যোগশক্তির দ্বারা এমন সব কার্য্য করিতে পারেন, যাহা সাধারণ লোকে করিতে পারে না—ইহা আমি অস্বীকার করি না। সিনেট (A. P. Sinnet) সাহেব তাঁহার Occult World গ্রন্থে যে সমুদয় সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটি প্রভৃতির যে চেষ্টা ও উদ্যম, তাহারও আমি খুব প্রশংসা করি। কারণ এই সকল ব্যাপার অলৌকিক হইলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার আলোচনা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্প শিক্ষিত লোক কর্ত্তৃক যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘোষিত হইতেছে, এবং ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিক কার্য্যকলাপ প্রচার করিয়া সরল-চিত্ত নরনারীকে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া কতকগুলি চতুর লোকের যে স্বচ্ছন্দে জীবিকার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে কি প্রমাণিত হয়? তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আমাদের দেশে এখনও বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অগষ্ট কোঁৎ মানব সমাজের ক্রমবিকাশে যাহাকে প্রথম স্তর বলিয়াছেন, এবং যাহার নাম দিয়াছেন "অলৌকিকের দোহাই দিবার যুগ," আমাদের দেশে এখনও সেই যুগ চলিতেছে। আমি প্রাণের গভীর বেদনায় এই কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। আমি সংস্কারক নহি—আমি প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দু, কিন্তু আমি মনে করি যে অলৌকিক সত্য হইলেও, অলৌকিকের উপর ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভবও নহে—সঙ্গতও নহে।

ভগবান মানুষকে বিচারণা-শক্তি দিয়াছেন—তাহার যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী নহে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে দৃঢ়ীকৃত করিবে—শিথিল করিবে না। দেশের কি দুরবস্থা, একটি সামান্য ঘটনার দ্বারা বুঝাইতেছি। একজন লোক, একজন কলেরাগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। বই ছাপাইয়া প্রচার করা হইতেছে—অতএব তিনি সাধু, তোমরা পূজা লইয়া তাঁহার মন্দিরে প্রণামী দিয়া যাও—তাঁহার অলস, মূর্খ, অকর্ম্মণ্য ও চরিত্রহীন শিষ্যগণকে, রাজার আদরে খাওয়াইয়া, পরাইয়া তোমাদের পরলোকের সুবিধা করিয়া লও! এই শ্রেণীর বই ছাপাইতে পয়সার অভাব হয় না—পয়সাওয়ালা অনেক লোক, এই শ্রেণীর বহি ছাপাইতে টাকা দিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সুলভে খ্যাতিলাভ করেন। আবার হয় ত দেখিব, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ একদিন, সাহিত্য-সম্মেলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন!

আমার বক্তব্য এই যে, রজার্সের মত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার, যিনি বহু গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া, কলেরা রোগের নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কলেরা আরোগ্য করিবার জন্য,

যদি 'সাধু' বলিয়া কাহারও পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে এই রজার্স সাহেবেরই পূজা হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের চেষ্টায়, নানা রোগে উপদ্রুত মানবের বাসের অযোগ্য সুবিস্তৃত জনপদ, স্বর্গের ন্যায় স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়াছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, পৃথিবীতে এই প্রকারে জয়যুক্ত হইয়াছে ও আজও হইতেছে। কিন্তু এই সব কথা আমাদের দেশে কতটুকু প্রচারিত হয়? কলেজে যাহারা বিজ্ঞান পড়িয়া পাশ করিয়া বাহির হইয়া যায়, চাকুরী না পাইলে তাহারাই, অলৌকিক ঘটনা প্রচার করিয়া অবতার গড়িয়া নূতন ধর্ম্ম-মণ্ডলী খাড়া করে। এই ঘটনা দেশের মধ্যে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। আজও যাহাদের মানসিক অবস্থা এইরূপ, তাহারা বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতে, এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে!

ইংরাজ কবি টেনিসনের "প্রিন্সেস" নামক কাব্যে একটি মেলার বিবরণ আছে। সে একটি গ্রাম্য মেলা। সেখানে বিজ্ঞানের বিজয় মহিমা, নানারূপ দৃশ্যের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ মেলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। আমাদের দেশে গ্রামের লোক ব্যারামে ভুগিতেছে, নিকটে চিকিৎসক আছে, দাতব্য চিকিৎসালয় আছে —কিন্তু ডাক্তারকে দেখাইয়া ঔষধ খাইবে না! কারণ সে বুঝিয়াছে, অদৃষ্টের ফল এড়াইবার উপায় নাই—সে অলস, একেবারে তমোগুণে আচ্ছন্ন, আত্মশক্তির মহিমা কি, সে ভাবিতে পারে না। সেই মানবের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে, বিজ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতে, সহস্র সহস্র নিষ্কাম কর্ম্মীর প্রয়োজন। আমাদের এই সাহিত্য-সম্মেলন হইতে, এই প্রকারের কর্ম্মীর উদ্ভব হউক।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হইবে। যে দেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের উদয় হইয়াছে—যে দেশ হইতে এই দুই চন্দ্রের প্রতিভা-কৌমুদী সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে জাতি বিজ্ঞান-রাজ্যে যে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বোলপুর শান্তিনিকেতনের সুধী শ্রীজগদানন্দ রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি কোনও মৌলিক গবেষণা করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার করিয়া দেশের উপকার করিতেছেন।

সমাপ্তি

আপাততঃ আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আপনারা হয় ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার কথা শুনিয়া, যদি কেহ বলেন—'ছোট মুখে বড় কথা'—তাহা হইলে আমার দুঃখ করিবার কারণ নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, আমার মনে হয়, তাহা অত্যন্ত সাধারণ কথা। কোনও কথায় কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই। যদি নূতন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আপনারা দয়া করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এবং আমার ভ্রান্তি সংশোধিত করিয়া আমায় উপকৃত করিবেন।

কোন কোনও স্থানে, সমালোচনা যদি তীব্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি প্রায় একা,—অথবা, এক আধজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া, ঘরের কোণে বসিয়া, নানারূপ চিন্তা করি। সুতরাং সামাজিক জীবনে, যাঁহারা চলা-ফেরা করেন, তাঁহাদের ন্যায় অসীম সহিষ্ণুতা এবং মার্জ্জিত ভাব আমার হয়ত নাই। আমার উক্তির ভিতর যদি এককণাও সত্য থাকে, দয়া করিয়া তাহাই গ্রহণ করিবেন।

আমরা কেহই চিরদিন থাকিব না। যিনি ছিলেন, তিনিই আছেন, এবং চিরদিন চিরকাল একমাত্র তিনিই থাকিবেন। অতীতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনে, বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তিনিই লীলা করিয়াছেন। আবার, আজ বর্ত্তমানে, যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও জীবনে, চিন্তায়, কল্পনায়, আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় তিনিই, তাঁহার আনন্দের খেলা খেলিতেছেন! আমরাই বা কয়দিন? —কোন্ অজানা অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া যাইব। এই রঙ্গমঞ্চে নব নব অভিনেতা ও অভিনেত্রী আসিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া, আলোকে আঁধারে নব নব খেলা খেলিবে। কিন্তু তাহাদেরও জীবনে যিনি খেলিবেন, তিনিই সেই এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ! তিনিই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানরূপ ও প্রেমরূপ। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত বৈষম্য দূরীভূত করিয়া, আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ সত্ত্বেও, তাঁহার নামে সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণত হই—তাঁহার কৃপায়, আমাদের এই সাহিত্য-সাধনা সফল হউক।*

শ্রীশিবরতন মিত্র।

মাসিক-সাহিত্য

আশীর্ব্বাদ—বৈশাখ ১৩৩০, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, সম্পাদক—শ্রীইন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ। ১০।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, মিশন লাইব্রেরী হইতে শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য।/•

বৈশাখ মাসের 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় 'সর্ব্ব-ধর্ম্ম মিশন' নামক একটি ধর্ম্মান্দোলনের সংবাদ বাহির হইয়াছে, এই মাসিক পত্রখানি সেই মিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত। সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্রহ্মবিদ্যা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত উজানচর নামক গ্রামে বাঙ্গালা ১৩২৬ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "দয়াময়"—এই নাম প্রচার করা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় মতবিরোধ দূর করা, এই মিশনের উদ্দেশ্য। শ্রীমৎ আচার্য্য আনন্দস্বামী এই মতের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ত্রিপুরার

---

* বীরভূমের হেতিয়া গ্রামে সাহিত্যিক-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে (১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৯) সভাপতির অভিভাষণ রূপে পঠিত। ১৩৩০ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" হইতে উদ্ধৃত।

দেওয়ান রামদুলালের পুত্র। বাঙ্গালা ১২৬৯ সালে তাঁহার জন্ম হয়। সর্ব্বধর্ম্ম কি, তাহা তিনি যোগ-প্রণালী, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-গীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শিষ্যের নাম—মনমোহন দত্ত। "মলয়া" নামক সঙ্গীত-গ্রন্থের রচয়িতারূপে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলেই পরিচিত। সর্ব্ব-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহার পর শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র পাল বি, এ, এই কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া, এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশন, সরকারী বিধানে রেজিষ্ট্রি করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য তিনটি—১। সর্ব্ব ধর্ম্মের ভিত্তির উপর বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করা ; ২। প্রচারের দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপনা করা ; ৩। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে মৈত্রী স্থাপিত হয়, সে জন্য চেষ্টা করা'।

আলোচ্য সংখ্যায়, শ্রীমদাচার্য্য আনন্দস্বামী মহোদয়ের 'প্রকৃত তত্ত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। ঈশ্বরবাণী শ্রবণ কি প্রকারে হয়, ঈশ্বরে মনের যোগ হইলে সাধক কি প্রকারে নানারূপ বর্ণ দেখিয়া থাকেন, এই সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়, বৃন্দাবন ভ্রমণের বিবরণ লিখিয়াছেন—তাঁহার নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রত্যেক হিন্দুরই আলোচনা করা আবশ্যক—"গোবিন্দজীর প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে বৃদ্ধ লম্বোদর সেবায়তগণ বড় বড় বাক্স লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা যাত্রিগণের নিকট ভেট আদায় করিতেছেন—যাত্রিগণের অবস্থাভেদে আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। যেখানে দু'পয়সার প্রত্যাশা আছে, সেই স্থানেই অধিক ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। বাস্তবিক সত্য কথা বলিতে কি, প্রায় সকল তীর্থস্থানেই পাণ্ডাগণ অর্থের লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া নিরীহ যাত্রি-গণের গলায় পা দিয়া অর্থ শোষণ করিয়া থাকেন।" উদার ও সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে ভারত-বর্ষের তীর্থস্থানগুলির সংস্কার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। "মৃত্যু, পরলোক ও স্থূলদেহ মুক্ত আত্মার জ্ঞান চৈতন্য"-সম্বন্ধে শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বি, এল্ মহাশয় প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে বলিতেছেন—"অনেকে Theosophical Society নামক ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সমিতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহার প্রচারিত সত্য সকলের প্রতি অবজ্ঞা ও হাস্য পরিহাস করেন ; কিন্তু ঐ সমিতিতে প্রভূত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সংযতচারী বহু সাধু মহাত্মা আছেন। মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তাঁহারা অনেক আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশিত করিয়াছেন।" লেখক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পদাশ্রিত স্বামী চিদানন্দের শিষ্য, ইহা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্ম মিশনের কাগজে লিখিতে-ছেন, এবং থিয়জফিক্যাল্ সোসাইটির সাহিত্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া, তাহার ভিতর যে সত্য রহিয়াছে, তাহাই প্রচার করিতেছেন। ধর্ম্ম সমন্বয়ের জন্য এইরূপ উদারতাই প্রয়োজন। শ্রীনরেন্দ্র কুমার দাস গুপ্ত এম, এ, বি, এল্ লিখিত "মহম্মদ" শীর্ষক একটি অতি সুপাঠ্য প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মিশনের ও এই মাসিক পত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

সঙ্কর্ষণ-প্রসঙ্গ

১। পৌরাণিকের কাল

আমাদের দেশে পুরাণ বলিয়া যে গ্রন্থগুলি পরিচিত, তাহার আলোচনা আরম্ভ করিলে প্রথমেই আমাদের মনে বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার উদয় হয়। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে আমরা সত্য বলিয়া যে সব কথা মানিয়া লইয়াছি, তাহার সহিত পুরাণের কথা একেবারেই মেলে না। প্রথমেই যদি বিরক্তি, বা সন্দেহ হয়, তাহা হইলে আর পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। কাজেই পুরাণের আলোচনা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এখন যে পুরাণের আলোচনা হয়, তাহা পুরাণের মূলের কথাগুলিকে বাদ দিয়াই হইয়া থাকে। পুরাণের যে সব কথা কাব্য-হিসাবে, বা তত্ত্বকথা-হিসাবে, আমাদের একালের ধারণা ও রুচির অনুকূল আমরা আজকাল পুরাণের সেই অংশগুলিরই আলোচনা করি, ইহা মন্দের ভাল, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত পুরাণ-আলোচনা বলিতে পারি না।

পুরাণের মতে এখন ব্রহ্মার পরমায়ুর একান্ন বৎসরের প্রথম মাসের প্রথমদিন চলিতেছে। ব্রহ্মার একমাসের যে ত্রিশটি দিন, তাহাদের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। শুক্লপক্ষের প্রথম দিনের নাম শ্বেতবরাহ, আর দিনের নাম কল্প। অতএব এখন ব্রহ্মার পরমায়ুর একান্ন বৎসরের, প্রথম মাসের প্রথম দিন বা শ্বেতবরাহ কল্প চলিতেছে। ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর। বর্ত্তমান দিনের ছয়মনু চলিয়া গিয়াছেন। এখন সপ্তম মনুর অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর শাসনকাল। প্রত্যেক মনুর শাসনকালে অর্থাৎ মন্বন্তরে একাত্তর চতুর্যুগ অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ পর পর কিঞ্চিদধিক একাত্তর বার আসিয়া থাকে। এখন ব্রহ্মার পরমায়ুর দ্বিতীয় পরার্দ্ধের (৫০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রথম পরার্দ্ধ, তাহার পর ৫০ বৎসর দ্বিতীয় পরার্দ্ধ) প্রথম কল্পের অর্থাৎ শ্বেতবরাহ কল্পের সপ্তম মনু বৈবস্বতের শাসনকাল। এই মনুর শাসনকালে একাত্তর চতুর্যুগের সাতাইশটি

চতুর্যুগ চলিয়া গিয়াছে এখন অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে। এই কলির ৫০২৪ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কল্পের ১৯৭২৯৪৯০২৪ বৎসর হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী সৃষ্টির পর ১৯৫৫৮৮৫০২৪ বৎসর গত হইয়াছে। পৌরাণিকের এই কাল পরিমাণ পঞ্জিকাতেও বৎসর বৎসর লিখিত হইতেছে। এই কালের কথা শুনিলেই আমাদের হাসি পায় এবং মনে হয় ইহা একেবারে কল্পনা, ইহার মধ্যে কোনই সত্য নাই।

কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসী, বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি যে আমরা অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আমরা এইরূপ শিখিয়াছি যে বর্ত্তমান ইউরোপ আধুনিক বিজ্ঞানের নামে আমাদিগকে যাহা শিখাইতেছে, তাহাই একমাত্র সত্য; তাহার উপর আর কাহারও কিছু বলিবার নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যে দোষ তাহা নহে, আমাদের শিক্ষারই দোষ। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রতিদিন বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। সে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত বিস্ময়াবহ। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাস আমরা জানিতে চেষ্টা করি না। একটা মত বা সিদ্ধান্ত, যাহা পরের মুখে শুনিয়া শিখিয়া রাখিয়াছি—তাহাই ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া এক নূতন প্রকারের চিন্তা-তরঙ্গ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আধুনিক চিন্তাপদ্ধতির সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এই চিন্তার কয়েকটি সূত্র আমরা নির্দ্ধারণ করিতেছি। খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল খৃষ্টানেরা সাধারণতঃ যেভাবে বুঝে তাহা ঠিক্ নহে। কিন্তু আমরা সে কথা বলিলে উহারা শুনিবে কেন? প্রচলিত খৃষ্টান মত এই যে ছয় হাজার বৎসর হইল মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে পাগলের প্রলাপ মাত্র, তাহা সামান্য বিজ্ঞান-পড়া লোকেও জোর করিয়া বলিতে পারে। ইউরোপের সাধারণ অতিদাম্ভিক পণ্ডিতেরা বলিতে চাহেন যে মানবজাতির যত কিছু জ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতি এই ছয়হাজার বৎসরের মধ্যেই হইয়াছে। কিন্তু ইহাও একেবারে অসম্ভব। পূর্ব্বকালে কত বড় বড় জাতি আসিয়াছে, কত বড় বড় মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমশঃ পাইতেছেন। ক্রমশঃ জানিতে পারা গিয়াছে, এমন অনেক তত্ত্বকথা ও জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত অতি প্রাচীনকালের মানুষেরা জানিতেন, যাহা এখনকার দিনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় পণ্ডিতেরও ধারণার অতীত। প্রাচীনকালের অনেক শাস্ত্র, বিদ্যা ও সাধনপথ, সরাইয়া রাখা হইয়াছে।

সে সব বিদ্যা লুপ্ত হয় নাই, গোপনে রহিয়াছে, মানবজাতি উপযুক্ত হইলে তাহা আবার দেওয়া হইবে। এই সব কথার প্রমাণ আমরা ক্রমে ক্রমে উপস্থাপিত করিব। এখন আমাদের বলিবার কথা এই যে, পৌরাণিকদের এই কালবিভাগ শুনিয়া বিচলিত হইবেন না। ইহা যুক্তিসঙ্গত ও সত্য—এবং ইহা বুঝিতে পারিলে জ্ঞানরাজ্যের নূতন দ্বার খুলিয়া যাইবে। তবে হঠাৎ একদিনে এক কথায় যদি ইহা বুঝিয়া লইতে চাই, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কোন আশা নাই।

বর্ত্তমান যুগে বহু আলোচনা ও অনুসন্ধানের পর একদল সাধুপুরুষ বলিতেছেন, প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে অধ্যাত্মবিদ্যা, বেদবিদ্যা বা যোগবিদ্যা প্রচলিত ছিল, এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় অধিকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা যাহা অনুশীলিত হইত, সেই বিদ্যায়, বহু বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, মানুষ কি ছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থাই বা কি এবং এই মানুষের বা আমাদের, ভবিষ্যতই বা কি, এই সমুদয় প্রশ্নের চরম মীমাংসা ছিল। মানুষের উৎপত্তি, তাহার জীবনের আবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ, জন্মান্তর, এবং পূর্ণ পরিণতি বা মুক্তি, এই সকলেরও সঠিক মীমাংসা ছিল।

Esoteric philosophy solved ages ago, the problem of what man was, is, and will be, his origin, life-cycle—interminable in its duration of successive incarnations or rebirths—and his final absorption into the source from which he started.

এই যে বিদ্যা, ইহা সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট ভাষায় যদি আমাদিগকে দেওয়া হয় তাহা হইলে আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। পক্ষান্তরে সামান্য একটু লইয়া জগতে অনর্থ উৎপাদন করিব। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রকারের অনর্থের অভিনয় অনেকবার হইয়া গিয়াছে—আমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের পুরাণ আলোচনা করিলে আমরা তাহার পরিচয় পাইব। কাজেই একদিকে প্রাচীন বিদ্যা যেমন অনেক সরাইয়া গোপনে রাখা হইয়াছে, তেমনি অনেক কথা ইঙ্গিতে, আভাসে, আংশিকরূপে ও কৌশলে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা সাধনশীল, যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া সত্য পাইতে ইচ্ছুক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা এই সব বর্ণনার ভিতরের অর্থ বুঝিতে পারেন। যাহারা বহিরঙ্গ, তাহারা পারে না। পুরাণ-সমূহের মধ্যে এই সব শিক্ষা বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে।

এইবার কল্প, মন্বন্তর ও যুগবিভাগ সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিতেছি। বিলাতের একজন খুব বড় চিন্তাশীল লোক বহুদিন পূর্ব্বে প্রাচীনজগতের পুরাণশাস্ত্রের এই কাল-বিভাগ আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রাচীন জগতের মানবগণের নিকট "Time, cyclical time, was their abstraction of the Deity, Coleridge. কালের এই আবর্ত্তন ও বিভাগের দ্বারাই অনন্ত পরমেশ্বরের লীলা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রকারের কাল-বিভাগ, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং কতকাল ধরিয়া যে প্রচলিত ছিল, তাহা একালের কোন প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ বলিতে পারে না। পুরাণের সহিত জ্যোতিষের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) নহে, গণিত জ্যোতিষের সহিত ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) এক সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে পুরাণের অনেক কথা বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু সে বড় কঠিন কথা।

যাহা হউক আমরা যদি অধীর ও শ্রদ্ধাহীন না হই, এই কঠিন কথাও ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিব।

২। পৌরাণিকের দেশ

পৌরাণিকের দ্বিতীয় কথা যাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাহা দ্বীপ ও বর্ষের কথা। প্রত্যেক পুরাণেই এই কথা বলা হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তিনিই প্রথম রাজা, তিনি দেখিলেন সূর্য্যদেবের কিরণে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ আলোকিত হয়, অপর অর্দ্ধাংশ অন্ধকারময় হইয়া থাকে। তিনি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আমি আমার নিজের তেজের দ্বারা রাত্রিকেও দিন করিব। এই বলিয়া তিনি এক উজ্জ্বল রথে চড়িলেন, আর সূর্য্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাতবার ভ্রমণ করিলেন। প্রিয়ব্রতের এই কার্য্য দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আসিলেন ও তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন 'বৎস তুমি তোমার অধিকারের বহির্ভূত কার্য্য করিতেছ।' ব্রহ্মার কথায় প্রিয়ব্রত নিরস্ত হইলেন। মহারাজা প্রিয়ব্রতের রথচক্রের অগ্রভাগের দ্বারা সাতটি গর্ত্ত হইয়াছিল, এই সপ্তখাতই সাত সমুদ্র। আর এই সাত সমুদ্রের ভিতরে সপ্তদ্বীপ। সকলের মধ্যস্থলে জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের চারিদিকে লবণ-সমুদ্র। তাহার পর প্লক্ষদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপের

চারিদিকে ইক্ষুরস-সমুদ্র। তাহার পর শাল্মলীদ্বীপ, সুরাসমুদ্র, কুশদ্বীপ, ঘৃতসমুদ্র, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, দধিসমুদ্র, শাকদ্বীপ, দুগ্ধসমুদ্র, পুষ্করদ্বীপ, শুদ্ধজলসমুদ্র। এই গেল সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র। পুরাণে এই সমুদয় দ্বীপের বিভাগ-সমূহের বর্ণনা আছে। তাহা ছাড়া ভগবান্ কোন্ দ্বীপে কোন্ মূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া থাকেন তাহারও বিবরণ আছে। পুষ্করদ্বীপে কমলাসন মূর্ত্তি, শাকদ্বীপে বায়ু, ক্রৌঞ্চদ্বীপে জল, কুশদ্বীপে অগ্নি, শাল্মলীদ্বীপে সোম, প্লক্ষদ্বীপে সূর্য্যরূপে ভগবান্ আরাধিত হইয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষ। ইহাদের এক এক বর্ষে উপাস্যদেব এক এক রূপ। ইলাবৃত বর্ষে সঙ্কর্ষণ, ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়গ্রীব, হরিবর্ষে নৃসিংহ, কেতুমালবর্ষে কামদেব, রম্যক্‌বর্ষে মৎস্য, হিরণ্ময়বর্ষে কূর্ম্ম, উত্তর-কুরুবর্ষে যজ্ঞপুরুষ বরাহ, কিম্পুরুষবর্ষে রামচন্দ্র, আর ভারতবর্ষে নর-নারায়ণ। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মত। বিষ্ণুপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের সহিত এই বর্ণনার নামের কিছু কিছু প্রভেদ আছে। কিন্তু এই সামান্য মতভেদ তেমন গুরুতর কিছু নহে। পৌরাণিকের এই দেশ-সম্বন্ধীয় মূল কথাটি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মনে রাখিয়া ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে। 'মন্বন্তর-কথা' নামক গ্রন্থে আমরা বলিয়াছি—"এই সপ্তদ্বীপকে কেবল দেশের মধ্যে দেখিবেন না। দেশ ও কাল এক করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন।"

সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র প্রভৃতি বিভাগের কথা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ত্রেতাযুগে প্রিয়ব্রত রাজা হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণে কথিত হইয়াছে। সে প্রায় দুই শত কোটি বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন এই ভূপৃষ্ঠের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ হিসাব করিবেন। সে সময়ে ভূপৃষ্ঠের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাতে কি প্রকারের প্রাণীর বাস সম্ভব ছিল তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ হিসাব করিবেন। এখন যে প্রকারের মানুষ দেখিতেছি, এই প্রকারের মানুষ কতদিন ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছে। এই সমুদয় ব্যাপার আমাদের আলোচনা করা দরকার। এই সব সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলে আমরা বিশ্বের অনেক রহস্য জানিতে পারিব। কিন্তু এই সব বিজ্ঞান জড়বস্তুকে মূল ধরিয়া জড়ের সাহায্যে তত্ত্বের আলোচনা করে। এখন দেখিতে হইবে চৈতন্যের দিক্ হইতে চৈতন্যের সাহায্যে তত্ত্বের আলোচনা করিতে পারা যায় কি না। এই সব প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হওয়া উচিত।

ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ ও বর্ষে ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে পূজা করা হয় বা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি সর্ব্বশেষে জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে নর-নারায়ণের উপাসনা। বর্ত্তমান সময়ে কোনও পরিণত ধর্ম্মমতের আলোচনা করিতে হইলে আমরা তাহার ক্রমবিকাশ আলোচনা করি। ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষের দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন মতের মিলনের দ্বারা, এবং মানবের হৃদয়-বৃত্তি ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের, প্রত্যেক চিন্তার, প্রত্যেক সংস্কার ও বিশ্বাসের ইতিহাস আছে। ভাগবতধর্ম্ম ভারতবর্ষের নরনারায়ণ উপাসনা, ইহার প্রকৃত ইতিহাস বা উৎপত্তি জানিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের ও বর্ষের বিবরণ আবশ্যক। সুতরাং সে দিক্‌ হইতেও এই সব তত্ত্বের আলোচনা করা উচিত।

৩। পুরাণ ও বিজ্ঞান

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই বদ্‌লাইতেছে। এখন যেখানে অতি উচ্চ পর্ব্বতমালা, একদিন সেখানে বিশাল সমুদ্র ছিল। আজ যেখানে মরুভূমি পূর্ব্বে সেখানে রমণীয় নগর ছিল। অতিরিক্ত শীতল বলিয়া এখন যে সব স্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য বলিলেও হয় পূর্ব্বে সেই সব স্থান, এত শীতল ছিল না, নাতিশীতোষ্ণ ছিল এবং সুসভ্য নরনারী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সেখানে পরমানন্দে বসবাস করিত, এই সব কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। এখন যেখানে মিশর দেশ ও মরুভূমি, পূর্ব্বে সেখানে সমুদ্র ছিল, একথা হেরোদোতাস্‌, স্ট্র্যাবো, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকেরা প্রাচীনতর কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে এই সব কথা লোকে উপন্যাস বলিয়া মনে করিত। এখন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন। এখন যে দেশের নাম আবিসিনিয়া, পূর্ব্বে উহা একটি দ্বীপ ছিল—একদল মানুষ উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চল হইতে তাহাদের দেবতা-সহ এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিল। মাদাগাস্কার দ্বীপ হইতে লঙ্কা ও সুমাত্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল মহাদেশ ছিল। বর্ত্তমান আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থান এই লুপ্ত ও বিস্তৃত মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। অপর দিকে এই মহাদেশ ভারত মহাসাগর হইতে অষ্ট্রেলিয়া-পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের জলে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। কয়েকটি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া এখন সমুদ্র-মধ্যে দ্বীপ হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রকারের বহু বহু পরিবর্ত্তনের কথা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা প্রাচীন যুগের যে সব সময় নির্দ্ধারণ করেন, তাহা এতই পরিবর্ত্তনশীল যে সমুদয়গুলি পড়িলে হাসি পায় এবং আমরা যখন তাহাদের মত অবনত-মস্তকে মানিয়া লই তখন দুঃখও পায়। সার্ উইলিয়ম্ টমসন্ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে একজন নামজাদা বড়লোক, ভূতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কালনির্ণয় ব্যাপারে তিনি দ্বাদশবার মত বদ্‌লাইয়াছেন। এই সব পণ্ডিতদিগের আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাকে মায়োসিন্ যুগ (Miocene age) বলেন, সেই যুগে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড ও স্পিটস্‌বার্গেন দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ছিল। Had an almost tropical climate. হোমারের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গ্রীক্‌দিগের মধ্যে কিম্বদন্তী ছিল—হে চিরসূর্য্যালোকে আলোকিত এক দেশ (Land of the Eternal sun) ছিল। তাঁহাদের দেবতা এপোলো (Apollo) প্রত্যেক বৎসর সেখানে একবার করিয়া যাইতেন।

এই সমুদয় বিষয়ের সুবিস্তৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা সংশয়ী, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের সামান্যমাত্র আলোক পাইয়া যাঁহারা প্রাচীন জগতের পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা করুণার পাত্র। তাঁহাদের হিতসাধনের জন্য এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক।

পৌরাণিকগণ যে দ্বীপ ও বর্ষের কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি পূর্ব্ব কালের ভূপৃষ্ঠের আলোচনা করিয়াই করিয়াছিলেন, এইরূপ অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দেবতার ঔরসে বানরের জন্ম সত্য সত্যই হইয়াছিল, কিন্তু সে বহুকালের কথা, পুরাণে সে কথা পাওয়া যায়। একালের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা এখনও স্বীকার করেন না, কিন্তু ক্রমশঃ যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যে দৃষ্টিতে আমরা জগৎ ও জীবন পর্য্যালোচনা করি, সে দৃষ্টিই ক্রমশঃ বদ্‌লাইয়া যাইবে। মানুষের ভাষাও বদ্‌লাইয়া যাইবে। সুতরাং ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। পুরাণের কথা বুঝিবার প্রণালী বা কৌশল আছে। নিরুক্তকার যাস্ক তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সাধনা-ব্যতীত সে কৌশল জানিবার উপায় নাই। অতএব অতীতের প্রতি যে অশ্রদ্ধার ভাব আমাদের জাগিয়া উঠিয়াছে, ব্যস্তভাবে পুরাণাদি শাস্ত্র-সম্বন্ধে যাহা হউক একটা মন্তব্য প্রকাশ করিবার যে অভ্যাস আমাদের জন্মিয়া গিয়াছে,

তাহা দূরীভূত হউক। শ্রদ্ধার সহিত পরিশ্রম করিয়া এই সব পবিত্র ও পূজনীয় বিষয় আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠুক।

৪। আলোচনার ভ্রান্তপথ

যাহা ভাল করিয়া জানা নাই, এবং যাহা ঠিক্ মত জানিবার কোন উপায়ও নাই, যাহা অস্পষ্ট ও সুদূরবর্ত্তী, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার সাহায্যে সুস্পষ্ট ও সুজ্ঞাত যে বর্ত্তমান, তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার যে চেষ্টা তাহার মত বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে অস্বাভাবিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে সর্ব্বত্রই এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণ—হিন্দুদের ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। বেদ যখন এই ধর্ম্মের মূল, তখন আমরা বেদ লইয়া বসিয়া গেলাম। বেদ বহুকালের জিনিস, সমগ্র বেদ পাওয়া যায় না, বা পাওয়া যায় নাই, যাহা পাওয়া যায়, তাহারও অর্থ লইয়া বিষম মতভেদ, কিন্তু তথাপি আমরা সেই বেদ হইতে আরম্ভ করিলাম, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে, আমরা প্রথমে বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহার তর্জ্জমা লইয়া আরম্ভ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সেই সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান লইলাম। তাহার পর পুরাণে আসিলাম, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের রচনার কাল নির্ণয় করিলাম এবং যে খানিকে প্রাচীনতম মনে করিলাম, তাহাকে মূল ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ করিলাম। এই পদ্ধতিই এখনকার পণ্ডিত-মহলের প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতি অস্বাভাবিক ও ভ্রান্ত, সুতরাং সর্ব্বনাশ-কর।

যাঁহারা মনে করেন বর্ত্তমানে যাহা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কোন মূল্য নাই, ক্রমে ক্রমে তাহা ধ্বংশ হইয়া যাইবে; তাহাকে কেবল জানা দরকার, জানিয়া আয়ত্ত করা দরকার, তাহারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। কিন্তু এই বর্ত্তমানকে যাহারা আদরের বস্তু, ও জীবনে গ্রহণ করিবার বস্তু বলিয়া মনে করে, তাহাদের আলোচনা করিবার পদ্ধতি অন্যরূপ। তাহারা সর্ব্বপ্রথম এই বর্ত্তমানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবে, এবং এই বর্ত্তমানকে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমানকে বুঝিতে গেলে অতীতের আলোচনা প্রয়োজন, বর্ত্তমানের ভিতর অতীত রহিয়াছে। বর্ত্তমানকে বুঝিয়া ও উত্তমরূপে ধরিয়া অতীতের অভিমুখী হইতে হইবে। এই প্রকারে চেষ্টা করিলে হয়ত শীঘ্র প্রাথমিক

অবস্থায় যাওয়া যাইবে না, বা মূল কথা বুঝিতে পারা যাইবে না, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি ?

উদাহরণ, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, এই ভারতবর্ষে একটি অপ্রচলিত পুরাতন জিনিস নহেন। ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি পুরাতন জিনিস, সত্য, কিন্তু কৃষ্ণ তো কেবলমাত্র একজন ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন। সহস্র সহস্র ভক্তের ও ভাবুকের হৃদয়াবেগ আশ্রয় করিয়া, তিনি আজও নানারূপে নানাসম্প্রদায়ে সম্পূজিত হইতেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমরা, বর্ত্তমান সময়ে যে আকারে কৃষ্ণ-উপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে অতি উত্তমরূপে তাহার সংবাদ লইব। এই সংবাদ লইতে গেলে আমরা যে উপকরণ সমূহ পাইব, সেই উপকরণগুলিকে ঠিক্‌মত বুঝিতে চেষ্টা করিব। সেই উপকরণগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিলে আপনা হইতেই আমাদিগকে প্রাচীনতর উপকরণের সন্ধান লইতে হইবে। এই প্রাচীনতর উপকরণগুলি আপনা হইতেই আসিবে। এই প্রকারে আলোচনা করাই সঙ্গত।

আমরা বর্ত্তমানপ্রসঙ্গে সেই পদ্ধতিই বিশেষরূপে অবলম্বন করিতে চাই। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আজও তাঁহার উপাসনা চলিতেছে। উপাসকেরা বলিতেছেন, আজ যিনি নিত্যানন্দ, তিনিই সঙ্কর্ষণ, তিনিই অনন্ত, তিনিই বলরাম। এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে প্রমাণ বচন সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্থানগুলির সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করিব, এই আলোচনা করিতে করিতে যদি স্বভাবতঃ অন্য প্রাচীনতর কোন মতের বা প্রমাণের আলোচনা করিতে হয়, তাহাও করা যাইবে। আমরা কোনও তত্ত্বের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি প্রভৃতি জানিবার জন্য যেন ব্যস্ত না হই, তবে ধীরভাবে আলোচনা করিতে করিতে চরম তত্ত্ব যদি আসিয়া উপস্থিত হয়—আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানকে গ্রহণ করিয়া এই প্রণালীতে আলোচনা করাই আমাদের উচিত। যাঁহারা বৈদেশিক, তাঁহাদের জন্য এই প্রণালী নহে। কারণ, তাঁহারা আমাদের কোন একটা জিনিস জানিতে চাহেন কেন, এবং তাহা লইয়া আলোচনাই বা করেন কেন ?

তাঁহাদের উদ্দেশ্য, জিনিসটার উদ্ভব ও বিকাশ বুঝিয়া লওয়া। একটি জিনিস বুঝিলে, সেই জিনিসটা যাহাদের তাহাদেরও বোঝা যায়। কতকগুলি মানুষকে বা কোন সমাজকে ঠিক্ মত বুঝিতে পারা শাসকগণের জন্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দ্বারা চালিত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতে চাহেন, জানিয়া শেষ করিতে চাহেন, জানিয়া শেষ করিয়া জিনিসটি যাহাদের তাহাদের বাহিরের ও ভিতরের জীবন আয়ত্ত করিতে চাহেন। কিন্তু আমরা আমাদের জিনিস জানিতে চাই কেন? কেবল জানা নহে, জানিয়া শেষ করাও নহে। আমরা জানিতে চাই, জীবনের সাধনার দ্বারা তাহাকে যথার্থরূপে গ্রহণ করিবার জন্য। যথার্থরূপে গ্রহণ করিয়া আমরাও সজ্ঞানভাবে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাই, এবং সেই তত্ত্বের যাহা স্বাভাবিক, সঙ্গত ও আত্মপ্রকৃতিগত বিকাশ, সেই বিকাশের অভিমুখে সেই তত্ত্বটিকে লইয়া যাইতে চাই। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। যাঁহারা বৈদেশিক, অথচ আমাদের ধর্ম্ম, আচার, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি জানিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য সকলেই এক প্রকারের লোক নহেন, তাঁহাদের মধ্যে নানাপ্রকারের লোক আছেন। একেবারে কোনরূপ পূর্ব্ব-সংস্কার নাই—আমরা যাহাকে 'অঘ' বলি, পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন্ যাহাকে Idola বলেন, একেবারে তাহা নাই—এ প্রকারের লোক যখন কোনও বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তখন অবশ্য কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। এই প্রকারের সাধকের নিকট সত্য আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন। কিন্তু ইহা যে অতি সুদুর্ল্লভ। অধিকাংশ লোকই কতকগুলি বদ্ধ-সংস্কার লইয়া বিদেশের প্রাচীন জিনিসের আলোচনা করেন। তাঁহারা আলোচনা করেন কেন, পূর্ব্বে বলিলাম—কথাটা ইংরাজীতে বলিলে কাহারও কাহারও বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে—They want to know it and master it by knowledge. কিন্তু আমরা জানিতে চাই কেন, We want to know it, so that we may properly live it and so to live it that it that it may grow. কতদূর তফাৎ ভাবিয়া দেখা উচিত।

৫। ইলাবৃত বর্ষ

এই ভূমণ্ডল একটি প্রকাণ্ড পদ্মের ন্যায়। সপ্তদ্বীপ তাহার কোষ। ঐ কোষের অভ্যন্তরে জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ, এই নয়টি বর্ষের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ একটি। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে এই বর্ষগুলির বিবরণ আছে। এই বিবরণ সমূহের মধ্যে ইলাবৃত-বর্ষের বিবরণ প্রয়োজন, কারণ এই ইলাবৃতবর্ষেই আমরা সঙ্কর্ষণ দেবের আরাধনার পরিচয় পাই। সমুদয় বর্ষের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ সকলের ভিতরে—শ্রীমদ্ভাগবত ইহাকে অভ্যন্তর-বর্ষ বলিয়াছেন। এই স্থানে সুমেরু পর্ব্বত বিরাজিত। আটটি কুলপর্ব্বত আছে. সুমেরু তাহাদের রাজা, আর এই সুমেরু পর্ব্বত সুবর্ণময়। এই সুমেরুপর্ব্বত ভূমণ্ডলরূপ সুবৃহৎ পদ্মের কর্ণিকার স্বরূপ। সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটি অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে। চারিটি পর্ব্বতে চারিটি অতি বৃহৎ বৃক্ষ—আম্র, জম্বু, কদম্ব ও বট। বৃক্ষ চারিটির নিকটে চারিটি হ্রদ—দুগ্ধজল, মধুজল, ইক্ষুরসজল, ও শুদ্ধজল। উপদেবগণ এই জল সেবন করিয়া যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। চারিটি উপবন—নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক, সর্ব্বতোভদ্র। ঐ উদ্যানে দেবরমণীগণ পতিসহ বিহার করেন—আর গন্ধর্ব্বগণ তাহাদের গুণগান করেন। মন্দর পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে অরুণোদা নাম্নী নদী বাহির হইয়া ইলাবৃত-বর্ষকে প্লাবিত করিতেছে। মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে দেবচূত নামে এক বৃক্ষ আছে—উহার ফল অতিশয় সুগন্ধি এবং উহার রস অরুণ বর্ণ—অরুণোদা নদীতে ঐ মধুর রস সর্ব্বদা বহিয়া যাইতেছে—ভবানীর সেবিকা যক্ষনারীগণ ঐ রস সেবন করে, তাহার ফলে তাহাদের অঙ্গের সৌরভ অতিশয় অপূর্ব্ব। পূর্ব্বে যে জম্বুবৃক্ষের কথা বলা হইল, তাহার ফলের রসে জম্বুনদের উৎপত্তি। ঐ নদের উভয় তীরের মৃত্তিকা ঐ রসে পরিপূর্ণ, ঐ রসের সহিত বায়ু ও সূর্য্যকিরণ সংযুক্ত হইয়া জম্বুনদ-স্বর্ণ নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণ উৎপাদন করে। দেবতাদের আভরণ এই স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে দুইটি দুইটি করিয়া আটটি পর্ব্বত। পূর্ব্বে জঠর ও দেবকূট, পশ্চিমে পবন ও পারিপাত্র, দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর, উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর। সুমেরু পর্ব্বতের মাথার উপর ব্রহ্মার পুরী। ঐ পুরীর আটদিকে ইন্দ্রাদি অষ্ট-দিক্‌পালের পুরী।

ভগবান্ বিষ্ণু যখন বামন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিরাজের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ চরণের দ্বারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ অধিকার করিয়া তিনি যখন উপরের দিকে বামপদ তুলিতেছিলেন, তখন সেই বামপদের অঙ্গুষ্ঠনখে অণ্ডকটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়, ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া ভগবানের শ্রীপদবিহারিণী গঙ্গার একটি বাহিরের ধারা উপরিস্থিত অণ্ডকটাহের ভিতরে প্রবেশ করে। ঐ ধারাই স্বর্গের মস্তক হইতে ক্রমশঃ ভূতলে পতিত হইয়াছে। স্বর্গের শিরোদেশের নাম বিষ্ণুর পরমপদ। গঙ্গা ঐ স্থানে ধ্রুব ও সপ্তর্ষিগণ-কর্তৃক সেবিতা হইয়া আকাশমার্গ দ্বারা অবতরণ পূর্ব্বক, চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মসদনে পতিত হইয়াছেন এই স্থানে গঙ্গা চারিটি ধারায় বিভক্ত হইয়াছেন। সীতা, অলকনন্দা বংক্ষু ও ভদ্রা। নয়টি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র। অন্য আটটি বর্ষ ভৌম স্বর্গ। দিব্য, ভৌম ও বিল, এই তিন প্রকারের স্বর্গ আছে।

ইলাবৃত বর্ষে ভগবান্ ভবই একমাত্র পুরুষ, তথায় আর কোন পুরুষ নাই। ভবানীর এক অভিশাপ আছে, কোন পুরুষ সেখানে প্রবেশ করিলে সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হয়। ইলাবৃত বর্ষে ভগবান্ ভবকে ভবানী দেবী অর্ব্বুদ-সংখ্যক নারী লইয়া সর্ব্বদা সেবা করেন।

৬। সঙ্কর্ষণদেবের স্তব

"ভগবতশ্চতুর্মূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞা-মাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্য এতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি।"

ভগবান্ চতুর্মূর্ত্তিধারী মহাপুরুষের চতুর্থী বা ত্রিগুণাতীতা শুদ্ধ চিন্ময়ী তামসী (বা তমঃকার্য্যভূত সংহারের প্রবর্ত্তয়িত্রী) মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি তাঁহার নিজের স্বরূপ, (প্রতিমা-রূপ নহে), সেই মূর্ত্তিকে ভগবান্ ভব নিজের ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন।

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি।

আপনি স্বরূপে অব্যক্ত ও অপ্রমেয়, অথচ সকল গুণের প্রকাশ তাঁহা হইতে হইয়া থাকে। সেই ভগবান্, অনন্ত মহাপুরুষ, তাঁহাকে প্রণাম।

তাহার পর আটটি শ্লোকে সঙ্কর্ষণদেবের স্তব, আমার সেই শ্লোক ও তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ দিলাম।

ভজে ভজেন্যারণ পাদপঙ্কজং ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণং।
ভক্তেষ্বলং ভাবিত ভূতভাবনং ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরং ॥ ১

ভজনা করি, হে ভজেণ্য, অরণ (শরণ) পদপঙ্কজ তোমার। সর্ব্ব ঐশ্বর্যের পরম আশ্রয় তুমি। ভক্ত-সমূহের কল্যাণের জন্য তুমি তোমার ভূতভাবন স্বরূপ প্রকটিত কর। তুমি ভক্তজনের সংসার হরণ কর, অভক্তের সংসার ঘটাইয়া দাও।

ন যস্য মায়া-গুণচিত্তবৃত্তিভির্নিরীক্ষতোহ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে।
ঈশে যথা নোজিত মন্যুরংহসাং কস্তং ন মন্যেত জিগিষুরাত্মনঃ ॥ ২

নিরীক্ষণ করিতেছেন, অথচ মায়ার গুণ যে বিষয় ও চিত্তবৃত্তিসমূহ, তাহাদের দ্বারা অনুমাত্রও লিপ্ত নহেন। আমরা অজিত-ক্রোধ-বেগ, সেই কারণেই আমরা লিপ্ত; আর আপনি ঈশ। আত্মজয়েচ্ছু ব্যক্তি কে না তাঁহার আদর করিবে?

অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া ক্ষীবেব মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ।
ন নাগবধ্বোর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ ॥৩

যাহাদের দৃষ্টি অসৎ, তাহাদের নিকট যিনি নিজের মায়ার দ্বারা মত্তবৎ ভয়ঙ্কর, মধু ও আসবের দ্বারা তাম্রলোচন বলিয়া প্রতিভাত। নাগবধূ-বিমোহনের জন্য এই প্রতিভান সঙ্গত। নাগবধূগণ চরণার্চ্চন করিবার সময় চরণ-স্পর্শ করিয়া মোহিত-চিত্ত হইয়া পড়েন —কাজেই লজ্জায় আর হস্ত প্রভৃতির সেবা করিতে পারেন না। তাঁহার সমাদর কে না করিবে?

যমাহুরস্য স্থিতিজন্ম সংযমং ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব কচ স্থিতং ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু ॥৪

ঋষিগণ তাঁহাকে এই বিশ্বের স্থিতি, জন্ম, ও সংযমের হেতু বলেন,—কিন্তু তিনি সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় রহিত। তিনি অনন্ত, তাঁহার সহস্র মস্তকরূপ ধামের এক প্রদেশে সর্ষপ-প্রমাণ ভূমণ্ডল, তিনি তাঁহার সংবাদও রাখেন না।

যস্যাদ্য আসীৎ গুণবিগ্রহো মহান্ বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল।
যৎ সম্ভবোহহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥৫

মহৎ যাঁহার আত্ম গুণ-বিগ্রহ,—বিজ্ঞান বা সত্ব তাঁহার আশ্রয়, তিনি চিত্তরূপ—সত্ব-প্রধান —অতএব বাসুদেব। ভগবান ব্রহ্মা তাঁহা হইতে উদ্ভূত। তাঁহা হইতেই আমি রুদ্র, ত্রিগুণময় স্বতেজের দ্বারা বৈকারিক দেবতাবর্গ, তামস ভূতবর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সৃজন করি।

এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ, স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ।
মহানহং বৈকৃত তামসেন্দ্রিয়াঃ সৃজাম সর্ব্বে যদনুগ্রহাদিদং॥
যন্নির্ম্মিতাং কর্হ্যপি কর্ম্মপর্ব্বণীং মায়াং জনোঽয়ং গুণ সঙ্গ মোহিতঃ।
ন বেদ নিস্তারণ যোগমঞ্জসা তস্মৈ নমস্তেবিলয়োদয়াত্মনে॥৭।৮

যাঁহার অনুগ্রহে মহদাদি আমরা সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করি, তাঁহার মায়া আমাদের ন্যায় গুণ-সঙ্গ-মোহিত জন কেবল জানিতে পারে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় জানিতে পারে না। তাঁহার মায়া কর্ম্মরূপ গ্রন্থির প্রাপক, তাঁহার স্বরূপ হইতে বিশ্ব প্রকাশিত ও তাঁহাতেই বিলীন, সেই ভগবান্‌কে প্রণাম।

ইলাবৃত-বর্ষে ভগবান্ ভব, ভবানী ও তাঁহাদের সেবিকা অসংখ্য নারীগণ কর্ত্তৃক এই সঙ্কর্ষণদেবের পূজা বর্ণিত হইল। এই যে অসংখ্য সেবিকা, ইঁহারা নাগবধূও হইতে পারেন, কারণ সঙ্কর্ষণদেবের যে স্তব উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল, তাহার মধ্যে নাগবধূগণের অর্চ্চনার কথা রহিয়াছে। এই সঙ্কর্ষণদেব চতুর্ম্মূর্ত্তি ভগবান্ মহাপুরুষের তুরীয় তামসী মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ষের আরাধনা-কথা বর্ণনা করিবার জন্য ভাগবত বলিয়াছেন নয়টি বর্ষেই ভগবান্ নারায়ণ অনুগ্রহ করিয়া—"আত্মতত্ত্বব্যূহেন" অর্থাৎ স্বমূর্ত্তি-সমূহের দ্বারা নিয়ত সন্নিহিত হইয়া রহিয়াছেন। এই মূর্ত্তি-সমূহের মধ্যে সঙ্কর্ষণ অন্যতম।

৭। সঙ্কর্ষণ, বলরাম ও নিত্যানন্দ

শ্রীনিত্যানন্দের বর্ণনায় তাঁহাকে সহস্রবদন, বলরাম, সঙ্কর্ষণ, অনন্ত ও সহস্রৈক-ফণাধর বলা হইয়াছে। তিনি হলধর—তাঁহার শরীর অতিশয় প্রকাণ্ড—তিনি চৈতন্যচন্দ্রের রসে মত্ত। তাঁহা অপেক্ষা কেহই চৈতন্যের প্রিয় নহে, চৈতন্যদেব তাঁহার দেহে সর্ব্বদাই বিহার করেন। এই শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র-কথা যিনি শ্রবণ করেন ও গান করেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তাঁহার পরম সহায় হইয়া থাকেন, মহেশ ও পার্ব্বতী তাঁহার উপর প্রীতি-যুক্ত হয়েন, আর তাঁহার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

সঙ্কর্ষণ-দেবের কথা বলা হইল, ইনিই হলায়ুধ ও বলরাম। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে রাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই রাস-ক্রীড়াই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম লীলা। কিন্তু এই রাস-ক্রীড়া কি কেবল শ্রীকৃষ্ণই করিয়াছিলেন? শ্রীমদ্ভাগবতে রহিয়াছে, শ্রীবলরামও রাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন!

৮। বলরামের রাসক্রীড়া ও কৃষ্ণসেবা

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৫ অধ্যায়ে শ্রীবলরামের রাসক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কতকাল শ্রীবৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিয়াছেন! প্রথমাবস্থায় আমরা বৃন্দাবনের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম—কিন্তু আর যেন সে কথা স্মরণ নাই। কংস-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত উদ্ধবকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন, উদ্ধবের সহিত ব্রজবাসিগণের যে কথোপকথন হয়, তাহাতে আমরা বৃন্দাবনের গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন তাহার পরিচয় পাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণও গোপগোপী ও বৃন্দাবন কিভাবে দেখিতেন তাহাও দেখা গিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের বস্তু, নীরবেই হৃদয়-মধ্যে থাকিয়া যায়, সংসারে বা প্রকট লীলায় তাহা পরিব্যক্ত করিবার উপায় নাই। প্রকট-লীলায় কেবলই সংগ্রাম, কেবলই সংশয়। ব্রজগোপীর আত্ম-সমর্পণ আর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরমানন্দ-সম্ভোগ ইহা গোপনের বস্তু—ইহা একটি আদর্শ-মাত্র—ইহা ধ্যানের বস্তু।

বৃন্দাবন হইতে আসিবার পর কংসবধ, কৃষ্ণ বলরামের গুরুগৃহে বাস, গুরু সান্দীপনি মুনিকে দক্ষিণা দিবার জন্য পাঞ্চজন্য অসুরকে বধ করিয়া যমালয় গমন ও তথা হইতে মৃত গুরুপুত্রের আনয়ন, তাহার পর জরাসন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, দুর্গ-নির্ম্মাণ, কালযবন বধ, মুচুকুন্দ রাজার প্রতি অনুগ্রহ, তাহার পর দ্বারকাগমন, রুক্মিণী-পরিণয়, প্রদ্যুম্নের জন্ম, শম্বরাসুর বধ, জাম্ববতী, সত্যভামা প্রভৃতির সহিত পরিণয়, নরকাসুর বধ, বাণ রাজার সহিত যুদ্ধ,—ঘটনার পর ঘটনা চলিতেছে। ইহাছাড়া পাণ্ডবদিগের অদৃষ্ট-চক্রও ঘুরিতেছে—এই সংগ্রামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগেরও সংবাদ লইতেছেন। এইবার সময় হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যাইবেন, তাহার পর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিয়া রাজসূয় যজ্ঞ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, সাল্ব, দন্তবক্র, বিদূরথ, পৌণ্ড্রক,

কাশীরাজ প্রভৃতিকে বধ করিবেন। এইগুলি শ্রীকৃষ্ণের লীলার আর এক অধ্যায়। এই নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের কথা—শুধু কথা নহে শ্রীবৃন্দাবনের চরম ও পরম কথা শ্রীমদ্ভাগবত একটি বিশেষ ঘটনার দ্বারা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন। ঘটনাটি আমাদের পরিচিত—উহা রাসক্রীড়া। কিন্তু এই যে রাসক্রীড়া, ইহার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নহেন, ইহার নায়ক বলরাম।

ভগবান্ বলভদ্র বন্ধুগণকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে রথে আরোহণ করিয়া নন্দ গোকুলে গমন করিলেন। অনেক দিনের কথা, কৃষ্ণ বলরাম চলিয়া যাওয়ার পর একবার রথে চড়িয়া উদ্ধব এই নন্দগোকুলে আসিয়াছিলেন এবং কিছুদিন তথায় বাস করিয়া কৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে ব্রজবাসিগণের শোক কিয়ৎপরিমাণে অপনোদন করিয়াছিলেন। গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয়-কথা উদ্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভাগ্যবান্ পরমজ্ঞানী ও একান্ত কৃষ্ণ-ভক্ত উদ্ধব ব্রজগোপীর হৃদয়ের সেই প্রেমরসামৃত প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উদ্ধব অনেক তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে আসিবেন এমন কথাও বলিয়াছিলেন। তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। ব্রজবাসী,—বিশেষ করিয়া ব্রজগোপী, আশাপথ চাহিয়া দারুণ উৎকণ্ঠায় বসিয়া রহিয়াছে—মৌনহৃদয় উষ্ণদীর্ঘশ্বাসের দ্বারা কেবল বলিতেছে, "কৈ, এখনত কৃষ্ণ আসিল না?" আবার রথ আসিল, বলরাম আসিলেন। কৃষ্ণ আসিলেন না, কিন্তু শুষ্কপ্রায় আশা-নদীতে আবার বন্যা বহিল, কত কথাই বলরামকে জিজ্ঞাসা করা হইল। বলরাম সকলের সহিত সেই পূর্ব্বের ন্যায় প্রেমে মিশিলেন, সেই ভালবাসার খেলা খেলিলেন,—শেষে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমরা আশ্বস্ত হও, আমি দ্বারকায় গিয়া বলপূর্ব্বক কৃষ্ণকে লইয়া আসিব—শূন্য বৃন্দাবন আবার পূর্ণ হইবে। উদ্ধব কৃষ্ণের অধীন, উদ্ধব কি আনিতে পারে? আমি অধীন নহি, আমি জোর করিয়া লইয়া আসিব।" বলভদ্রের কথায় সকলের বিশ্বাস হইল। অবিশ্বাসের যে কোন কারণ নাই—ইনি বলভদ্র—ইঁহার বলের সীমা নাই, ইনি সঙ্কর্ষণ ও অনন্ত, সুতরাং যাহা হইবার নহে, যাহা অসম্ভব, জোর করিয়া অবশ্যই তাহা করিতে পারেন।

তাহার পর চৈত্র ও বৈশাখ এই দুইমাস, তিনি ব্রজগোপীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় যাপন করিলেন। অবশ্য এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার সঙ্গিনী নহেন—ইঁহারা অন্য গোপী।

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥

পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণে সমুজ্জ্বল রজনী, প্রস্ফুটিত কুমুদ পুষ্পের গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহ, যমুনার উপবনে (রামঘট্ট নামক প্রসিদ্ধ স্থানে) স্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া বলরাম বিহার করিতে লাগিলেন।

সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বের ইহাই দ্বিতীয় কথা। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার সময়েও বলরামের রাসক্রীড়ার প্রসঙ্গ আছে। দশম স্কন্ধের ৩৪ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই রাস করিয়াছেন।

যিনি রাসক্রীড়ার নায়ক, তিনি পরম প্রভু বা পরমপতি। সেই পরমপতি ব্যতীত রাসক্রীড়ার অধিকার কাহারও নাই, ইহাই তত্ত্ব। সুতরাং বলরামের যখন রাসক্রীড়া রহিয়াছে, তখন তিনিও পরম প্রভুত্বের অধিকারী—অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়েই একতত্ত্ব, একই বস্তু—শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দেও তাহাই। কিন্তু, এই সঙ্কর্ষণদেবের বা বলরামের বা নিত্যানন্দের, এই প্রভু ভাব ব্যতীত আর একটি ভাব আছে, তাহার নাম দাস-ভাব। "মূর্ত্তিভেদে আপনি হয়েন প্রভু দাস।" যদিও তিনি প্রভু, কিন্তু মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া দাসের কার্য্য বা সেবার কার্য্য করিয়া থাকেন। যাহা কিছু শ্রীভগবানের বা শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য প্রয়োজন, সমস্তই সেই অনন্ত, অর্থাৎ একই অনন্তদেব নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া, স্বয়ং নানা উপকরণ হইয়া ভগবানের সেবা করিতেছেন—

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ আসন ॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেইজনে ॥

বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই সেবাকার্য্যে আপনাকে নিঃশেষিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নাম "শেষ"। যামুন মুনির বিরচিত একটি শ্লোক শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই কথাই আছে।

৯। সঙ্কর্ষণ ও লীলা

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বের দ্বারাই শ্রীভগবানের লীলা প্রকট হইয়াছে। লীলা প্রকট করিতে হইলে, সেবার উপকরণ আবশ্যক। ভগবান স্বরূপে অনন্ত, বাক্যমনের অগোচর। তাঁহার লীলা এখানে, এই প্রপঞ্চে যে প্রকট হইবে, ইহার কোনই আশা ছিল না—এই সঙ্কর্ষণ দেবই লীলা-প্রাকট্যের জন্য যে যে উপকরণ আবশ্যক তৎসমুদয় যোগাইলেন, তাই লীলা প্রকট হইল। যামুন মুনির শ্লোক এই—

> নিবাস শয্যাসন পাদুকাংশুকোপধানবর্ষাতপবরণাদিভিঃ।
> শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ॥

আপনাকে লোকে শেষ বলিয়া থাকে, কারণ, বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান ছত্র প্রভৃতি সেবার সামগ্রীগুলি সমস্তই আপনার মূর্ত্তিভেদ মাত্র। আপনি সেবার শেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই সংসারে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে তাহারা সীমাবদ্ধ, ক্ষয়শীল ও অপূর্ণ। মানুষ যখন নিত্য, পূর্ণ ও অসীম শ্রীভগবানের অন্বেষণ করে তখন এই প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু, তাহা ছাড়িয়া, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে চাহে। এই এক প্রকারের উপাসনা-পদ্ধতি। কিন্তু আর এক প্রকারের দৃষ্টি বা অনুভব-প্রণালী আছে। এখানে যাহা কিছু আছে তাহা খণ্ডিত ও অনিত্য হইলেও তাহাদের একটি নিত্য, পূর্ণ ও অখণ্ড ভাবমূর্ত্তি আছে। সেই নিত্য ও আদর্শস্থানীয় মৃত্যুহীন ভাবমূর্ত্তি আছে বলিয়াই এই ছায়ার জগতে নিত্যের ও ভাবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। যাবতীয় সেবার উপকরণের বা যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থের যে নিত্যমূর্ত্তি (Ideal Infinitude of the Eternal Type) তাহাই সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি, সেই কারণেই তিনি একই সঙ্গে এক ও বহু, তিনি সহস্রবদন ও সহস্রমস্তক। এই সঙ্কর্ষণই যথার্থ অনন্ত। এই অনন্তের বোধের উপরই নিত্যের প্রাকট্য বা লীলার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং সঙ্কর্ষণকে লইয়াই লীলা। ইহাই লীলাবাদের শেষ সিদ্ধান্ত, সকলেই ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিবেন। ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সাধনসম্পদের সামঞ্জস্য আছে—ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মহাবল

গরুড়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাহন, যিনি অতি অনায়াসে ও আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকে বহন করেন তিনি অনন্তের অংশ। ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, ব্যাস, শুক, নারদাদি যাবতীয় ভক্ত, তাঁহারা অনন্তের পূজা করেন। তিনি আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর ও বৈষ্ণব; তিনি সর্ব্বদাই প্রেমরস আস্বাদনে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন।

১০। সঙ্কর্ষণ ও শেষ

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ইলাবৃত বর্ষে সঙ্কর্ষণ দেবের ভব ও ভবানী কর্ত্তৃক যে পূজা, তাহার কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। আবার পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে পাতালের তলে ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব শেষ-নামক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে প্রকারে অবস্থান করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পাতালের মূলদেশে ভগবানের তামসী (তমোগুণের কার্য্য যে সংহার, তাহার প্রবর্ত্তয়িত্রী যে মূর্ত্তি, তমোময়ী মূর্ত্তি নহে। বিশ্বনাথ) অংশ আছে, তাহার নাম অনন্ত। সাত্বততন্ত্রনিষ্ঠ ভক্তগণ চতুর্ব্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাঁহারা ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি আমার' এই বোধ, ইহাই তাঁহার অধিষ্ঠান, এই অধিষ্ঠানের দ্বারা তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে আকর্ষণ করেন। এই জন্যই তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। সহস্রশীর্ষ ভগবান্ তাঁহার এই অনন্ত মূর্ত্তির একটিমাত্র মস্তকে এই ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেখানে এই ভূমণ্ডলকে একটি শ্বেত-সর্ষপের ন্যায় দেখায়। প্রলয়কালে তিনি এই জগৎকে সংহার করিতে বাসনা করিয়া সঙ্কর্ষণ নামক একাদশ ব্যূহে রুদ্ররূপ ধারণ করেন। তখন তাঁহার ভ্রূযুগল ক্রোধে বিঘূর্ণিত হয়, আর তিনি ত্রিশিখ-শূল হস্তে লইয়া সমুত্থিত হন। তাঁহার চরণ-পদ্মে নখগুলি মণিদর্পণের ন্যায় ঝল্ ঝল্ করিতেছে—নাগপতিগণ ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করেন। নাগকুমারীগণ পরম ভক্তি-সহকারে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। অনন্ত গুণসাগর ভগবান্ আদিদেব অনন্ত, কেবল প্রলয়কালেই ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করেন, অন্যসময়ে তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও মঙ্গলকর। সুর, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগ ও মুনিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার ধ্যান করেন, তাঁহার নয়নদ্বয় মদ দ্বারা সর্ব্বদা মুদ্রিত ও বিকৃত এবং বিহ্বল, তিনি সুললিত বাক্যের দ্বারা আশ্রিত দেবগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন। তাঁহার বসন নীলবর্ণ, কর্ণে কুণ্ডল, হস্ত দুইটি অতি সুন্দর, পৃষ্ঠদেশে হল। তাঁহার গলদেশে বৈজয়ন্তী-মালা।

১১। নারদ ও সঙ্কর্ষণ

দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সভায় তুম্বুরুর সহিত সেই ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমা নিম্নরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণাঃ যদীক্ষয়াসন্
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্ নানাঽধাৎ কথমুহবেদ তস্য বর্ত্ম।

এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতুরূপ সত্ত্ব প্রভৃতি প্রকৃতির গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণের দ্বারা নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহার স্বরূপ অনন্ত ও অনাদি, যিনি একমাত্র সত্য হইয়া এই বিচিত্র প্রপঞ্চ আপনাতেই ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ অনন্তদেবের তত্ত্ব (প্রাপ্তিমার্গ) কে বুঝিবে?

মূর্ত্তিং নঃ পুরু কৃপয়া বভার সত্ত্বং সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যামাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ॥

তাঁহার তত্ত্ব অবোধ্য, কিন্তু তথাপি মুমুক্ষুজন তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাহার কারণ তিনি আমাদের ন্যায় ভক্তগণের প্রতি অশেষ করুণা করিয়া আশ্রিত জনগণের মন বশীভূত করিবার জন্য শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার লীলা-পরাক্রম মহাবল সিংহেরা শিক্ষা করিয়াছে।

যন্নাম শ্রুত মনুকীর্ত্তয়েদকস্মাদার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥

মহাপাতকীও যদি, অন্যের নিকট শুনিয়াই হউক, আর না জানিয়া দৈবক্রমেই হউক, অথবা পরিহাস করিয়াই হউক, তাঁহার নাম একবার উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে নিজের কলুষ রাশি হইতে স্বয়ং শুদ্ধ হইয়া অন্যেরও কলুষরাশি বিনষ্ট করে। অতএব সেই মুমুক্ষু জন সেই ভগবান্ ব্যতীত আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো ভূগোলং সগিরি সরিৎ সমুদ্রসত্ত্বং।
আনন্ত্যাদনিমিত বিক্রমস্য ভূম্নঃ কোবীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ॥

তাঁহার সহস্র মস্তক, তন্মধ্যে একটি মস্তকে সরিৎসাগর গিরি ও প্রাণিসমূহ-সমন্বিত, এই নিখিল ভূমণ্ডল অর্পিত রহিয়াছে। তাঁহার বিক্রম অনন্ত ও অপরিমিত, সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কেহ তাঁহার গুণরাশি বর্ণনা করিতে পারে না।

এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি॥

ভগবান্ অনন্তের এইরূপ প্রভাব। তাঁহার বল, গুণ ও প্রভাবের অন্ত নাই। অথচ তিনি রসাতলের মূলে অধিষ্ঠিত হইয়া লোকস্থিতির জন্য লীলায় নিজের মস্তকের দ্বারা ভূমিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিরাধার।

শ্রীমদ্ভাগবতে সঙ্কর্ষণের পূজা ইলাবৃতবর্ষে ও পাতালে কি প্রকারে হইয়াছে, তাহা আমরা আলোচনা করিলাম। এই সঙ্কর্ষণই বলরাম, আবার সেই বলরামই নিত্যানন্দ। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দচরিত্র সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান কথা আলোচনা করিলে আমরা সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত সম্বন্ধীয় শেষকথা বা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রচলিত কথা জানিতে পারিব।

১২। নিত্যানন্দ-মিলন।

বৈষ্ণব-সম্প্রাদায়ে শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত নামে পরিচিত। সন্ন্যাসীর কথা সকলেই জানেন—আচার্য্য শঙ্কর এই প্রাচীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সংশোধিত করিয়া পুনর্গঠিত করেন। সন্ন্যাস-পন্থা বৈদিক। বৈদিক সন্ন্যাস পন্থাই তন্ত্রে অবধূত-পন্থা নামে পরিচিত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও অবধূত-পন্থা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই কথিত হইয়াছে। মুণ্ডমালা-তন্ত্রেও অবধূত-পন্থা সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমুদয় কথা পরে আলোচ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী তৎকালীন ভক্তগণ কি ভাবে দেখিতেন, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

১৩৯৫ শকের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। তিনি বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অপেক্ষা বার বৎসরের বড়। এগার বৎসর পর্য্যন্ত তিনি পিতামাতার নিকট একচক্রা বীরচন্দ্রপুরে ছিলেন। উপনয়ন সংস্কারের পর তাঁহার পিতা হাড়াই ওঝা (নামান্তরে মুকুন্দ পণ্ডিত) পুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া আসিয়া পুত্রটিকে তাহার পিতার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইলেন। সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটনে যাইতেছিলেন, ছেলেটিকে তিনি সঙ্গে লইলেন। বালক নিত্যানন্দ এই সন্ন্যাসী গুরুর সহিত ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেন—তীর্থ-পর্য্যটনের শেষে তিনি আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত গয়াক্ষেত্রে পূজ্যপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা লইয়া নবভাবে বিহ্বল হইয়া নদীয়ায় ফিরিয়া আসিলেন—নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর আর আনন্দের সীমা থাকিল না। নবদ্বীপে প্রেমামৃত-বন্যা উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক্ সেই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি গোপনেই নবদ্বীপে আসিলেন ও নন্দন আচার্য্যের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণকে বলিলেন—কোন মহাপুরুষ সত্বর নবদ্বীপে আসিতেছেন। তাহার পর একদিন মহাপ্রভুর দেহে হলধরের আবেশ উপস্থিত হইল। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি বলিতে লাগিলেন "মদ-আন, মদ-আন।" বাহ্য-জ্ঞান হইলে পর তিনি হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন "কে কোথায় আসিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া আইস।" হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত নবদ্বীপ খুঁজিলেন, কিন্তু কাহাকেও বাহির করিতে পারিলেন না। এইবার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজেই বাহির হইলেন, "জয় কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে নন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন নন্দন আচার্য্যের গৃহে এক পুরুষরত্ন বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার অঙ্গের জ্যোতি 'কোটি-সূর্য্য-সম,' তাঁহার অবস্থা সকল সময়েই আবেশময়, তিনি ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদা হাস্য করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর সহচর-গণ-সহ নমস্কার করিয়া সম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও বিশ্বম্ভরকে চিনিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অনিমেষ নেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে দেখিতেছেন

"রসনায় লেহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ।

সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে পরিপূর্ণ-রূপে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণের এই মিলন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচ্য। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম শুনিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম শুনিলেই তাঁহারা উঠিয়া পলায়ন করেন। যেমন অনেক লোক গোবিন্দের পূজা করেন কিন্তু শঙ্করকে মানেন না,

এবং শিবদ্বেষী হওয়ার জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান নিস্ফল হয় এবং তাহারা নরকে যায়, ইহাও ঠিক্ সেইরূপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে লইয়া অনেক সময়ে অনেক গোলমাল হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণবমতের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিববিদ্বেষ বা শৈব সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ রকমের কলহ ছিল, মধ্বাচার্য্য শৈব ও বৈষ্ণব মতের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে পরিচিত, তাহা এই মধ্বসম্প্রদায়েরই শাখা। সুতরাং তাঁহার সম্প্রদায়ে শিববিদ্বেষ না থাকিবারই কথা। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবকে স্বীকার করার জন্য আপত্তি হইয়াছে। লোচন দাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল-গ্রন্থে ইহার এক প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক শঙ্কর-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আপত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মণ্ডলীর মধ্যে হয় নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে লইয়া বরাবরই আপত্তি ছিল, ইহার আরও অনেক প্রমাণ আমরা পাইব।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলিলেন বর্ত্তমান অবতারে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বড়ই গূঢ়। এই কারণেই শ্রীবাস ও হরিদাস সারাদিন খুঁজিয়াও তাঁহাকে বাহির করিতে পারিলেন না। এস্থলে একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাতালে অনন্তদেব বা সঙ্কর্ষণদেব সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহার শেষ অংশে আমরা জানিয়াছি যে এই অনন্তদেবের মহিমা দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সভায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় এই ব্রহ্মাই হরিদাস আর শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ। এবারে সেই দুইজনই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইলেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য কথা, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত পড়িয়া এরূপ অনুমানও করা যায় যে ইঁহারা দুইজনে নন্দন আচার্য্যের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বেশভূষা বা ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তিনিই যে সেই মহাপুরুষ, যাঁহার কথা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আবিষ্ট অবস্থায় বলিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। কাজেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই বাহির হইলেন এবং তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বাহির করিলেন।

পুরাতনকে তাহার পুরাতনত্বের মধ্যে চিনিয়া লওয়া বেশী কঠিন নহে, কিন্তু তিনি

[illegible] মধ্যে কিভাবে কোথায় রহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা বড় কঠিন। আমরা বাহিরের লক্ষণ লইয়াই থাকি, এবং বাহ্য লক্ষণের দ্বারা সমুদয় বস্তুকে চিনিয়া লইতে চাই। কিন্তু যে বস্তু চৈতন্যরূপ বা যাহা তত্ত্ব বস্তু, তাহা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করিয়া যাহারা বাহিরের পুরাতন চিহ্ন ও লক্ষণ লইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা আর সত্যের সন্ধান পাইবে না। লীলাবাদের ইহাই প্রথম কথা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ যেদিন তিনি গোচারণের মাঠে রাখাল বালকগণের মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে বসিয়া তাহাদের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছিলেন, সেদিন বেদপতি ব্রহ্মাও তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। তিনি শিশুবৎস লুকাইয়া রাখিয়া কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেদিনের সেই দম্ভের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই আজ তিনি হরিনাম মহামন্ত্রের প্রচারক হরিদাস-রূপে আবির্ভূত—শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ। শ্রীমদ্ভাগবতে পাইয়াছি একদিন ইঁহারাই সঙ্কর্ষণ তত্ত্বের মহিমা বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদেরই বোধ ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার অনুমোদন আর নারদের প্রচার, এই দুইকে আশ্রয় করিয়া ইলাবৃতবর্ষের ভবভবানী-সম্পূজিত, আর পাতালের নাগকন্যাগণ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে সংসেবিত, সেই সংকর্ষণ তত্ত্ব আমাদের ভারতবর্ষের সামগ্রী হইলেন। এই সঙ্কর্ষণ ব্যতীত লীলা হয় না। সঙ্কর্ষণই অনন্ত ; কিন্তু এই প্রকাশিত বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত অনন্ত নহেন, সমগ্র বিশ্বকে কারণরূপে বা নিত্যরূপে আপনার মধ্যে তিনি সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সুতরাং এই সঙ্কর্ষণকে বাদ দিলে প্রপঞ্চে লীলার প্রাকট্য একেবারেই সম্ভব হয় না, কারণ তাহা হইলে এই প্রপঞ্চে নিত্যের স্থান হয় না। এই কারণে অনন্তই সঙ্কর্ষণ, তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বলের সীমা নাই, তিনি রমণীয়, সকলের আনন্দদায়ী, এই কারণে তিনি বলরাম। আজ তাঁহার শেষ লীলা, আজ তিনি শ্রীনিত্যানন্দ রূপে আসিয়াছেন, নন্দন আচার্য্যের গৃহে রহিয়াছেন, শ্রীবাস ও হরিদাস তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। তার পর কি হইল ? শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বলিলেন—

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে॥
না বুঝি যে নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় বড় বাধ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আজ এই জন্যই আসিয়াছেন, কত যুগে কত মন্বন্তরে, কল্পে কল্পে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণের, কত দ্বীপে, কত বর্ষে, কত প্রকারের লীলা হইয়া গিয়াছে। লীলা পুরাতন ঘটনা নহে, লীলা নিত্য বা নিত্য-নূতন। আজও অনেক লীলা হইতেছে, আরও অনেক লীলা হইতে পারে, প্রয়োজন হইলে হইবে। সেই সমুদয় প্রাচীন কালের লীলা-সমূহের নায়কগণ আজও খেলা করিতেছেন বা খেলা করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু আমরা যে সংসারে সংসার দেখিতেছি, আমি আমাকে দেখিতেছি, "তত্ত্বতঃ" অর্থাৎ নিত্যসত্যের ভূমিতে দাঁড়াইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ সে চৈতন্য নাই, যে চৈতন্যকে আমরা পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া বুঝিব, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাহায্য বা কৃপা না পাইলে, লীলার রহস্য বুঝিবার উপায় নাই। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিলেন—

"চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে"

এই কারণেই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ও কলিহত নরনারীকে কাতর প্রাণে বলিতেছে,

'ভজ চৈতন্য, কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্যের নাম।' এই চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি এই নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানিতেন, কিন্তু তত্ত্ব জানিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাহার কারণ কি? "কোন কৌতুকে কারণে।" তত্ত্ব হইতে লীলায় আসা, অর্থাৎ নির্বিশেষ সত্যকে এই বিশেষের মধ্যে ক্রীড়ান্বিত অবস্থায় নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। চৈতন্যের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-ব্যতীত কি প্রকারে হইবে?

এইবার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে চিনাইয়া দিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বিশেষ শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন—শ্রীবাস পণ্ডিত এই শ্লোক পাঠ করিলেন—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ শ্রবণযুগলে কর্ণিকার কুসুম, কনক-কপিশ বস্ত্র পরিধান, গলে বৈজয়ন্তী

আহা, নটবরবেশ শ্রীকৃষ্ণ গোপবৃন্দসহ অধর সুধায় বেণুরন্ধ্র পূর্ণ করিয়া আপনার চরণচিহ্ন-অঙ্কিত রতিজনক পরমস্থান শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন— আর গোপগণ তাঁহার গুণগাথা গান করিতে লাগিলেন।

এই শ্লোক শ্রবণমাত্রেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অচেতন হইয়া পড়িলেন—উন্মাদ বাড়িতে লাগিল, সে কি সিংহনাদ, সে কি আছাড়—হাড় যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আনন্দের সীমা নাই, শ্রীবিশ্বম্ভরের মুখের প্রতি চাহিয়া ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন, আবার কখন বাহুতে তাল ঠুকিতেছেন। এই প্রকারের 'কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ' দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অন্যান্য বৈষ্ণবের সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। কাহারও সাধ্য নাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিবারণ করেন। শেষে মহাপ্রভু যখন তাঁহাকে কোলে লইলেন, তখন তিনি নিস্পন্দ হইলেন।

যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই ভাবাবেশ দেখিয়া সকলেরই অন্তরে নিত্যানন্দের সঞ্চার হইল। এইবার মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্তুতি করিয়া বলিলেন—"আপনি ঈশ্বরের পূর্ণশক্তি, আপনার ভজনা না করিলে লোকে কৃষ্ণভক্তি পায় না। আপনার চরিত্র অগম্য ও অচিন্ত্য। তিলার্দ্ধের জন্যও আপনার সঙ্গ হইলে জীব কোটি পাপ হইতেও অনায়াসে পরিত্রাণ পায়। আমি বুঝিলাম কৃষ্ণ আমায় উদ্ধার করিবেন—তাই আপনার সঙ্গ লাভ করিলাম।" তাহার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোথা হইতে আসিলেন, মহাপ্রভু তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বালকের ন্যায় অতিশয় চঞ্চল, মহাপ্রভু তাঁহার স্তুতি করায় যেন অতিশয় লজ্জিত হইলেন। লজ্জা-বিজড়িত-স্বরে বলিলেন—"অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিলাম, কৃষ্ণের প্রাচীন স্থান-সমূহে অন্বেষণ করিলাম—স্থানগুলি রহিয়াছে কিন্তু কৃষ্ণকে কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না। শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনসমূহ আচ্ছাদিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ভাল লোককে জিজ্ঞসা করিয়া জানিলাম কৃষ্ণ গৌড়দেশে গিয়াছেন। তাই এখানে আসিলাম।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে রহিলেন—তাঁহার প্রথম কার্য্য ব্যাস-পূজা। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রায়ই কলহ হইত—এই কলহকে একটা বাহ্য ব্যাপার

বা একটি ক্রীড়ামাত্র বলা হইয়াছে। যাহা হউক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বালকের ন্যায়, নিজের হাতে ভাত তুলিয়া খাইতে পারেন না—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী মালিনী দেবী মায়ের মত তাঁহাকে যত্নে পালন করেন, এবং ভাত খাওয়াইয়া দেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—"তুমি এই অবধূতকে কি জন্য স্থায়ীভাবে ঘরে রাখিয়াছ? ইহার জাতিকুলের স্থিরতা নাই, তুমি অতিশয় উদার প্রকৃতির লোক। কিন্তু তুমি যদি নিজের জাতিকুল রাখিয়া সমাজে চলিতে চাও তাহা হইলে এই অবধূতকে বাড়ি হইতে সরাইয়া দাও।"

ইহা অবশ্য মহাপ্রভুর পরীক্ষা। কিন্তু ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের সহিত মিশিয়া গেলেও সামাজিকগণ তাঁহাকে মোটেই ভাল চক্ষে দেখিতেন না, তাঁহার আচার ব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি সমস্তই অন্য রকমের, আমাদের প্রচলিত রীতি-নীতির সহিত তাহার মিল নাই। সকলেই শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় উদার প্রকৃতির লোক নহেন—অনুদার ও সঙ্কীর্ণচিত্ত লোক সমাজের ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত, তাহাদের সাহস নাই, সত্য যদি কোন নূতন বা অপ্রচলিত মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তাহারা সে সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় এই প্রকারের আর একটি ঘটনা ইহার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। হরিদাস ঠাকুর যবন বলিয়াই সমাজে পরিচিত ছিলেন—শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একজন প্রাচীন ও পদস্থ ব্রাহ্মণ। তিনি হরিদাসকে যখন নিজের গৃহে রাখিলেন—তখন এই প্রকারের একটা সামাজিক আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সে আন্দোলনকে গ্রাহ্য করেন নাই, অধিক কি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়া বলিয়াছিলেন "ইনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, কারণ ইনি ভক্ত।"

যাহা হউক মহাপ্রভু যে পরীক্ষা করিতেছেন, ইহা শ্রীবাস পণ্ডিত বুঝিলেন এবং মহাপ্রভুকে বলিলেন—"প্রভো! আমি সামান্য ব্যক্তি, আমাকে এ প্রকারে পরীক্ষা করা আপনার পক্ষে সঙ্গত নহে। একদিনের জন্যও যিনি আপনার ভজনা করেন, তিনি আমার প্রাণ স্বরূপ। নিত্যানন্দ আপনার দেহ। এই নিত্যানন্দ যদি মদিরা ও যবনী

করেন, আমার জাতি, প্রাণ, ধন সমস্তই যদি বিনাশ করেন, তথাপি আমার চিত্তে কোন বিরুদ্ধভাব জাগিবে না।

শ্রীবাসের কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতকে বর দিলেন—"পণ্ডিত, লক্ষ্মী যদি কখনও নগরে নগরে ভিক্ষা করেন, তাহা হইলেও তোমার ঘরে কখন দারিদ্র্য হইবে না। তোমার বাড়ীর কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত আমাতে অবিচলা ভক্তি লাভ করিবে। তোমার হস্তে আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় এই শ্রীনিত্যানন্দকে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

১৩। শ্রীনিত্যানন্দ রহস্য

শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে বিহার করিতে লাগিলেন, কখনও তিনি গঙ্গার অগাধ জলে মহাস্রোতে নির্ভয়ে সাঁতার খেলেন, কখনও বালকগণের সহিত নিতান্ত চপলভাবে খেলা করিয়া বেড়ান। বালক ও স্ত্রীলোকগণের সহিত তাঁহার ব্যবহার সকলের চক্ষে বেশ ভাল লাগিত না। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী তাঁহাকে ছোট ছেলের মত হাতে করিয়া খাওয়াইয়া দিতেন, শচীমাতা তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। নিত্যানন্দ বালকের ন্যায় সরল ও চপল, কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ত্রিশ বৎসরের উপর, সুতরাং তাঁহার স্ত্রীলোকগণের সহিত এই বালকের মত ব্যবহার সকলের চক্ষে ভাল লাগিত না। তাহার পর তাঁহার জাতি কুলের যে ঠিকানা নাই, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ বালকভাবে শচীমাতার চরণ ধরিতে যাইতেন আর শচীমাতা পলাইয়া যাইতেন।

স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার যে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিত না এবং সে সম্বন্ধে লোকে যে নানারূপ প্রতিকূল সমালোচনা করিত, তাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি স্থান পড়িয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আলোচনা নহে, শ্রীবলরামের রাসের বর্ণনা হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলরামের এই রাস বর্ণনায় অবশ্য বারুণী মদ্যপানেরও প্রসঙ্গ আছে। যাউক, সে দ্বাপরযুগের কথা। বলরাম-সম্বন্ধেও দ্বাপরযুগে আপত্তি হইয়া থাকিবে—যাহা হউক বলরামের রাসক্রীড়ার প্রমাণ দেওয়া উপলক্ষে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তারাও রামের রাসে করেন স্তবন॥

যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে এক তত্ত্ব কৃষ্ণ-হলধরে॥
চারিবেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত॥
মূর্খ দোষে কেহ কেহ না দেখি পুরাণ।
বলরাম রাস-ক্রীড়া করে অপ্রমাণ॥

উদ্ধৃত অংশের আলোচনাতেই অনেক কথা পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ বলরামের চরিত্র "চারিবেদে গুপ্ত"—পুরাণে অবশ্য ইহা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু লোকেরা মূর্খ, তাহারা গভীররূপে পৌরাণিক সাহিত্যের আলোচনা করে না। বলরামের চরিত্র যে কিছু অসাধারণ রকমের, সাধারণ মানুষের যাহা প্রচলিত ধারণা সেই ধারণার মাপ কাঠিতে তাঁহাকে মাপিবার উপায় নাই. যাহারা গতানুগতিক ও অনুদার, বাহিরের ছোট খাটো বিচারের তুলাদণ্ড লইয়া যাহারা বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা বলরামকেও বুঝিতে পারে নাই, শ্রীনিত্যানন্দকেও তাহারা বুঝিতে পারে নাই। মুনিরা স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করেন, এই এক সামাজিক ধারণা, বলরাম রাস করিলেন, মুনিগণ তাহার বন্দনা করিলেন, আর দেবতারা সেই রাসে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। কি বলিবেন? শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় "তেজীয়সাং ন দোষায়" যাহারা তেজস্বী তাহাদের দোষ নাই, অথবা সব লোককে এক রকমের মাপ কাঠি দিয়া মাপিতে নাই—সত্য বুঝিতে হইলে কেবল বাহিরের লক্ষণের দ্বারা বিচার করিতে নাই। বলরাম সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ইহাই বলিয়াছেন। তাঁহার কথার ভিতর আর একটি কথা রহিয়াছে, তাহাও বেশ ভাল করিয়া ভাবিবার ও বুঝিয়া দেখিবার। চারিবেদে যাহা গুপ্ত, পুরাণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্ব সন্দর্ভে বলিয়াছেন, যিনি বেদের অর্থ পূরণ করেন, তিনি পুরাণ, বেদার্থের পূরণ বলিতে কি বুঝায় তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক বিরোধের যুগে বৈষ্ণব মতকে অনেকে অবৈদিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধনও শ্রীনিত্যানন্দে আপত্তি হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণের উপাসনা বা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের উপাসনা যে প্রাচীন

ভাগবত মত, তাহা মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানেই পাওয়া যায়। যাহা হউক এই সমুদয়ের প্রমাণের দ্বারা কোন মীমাংসা হইবে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সময়ে অনেকের নিকট কিভাবে প্রতীত হইয়াছিলেন, আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রাচীন সন্ন্যাস-পন্থায় সমাজে স্ত্রীলোকের যে বিশেষ কোন উচ্চস্থান ছিল, তাহা মনে হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রেমভক্তির পথ সার্ব্বজনীন আকারে প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহাতে স্ত্রীলোকের স্থান অতিশয় উচ্চ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। "ব্রজগোপীদের আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" "রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ বা কল্পিতা" ব্রজবধূগণের কল্পিত পরম রমণীয় যে উপাসনা-পদ্ধতি তাহাই যখন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া ঘোষিত হইল, তখন স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা যে কতদূর বাড়িয়া গেল তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই মত প্রচারের যখন প্রধান সহায় ও অবলম্বন হইলেন, তখন মতদ্বৈধ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যবহার সে সময়ে অনেকের নিকট একটি ভীষণ রকমের বিদ্রোহ বলিয়া মনে হইয়াছিল—অবশ্য গতানুগতিককে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্রই এক নব জীবনের তরঙ্গোচ্ছাস জাগাইয়া তুলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কলিযুগকে ধন্য করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর সকলই মধুর, মাধুরীই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বস্ব—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতেও মাধুরী এবং করুণা অসীম, কিন্তু এই মাধুরী ও করুণার সহিত একটা তেজস্বিতা ও উদ্দামভাব ছিল—এই কারণেই নিত্যানন্দ প্রভুকে যথার্থরূপে গ্রহণ করা গতানুগতিকের অনুবর্ত্তী দুর্ব্বল প্রকৃতির ও ভীরু স্বভাবের লোকের পক্ষে কঠিন ছিল। অবশ্য মহাপ্রভুকে যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা যে কেহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অস্বীকার করিলেন, তাহা নহে, কিন্তু সাধারণ লোকে এত বড় একটা নূতন বস্তু একেবারে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যে সময়ে প্রত্যেক রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহে নব নব ভাবের আবেশ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, ইনিই শ্রীভগবান্, আজ দাস্য ভাব জগতে প্রচার করিবার জন্য নিজে ভক্তের ভাব লইয়া আসিয়াছেন, সেই সময়ে নবদ্বীপে একটি অতি প্রবল বিরোধীদল গড়িয়া উঠিল। তাহারা নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল, ভক্তগণকে জব্দ করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

লোকে বলিতে লাগিল, ইহারা জাতিভেদ মানে না, ইহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, ইহারা মদ খায়, ইহারা তান্ত্রিকী সাধনার দ্বারা পঞ্চকন্যা ও নানাবিধ ভোগের সামগ্রী আনিয়া রাত্রিতে আমোদ প্রমোদ করে; ইহাদের এই সব দৌরাত্ম্যের দ্বারা অনাবৃষ্টি ও শস্যহানি হইতেছে, অচিরেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি উপস্থিত হইবে, ইহাদের কিছুতেই প্রকৃতিস্থ করিতে পারা গেল না, এখন রাজদ্বারে অভিযোগ করা আবশ্যক। এই প্রকারের বিরুদ্ধ ভাব যখন জাগিয়া উঠিল, তখন বেশীর ভাগ আক্রোশ হইল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর।

কেহ বলে "ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত।"
*   *   *   *
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বাড়ীতে অতিথি করিয়া রাখার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের উপরও লোকের আক্রোশ হইল—

শ্রীবাস বামন এই নদীয়া হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি লইয়া ফেলাইব সোঁতে॥
ও বামন ঘুচাইল গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই এ সমুদয় জানিতেন, সেই কারণেই তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে যেদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বিষ্ণুর খট্টাতে বসিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, যাহা সাতপ্রহরিয়া ভাব নামে পরিচিত, সেদিন সেই অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীতে স্ত্রীলোকও ছিলেন—

পতিব্রতাগণ করে জয় জয় কার।
আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সভার।

শ্রীবাস পণ্ডিতের একজন দাসী, তাহার নাম ছিল দুঃখী, সে জল বহিতেছিল, মহাপ্রভু সেদিন তাহার নাম দিয়াছিলেন সুখী।

কেবল সাধারণ লোক নহে সে সময়ে যাঁহারা সমাজে পদস্থ ও পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাঁহারা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহাকে দলে লইয়া পরম আদরে তাঁহার সহিত মাতামাতি করার জন্য ভক্তগণের নিন্দা করিতেন, ইহা ভক্তেরা ও তাঁহাদের মণ্ডলীর যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা সকলেই জানিতেন। কিন্তু এই আলোচনায় তাঁহারা বিরক্ত হইতেন না এবং এই নিন্দা বেশ কৌতুকের সহিত শ্রবণ করিতেন। জগাই মাধাই উদ্ধারের পর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লইয়া গঙ্গার জলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীগদাধর জল খেলা করিতেছিলেন। গদাধরের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের আর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অদ্বৈত প্রভুর জলখেলা চলিতেছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চোখে এমন জল দিয়া দিলেন যে অদ্বৈত প্রভু খেলাতে বেশ ভাল রকম পরাস্ত হইলেন, তিনি অনেকক্ষণ, চোখ মেলিতে পারিলেন না। সেই অবস্থায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিতেছেন—

নিত্যানন্দ মদ্যপ করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি।
কোথাকার অবধূতে আনি দিলা ঠাঞি॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত সংহতি বিহরে॥

আর একবার জলখেলায় হারিয়া অদ্বৈত প্রভু বলিলেন—

পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কোথা না জানে কোথাত॥
মাতা পিতা গুরু নাহি না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল বোলায় অবধূত॥

জগাই মাধাই উদ্ধারের ঠিক্ পূর্ব্বে ভক্ত-মণ্ডলীতে যখন উহাদের কথা এবং প্রথম দিন হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাহাদের সাক্ষাতের কথা হয়—তখন শ্রীঅদ্বৈত

প্রভু হরিদাসকে কৌতুক করিয়া বলেন—"জগাই মাধাই মাতাল, নিতাইও মাতাল, মাতালের সঙ্গে মাতালের মিলন হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি হরিদাস, তুমি নৈষ্ঠিক, তুমি কি জন্য মাতালের দলে যাও। এই নিত্যানন্দ সকলকেই মাতাল করিবে, আমি উহাকে খুব ভাল করিয়া জানি। দুই তিন দিন পরে দেখিবে নিতাই ঐ দুইজন মাতালকে আমাদের দলের ভিতর লইয়া আসিবে।"

নিত্যানন্দের এই মাতাল-সুখ্যাতি অনেকবার শুনিতে পাওয়া যাইবে, কেন এ সুখ্যাতি তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। মাতাল মদ খায়, মদের প্রভাবে কিছুক্ষণ একটা সামান্য আনন্দ পায়, কিছুক্ষণ বেশ বিহ্বল হইয়া থাকে। আমরা মাতালের যতই নিন্দা করি, সংসারের সাধারণ হিসাবী ও পরনিন্দক লোক অপেক্ষা তাহারা যে অনেক ভাল, তাহা জগাই মাধাই উদ্ধারেই বুঝিতে পারা যায়। মাতাল আনন্দের কাঙাল। তাহাকে ঘৃণা করিবেন করুন, কিন্তু সে ঘৃণার পাত্র নহে, সে করুণার পাত্র। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছিল। যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত তাহারা গম্ভীর হইয়া নিজেদের শুচিতার অহঙ্কার লইয়া পৃথক্‌ভাবে বসিয়া থাকিত, কাহারও সহিত মিশিতে ঘৃণা বোধ করিত। সংসারের সাধারণ মানুষ আনন্দ চায়, আনন্দে মত্ত ও বিহ্বল হইতে চায়—ইহা তাহাদের স্বভাব। আর ধার্ম্মিক লোকেরা তাহাদের সেজন্য তিরস্কার করে। সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা, অর্থাৎ ধার্ম্মিক পণ্ডিত সাধু ও প্রধান প্রধান লোকেরা যখন ধর্ম্মের নামে বিষণ্ণ ও মলিন বদনে নিরানন্দের অন্ধকারে নিস্তব্ধভাবে একা একা বসিয়া, আর সাধারণ জনশ্রেণী বিষয়ানন্দ ও তদপেক্ষা নিম্নতর মাদক সেবনাদি জনিত ঘোর তামসিক আনন্দে আত্মহত্যার পথে ধাবিত, সেই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব। তাঁহাকে যে দেখিবে সে যদি সরল প্রকৃতির লোক হয় তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে, ইঁহার সমগ্র জীবনটাই বিশুদ্ধ আনন্দ। কি যে ভাবের অমৃত পানে তিনি নিয়ত বিহ্বল তাহা কে বলিবে, তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান নাই, তাঁহার পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার স্ত্রীর সহিত বাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিয়াছেন আর শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত দিগম্বর হইয়াই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে বালকের মত ভাব, কিন্তু বয়সে বালক নহেন। বালক বলুন, উন্মাদ বলুন, সকল সময়েই বিহ্বল, মাতিয়াই আছেন। মাতাল মদ খাইয়া হৈ হৈ করিতেছে, আর

বড়-মাতাল নিতাই "হরি হরি" বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে ও নাচিতে নাচিতে তাহাদের দলে গিয়া মিশিলেন—তাহারা নিতাইকে আপনার লোক বলিয়াই দলে লইল—তাহারা হৈ হৈ করিতেছিল, এখন 'হরি হরি ! করিতে লাগিল। শেষে তাহারা ভাবিল আমাদের মদের নেশা ছাড়িয়া যায়, তখন অবসাদ আসে আর এই নিতাই মাতালের নেশা ছাড়ে না। তাহারা ভাবিল এই বড়-মাতালটি কোন্ ভাটিতে মদ খায় তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। ক্রমে ক্রমে তাহারা নিতাইএর ভাটির মদ খাইতে পাইল ও ধন্য হইল।

ধার্ম্মিক লোক, পণ্ডিত লোক ও সাধু লোক, কে এমন করিয়া নিম্নশ্রেণীর মাতালের দলে মিশিয়া তাহাদের টানিয়া আনিয়া আপনার করিবে ? সাধু লোকেরা যে তাহাদের ঘৃণা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে নিজেরা পবিত্র হইয়া থাকিতে চায় ! সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের এই ভাব তাহাদের নিকট নিতান্তই নূতন ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু নিত্যানন্দ যে সঙ্কর্ষণ।

সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বের কথা বলিয়াছি—সঙ্কর্ষণ তিনি, যাঁহার ভিতরে বিশ্বের সকলেরই চির-বিশ্রামের স্থান আছে—সঙ্কর্ষণ তিনি, যিনি বিশ্বের কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি সঙ্কর্ষণ ছাড়া লীলা হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ যে নূতন ভাব বা ধর্ম্মজীবনের যে নূতন আদর্শ আনিলেন তাহাই যে সঙ্কর্ষণ ভাব ইহা বুঝিয়া লইবেন। বৈদিক ধর্ম্ম কোন সময়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তখন বৈদিক ধর্ম্মের সাধকগণ সঙ্কর্ষণের তত্ত্ব বুঝিতেন না। ইলাবৃত বর্ষের ভব-ভবানীর আরাধনা, পাতালে নাগবধূগণের আরাধনা হইতে নারদ এই সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বকে সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার সভায় আনিলেন। এই নারদই কলিতে শ্রীবাস পণ্ডিত তাহা মনে রাখিতে হইবে। আর বেশী কথায় প্রয়োজন নাই, ভক্তগণ আস্বাদন করিবেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে ॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান নাহি সর্ব্ব নগরে বেড়ায় ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় মাধাই উদ্ধার হইলেন, উদ্ধার হওয়ার পর তিনি অবশ্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব বুঝিলেন। এই অবস্থায় তিনি একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর

বন্দনা করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এই স্তবের ভিতরে সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং বৈষ্ণব-সাধনার সহিত তাহার সম্পর্ক কথিত হইয়াছে —এই স্তবে আলোচনার অনেক বিষয় আছে—সেই স্তবের মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

১৪। 'জগাই মাধাই' এর স্তব

১। তুমি বিষ্ণু, পালন কর। ২। তুমি অনন্ত, ভুবনকে ফণায় ধারণ কর। ৩। তোমার কলেবর ভক্তির স্বরূপ। ৪। পার্ব্বতী-শঙ্কর তোমাকে সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করেন। ৫। ভক্তিযোগ তোমার, তুমিই তাহা দান কর। ৬। তোমা অপেক্ষা চৈতন্যের প্রিয় আর কেহ নাই। ৭। গরুড় মহাবলী, তিনি কৃষ্ণকে বহন করেন, সে তোমারই কৃপায়। ৮। অনন্তমুখে কৃষ্ণগুণ গান কর ও কৃষ্ণভক্তি বুঝাইয়া দাও। ৯। নারদ তোমার গুণ গান করেন। ১০। তোমার যাহা কিছু সমস্তই চৈতন্যের সম্পদ। ১১। তুমি যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলে। ১২। জনক যে মহাজ্ঞান পাইয়াছিলেন সে তোমারই কৃপায়। ১৩। তুমি সর্ব্বধর্ম্মময় পুরাণ পুরুষ, বেদ তোমাকে আদিদেব বলেন। ১৪। তুমি জগৎ-পিতা ও মহা-যোগেশ্বর। ১৫। তুমি লক্ষ্মণ ও মহাধনুর্দ্ধর। ১৬। তুমি পাষণ্ড-ক্ষয়কারী রসিক আচার্য্য। ১৭। চৈতন্যের সমুদয় কার্য্য তুমিই জান। ১৮। মহামায়া তোমার সেবিকা। ১৯। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার পদছায়া কামনা করে। ২০। তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি এবং তুমি চৈতন্যের মহাশক্তি। ২১। চৈতন্যের শয্যা খট্টা প্রভৃতি সমস্তই তুমি। ২২। পতিতের ত্রাণকর্ত্তা, পাষণ্ড দলন।

> ২৩। তুমি সে করহ প্রভু বৈষ্ণবের রক্ষা।
> তুমি সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা॥

২৪। ক্রোধকালে তুমি রুদ্র। ২৫। সকল করিতেছ, অথচ কিছুই কর না। ২৬। তোমার বিগ্রহ পরম কোমল ও সুখময়, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে শয়ন করেন। ২৭। মহারাজা চিত্রকেতু তোমার সেবা করিয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়াছেন। ২৮। শৌণিকাদি ঋষি নৈমিষারণ্যে তোমারই সেবা করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝিলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের

প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে, এবং বৈষ্ণবজীবন কি আদর্শে ও কি প্রণালীতে গঠন করা আবশ্যক তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং পূর্ব্বের ঐ আটাশটি কথা ক্রমে আলোচনা করা যাইবে। ইহার ভিতর ইতিহাস আছে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনার যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত ও সমন্বয় চলিতেছে তাহার আভাস আছে—আর আমরা কোন্ পথে চলিব ও কি করিব তাহারও উপদেশ আছে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস যে সত্যই ব্যাসাবতার এই সমুদয় অংশ বিশেষরূপে আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যে স্তব মাধাই কর্ত্তৃক কথিত হইল, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দের যে সমুদয় মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, সেগুলি যে ইচ্ছাগত অর্থাৎ যখন যেটি মনে পড়িয়াছে, তখন সেটি বলা হইয়াছে তাহা নহে। মানব-জাতি একদিনে হঠাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপের এই অপূর্ব্ব পরিচয় যাহা শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের লীলায় প্রকটিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পায় নাই। এই পরিচয় লাভের একটি ইতিহাস আছে। যুগের পর যুগ যাইতেছে, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর যাইতেছে, অস্ফুট সচ্চিদানন্দ এই জীব ক্রমশঃ জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে প্রস্ফুট হইতেছে। জীবচৈতন্য যেমন বিকশিত হইতেছে, লীলাময় শ্রীভগবানের স্বরূপের গভীর হইতে গভীরতর পরিচয় সেই পরিমাণে তাহার চিত্ত-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জীবের সমষ্টি চৈতন্যে (In the total consciousness of the phenomenal universe) ক্রমে ক্রমে বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রতিফলিত হইতেছে। এই ক্রমিক প্রতিফলন ক্রিয়া অগ্রসর হইতে হইতে সর্ব্বশেষে শ্রীরাসমণ্ডলের মহা সঙ্কীর্ত্তনের মহামিলন হইবে; ইহাই লক্ষ্য, ইহাই শেষ কথা। শ্রীবৃন্দাবনে ও নদীয়ালীলায় আমরা এই শেষ কথার বা ভক্ত ভগবানের পূর্ণমিলনের শেষ দৃশ্যের দ্বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব। কিন্তু এই যে চরমমিলন, ইহা একদিনে অকস্মাৎ হয় নাই। শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয় তাঁহার শ্রীল লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে এই মিলনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। একদিকে ভক্ত আর একদিকে ভগবান্, উভয়ে ক্রমশঃ কাছাকাছি হইতে হইতে চরমে পরম লক্ষ্য সাধিত হইল, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। ভক্তের দিক্ হইতে ইহাই শেষ কথা, কিন্তু জগজ্জীবের প্রাপ্তি বা উপভোগের কথা ভাবিতে গেলে আর একটু বাকি থাকিল। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এখনও জগতের সকলের হইলেন না।

এইটুকু না হইলে শ্রীবৃন্দাবনের লীলাই যে পূর্ণ হয় না, তাই নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের লীলা।

সাধারণ লোক অজ্ঞ, কাজেই তাহারা একজন গৌরাঙ্গ, একজন নিত্যানন্দ, একজন অদ্বৈত, এই প্রকারে লীলার পরিকরগণকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখে, কাজেই লীলা বুঝিতে পারে না। লীলা বুঝিতে গেলে এইটুকু জানিতে হইবে যে ইঁহারা অভিন্ন ও ভিন্ন। প্রকট হইয়া ইঁহারা যেন পৃথক্, এইভাবে কার্য্য করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে আনন্দ কন্দলও হইতেছে, কিন্তু স্বরূপে, এক মহাপ্রভু, দুইপ্রভু, আর গদাধর ও শ্রীবাস, এই পঞ্চতত্ত্ব, ইঁহারা এক। অর্থাৎ এই পঞ্চতত্ত্বকে এক সঙ্গে একই তত্ত্বরূপে যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন তাঁহারাই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবেন, তাঁহারাই ভগবৎ-স্বরূপের সেই পূর্ণ পরিচয় (That perfected conception of the Divine in sport) পাইবেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার দ্বারা জগজ্জীবের ধারণায় বা অধিকারে আসিয়াছে। কিন্তু এই পূর্ণ পরিচয় একদিনে হঠাৎ মানব-হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। এই উপলব্ধির ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ আছে। নানা ভাবের ভাবুক, নানারূপ সাধন-পথের পথিক সেই এক পরমার্থ বস্তুকে পাইবার জন্য নানা পথে অগ্রসর হইয়াছেন, নিজ নিজ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই পথিকগণের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, কেবল বাহিরের দেখা সাক্ষাৎ নহে, হৃদয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন তাহাদের মধ্যে আদান প্রদানও হইয়াছে। এই প্রকারে নানা দিক্ হইতে একলক্ষ্যের অভিমুখী তীর্থযাত্রীগণের যে ক্রমিক মিলন, তাহাই অবলম্বন করিয়া সেই মহামিলনের বা মহারাসের রসিক নাটুয়া নিজের পরিচয় অল্পে অল্পে প্রকট করিয়াছেন। তাহার পর একদিন যেন তীর্থযাত্রীগণের মহামিলন তাহার পূর্ণাবস্থায় আসিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশে আমরা এই দৃশ্য দেখিতে পাইব, নদীয়ার মহাসঙ্কীর্ত্তনে ও জগন্নাথের রথে আমরা এই দৃশ্য দেখিতে পাইব।

সমষ্টি-চৈতন্যে এই লীলাময় তাঁহার স্বরূপের অন্তরতম মাধুর্য্যের পরিচয় যে প্রণালীতে অর্থাৎ যে সমুদয় স্তরের মধ্য দিয়া প্রকট করিয়াছেন, ব্যষ্টি-চৈতন্য যে সাধক জীব, তাহারও হৃদয়ে তাঁহার পূর্ণতম পরিচয়, প্রায়শঃ সেই সমুদয় স্তরের মধ্য দিয়াই উপস্থিত হইবে। এই বিশ্বের জীবনের ইতিহাস আছে—পুরাণে সেই ইতিহাস ঋষিরা বর্ণনা করিয়াছেন,

আমাকে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে সেই ইতিহাসের যাহাতে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে—এই প্রকারে বিশ্বের জীবন আমার জীবন হইবে—এবং আমার জীবন ভরিয়া বিশ্বনাথের লীলাতরঙ্গ নাচিয়া উঠিবে।

এই সিদ্ধান্তটি পৌরাণিক সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা। এই তত্ত্বটি ভালরূপে বুঝিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যে স্তব মাধাই কর্ত্তৃক কথিত হইল, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমেই মাধাই বলিলেন—তুমি বিষ্ণু, তুমি বিশ্ব পালন কর। ইহাই মূলসূত্র (Nucleus)। এইজন্যই 'বৈষ্ণব' এই নামটি এত সাধারণ। কেহ লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করেন, কেহ সীতারামের আরাধনা করেন, কেহ রুক্মিনীকান্তের, কেহ বাল-গোপালের কেহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ নাম "বৈষ্ণব।"

শক্তি-উপাসনার তৃতীয়স্তর বা শেষস্তর শ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে আলোচনা করিলে দেখিবেন, সেই এক‍ই কথা—বৈষ্ণবী-শক্তির আরাধনা। বিষ্ণু আর বৈষ্ণবী শক্তি,—শক্তি ও শক্তিমান্ যখন অভেদ, তখন ইহার মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করি কেন? বৈষ্ণবী তাহার পর নারায়ণী। বৈদিক কোন ক্রিয়া করিতে গেলে প্রথমেই আচমন, আর সেই আচমনে 'বিষ্ণুর পরম পদ' চিন্তা। আবার রায় রমানন্দের সহিত যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথোপকথন হইতেছে তখন প্রথমেই বর্ণাশ্রমাচার আর তাহার লক্ষ্য, বিষ্ণু-ভক্তি। এই বিষ্ণুকে মূল ধরিয়া আমাদিগকে এই প্রেমধর্ম্মের বা লীলাবাদের শেষ কথা কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে জগতে আসিয়াছে তাহার আলোচনা করিতে হইবে। নানা পুরাণে নানারূপ বর্ণনা দেখা যায়, কেহ নারায়ণের পর বিষ্ণুকে ধরিয়াছেন, কেহ বিষ্ণুর পর নারায়ণকে ধরিয়াছেন। এই সকল সামান্য মতভেদের মীমাংসা কিছু কঠিন নহে। সঙ্কর্ষণ, বিষ্ণুরই নামান্তর, ইহা মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে।

সঙ্কর্ষয়সি ভূতানি কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ।
ততঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তস্তত্ত্বজ্ঞান বিশারদৈঃ॥

যাবতীয় ভূতগ্রাম কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ কর, এই কারণে তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদগণ-কর্ত্তৃক তুমি সঙ্কর্ষণ-নামে অভিহিত। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, যাঁহাদের সহিত সঙ্কর্ষণকে লইয়া চতুর্ব্যূহ, তাঁহারাও এই বিষ্ণুর নামান্তর, ইহাই

মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, পাতালে সঙ্কর্ষণদেব রহিয়াছেন, আর নারদ ব্রহ্মার সভায় তাঁহার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তখন কেহ মনে করিতে পারেন বিষ্ণু ও সঙ্কর্ষণ বুঝি পৃথক্। লীলায় কখন কখন পৃথকরূপে প্রতীত হইতে পারেন, কিন্তু পৃথক নহেন—তত্ত্বে এক।

"বিষ্ণু" বলিতে কি বুঝায়, প্রথমে তাহারই আলোচনা করা দরকার।

(ক) বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ—এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া যিনি রহিয়াছেন, তিনি বিষ্ণু।

(খ) বেষতি, সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বমিতি। যিনি বিশ্বকে সিঞ্চিত বা আপ্যায়িত করেন। মেঘ যেমন বৃষ্টি দ্বারা বিশ্বের পোষণ করেন, বিষ্ণুও সেইরূপ তাঁহার কৃপামৃত বা লীলামৃতের দ্বারা বিশ্বের পোষণ করেন।

(গ) বিষ্ণাতি বিযুনক্তি ভক্তান মায়াপসারণেন সংসারাদিতি বা—যিনি ভক্তগণের মায়া অপসারণ করিয়া সংসার হইতে নির্ম্মুক্ত করেন তিনি বিষ্ণু।

(ঘ) বিশতি সর্ব্বভূতানি বিশন্তি সর্ব্বভূতানি অত্র—যিনি সকলভূতে প্রবেশ করেন আর-সকল ভূত যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি বিষ্ণু।

বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

> যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
> তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশ ধাতোঃপ্রবেশণাৎ॥

যেহেতু সেই মহাত্মার শক্তিতে এই বিশ্বের সম্ভব হইয়াছে, এই কারণে তাঁহার নাম বিষ্ণু। বিশ্ ধাতুর অর্থ প্রবেশন।

প্রথমে বিষ্ণুরূপে পালন, তাহার পর ধারণ। উভয়েই এক ভাবের কথা। তাহার পর বলা হইল, তোমার কলেবর ভক্তির স্বরূপ। অতএব ভক্তিবাদ সংসারকে উপেক্ষা করা নহে, রক্ষা করা ও উন্নত করা। যাঁহারা মনে করেন সাংসারিক কর্ত্তব্য বা জগতের ও মানবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোনও একটা অলৌকিক উপায়ে এক সুদূরবর্ত্তী আনন্দ-ধামে যাইয়া উপস্থিত হইব, তাহারা ভক্তিবাদ বুঝিতে পারে নাই বা ভুল বুঝিয়াছে। পার্ব্বতী ও শঙ্কর, দেবাদিদেব মহাদেবের এই যে যুগলমূর্ত্তি, ইহারও তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। ইহা শিবের আনন্দমূর্ত্তি। 'স্বারাজ্য সিদ্ধি' গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই ইহার পরিচয় পাওয়া

যায়। যিনি প্রলয়ের দেবতা ও শ্মশানবাসী তিনি অমঙ্গলরূপ নহেন। তিনি শঙ্কর,—পরম শুভদায়ক। তিনি রসহীন বা স্নেহহীন নহেন—তিনি পার্ব্বতীপতি—তিনি জগতের পিতা। শিব-উপাসনার এই ধারণা সঙ্কর্ষণতত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে। যাহা হউক এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিস্প্রয়োজন। সহৃদয় ও তত্ত্বান্বেষী ভক্তগণ আস্বাদন করিবেন।

সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব।

আমরা পূর্ব্বে পুরুষাবতার-প্রসঙ্গ আলোচনায় সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কোন কথাই সুস্পস্ট হয় নাই, তবে চিন্তা করিবার কতকগুলি প্রণালী উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহার অধিক কিছু হইবার আশা নাই। আমরা প্রারম্ভেই বলিয়াছি, ব্যস্ত হইলে চলিবে না। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ স্মরণ করিবেন। কতকগুলি ভক্ত একমনে ও একপ্রাণে সরল হৃদয়ে সমস্বরে যেখানেই শ্রীভগবান্‌কে ডাকিবেন, শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে আবির্ভূত হইবেন। ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বর্ণনায় শ্রীভগবান্‌ও ঠিক্ এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এক জায়গায় জুটিয়া কেবল চীৎকার ও লাফালাফি করিলেই হইবে না। হৃদয় মন এক হওয়া চাই, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা চিন্তা ও চেষ্টা এক হওয়া চাই। কাজেই এই সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব বা অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুনির্দ্দিষ্ট মীমাংসা পাইবার জন্য আমরা আশা করিব না। তাঁহাকে আমরা দলবদ্ধভাবে অন্বেষণ করিব; সত্য করিয়া,—আমাদের ধারণা ও ধ্যানের দ্বারা, আমাদের শাস্ত্রানুশীলন, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, আমাদের দয়া বা ভূতানুকম্পার দ্বারা তাঁহার অন্বেষণ করিব। অন্বেষণের পথ কোথায়, শাস্ত্র তাহা বলিয়া দিবেন, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ বা সাধু বা গুরু তিনি সেই শাস্ত্রীয় পথ বুঝাইয়া দিবেন। ধারণা ও ধ্যানের দ্বারা সেই পথে চলিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যের মহারথী পূজ্যপাদ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা নাই। ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের বাঙ্গলা রচনাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুরোধে একত্র করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, সেই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। সেই ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—'মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।'

এই ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতীভাষার অবোধ্যতা ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যে—'এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা, প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল।' তাঁহাদের ভাষা তত দুর্বোধ্য না হইলেও, ঐ ভাষা সার্ব্বজনীন নহে—ইহাই প্রমাণিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—'যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই (প্যারীচাঁদ মিত্র) তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত সম্বন্ধে আমরা দুইটি প্রশ্ন, সসম্মানে সাহিত্য-সমাজে উপস্থাপিত করিতেছি।

রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য রচনার সহিত, কি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই পরিচিত ছিলেন না? প্রকৃত কথা এই যে, মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের পিতা স্বর্গীয় রামনারায়ণ মিত্র মহোদয়, রাজা রামমোহন রায়ের একজন সুহৃদ্ ছিলেন। রামনারায়ণ বঙ্গভাষায় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক একখানি গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, স্বদেশে নানা বিভাগে নানারূপ কার্য্যের দ্বারা একটি বিপুল আন্দোলন জাগরিত করিয়া বিদেশে গমনপূর্ব্বক যে সময়ে ব্রিষ্টল্ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন (১৮৩৩ খ্রীঃ), তখন প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয়ের বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর (জন্ম ১৮১৪ খ্রীঃ)। প্যারীচাঁদ, পনর বৎসর বয়ঃক্রমকালে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির তিনি সহপাঠী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই প্যারীচাঁদ অতিশয় চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

বাল্যজীবনের এই ঘটনাগুলি হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি বাল্যকাল হইতেই, তাঁহার পিতৃবন্ধু রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা, চেষ্টা ও রচনাবলীর সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বাঙ্গলা সাহিত্য-সাধনার আলোচনায়, রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকাল ইংরাজী ১৮২০ খ্রীঃ; অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয় তাঁহাদের ছয় বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং অক্ষয়কুমার দত্ত বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য সংস্কৃতানুসারী রচনা-রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর, তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে প্যারীচাঁদ মিত্রের কথ্য-ভাষার রচনা-রীতি যে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে।

আমাদের বিশ্বাস, রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীর সাহায্যে, তাঁহার রচনা-রীতি অনুভব করিলে ইহা দেখা যাইবে যে, একদিকে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃতানুসারী সুবোধ্য ভাষা, আর একদিকে প্যারীচাঁদ মিত্রের কথ্য ভাষা—এই উভয়েরই বীজ, রাজা রামমোহন রায়ের রচনায় সংমিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। প্রয়োজনের তাড়নায়, রাজা রামমোহন রায়ের পর, এই দুইটি ধারা স্বভাবতঃই বিভক্ত হইয়া গেল।

প্যারীচাঁদ মিত্র উপন্যাস লিখিয়াছেন, গল্প লিখিয়াছেন, লৌকিক চিত্রাবলী সাহিত্যে চিত্রিত করিয়াছেন এবং বহুলপরিমাণে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া সাহিত্যকে সরস ও হৃদ্য করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য ক্ষেত্রের বিপুলতা নিবন্ধন কথ্য-ভাষার শক্তি, তাঁহার রচনায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় পণ্ডিতদের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব, সামাজিক আচার ব্যবস্থা প্রভৃতি গভীর বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিচারেই তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্য-সাধনার সামর্থ্য প্রধানরূপে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। কাজেই, কথ্য ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে, তাঁহার হস্ত রীতিমত শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তাঁহার যে সমুদয় রচনা 'সংবাদ-কৌমুদী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সাহিত্য-রচনায় কথ্য-ভাষা ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন করিবার চেষ্টা তাঁহার ভিতর পরিপূর্ণরূপেই ছিল। অন্যান্য গভীর বিষয়ের আলোচনাতেও ইহার নিদর্শন আছে। তাহার পর রাজা রামমোহন রায়, সমাজ-সংস্কারক রূপে দেশের জনসাধারণের উন্নয়ন কার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। দেশীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন কার্য্যে, এই জন্যই তাঁহাকে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের কথ্য-ভাষার প্রবর্ত্তন কার্য্যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব ও সাহায্য বিশেষভাবে স্বীকার করা আবশ্যক।

রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের

পুষ্টিসাধনে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের জনসাধারণকে প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের তত্ত্ব শিখাইবার জন্য ও দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিবার জন্য, গদ্য-সাহিত্যের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জনসাধারণকে কোন বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করা যখন উদ্দেশ্য, তখন ভাষাকে সুবোধ্য করিবার জন্য বহুলপরিমাণে কথ্য-ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের বাঙ্গলা গদ্যে গ্রন্থাদি রচনার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজ যুবকেরা এদেশে রাজকার্য্য করিবার জন্য আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশীয় পণ্ডিতেরা এই কলেজের পাঠ্যপুস্তক লিখিতেন। কিন্তু ঐ সমুদয় গ্রন্থ, অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুসারী ও দুর্ব্বোধ্য। সেই গ্রন্থের দ্বারা কলেজের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা যথার্থরূপে সিদ্ধ হইত না। খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণ কলেজের এই অভাব পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। মহাত্মা কেরী, কলিকাতার ইংরাজ শাসকগণ কর্ত্তৃক প্রথমাবস্থায় উপেক্ষিত হইয়াও, শেষে যে আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সসম্মানে গৃহীত হইলেন, তাহার ইহাই কারণ।

রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্যের সাধনায় দেশের লোককে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই কার্য্যেই তাঁহাকে তাঁহার অধিকাংশ শক্তি ও সময় নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। কাজেই, ইংরাজ রাজপুরুষগণের বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষালাভ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার মনে জাগ্রত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের পর, বহুজনে বহুদিক্ হইতে রাজার আরব্ধ কার্য্য বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। রাজা রামমোহনের আরব্ধ কার্য্যের অনেকগুলি, প্যারীচাঁদ মিত্রের সাধনার বিষয় ছিল। ইহা তাঁহার জীবনী ও গ্রন্থাবলী আলোচনা দ্বারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়।

রাজা রামমোহন রায়, ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমনে, অত্যন্ত আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার সময়ের বা তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় ইংরাজ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা কামনা করিতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ—'আলালের ঘরের দুলাল'-এর একটি ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে—এই গ্রন্থপাঠে বৈদেশিকগণ, বাঙ্গালার কথ্য-ভাষা শিখিতে পারিবেন, হিন্দু সমাজের আচার নিয়ম, বঙ্গদেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রা-পদ্ধতি প্রভৃতিও এই গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই ভূমিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদেশীয়গণকে আমাদের দেশের কথ্যভাষা ও দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত করান, এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য ছিল। সমাজ সংস্কারও যে এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও গ্রন্থকার ঐ ইংরাজী ভূমিকায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। সুতরাং প্যারীচাঁদ মিত্রের বাঙ্গলা সাহিত্যের

বাঙ্গলায় রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তিতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়কে বাদ দিয়া প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করা যায় না। কেবল প্যারীচাঁদ মিত্র কেন? নবীবঙ্গের সাহিত্য ও সাধনা, আজ বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের পুরোদেশে উপস্থিত। ইহার যে কোন অংশের আলোচনায় রাজা রামমোহন রায়ের প্রেরণার আলোচনা করিতেই হইবে। কিন্তু মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা রামমোহন রায়কে বর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। ইহার সঙ্গত কারণ কি?

বাঙ্গলা সন ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের 'বঙ্গদর্শন'-এ, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গলা ভাষা—লিখিবার ভাষা' সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচারিত করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের প্রাথমিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং সাধুভাষা ও কথ্যভাষার দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নবীন লেখকগণকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি বড়ই মূল্যবান। বাঙ্গলার সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁহারা লেখনী চালনা করেন, প্রথমাবস্থায় তাঁহাদের সকলেরই এই প্রবন্ধটি বিশেষ ভাবে পাঠ করা আবশ্যক। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধেও আমাদের দুই একটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম কথা—এই প্রবন্ধেও রাজা রামমোহন রায়ের নামও উল্লিখিত হয় নাই। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গলা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।' বাঙ্গালায় প্রচলিত ভাষায় প্যারীচাঁদ মিত্র উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। উপন্যাস রচনায় তিনি বহুল পরিমাণে কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, এবং কথ্য-ভাষার শক্তি ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, কথ্য-ভাষার রচনাকে—'টেকচাঁদী ভাষা' বলিয়াছেন। অবশ্য নামকরণে কোন আপত্তি নাই—বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র যে নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সে নাম সাহিত্যে রক্ষা করাই সঙ্গত। কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয় যে, সকল সময়েই কথ্যভাষায় লিখিতেন তাহা নহে। কাজেই, এই কথ্যভাষাকে—'আলালী ভাষা' বলিলে অধিকতর সঙ্গত হইবে।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের রচনা-রীতি ও সাহিত্যিক-প্রকৃতি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্গসমাজে যে বিচিত্রমুখী জাগরণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিরই প্রভাব প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য-সাধনায় সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম-উপাসনা, আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা, কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া প্রকারান্তরে ঐ মহাত্মাদ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের অনেক রচনায় ভাষা,

অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষারই প্রায় তুল্য এবং রাজা রামমোহন রায় যে ভাষার রচনা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারই মার্জ্জিত মূর্ত্তি। সুতরাং কি মানস-জীবনে, কি বাহিরের রচনা রীতিতে রাজা রামমোহন রায়ই প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রেরণাদাতা।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য-রচনায় ভাবানুযায়ী যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রকৃত প্রস্তাবে সেই মধ্য পথেরই পথিক। গভীর বিষয়ের রচনায় তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অক্ষয়কুমার দত্ত বা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়েরই ভাষার মত। তবে উপন্যাস রচনায় পাত্র পাত্রীর অবস্থা ও শিক্ষানুসারে সংস্কৃত নাটকে যেমন নানা প্রকারে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন আছে, সেইরূপ কথ্য-ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র ও ব্যবহার বর্ণনায় তিনি বহুল পরিমাণে কথ্য-ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবহারেই তাঁহার কৃতিত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগকে কথ্য-ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজন বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে—মিঠাই মণ্ডা খাইতে খাইতে জিহ্বার একরূপ বিকৃতি হয়; তখন আদার কুচি, কুমড়ার অম্বল প্রভৃতি একটু মুখে দেওয়ার দরকার হইয়া পড়ে। সাহিত্যেরও সেইরূপ সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষা শুনিতে শুনিতে কর্ণের বা মনের একপ্রকার ক্লান্তি জন্মায়। সেই সময়ে কথ্য-ভাষার চাটনি পাইলে, হৃদয় ও কর্ণ উভয়েরই রসায়ন স্বরূপ হইয়া থাকে। ইহাই কি কথ্য-ভাষা ব্যবহারের উপযোগিতা?

সাহিত্যে কথ্য-ভাষার যদি ইহাই মূল্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্যকে আমরা নিতান্ত বাহিরের জিনিষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি বলিয়াই মনে হয়। সাহিত্যে যে শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার অর্থের উপরই শব্দটীর সার্থকতা নির্ভর করে না। সংস্কৃত শব্দের অতি উচ্চাঙ্গের ব্যঞ্জনা-শক্তি আছে। সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থের প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ টীকাকারগণের টীকায় কেবল শব্দের নহে,—যে ধাতু হইতে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ধাতুর ব্যঞ্জনা-শক্তির দ্বারায় কাব্য যে কিরূপ হৃদ্য ও সরস হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু অপ্রচলিত ও ভদ্র সমাজে স্বল্পপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি বঙ্গীয় পাঠকের নিকট সহজ-লভ্য নহে। যাঁহারা পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যালোচনায় যাঁহাদের মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও রুচি মার্জ্জিত হইয়াছে, ব্যঞ্জনা-শক্তি সঞ্জাত এই রস তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন। সুতরাং মৃত বা অপ্রচলিত বা স্বল্প-প্রচলিত ভাষার শব্দ, বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইলে সাহিত্যের ব্যঞ্জনা-শক্তির যে অশরীরী আনন্দ, তাহা বিশেষভাবে পাওয়া যায় না। কথ্য-ভাষায়, আনন্দের সময়, উল্লাস ও উৎসাহের সময়, কৌতুক রসের জাগরণের সময়, মানুষ স্বভাবতঃ এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে, যাহার শক্তির তুলনা নাই। আবার এই শব্দগুলি অনেক স্থলে ধ্বন্যাত্মক—অর্থাৎ তাহাদের কোন ব্যাকরণশুদ্ধ আভিধানিক অর্থ নাই। এই

শব্দ বা তার প্রয়োগের উপকরণগুলিকে যদি সাধুভাষার অনুরোধে সাহিত্য-রচনা হইতে বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে সাহিত্য শ্রীহীন, নীরস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে—মানবের প্রকৃত হৃদয়ের সতেজ প্রতিধ্বনি সাহিত্যের মধ্যে ঝঙ্কৃত হয় না। কাজেই এই শব্দগুলি ব্যবহার করা আবশ্যক। কিন্তু বিপদও আছে। মানবের অমার্জ্জিত নিম্নবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যঞ্জনাও লৌকিক শব্দের ভিতর রহিয়াছে। সাহিত্য যখন মানবকে উন্নীত করিতে চাহে, যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর—তাহাকেই মূর্ত্তিমান করিতে চাহে, তখন একদিকে কথ্য-ভাষার সামর্থ্য রক্ষা করিতে হইবে—আর একদিকে কথ্য-ভাষার নিম্নস্তরের মলিন ব্যঞ্জনাযুক্ত শব্দসমূহ বর্জ্জন করিতে হইবে।

তাহার পর প্রাদেশিকতা একটি অন্তরায়। বীরভূমের লোকও বাঙ্গালী—শ্রীহট্টের লোকও বাঙ্গালী। বাঙ্গলা দেশই যে একটা মহাদেশ। সুতরাং প্রাদেশিকতার আপত্তিও কথ্য-ভাষার প্রয়োগে উপেক্ষণীয় বা অসঙ্গত নহে। ফলতঃ, সাহিত্যে কথ্য-ভাষার প্রয়োগ বড়ই কঠিন। সংস্কৃতানুসারিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, কথ্য-ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনা করিয়া সেই গ্রন্থকে বিদ্বজ্জনের অনুমোদিত করা বড়ই কঠিন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় 'হুতোম পেঁচার নক্সা'য় কথ্য-ভাষার ব্যবহার, প্যারীচাঁদ মিত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর।' বঙ্কিমচন্দ্র, 'হুতোমি'-ভাষার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—'সাহিত্যের মহৎ উদ্দেশ্য, এই ভাষায় সিদ্ধ হইতে পারে না, এই ভাষা দরিদ্র, নিস্তেজ, এই ভাষার বন্ধন নাই—'হুতোমি' ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি 'হুতোম-পেঁচা' লিখিয়াছেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করিনা।'

বাঙ্গালা ভাষার রচনা-রীতি সম্বন্ধে খুব ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। রচনারীতির আলোচনা বড়ই গভীর বিষয়। হুতোমি-ভাষা সম্বন্ধেও মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য ধীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা সাহিত্য-রথিগণের মনোযোগ এই দিকে বিনীতভাবে আকর্ষণ করিতেছি।*

শ্রীশিবরতন মিত্র

* ১৩৩০ বৈশাখ সংখ্যা "বঙ্গবাণী" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

আলোচনা ও অনুশীলন

সাহিত্য-সম্মিলন

এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন লইয়া বেশ খোলাখুলি রকমের দলাদলি হইয়া গেল। কেমনই বা দলাদলি হইল, কর্ম্মিগণ পৃথক্ হইয়া কি কি করিলেন, এবং তাহার দ্বারা কলাফলই বা কি, সে সম্বন্ধে খবরের কাগজে বেশী কিছু আলোচনা হয় নাই। এই দলাদলি যদি একটা ব্যাধিই হয়, তাহা হইলে তাহার নিদানও জানা গেল না, লক্ষণও ধরা গেল না—কাজেই চিকিৎসক থাকিলেও চিকিৎসার উপায় নাই।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মূল সভাপতি, কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা একজন শাখা-সভাপতি। তাহা ছাড়া পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন, নাট্যকার অমৃতলাল বসু, শান্তিনিকেতনের বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ রায় মহাশয় এক এক শাখায় অধিষ্ঠিত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি,—কেহ ধনে মানে, কেহ জ্ঞানে বিদ্যায়, কেহ নামে, যশে। সুতরাং বিরোধ কেন?

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তুর উপর সভার স্থান না করিয়া একটু দূরে করা হইল, ইহাই কি বিরোধের হেতু? বঙ্কিমের অতিভক্তগণ কি বঙ্কিমের বাস্তুভিটার ধূলিরাশিকে উপেক্ষিত দেখিয়া মনের দুঃখে একটি প্রতিযোগী সম্মিলন করার সঙ্কল্প করিলেন? ব্যাপারটা যদি ব্যক্তিগত না হইয়া ভাবগত বা নীতিগত হয়, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করিবে কে? মূল সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তুভিটার উপরেই সম্মিলনের স্থান করিতে চহিয়াছিলেন, এবং সেজন্য চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই, একটু দূরে জায়গা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের অপরাধই বা কি?

বঙ্কিমের ভিটার উপরের সম্মিলনের অধিবেশন আগেই হইয়া গেল। তাহাতে আসিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, আসিতেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—কিন্তু শরীরের জন্য পারিলেন না। আর আসিলেন নাটোরের মহারাজা, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রামপ্রসাদ চন্দ্র আর ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। বড় বড় এক একখানা মাসিক কাগজকে যদি সাহিত্যের এক একটা ছোট ছোট দল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে—পূর্ব্বোক্ত তালিকার প্রথম দুইজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা, রাজনীতিক ও সংবাদ পত্র-লেখককে একত্রে "বঙ্গবাণী" মাসিকপত্র বলা যাইতে পারে। ইঁহারা ঐ কাগজখানির

সর্ব্বস্ব—প্রাণ ও আত্মা। সকলেই জানেন, এই কাগজখানি পরাক্রমশালী নরসিংহ বিচারপতি সার্, আশুতোষের।—পূর্ব্বোক্ত তালিকায় আরও দু একজন সার্ আশুতোষের আশ্রিত ও অনুগত। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হউক, দূর হইতে, মুখ্যভাবে না হউক গৌণভাবে, এমন কি জ্ঞাতসারে না হইয়া অজ্ঞাতসারে সার্ আশুতোষের প্রভাব এই প্রতিযোগী দলের মূলে আছে কি না, জানা যায় নাই। অবশ্য অন্যান্য কারণ—স্থানীয় ও দেশীয়, ব্যক্তিগত, চাকুরীগত বা ব্যবসায়গত তাহার সহিত মিশিয়া থাকিতে পারে।

যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী এই সম্মিলন সফল হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষগণ শেষে বলিয়াছেন বা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—ইহা প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন নহে—ইহা "বঙ্কিম-উৎসব" এবং বৎসর বৎসর ইহার অধিবেশন হইবে। শুভ প্রস্তাব, সন্দেহ নাই।

সম্মিলনের বিরুদ্ধে আর একটা দল যখন গড়িয়া উঠিল এবং তাঁহারা বিধিমতে যখন আপনাদিগকে জাহির করিতে লাগিলেন, তখন বর্দ্ধমান খবর দিলেন, দলাদলি হইলে তিনি সভাপতি হইবেন না, অর্থাৎ গোটা বাঙ্গলাদেশের যাবতীয় সাহিত্যিক একমত হইয়া যদি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি সাহিত্য-সম্মিলনকে অলঙ্কৃত করিতে অনিচ্ছুক। বিরোধী দল যখন সফলকাম হইলেন না, তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বর্দ্ধমানকে বুঝাইলেন, বিরোধ বা দলাদলি কিছুই নহে, একটি অতি সামান্য ব্যাপার—অতএব দয়া করিয়া আপত্তি করিবেন না।

মূল সম্মিলন হওয়ার পরেই আর এক প্রতিযোগী সম্মিলন হইল। হুগলীতে হইলে ভাল হইত—কারণ গঙ্গার ঠিক্ পরপার হইত, এবং ইংরাজী Rival কথাটার প্রয়োগ সুসিদ্ধ হইত। এই সম্মিলন বসিল হাবড়ায়—গঙ্গার পরপার—তবে কিছু দূর। শুনা যায় এই সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তা প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ নৈহাটিতেও পদধূলি দিয়াছিলেন—এখানেও দিয়াছিলেন। প্রবাসীর চারুবাবু প্রভৃতিও এখানে ছিলেন, সার্ আশুতোষের ভক্তেরাও ছিলেন। উপন্যাসের নব্যপন্থীগণ এই সম্মিলনে নিজেদের মর্ম্মকথা খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই সম্মিলনের মূল্য আছে। কিন্তু প্রতিযোগীরূপে করা হইল কেন? হাবড়ায় আর একবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, তাহা সার্ আশুতোষের বিজয়-নিশান। হাবড়ায় সম্মিলন হইয়া ভালই হইয়াছে, কিন্তু নৈহাটির শাস্ত্রী-বর্দ্ধমান সম্মিলনের প্রতিযোগীরূপে না হইলেই ভাল হইত।

শরৎ বাবুই যদি এই সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তা হন, আর প না দিয়া কাজ করা যদি ইহার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, ইহা শরৎ বাবুর জীবনের দ্বিতীয় মহাভুল। তাঁহার প্রথম ভুল রাজনীতির আসরে নামা, আর চিঠি লিখিয়া ছাড়িয়া যাওয়া, আর এইটি দ্বিতীয় ভুল।

দুই রকমের কাজ আছে এক ভাবের কাজ আর এক বাস্তব কাজ। যাঁহারা আনুগত্য করিয়া ধনবান্, পদস্থ ও প্রতিপত্তিশালী ভাগ্যবান্দিগের সহিত মিশিতে পারেন না, তাঁহারা শক্তি থাকিলে ভাবের কাজ করিতে পারেন। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাস্তব কাজ করিতে গেলে, যদি নিঃশব্দে করেন, শক্তি থাকিলে কিছু করিতে পারেন, কিন্তু সশব্দে করিতে গেলে কিছুতেই পারিবেন না।

সাহিত্য পরিষৎ হইয়াছে—সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে। দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকই যখন পৃষ্ঠপোষকতা চাহেন, দেশের অধিকাংশ লেখাপড়া জানা লোকই যখন চাকুরীজীবি, তখন সাহিত্য-পরিষদে বা সাহিত্য-সম্মিলনে ধনবান ও পদস্থ লোককে যতই লইতে পারা যায়, ততই সুবিধা। কেবল সুবিধা বলি কেন,—তাঁহাদের লইয়া আসা, তাঁহাদের অভিনন্দন দেওয়া, তাঁহাদের স্তবস্তুতি করা স্বাভাবিক। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন না, তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া শক্তি থাকে নীরবে কাজ করিবেন। একাই কাজ করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া কাজের পত্তন করিবেন। যদি কেহ আসেন সৌভাগ্যের কথা। আর শক্তি না থাকে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রার আয়োজন করুন। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার বেশী হইবে না—প্রমাণ কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ একদিকে, আর একদিকে অন্যবিধ প্রমাণ জন-সাধারণের কাগজ অমৃতবাজার-পত্রিকা।

কাশীমবাজারে হাঁটাহাঁটি করিয়া, লালগোলার বিদ্যোৎসাহী জমিদারকে তাঁহার কুটুম্বের দ্বারা আয়ত্ত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎটি হইয়াছে, সাহিত্যপরিষৎ হইতে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছে। সুতরাং টাকা তুলিয়া পুরস্কার দিয়া বই লেখাইয়া লওয়া, সাহিত্যিকদিগকে রাজসভার সভাপণ্ডিত করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য কি উপায়ে পরিষৎ বা সম্মিলন সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন?

শরৎ বাবু না কি খুব দুঃখিত—বাঙ্গালাদেশের ভদ্রসাহিত্যিকেরা তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিয়াছে। তিনি অপাংক্তেয় হইয়াছেন বলিয়া আমাদের দুঃখ নাই—তবে ইহার জন্য তিনি সুখী না হইয়া দুঃখিত বলিয়া আমরা তাঁহার জন্য আরও বেশী দুঃখিত।

ভদ্র সাহিত্যিকই বা কে, আর অপাংক্তেয়ই বা কে, ইহা বুঝিলাম না। চাকুরী-করা লোক যেখানে শ্রেষ্ঠ, সেখানে ভদ্রাভদ্রের বিচার কেন? শরৎ বাবুর পুস্তক বিক্রয় কি কিছু কমিয়াছে? যাহারা তাঁহার গ্রন্থ পড়ে তাঁহারা কি আর পড়িতেছে না? যদি তাহা না হয় তবে আর দুঃখ কেন? ইহাই প্রকৃত মানদণ্ড। বিদেশের লোকে বড় বলিয়াছে বলিয়াই যাহারা বড়, অন্য কোন কারণে নহে—তাহারা ছোট বলিলে যে দুঃখিত হয়, সে ছোট বলার জন্য ছোট নয়, দুঃখিত হওয়ার জন্য ছোট। সুতরাং এজন্য আলোচনা করা শরৎ বাবুর ভাল হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, আশা করি তিনি শান্ত হইয়াছেন?

অতএব, "যাহার শেষ ভাল, তাহার সব ভাল" এই নীতি অনুসারে—এই দলাদলি কিছুই নহে—

বাঙ্গালার সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্য-সম্মিলন, সাহিত্য পরিষৎ, লেখক, পাঠক, বক্তা, সভাপতি, সকলেরই জয় হউক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। ৩১শে আষাঢ়ের "বীরভূম বার্ত্তা"য় আমরা তাঁহার পত্রখানি পড়িলাম। মোটামুটি অভিযোগ এই—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এমনভাবে নির্ব্বাচিত হয় প্রত্যেক বৎসরে 'গুটিকত মার্কামারা লোক সভ্য ও কার্য্যাধ্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। "বোধ হয় তাহারা সকলে এইভাবে কোনরূপ সাহিত্য-চর্চ্চা না করিলেও সাহিত্যরথী বলিয়া জাহির হইতে চাহেন।" লেখক ইহার সুবিচারপ্রার্থী। বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে সভাপতি শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি—তাহাতে সাধারণভাবে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এই পত্রখানি তাঁহার মন্তব্যের পুষ্টি করিতেছে। এ বিষয়ে দেশে একটা চিন্তা ও আলোচনা জাগিয়া উঠিয়াছে—সুতরাং সংস্কার অবশ্যম্ভাবী।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

১। সাময়িক সাহিত্য

শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-গৌরাঙ্গ—[শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও ধর্ম্মপ্রচারিণী মাসিক পত্রিকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস গোস্বামী, ৭ বিডন্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। বার্ষিক ভিক্ষা ২।৵০] আমরা প্রথমবর্ষের প্রথম ৪ মাসের কাগজ পাইয়াছি—১৩২৯ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মে বা বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনেকগুলি দল আছে—এবং দলাদলিও আছে। বর্ত্তমান সময়ে সেই দলাদলি কমিতেছে না, বাড়িতেছে। তবে প্রত্যেক দল যদি প্রকাশ্যভাবে নিজেদের মত স্পষ্ট করিয়া বলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে একটা মীমাংসা হইতে পারে। দলাদলি তত্ত্বগত হইলেই অবশ্য মীমাংসা হইবে, কিন্তু দলাদলির মূলে পার্থিব স্বার্থ বা ব্যবসায় বুদ্ধি থাকিলে মীমাংসা হইবে না, দেশের উন্নতি হইলে ধ্বংস হইবে। "বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" এই যুগল-উপাসনা বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে একটি বিশিষ্ট দল—সুতরাং তাঁহাদের যাহা মত, সম্প্রদায়িক লোক ছাড়া, যাহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের

তুলনামূলক আলোচনা করেন, তাঁহাদেরও এই মতের ব্যাখা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা আবশ্যক। এই কারণে আমরা এই পত্রিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব কামনা করি। শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহাশয় সুলেখক, বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা এই প্রকারের একখানি পত্রিকার প্রকাশ, আনন্দের কথা। যুগের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্মমত ব্যাখা করিবার জন্ত তিনি চেষ্টা করিলে দেশের উপকার হইবে। আমরা বারান্তরে বিস্তৃততর আলোচনা করিব।

গৌড়দূত—মালদহের সাপ্তাহিক পত্র—এখানি স্বাধীনপত্র অর্থাৎ সরকারী ইস্তাহার-পুষ্ট নহে। আমরা দুই সংখ্যা পাইয়াছি। আমরা এই পত্রে একটি কথা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। দেশবন্ধু দাসের দলের লোক মালদহে গিয়া চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা সেখানে বিক্রীত না হয়। আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, যে ইহা সত্য কথা। কিন্তু গৌড়দূত নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ, অতএব অবিশ্বাসই বা করি কিরূপে—ভগবান্ সর্ব্ববিধ নীচ ও ক্ষুদ্র চেষ্টা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। গ্রন্থ-সাহিত্য

মর্ম্মবাণী—[শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত, কবিতাপুস্তক মূল্য চারি আনা। শান্তিপুর, প্রেমনিকেতন হইতে শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত] এই পুস্তকের কবিতাগুলির ভাষা যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, ভাবও তেমনি পবিত্র। প্রত্যেক কবিতাই ভক্তিরসপূর্ণ ও উদারভাবের উদ্দীপক। বালক বালিকাগণকে এই প্রকারের কবিতাপুস্তক পড়িতে দেওয়া আবশ্যক। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হওয়ার উপযুক্ত. পারিতোষিক পুস্তকরূপে বালক বালিকাগণকে দিলে তাহারা আনন্দিত ও উপকৃত হইবে।

ব্রহ্মদর্শন—[শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্, এ, প্রণীত। শ্রীমতী শকুন্তলা রাও এম, এ, কর্ত্তৃক ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা আকারের ৫৪ পৃষ্ঠা গ্রন্থ, মূল্য ।৵০ মাত্র।]

এই গ্রন্থে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শনের সর্ত্ত, নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, সত্যেন লভ্যঃ, ব্রহ্মদর্শনের অধিকার, এই কয়েকটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট প্রচারক; সুপণ্ডিত, সুলেখক, ত্যাগী ও সাধুপুরুষ।

আমাদের দেশে এখনও এমন হতভাগ্য লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, "আমি হিন্দু আমি ব্রাহ্মদের বই পড়িব কেন?" অথবা "আমি ব্রাহ্ম আমি হিন্দুদের বই পড়িব কেন?" এই সকল লোক হতভাগ্য ও চিরবঞ্চিত। এই গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়িলে ধর্ম্মান্বেষী ও সত্যজিজ্ঞাসু মাত্রেই উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক ভাবের লেশমাত্র নাই, ইহা বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সত্য-

ধর্ম্মের গ্রন্থ। উপনিষদের ব্রহ্মদর্শন্ বা ভারতীয় মহর্ষিগণের অপরোক্ষ অনুভূতি বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে মূল সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া শাক্যসিংহ, ইশা, রূপসনাতন, শ্রীচৈতন্যদেব, ফ্র্যান্সিস্, মহম্মদ, এবং বর্ত্তমান যুগের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অভিজ্ঞতার সাহায্যে লেখক দেখাইয়াছেন —"ব্রহ্মদর্শন আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটি জীবন্ত অনুভূতি। বিভিন্ন দেশের সাধুগণ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। * * ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে তাঁহারা ঈশ্বর-দর্শন করিয়াছেন; কেবল তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় মিল আছে তাহা নয়, তাঁহাদের ভাষাতেও আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। এই অভিজ্ঞতাকে তাঁহারা দর্শন আখ্যা দিয়াছেন। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা ব্রহ্মদর্শনের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।" ইহাই গ্রন্থের উপসংহার।

মানবের সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস শোনা কথা বা শেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম অবস্থায় ইহা ভাল ও দরকার; কিন্তু এই বিশ্বাস জীবনের কঠোর পরীক্ষায় ও ঘাত-প্রতিঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। মানুষের জ্ঞানশক্তির উপর সন্দেহ করিবেন না, সংশয় ভাল, মানুষ সরলপ্রাণে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করুক। প্রকৃত বিশ্বাসে ও জ্ঞানে বিরোধ নাই। জ্ঞান বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ও সমুজ্জ্বল করে। ইহাই দ্বিতীয় স্তর। ইহার উপরে আর একটি স্তর আছে, সেখানে আর যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নাই, তাহারই নাম ব্রহ্মদর্শন। মানব আত্মায় পরমাত্মার প্রকাশ, একটি মৌলিক অভিজ্ঞতা —বর্ণনা পড়িয়া বা অন্যের মুখে শুনিয়া তাহা বোঝা যায় না, নিজের অভিজ্ঞতায় জানিতে হয়।

গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে যে সমুদয় সাধন প্রণালীর আলোচনা করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই নিরপেক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অনেকে তপস্যা বলিতে কেবলমাত্র শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধন বুঝিতেন, এখনও অনেকে সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন—শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধনেরও প্রয়োজন আছে। শরীরের সঙ্গে ধর্ম্মের নিগূঢ় যোগ আছে। শরীরের সঙ্গে মনের গূঢ় যোগ আছে; মনকে দমন করিতে হইলে শরীরের সংযম আবশ্যক। শরীরকে যথেচ্ছ ভোগ ও বিলাসের স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মসাধন অসম্ভব না হইলেও সুদুষ্কর। গ্রন্থকার ইহা বলিয়াছেন— আমরা বলি "অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।" মধ্যযুগের অতিকৃচ্ছ্র-বাদ ও আধুনিক যুগের কৃচ্ছ্র-ত্যাগবাদ বা যথেচ্ছ ভোগ-বাদ, লেখক এই দুই মতের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার ধর্ম্মও এইরূপ। বুদ্ধদেব ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেন কিছু বলেন নাই, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর।

শ্রীমদ্ভাগবতের ধারণা ও ধ্যান

১। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিমত

আমাদের দেশে এখনও শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের বেশ আলোচনা আছে। নানাস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ ও কথকতা হইয়া থাকে। ইহা বড়ই সুখের বিষয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলির জীবকে এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। "শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং"। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা উচিত। দেবানন্দপণ্ডিতকে কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই এই কথা বলা হইয়াছে, যে বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয় এবং অব্যয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই সত্য, মহাপ্রলয়েও ইহার পূর্ণশক্তি বিদ্যমান থাকে। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত এই ভক্তিতত্ত্ব জানা যায় না, নারায়ণ মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র, এই ভক্তির তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, এই কারণে অন্য কোন শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের সমান নহেন। মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি শ্রীভগবানের অবতার-সমূহ যেমন নিত্য, সময়ে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়, আবার সময়ে তাঁহাদের তিরোভাব হয়, সেই প্রকার এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রেরও কখন আবির্ভাব হয় আবার কখন তিরোভাব হয়, ইনি নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিযোগে শ্রীব্যাসদেবের জিহ্বায় এই শ্রীমদ্ভাগবত স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের তত্ত্ব যেমন অবোধ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বও ঠিক সেইরূপ। যিনি মনে করেন যে ভাগবত জানেন, তিনি ভাগবতের প্রমাণ কিছুই জানেন না। অজ্ঞ হইয়াও যিনি ভাগবতের শরণ গ্রহণ করেন, ভাগবতের অর্থ তাঁহার নিকট আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। ভাগবত প্রেমময়,

ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় গোপ্য-লীলা এই গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছে। বেদব্যাস বেদ ও অন্যান্য পুরাণ প্রচার করিয়া চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীভাগবত যে সময়ে নারদের কৃপায় ও উপদেশে তাঁহার জিহ্বায় স্ফূর্ত্তিলাভ করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ, তাহা শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ চরণদ্বয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দুই উরু, পঞ্চম নাভি, ষষ্ঠ কটিদেশ, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টম বাহু, নবম স্কন্ধদেশ, দশম বদন, একাদশ ললাট, আর দ্বাদশস্কন্ধ মস্তক।

২। অষ্টাঙ্গ যোগ

শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদিগকে একটি কথা সর্ব্বদাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সময় এই কথাটি প্রতিপালন করিতে হইবে। এই কথাটি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথমে, যখন শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমেই অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ দিলেন।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—ইহাদের নাম অষ্টাঙ্গ যোগ। শ্রীশুকদেব অতি সংক্ষেপেই অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ যে অষ্টাঙ্গ যোগ-বিষয়ক তাহা আমরা পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধরস্বামী মহোদয়ের টীকা হইতে বুঝিতে পারি। শ্রীশুকদেব বলিলেন, অন্তকাল উপস্থিত হইলে,—অর্থাৎ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে, এই দেহ ও এই সংসার আর থাকিবে না, এই বোধ দৃঢ়রূপে অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিলে এবং মানবজন্ম লাভ করিয়া কেবলমাত্র এই ইহলোকের সুখ সুবিধা লইয়াই বিব্রত থাকা উচিত নহে, পরমার্থের সন্ধান করা একান্তভাবে আবশ্যক, এই চিন্তা অন্তর মধ্যে জাগ্রত হইলে, মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য মৃত্যুভয় পরিহার করা। মৃত্যুভয় পরিহার করিয়া অনাসক্তিরূপ শাস্ত্রের দ্বারা দৈহিক সুখেচ্ছা, এবং স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যে স্নেহবন্ধন তাহা ছেদন করিতে হইবে।

সংসারে থাকিয়া যে এ অবস্থায় ধর্ম্মসাধন হইবে না তাহা নহে, কিন্তু সংসারে থাকিলে পুনরায় আসক্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব সংসার হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাওয়াই সঙ্গত।

শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় 'সংসার হইতে চলিয়া যাওয়া'র হেতু দেখাইয়াছেন,—মূলে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে এই হেতু নাই। হেতু এই, যে সংসারে থাকিলে পুনরায় আসক্তি জন্মিতে পারে, সুতরাং চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর। তাহা হইলে এ বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা থাকিল। সংসার হইতে চলিয়া গেলেই যে অমনি আপনা হইতে পরমার্থলাভ হইবে তাহা নহে। আবার যাহাতে নূতন করিয়া আসক্তি না জন্মে, সেজন্য সংসার ছাড়িয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু এমন অবস্থাও হয় যে সংসার ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গেলেই আসক্তি বাড়িয়া যায়, আর সাধনশীল হইয়া শান্তিময় ও পুণ্যময় সংসারে থাকিলে আসক্তি জন্মে না। এরূপ অবস্থা যখন ঘটে বা ঘটিতে পারে, তখন সংসার ছাড়িয়া যাওয়া বা সংসারে থাকিয়া পরমার্থ সাধন করা, ইহা প্রত্যেক মানবের বিবেচনাধীন অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের ভিতরের ও বাহিরের অবস্থা, উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে নিজের কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। কোন গুরু বা কোন শাস্ত্র, এ বিষয়ে "ইহাই কর" এ প্রকারের উপদেশ দিবেন না। পরমার্থ-সাধনের রাজ্যে প্রথম হইতেই শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ লইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় নাই, অর্থাৎ অন্তর্মুখী হইয়া চিন্তা করিবার সামর্থ্য যাহার নাই, তাহার পক্ষে পরমার্থরাজ্যে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব।

আসক্তি নিবারণের জন্য গৃহত্যাগের কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিৎকে সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করিলেন।

প্রথমে বলিলেন ধীর হইবে। শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিলেন—'ব্রহ্মচর্য্যাদি যমোপলক্ষণং'। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম সাধনাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাদেরই নাম "যম"। যোগ-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে "যম" কহে। এই পাঁচ প্রকারের যম যদি সকল অবস্থায়, সকল স্থানে ও সকল সময়ে পালন করা যায়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেকটিই এক এক মহাব্রত।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাযমাঃ।
এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্॥

পাতঞ্জলদর্শন সাধনপাদ ৩০ ও ৩১ সূত্র।

তাহার পর শ্রীশুকদেব বলিলেন—"পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ"। শ্রীধরস্বামী বলিলেন—"পুণ্যতীর্থেতি স্নানাদি-নিয়মোপলক্ষণং"। পুণ্যতীর্থের জলে স্নান করিবে, ইহার অর্থ স্নানাদি নিয়ম-সম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ যে নিয়ম, তাহা প্রতিপালন করিবে।

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রাণিধান, এই পঞ্চপ্রকার অনুষ্ঠানকে নিয়ম বলা যায়।

নিয়মের মধ্যে বাহ্য শৌচ ও অন্তর শৌচ, দ্বিবিধ প্রকারের শৌচই রহিয়াছে, এবং বাহ্য শৌচ যে অন্তর শৌচের জন্য প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য।

তাহার পর শ্রীশুকদেব বলিলেন—

"শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে।"

পবিত্র অথচ নির্জ্জন স্থানে যথাবিধি আসন কল্পনা করিয়া, অর্থাৎ কুশ, অজিন (মৃগ-চর্ম্ম) ও চেলবস্ত্রদ্বারা আসন রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবে। ইহাই অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ অর্থাৎ আসন। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

স্থিরসুখমাসনম্। ৪৬

প্রযত্ন শৈথিল্যানন্ত সমাপত্তিভ্যাম্॥ ৪৭

ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮

যে প্রকারের বসিবার পদ্ধতি নিশ্চল, উদ্বেগশূন্য এবং সুখজনক, তাহাই প্রকৃত আসন। স্বভাবতঃ যে প্রণালীতে উপবেশন করা যায়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যোগশাস্ত্রীয় উপদেশানুসারে আসন অভ্যাস করিলে, অনন্তে মগ্ন হওয়া যায় এবং অচৈতন্যের নিবারক যে তন্ময়তা, তাহা লাভ করা যায়। তাহা হইলে আসন-অভ্যাস আর কষ্টকর হয় না। আসন-সিদ্ধি হইলে আর শীত গ্রীষ্মের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না, ক্ষুধা এবং পিপাসাও ব্যাকুল করিতে পারে না।

আসনের পর প্রাণায়াম। ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ। শ্রীশুকদেব বলিলেন—

অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃৎ ব্রহ্মাক্ষরং পরং।

মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥

অকার, উকার, মকার, এই তিন অক্ষরে গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর বা প্রণব মনে মনে আবৃত্তি

করিবেন অর্থাৎ জপগর্ভ প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহার পরের কার্য্য প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় সমূহ হইতে আকর্ষণ করার নাম প্রত্যাহার। ঐ কার্য্য করিবার জন্য প্রণবকে বিস্মৃত না হইয়াই নিশ্বাস জয়পূর্ব্বক মনকে সংযম করিবে। ইহাই প্রাণায়াম।

যোগশাস্ত্রে আছে—

তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। ৪৯

আসনসিদ্ধি বশে শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম করিয়া যোগ শাস্ত্রমতে রেচক, পূরক ও কুম্ভকের দ্বারা যাহা সমাধা করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম।

প্রণায়ামের পর প্রত্যাহার। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

নিযচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোঽক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।

মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আনিবেন, আর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই আপনার সারথি করিবেন।

যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন—

ইতীন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥ ৫৪

যে সকল বিষয়ে, যে সকল বস্তুতে, ইন্দ্রিয়গণ আসক্ত আছে, সেই সকল বিষয় ও সেই সকল বস্তু হইতে তাহাদের বিরত করিয়া, সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত অবস্থায় তাহাদিগকে নির্ব্বিকার চিত্তস্বরূপের অধীন করার নাম প্রত্যাহার।

ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্॥ ৫৫

ঐ প্রকার প্রত্যাহার প্রভাবে অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়।

প্রত্যাহারের পর ধারণা।

মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া॥

মন কর্ম্মবাসনায় আকৃষ্ট হইলে, বুদ্ধিযোগে তাহাকে ভগবানের রূপের প্রতি ধারণা করিবেন।

যোগশাস্ত্র ধারণা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।

—বিভূতিপাদ প্রথম সূত্র।

নাড়ীচক্রে, ভ্রূমধ্যে, নাসাগ্রে অথবা কোন দিব্যমূর্ত্তিতে চিত্ত আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনোনির্বিবষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎপরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি॥

ধারণার পর ধ্যান। ধ্যানের প্রণালী এই,—মনের দ্বারা শ্রীভগবানের কর চরণ প্রভৃতি এক একটি অঙ্গ চিন্তা করিবেন। ধারণাকালে সমগ্ররূপে সাধারণভাবে মন স্থাপন করা হইয়াছে, ধ্যানের সময় এক এক অঙ্গ চিন্তা করিতে হইবে, কিন্তু এই এক এক অঙ্গ চিন্তা করিবার সময় সমগ্র মূর্ত্তিটি যেন একেবারে ভুলিয়া না যাই। সমগ্র মূর্ত্তিটি একবারে ভুলিয়া গেলে, ধ্যানের দ্বারা কোনই কার্য্য হইবে না। ধ্যানের পর মন নির্বিবষয় হইয়া যাইবে। তখন সমাধি। এইরূপে যাহাতে মন উপশান্ত হয়, তাহাই বিষ্ণুর 'পরমপদ'। বিষ্ণু, ভগবান্, আর পদ শব্দের অর্থ—স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম। এই প্রকারে সমাধি-সাধনে যদি বিঘ্ন উপস্থিত হয়, অর্থাৎ রজোগুণ বা তমোগুণের দ্বারা যদি বিক্ষেপ বা বিমূঢ়তা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ধারণা দ্বারা মনকে শোধিত করা আবশ্যক। রজোগুণ তমো-গুণের দ্বারা মনের যে মলিনতা উপস্থিত হয়, ধারণা দ্বারাই তাহা দূর করিতে পারা যায়। ধারণা দ্বারা ভক্তিযোগও সত্বর সাধিত হয়।

এই পর্য্যন্ত শ্রীশুকদেবের প্রথম উপদেশ এবং ভাগবতধর্ম্মের সাধনায় এই উপদেশ-গুলিকে প্রথম সোপানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর মহারাজা পরীক্ষিত এই ধারণা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন এবং শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের স্থূলরূপে কি প্রকারে মনের ধারণা করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিবেন। সে সমুদয় কথা অন্যত্র আলোচনা করা হইবে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ধারণা ও ধ্যান কি, তাহারই আলোচনা করিব।

৩। হঠযোগ ও রাজযোগ

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম পাঁচটি অঙ্গ অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সকল শ্রেণীর সাধকের জন্যই প্রয়োজন। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষতঃ যোগশাস্ত্রে, এই অঙ্গগুলি যেরূপ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে সেরূপ বিস্তৃতভাবে

বলা হয় নাই। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে অতিশয় সংক্ষেপেই এই কথাগুলি বলিয়াছেন। ইহার বিশেষ কারণ আছে। এই অঙ্গগুলির প্রয়োজন আছে, কিন্তু অনেক স্থলে এই প্রয়োজনকে অতিমাত্রায় বাড়াইয়া ফেলা হয়। এইগুলির প্রয়োজন অতি-মাত্রায় বাড়াইয়া ফেলিলে, ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এ প্রকারের অনিষ্ট অনেকেরই হইয়াছে, একালেও অনিষ্ট হইতে দেখা যায়। প্রকৃত কথা, অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম কয়েকটি অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম মূলতঃ হঠযোগের অন্তর্গত। প্রত্যাহার—হঠযোগ ও রাজযোগের মধ্যবর্ত্তী, আর শেষ তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি মূলতঃ রাজযোগের অন্তর্গত। অবশ্য পাতঞ্জলদর্শন যে ভাবে এই অঙ্গগুলির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে হঠযোগ ও রাজযোগকে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই এবং তাহাই সঙ্গত ব্যবস্থা—কিন্তু পরবর্ত্তী কালের অনেক গ্রন্থে এই দুইটিকে অনেকটা পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবে, ইহাই সকলের উদ্দেশ্য। এই দেহ আত্মা নহে, কিন্তু আমরা দেহ লইয়াই যাবতীয় কার্য্য সাধন করিতেছি এবং অনেক সময়ে এই দেহ লইয়া বিব্রত ও বিপন্ন। এই দেহকে জয় করিতে হইবে অর্থাৎ দেহকে এমন অবস্থায় আনিতে হইবে যে, এই দেহ যেন আমার সাধনার বিঘ্ন না করে, পরন্তু আমার সাধনার সাহায্য করে। এই দেহ আবার স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে, প্রাণবায়ু এই দেহকে জীবিত ও ক্রিয়ান্বিত রাখিয়াছে, দেহের বিবিধ প্রকারের অবস্থা এই প্রাণবায়ুর দ্বারা ঘটিয়া থাকে। এই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং তাহাকেও আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহার পর এই ইন্দ্রিয়গুলি, এই কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলি, ইহারাও এই দেহ লইয়া ক্রিয়া করিতেছে, ইহাদের প্রভাব এই দেহের উপর সর্ব্ব-দাই বিদ্যমান, সুতরাং এই দেহকে জয় করিতে গেলে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে জয় করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। হঠযোগ প্রধানতঃ এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে নিয়মিত করি-বার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সাধনার পথে চলিতে গেলে যখন দেহকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই, অধিক কি, দেহই যখন আমার প্রথম ও প্রধান সম্বল, তখন এই দেহকে বশীভূত করিয়া সাধনার অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করিতে আমাকে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। এই কারণেই শৌচ, সদাচার, মন্ত্রের দ্বারা বিবিধ সংস্কার, আহার-

শুদ্ধি প্রভৃতি আমাদের দেশে নানা আকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেহের প্রতি লক্ষ্য সকলকেই রাখিতে হইবে, এবং দেহকে সাধনের অনুকূল অবস্থায় রাখিতে গেলে, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের সংযমও আবশ্যক। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায়, দেহের প্রতি মানুষ অতিরিক্ত জোর দিয়া ফেলে, দেহকে জয় করিতে গিয়া তাহাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। তাহার ফলে দেহ-মাত্রই কিয়ৎপরিমাণে বিজিত হইলেও, চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, ফলে হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি—পাতঞ্জল-দর্শনের শিক্ষায় উভয়দিক্ সমানভাবে রক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাতে বাহিরের ক্রিয়াগুলিরও যেমন ব্যবস্থা আছে, ভিতরের ক্রিয়াগুলির অর্থাৎ চিন্তা ও ভাব-সংযমনেরও তেমনি ব্যবস্থা আছে।

পাতঞ্জল দর্শনে অষ্টাঙ্গ-যোগের যে প্রথম অঙ্গ অর্থাৎ যম, তাহার সাধনের প্রথম কার্য্য অহিংসা। "অহিংসা" বড় সহজ কথা নহে। বুদ্ধদেব এই এক অঙ্গের সাধনের উপর তাঁহার নৈতিক সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই 'অহিংসা'-সাধনের ফল চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে মহাপুরুষ এই অহিংসা-সাধনে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধলাভ করিয়াছেন, হিংস্র বন্যজন্তুগণ তাঁহার নিকট যদি কখনও আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করে। সেই মহাপুরুষ অনায়াসে হিংস্রজন্তুগণের সহিত নিরাপদে বাস করিতে পারেন। অহিংসার পর সত্য, তাহার পর অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। সুতরাং এই যে যম, ইহা কেবল বাহিরের অনুষ্ঠান নহে; হিংসা ত্যাগ করিতে গেলে কেবলমাত্র বাহিরে নিরামিষ ভোজন করিলেই যে হইল, তাহা নহে। অহিংসা-ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে যে নানা প্রকারের আসন অভ্যাস করিলেই হইবে তাহা নহে, কেবল বসিয়া বসিয়া প্রাণায়াম করিলেই যে হইবে—তাহাও নহে। মনকে জয় করিয়া তাহার সাহায্যে ভিতর হইতে আত্মশোধন করা প্রয়োজন। ইহার অর্থ অবশ্য এরূপ নহে যে বাহিরের শৌচ সদাচারাদির প্রয়োজন নাই। শৌচ সদাচারাদির প্রয়োজন আছে, কিন্তু মনকে বুদ্ধির দ্বারা ধারণার দ্বারা জয় করিতে না পারিলে, কেবল বাহির হইতে চেষ্টা করিয়া বিশেষ কিছু হইবে না।

এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে ধারণার উপরে জোর দিলেন। ধারণার পূর্ব্বে অষ্টাঙ্গ যোগের অপরাপর অঙ্গগুলির কিছু কিছু প্রয়োজন, কিন্তু ধারণায় অভ্যস্ত না হইলে, ধারণা

করিবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি না জন্মিলে, পূর্ব্বোক্ত অঙ্গগুলিও সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইবে না। সুতরাং ধারণার প্রয়োজন—প্রথমে ধারণা, তাহার পরে ধ্যান। ইহাই শ্রীশুকদেবের সুস্পষ্ট উপদেশ, ইহাতে মতভেদের কোনই কারণ নাই।

৪। ধারণা ও ধ্যান

এইবার আলোচনা করা যাউক—ধারণাই বা কি, আর ধ্যানই বা কি, আর ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধই বা কি? শ্রীধরস্বামী ধারণা ও ধ্যানের এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন। "আশ্রয়-বিশেষে সামান্যতশ্চিত্তস্থিরীকরণং ধারণা, অবয়ববিশেষ ভাবনয়া তদ্দার্ঢ্যং ধ্যানম্।" আশ্রয় বিশেষে সামান্যরূপে যে চিত্তের স্থিরীকরণ অর্থাৎ যে বিষয়ে আলোচনা করিব সেই বিষয়টির আগাগোড়া প্রথমে মোটামুটি জানিয়া লইয়া তাহা মনে রাখার নাম ধারণা; তাহার পর সেই সমগ্র বিষয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ বা অংশ গভীররূপে জানিবার জন্য চিত্তের যে একাগ্রতা সাধন, তাহার নাম ধ্যান। যখন ধ্যান করিতে হইবে, তখন একটি বিশিষ্ট অঙ্গে একাগ্র হইয়া মনোনিবেশ করিতে হইবে, কিন্তু দেখিতে হইবে যেন সমগ্র বিষয়ের যে সামান্য উপলব্ধি বা ধারণা, তাহা মন হইতে চলিয়া না যায়। যাহা ধারণার বিষয়, তাহা ভুলিয়া গিয়া যদি ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে ধ্যানের ফল হইবে না।

ধারণা ও ধ্যান সম্বন্ধীয় এই যে উপদেশ, ইহা সকল বিষয়েই প্রয়োগ করিতে হইবে। নতুবা জগতে মানব কোন বিষয়েই যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। আর যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, জীবন যে একেবারেই নিষ্ফল, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা সম্বন্ধেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের কোন একটি উপাখ্যান পাঠ হইতেছে—যেমন অজামিলের উপাখ্যান পাঠ হইতেছে। এই উপাখ্যান যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত কি, এবং তাহাতে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গবিসর্গাদি যে দশটি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, প্রথমে তাহাই জানিতে হইবে। তাহার পর, এই দশটি বিষয়ের মধ্যে অজামিলের উপাখ্যান কোন্ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ইহা 'স্থান' নহে, ইহা 'পোষণ,' এই তত্ত্বটুকু জানিতে হইবে। 'পোষণ' কি তাহা বুঝিয়া, তাহার পর যদি অজামিলের উপাখ্যান আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে এই উপাখ্যানের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম

হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত একখানি গল্পের পুস্তক নহে, কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ উপাখ্যান একত্র করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই, এই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। একজন মানুষের যদি নাসিকাটি আমায় বুঝিতে হয়, তাহা হইলে শরীর হইতে নাকটি কাটিয়া পৃথক্ করিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, প্রকৃত আলোচনা হইবে না; সমগ্র শরীরটি দেখিয়া, সেই শরীরের অন্যান্য অঙ্গের সহিত মিলাইয়া, সমগ্র শরীরের সহিত ও অন্যান্য অঙ্গের সহিত নাসিকার যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া আমাকে আলোচনা করিতে হইবে, নতুবা আমি এই নাসিকাটিকে বুঝিতে পারিব না। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, একথা প্রথমেই কথিত হইয়াছে। দ্বাদশ স্কন্ধে এই গ্রন্থ বিভক্ত, এক এক স্কন্ধ তাঁহার এক এক অঙ্গ, সুতরাং এক একটি উপাখ্যান বা এক একটি বিষয়ের আলোচনা, এক একটি উপাঙ্গ। সমগ্রকে সাধারণভাবে না জানিলে, কোন বিশেষ অংশ উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনায় সর্ব্বত্রই এই পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

রসশাস্ত্রে স্থায়ীভাব, সঞ্চারী ও ব্যভিচারী, এই সমুদয় কথার প্রয়োগ আছে। ব্রজগোপীগণের কোন একটি লীলার আলোচনা হইতেছে। তাহাতে গোপীগণের হিংসা, বা মান, অভিমান প্রভৃতির কথা রহিয়াছে, সাধারণ লোকে এই কথা শুনিলে মনে করিবে, প্রাকৃত-জগতে অর্থাৎ আমাদের সংসারে সাধারণ নায়ক নায়িকার যেমন ব্যাপার হয়, ইহাও তো দেখিতেছি সেই প্রকারের ব্যাপার। কোন কোন লোক যদি এইরূপ মনে করে, তাহা হইলে যে বড়ই বিড়ম্বনার কথা হইবে। তাহা হইলে উপায় কি? স্থায়ীভাবটি প্রথমে সাধারণভাবে বুঝাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে বুঝাইতে হইবে, গোপী কি, কৃষ্ণ কি, গোপীপ্রেম কি? সাধারণভাবে এই কথাগুলি যাঁহারা শুনিবেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে মনে রাখিবেন, তাঁহারাই সঞ্চারী ও ব্যভিচারী শুনিলে ভুল বুঝিবেন না, বরং তাঁহাদের রসাস্বাদন হইবে ও তাঁহারা ধন্য হইবেন।

সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। সাহিত্যালোচনায় কি? একজন কবির সম্বন্ধে আপনি আলোচনা করিতে চাহেন, কি প্রকারে আলোচনা করিবেন? মনে করুন, কবি বাঙ্গালী। আপনাকে প্রথমতঃ জানিতে হইবে ও বুঝিতে হইবে—কবিতা কি? তাহার পর, বাঙ্গলা কবিতার মোটামুটি ইতিহাস আপনাকে জানিতে হইবে। সাধারণভাবে এই

ইতিহাস যিনি জানেন, কোনও একজন বিশেষ কবির সম্বন্ধে আলোচনা করা, তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। নতুবা ঐ আলোচনা নিষ্ফল ও হাস্যাস্পদ।

রাজনীতি-সম্বন্ধে আজকাল অনেকেই, যেখানে সেখানে বাজে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অর্থযুক্ত কথা বলিবার অধিকারী কে? রাজনীতি ও ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে ধীরভাবে মোটামুটি কথা, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশধারার মধ্য দিয়া যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই আলোচনা করিবার ও মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারী। এ বিষয়ে যাহাদের ধারণা নাই, তাহারা দৈবযোগে দু' একটা ভাল কথা বলিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কথার কোনই মূল্য নাই, তাহাদের কথা যদি অবাধে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবে। ধারণা ও ধ্যানের তত্ত্ব সকল বিষয়েই এই প্রকারে বুঝিতে হইবে।

মানসিক শক্তি যাহাদের কম, যাহাদের তেমন স্মরণশক্তি নাই, বা যাহারা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা-রোগে পীড়িত, তাহারা একটা বড় বিষয় সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না বা মনে রাখিতে পারে না। যাহারা এই প্রকারের ধারণা-শক্তি-হীন, তাহারা সাধন করুক, চেষ্টা করুক। যাহাতে ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, সেজন্য বর্ত্তমান জন্মে তাহারা চেষ্টা করুক, নিরাশ হইবার কারণ নাই, পর জন্মে তাহার উৎকৃষ্ট ধারণাশক্তি হইবে। যদি বলেন আমাদের অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা রহিয়াছেন তাহারা একথা বলেন না, এবং তাঁহাদেরও ধারণাশক্তি নাই। এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে আপনাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, আপনারা ধর্ম্ম বলিয়া যাহা গ্রহণ করিতেছেন, তাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা ছলধর্ম্ম বা ধর্ম্মাভাস, —আপনারা পশুত্বের মধ্যে অধঃপাতিত হইতেছেন। যদি নিজের ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল চাহেন, তাহা হইলে এই সমুদয় বঞ্চক, যাহাতে কার্য্যান্তরে চলিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করুন। ধর্ম্মসাধনা বা অধ্যাত্ম-জীবন লাভ, এত সুলভ ব্যাপার নহে। সর্ব্বপ্রথমে ধারণা চাই, ধারণার পর ধ্যান। ধারণা-শক্তিহীন ব্যক্তির অশ্রুপাত হয়, কম্প হয়, পুলকও হয়। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে শ্রীরূপগোস্বামীর ভাষায় ইহা—রত্যাভাস বা ছায়া রতি। ইহা লোক ঠকাইবার ছলাও হইতে পারে, আর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধনও ইহা হইতে পারে। যাহা হউক, যাঁহারা অন্তর্জগতের তত্ত্ব সামান্যমাত্রও অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে আর অধিক বলিতে হইবে না, তাঁহারা সহজেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম উপদেশ—

প্রথমে ধারণা, তাহার পর ধ্যান। ধারণাহীন ধ্যান কিছুই নহে। সকল বিষয়েই যাহাতে আমাদের এই ধারণাশক্তির অনুশীলন হয়, আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই করি। তাহা হইলেই দেশে ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। নতুবা পাথরের উপর বীজ ছড়াইলে, তাহা যেমন একেবারেই নিষ্ফল, আমাদের যাবতীয় চেষ্টা সেইরূপ নিষ্ফল হইবে। প্রথমেই দেশব্যাপী এই স্নায়বিক দুর্ব্বলতার চিকিৎসা করা হউক, তাহার পর মানুষ যাহাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছোট ছোট বিষয়ের আলোচনায় সঙ্কীর্ণচিত্ত না হইয়া, সমগ্র বিষয় আনুপূর্ব্বিক উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন "উদারধী" হইতে হইবে—ধারণাশক্তির সাম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত মানুষ "উদারধী" হইতে পারে না, আর শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, 'উদারধী' না হইলে মানুষ তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা কখনও পরমপুরুষের আরাধনা করিতে পারে না। অতএব এই ধারণা ও ধ্যানের তত্ত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, ভগবান্ আমাদিগকে ছলধর্ম্ম ও ধর্ম্মাভাস হইতে রক্ষা করিয়া, সত্যধর্ম্মের দ্বারা সঞ্জীবিত করুন।

৫। বোপদেবের 'হরিলীলা'—বেদ, পুরাণ ও কাব্য

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি যাহাতে লোকে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ব্বকালে শ্রীবোপদেব, "হরিলীলা" নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত, এই হরিলীলা গ্রন্থখানিও সেইরূপ দ্বাদশ অধ্যায়ে সূত্রাকারে রচিত। এই গ্রন্থখানির এক এক অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের এক এক স্কন্ধের সূচীপত্র-স্বরূপ। যাহাতে শিক্ষার্থীরা সমগ্র ভাগবতখানি স্মরণ রাখিতে পারেন, তজ্জন্যই এই গ্রন্থখানি লিখিত। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। "হরিলীলা" নামক এই গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুক্রমণী। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে শ্রোতা ও বক্তার লক্ষণ, আর দ্বিতীয় স্কন্ধে ভাগবত-শ্রবণের বিধি। পরবর্ত্তী দশ স্কন্ধে পর পর সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐ দশটি বিষয়ের অর্থ জানিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে আমরা তিন জন শ্রোতা ও তিন জন বক্তার সাক্ষাৎ

পাই। প্রথম শ্রোতা শৌনক, বক্তা সূত; দ্বিতীয় শ্রোতা ব্যাস; বক্তা নারদ; আর তৃতীয় শ্রোতা মহারাজা পরীক্ষিৎ, আর বক্তা শ্রীশুকদেব। বোপদেব বলেন—ইঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রোতা ও বক্তা হীন, মধ্যম শ্রোতা ও বক্তা মধ্যম, আর তৃতীয় শ্রোতা ও বক্তা উত্তম। বৈরাগ্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিবন্ধন, বক্তা ও শ্রোতার এই শ্রেণী বিভাগ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "এই শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে বেদ, পুরাণ ও কাব্য"। মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বোপদেবের এই কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদে শব্দের প্রাধান্য, পুরাণে অর্থের প্রধান্য, আর কাব্যে রসের প্রাধান্য। বেদ প্রভুর ন্যায় মানবকে আদেশ করেন। প্রভুর বাক্য অবনতমস্তকে মানিয়া লইতে হইবে, তাহাতে ইষ্ট হইবে কি না, ইহা আর আলোচনা করার অবসর নাই। পুরাণ মিত্রের ন্যায়, মিত্র প্রভুর মত আদেশ করিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন না, তিনি যুক্তির দ্বারা কার্য্য-বিশেষের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া, সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কাব্য প্রেয়সীর ন্যায়। প্রেয়সী যেমন মনোহারী কার্য্যসমূহের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পুরুষকে কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত করেন, এবং পুরুষও প্রেয়সীর আকর্ষণে তাহা আনন্দের সহিত করিয়া থাকেন, কাব্যও সেইরূপ, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী প্রভৃতির দ্বারা মানুষের হৃদয়ে রসের উদ্বোধন করেন, মানুষের হৃদয় আনন্দে সরস হইয়া উঠে, তখন মানুষ আপনা হইতেই বুঝিতে পারেন, রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় জীবন গঠন করা আবশ্যক—রাবণ প্রভৃতির ন্যায় করা উচিত নহে। বোপদেব বলেন—"ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ"—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের এই তিনের ধর্ম্ম, অর্থাৎ বেদ, পুরাণ ও কাব্যের ধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হইবে। ইনি একাধারে প্রভু, মিত্র ও প্রেয়সী।

প্রাচীন টীকাকার বোপদেব গোস্বামীর এই উক্তি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। মানুষ মাত্রেরই নিজের একটা গৌরব ও মহত্ত্ব আছে, মানুষ মাত্রেই স্বাধীনভাবে সত্যালোচনা করিবার ও নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার অধিকারী, নানা কারণে মানুষ অজ্ঞানান্ধকারে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এ প্রকারে পড়িয়া থাকিলে হইবে না। এই কথা যিনি স্বীকার না করেন, তিনি প্রাচীন ভাগবত-ধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মও স্বীকার করেন না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বেদের সার। বেদের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ইহাতে আছে। কিন্তু বেদ যেমন প্রভুর ন্যায় দণ্ড হস্তে মানুষকে বলেন—"তুমি এই কার্য্য কর, তুমি এই কার্য্য করিও না"—সেখানে মানুষের জিজ্ঞাসা করিবার

অধিকার নাই, "ঠাকুর একার্য্য কেন করিব, আর একার্য্য কেনই বা করিব না"—সেখানে মানুষের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই, বেদের বিধিনিষেধ মানুষকে অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতে হইবে। অবশ্য ধর্ম্ম এই প্রকারের প্রভু হইলে, সমাজেও তাঁহার সেইরূপ প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক ; অর্থাৎ যদি কেহ আদেশ না মানে, তাহা হইলে তাহাকে শাসন করিয়া বা লোভ দেখাইয়া তাহা মানাইতে হইবে। কিন্তু মানুষ চিরকাল এপ্রকারে অন্ধভাবে অর্থাৎ হেতু না বুঝিয়া কোন কথা মানিয়া চলিতে পারে না। কাজেই বিদ্রোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময়ে পুরাণের ধর্ম্ম সমাজে প্রচারিত হইলেন। পুরাণ যে বেদ হইতে বিভিন্ন তাহা নহে, পুরাণের ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা যে বেদ ভুলিয়া যাইবেন, তাহা নহে ; ধর্ম্ম সনাতন—বেদই পুরাণরূপে জগতে আসিলেন। পুরাণ মানুষকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। মানুষ জিজ্ঞাসা করে, কেন এ কার্য্য করিব, আর কেনই বা এ কার্য্য করিব না। পুরাণ জিজ্ঞাসুকে তিরস্কার করিলেন না, শাসন করিলেন না, দণ্ডও দেখাইলেন না। তিনি নানারূপ যুক্তি দ্বারা মানবকে বুঝাইলেন যে এই উপদেশ যথারীতি পালন করিলে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। মানব বনের পশু নহে, যুক্তির দ্বারা তাহাকে ক্রমে ক্রমে বুঝাইলেন—সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, পৌরাণিক এই বিশ্বাস লইয়া মানবকে বুঝাইতে লাগিলেন। ইহাই দ্বিতীয় যুগ। এখন বৈদিক ধর্ম্ম যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মানবমাত্রেই অর্থাৎ স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও নিজে চিন্তা করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে লাগিল এবং সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহার পর তৃতীয় যুগ। এযুগে অবশ্য আদেশবাণীও থাকিল, যুক্তির দ্বারা আদেশবাণী বুঝিয়া লইবার অধিকারও থাকিল, কিন্তু কেবল যুক্তির দ্বারা কোন কিছু কিছু বুঝিলেও তাহাতে অনুরাগ হয় না। হৃদয় যদি না জাগে, তাহা হইলে কেবল যুক্তির দ্বারা মানুষ জীবনের পথে চলিতে পারে না। সকলেই যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারে, যে মানুষ মাত্রেরই ত্যাগশীল ও পরার্থপর হওয়া আবশ্যক, কিন্তু যুক্তির দ্বারা বুঝিয়া কয়জন সত্য সত্যই পরার্থপরতা ও ত্যাগশীলতার পথে চলিতেছে ? কেন চলিতেছে না ? কারণ আনন্দ পায় না। মানুষ যে কার্য্যে আনন্দ পায় না, সে কার্য্য সে সত্য করিয়া, প্রাণ ভরিয়া করিতে পারে না। সুতরাং মানবের হৃদয়ের জাগরণ আবশ্যক। হৃদয়বৃত্তির যাহাতে অনুশীলন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই কার্য্য করিবার জন্য কাব্যের আবির্ভাব। কাব্য আসিয়া মানুষকে প্রভুর মত

দণ্ড হস্তে শাসন করিলেন না, পুরাণের মত কেবলমাত্র কতকগুলি শুষ্ক যুক্তি বিন্যাস করিয়া মানুষকে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না—কাব্য প্রেয়সীর মত আসিলেন। তিনি দেখিতে সুন্দর, কথা তাঁহার মধুর—তাঁহার ব্যবহার মানুষের মন মুগ্ধ করে। কাব্য এই প্রকারে আসিয়া মানুষের হৃদয় হরণ করিলেন, মানুষ তাঁহার কথা আনন্দসহকারে শুনিতে লাগিল। কোন তিরস্কার নাই, কোনরূপ ভয় প্রদর্শন নাই, মানুষ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কাব্যের অনুশীলন করিতে লাগিল, তাহার ফলে মানুষের হৃদয় মার্জ্জিত ও সরস হইল, যুক্তি তখন আপনা হইতেই অতিশয় সহজ হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্মা-ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া মানুষ সানন্দচিত্তে ও স্বাধীনভাবে জীবনের উন্নততর কর্ত্তব্যপালনের পথে ধাবিত হইল। ইহাই মানবাত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের পথ। মধুসূদন সরস্বতী "হরিলীলা" গ্রন্থের টীকায় বলিতেছেন। "অধিকারিভেদোত্তুপদেশস্ত্রিধা। আদ্যে শব্দস্য প্রাধান্যং, দ্বিতীয়ে অর্থস্য, তৃতীয়ে রসস্য প্রাধান্যম্। এষু চ ক্রমাদুত্তমাদয়োঽধিক্রিয়ন্তে।" অধিকারী ভেদে উপদেশ ত্রিবিধ। প্রথমে শব্দের, দ্বিতীয়ে অর্থের, আর তৃতীয়ে রসের প্রাধান্য। ইহাদের মধ্যে শেষ অর্থাৎ রসের প্রাধান্যই উত্তম। এই কথাগুলি উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতের বা ভাগবত-ধর্ম্মের বিশেষ কথা। মানুষ স্বাধীনভাবে তাহার হৃদয়ের আনন্দবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রত্যেক মানবকে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানই যুগ ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্মের প্রধান কথা। যাজক-তন্ত্রের বা মণ্ডলী বিশেষের পরাক্রমে বাধ্য ও অভিভূত হইয়া মানুষকে অন্ধভাবে চলিতে হইবে না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই শ্রীভগবান্ রহিয়াছেন, তিনি জ্ঞানময় ও প্রেমময়, মানুষ নিজের ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে জানিবে। এ অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, মানবের কেহ যেন এ অধিকার হইতে বঞ্চিত না করে। ইহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। আমরা পূর্ব্বে যে ধারণার কথা বলিয়াছি, ইহা হইতে সে কথার মর্ম্ম বেশ ভালরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

৬। বিধিমার্গ ও রাগমার্গ

আর একদিক্ হইতে আলোচনা করিলে পূর্ব্বের কথা আরও স্পষ্ট হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহার শেষ কথা রাগমার্গ। এই রাগমার্গ বুঝিলে পূর্ব্বের কথা আরও স্পষ্ট হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে মানবজাতির উন্নততর চিন্তা যে ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে, সেই ভূমিতে দাঁড়াইয়া, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, রাগমার্গ বা পুষ্টিমার্গের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামে এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গত চারিশত বৎসরে আমাদের দেশে যে ধর্ম্মমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত অনেক সরল হৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তি, যাঁহারা স্বভাবতঃই মনে করেন যে তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য দেবের প্রকৃত ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহারা মনে করেন যে রাগমার্গের আলোচনা করা অনাবশ্যক। বর্ত্তমান যুগের মানব নিতান্ত পতিত, তাঁহাদের জন্য বিধিমার্গই প্রয়োজন, রাগমার্গের কথা শুনিতেও তাহাদের অধিকার নাই। কিন্তু আর একদল সরল-হৃদয় এবং সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প পণ্ডিত লোক বিবেচনা করেন যে, রাগমার্গই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বিশেষত্ব এবং এইটিই বিশেষভাবের নূতন কথা, যাহার আভাস প্রাচীনতর শাস্ত্র সমূহে পরিদৃষ্ট হইলেও, সাধারণ মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই রাগমার্গের আদর্শ প্রচার করিতেই ভারতবর্ষে বা বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। রাগমার্গের কথা বাদ দিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মে এমন কিছু পাওয়া যাইবে না, যাহার জন্য তাঁহার আসার প্রয়োজন ছিল। রাগমার্গই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রাণ।

রাগমার্গ আদর্শ—আমাদিগকে এই রাগমার্গে লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতে হইবে। বিধিমার্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়, করিবেন। কিন্তু বিধিমার্গের অনুষ্ঠানের উপর জোর দেওয়া এবং ক্রমে ক্রমে এই বিধিমার্গকে একান্ত করিয়া তোলা, ধর্ম্মমণ্ডলীর নেতৃগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন ও বিরোধী সমাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করার জন্যই ইহা ঘটিয়াছে। সন্ধি-স্থাপন যে সৎকার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্ধি-স্থাপনের জন্য আত্মঘাতী হওয়ারও ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না এবং দেখা যাইলেও একালের মানুষ যে তাহা স্বীকার করিবে, এরূপ মনে হয় না।

কাজেই রাগমার্গ-সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচনা করা দরকার। কিন্তু এই রাগমার্গ-সম্বন্ধে সকল কথা যে আমরা বুঝিতে পারিব, তাহার ভরসা কম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার পরিকরগণ কর্ত্তৃক যে সব কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আজই তাহা আমরা বুঝিয়া ফেলিব, এরূপ আশা করিবেন না। যাঁহারা সাধন-পথে চলিয়াছেন,

তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু জগতের মানুষ ধর্ম্মকথা যে প্রণালীতে বুঝিতে চায়, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই সব কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কতদিনে মানুষ তাহা ষোল আনা বুঝিতে পারিবে, জানি না; কিন্তু এটুকু ঠিক্ জানি, যেদিন মানুষ মাত্রেই এই কথা ষোল আনা বুঝিতে পারিবে, সেদিন আমাদের জগৎ নূতন জগৎ হইবে—বৃন্দাবন হইবে। কেহ বলিবেন—বুঝিতে পারিলে কি হইবে, আচরণ করিতে হইবে ত? কিন্তু সত্য করিয়া বুঝিতে পারাই যে আচরণের শেষ কথা।

রাগমার্গ আদর্শ—সুতরাং ইহা বিধি মার্গকে বর্জ্জনও করে না এবং উপেক্ষাও করে না। তবে বিধি যদি বলেন যে আমিই তোমার সর্ব্বস্ব, তাহা হইলে প্রবুদ্ধ মানব তাহা স্বীকার করিবে না। বিধিমার্গ খুবই ভাল—কিন্তু এই পথে চলিতে চলিতে মানুষের একটা ব্যাধি হইবার ভয় আছে—সেই ব্যাধির নাম অন্ধতা। এই ব্যাধি আবার সংক্রামক—এই ব্যাধির আর একটা খুব বড় রকমের দোষ, এই ব্যাধি যাহার বা যাহাদের হয়, তাহারা সর্ব্বদাই মনে করে যে এই ব্যাধিই প্রকৃত স্বাস্থ্য—এই ব্যাধি যাহার হয় নাই, সেই ব্যাধিগ্রস্ত!

রাগমার্গ প্রবর্ত্তিত করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, মানবের এই ব্যাধি বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলেন—বিধিমার্গ ধ্বংস করিতে নহে।

শাস্ত্র যে-ভক্তির প্রবর্ত্তক অর্থাৎ শাস্ত্রের আদেশে বা উপদেশে মানুষ যে-ভক্তির অনুশীলন করে, তাহার নাম বৈধী ভক্তি, আর লোভ যে ভক্তির প্রবর্ত্তক, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্র বলিতেছেন—ভগবানের ভজনা করিবে, যদি না কর, পাপ হইবে। শাস্ত্রের আদেশে, পাপের ভয়ে, একজন লোক ভগবানের বা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেছেন, ইহার নাম বিধিমার্গের ভজন। ইহার আর একটি নাম মর্য্যাদা-মার্গ। আর একজন শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুনিতেছেন, শুনিতে শুনিতে অন্তরের ভিতর হইতে দৃঢ়রূপে বুঝিলেন —শ্রীকৃষ্ণ বড় মধুর। তখন সেই মাধুর্য্যে তাঁহার লোভ জন্মিল। এই লোভের দ্বারা চালিত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলেন, এই যে ভজনা—ইহার নাম রাগমার্গের ভজনা। ইহার অপর নাম পুষ্টিমার্গ।

লোভ যখন জাগিয়া উঠে, তখন আর শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা থাকে না। শাস্ত্র কি বলিতেছেন, ইহা ভাবিবার তখন আর অবসর থাকে না, আমি যাহা করিতেছি তাহা

যুক্তিযুক্ত কি না, ইহা বিবেচনা করিবারও তখন সামর্থ্য থাকে না। যে বস্তুতে আমার লোভ জন্মিয়াছে, তাহা পাইবার আমার যোগ্যতা আছে কি না, এ প্রকারের হিসাবও প্রকৃত লুব্ধ ব্যক্তি করিতে পারে না।

প্রাচীন আচার্য্যগণ বলেন, এই লোভ দুই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারা হয়, আর অনুরাগী ভক্তের কৃপার দ্বারা হয়। ভক্তের কৃপাবশতঃ যে লোভ জন্মায়, তাহা আবার দ্বিবিধ—প্রাক্তন ও আধুনিক। অনেকের জীবনে দেখা যায় যে, জীবনের প্রথম হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে তাঁহার লোভ। এই প্রকারের লোভকে প্রাক্তন লোভ বলে। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও জন্মে প্রাপ্ত ভক্তকৃপানিবন্ধন হইয়া থাকে। প্রাক্তন লোভ জন্মিলে কেবলমাত্র তাহারই উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। লোভের বিকাশ হওয়ার পর, কোনও অনুরাগী ভক্তের শরণাগত হওয়া আবশ্যক। যাহার জন্মাবধি লোভ নাই, হঠাৎ ভাগ্যবশে কোন অনুরাগী ভক্তের শরণাগত হওয়ায় তাহার লোভ জন্মিল। এই লোভকে আধুনিক লোভ বলে। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বা ভক্তের কৃপানিবন্ধন যে লোভ জন্মে, সেই লোভই রাগমার্গে প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ।

লোভ জন্মাইলেই যে কাজের শেষ হইল, তাহা নহে। লোভ জন্মাইলে পর, কেমন করিয়া সেই লোভনীয় বস্তু পাওয়া যায়, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। সে সময়ে শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না। কারণ শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তি ছাড়া অন্য উপায়ে, সেই লোভনীয় বস্তু পাইবার অন্য পথ নাই। সুতরাং লোভের ফলে রাগমার্গে প্রবৃত্তি জন্মাইবার পর, শাস্ত্রোক্ত সাধন-ভক্তির প্রণালী অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রোক্ত সাধন-ভক্তি অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত যে পরিমাণে শুদ্ধ হয়, লোভও সেই পরিমাণে বাড়িয়া থাকে।

একই ভগবান্, তিনি বাহিরে গুরুরূপে উপদেশ দান করেন। কিন্তু বাহিরে ভাল লোকের উপদেশ কেবলমাত্র শুনিলে কি হইবে? কাজেই সেই ভগবান্ই অন্তরে অন্তর্যামিরূপে সৎপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করেন। সৎপ্রবৃত্তি-দ্বারা মানুষের বিষয়-বাসনা দূরীভূত হয়; ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য হইয়া যায় এবং সেই অবস্থায় ভগবানের রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং দুই প্রকারের উপায় আছে। কেহ গুরুর মুখ হইতে বা অনুরাগী

ভক্তের মুখ হইতে উপদেশের সাহায্যে এই লোভ পাইয়া থাকেন, আবার কাহারও বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবান্ আপনা হইতেই স্ফূরিত হইয়া লোভ জাগাইয়া দেন। লোভ জাগিলে সাধনা যে বেশ সহজ হইয়া পড়ে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। সাধারণ বিষয়ী লোক যেমন বিষয়লোভে চালিত হইয়া আনন্দের সহিত পরিশ্রম করে এবং বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া পড়ে, ভগবানে লোভ জন্মিলেও মানুষ সেই প্রকার ভগবানের জন্য আনন্দের সহিত ও স্বেচ্ছায় সর্ব্ববিধ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, সর্ব্ববিধ পরিশ্রম করিতে পারে এবং ভগবানে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, সকল সময়েই একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শাস্ত্র প্রতিপাদিত আদিম আচার্য্য প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ ধর্ম্ম, সর্ব্বত্রই পরবর্ত্তী মণ্ডলী-কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন হয়ত প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মের উপদেশ-সমূহকে সাধারণ মানবের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য আবশ্যক হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যে তাহা মণ্ডলীর বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই আমরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এবং পৃথিবীর যাবতীয় সাধুমহাশয়গণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মমণ্ডলীর ইতিহাসে দেখিবেন, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু লইয়া কত বাদানুবাদ ও বিরোধ চলিতেছে। দীক্ষাদানে ব্রাহ্মণেতর জাতির অধিকার আছে কি না এবং অধিকার থাকিলে উন্নততর বর্ণকে নিম্নতর বর্ণের লোক দীক্ষা দিতে পারেন কি না, এই সব বিষয় লইয়া দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে লইয়া অনেক আচার্য্য সর্ব্বদাই বাদানুবাদ ও বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বের অংশ আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে গুরুগ্রহণ সম্বন্ধে, বিশেষ একজন লোককে গুরুত্বে বরণ করিব কি না, সে বিষয়ে মানুষের বিশেষ স্বাধীনতা রহিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে যাঁহারা বাদানুবাদ করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রথম কথাতেই যেন একটা খুব বড় রকমের গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন, বলিয়াই মনে হয়।

রাগমার্গের ভক্তের অবলম্বনীয় শাস্ত্র-সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যেরা বলিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সকল উপনিষদের সারভূত। এই গ্রন্থে ভগবানের

সহিত মানবের বা ভক্তের যে সম্বন্ধ ঘোষিত বা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মধুর ও সুন্দর। ভগবান্ আমাদের ভয় দেখান না, কেবল কর্ম্মফল দান করেন না, তিনি কেবল একটি তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত নহেন, তিনি আমাদের প্রিয় আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ, দেবতা ও ইষ্ট। কথাগুলি অবশ্য বেদের, কিন্তু বেদান্তের বা বৈদিক সারসিদ্ধান্তসমূহের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে, বেদের এই গূঢ় কথা বিশদভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং লোভ-সম্পন্ন রাগমার্গের পথিকের পক্ষে এই শাস্ত্রই সর্ব্বোত্তম। অন্য সম্প্রদায়ের বা অন্য দেশের অন্যান্য শাস্ত্রের যে আলোচনা করিব না, তাহা নহে ; কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষকরূপে অন্যান্য শাস্ত্রকে গ্রহণ করিলে আমরা লাভবান্ হইব। আবার এই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত ভক্তি, শ্রীরূপগোস্বামী রচিত-ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু-প্রভৃতি গ্রন্থে সম্যকরূপে বিবৃত হইয়াছে—সুতরাং এই সমুদয় গ্রন্থও অবলম্বনীয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে তিনটি বাক্য, রাগমার্গের সর্ব্ববিধ সাধকের জন্য কথিত হইয়াছে। সে তিনটি বাক্য এই—

(ক) প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এবং সাধকের নিজের অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদেরই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন।

"কৃষ্ণং স্মরণ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

(খ) যাঁহারা সেই ভাবে লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রজবাসিগণের অনুসরণে সাধকরূপে ও সিদ্ধরূপে সেবাপরায়ণ হইবেন।

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

(গ) বিধিমার্গের ভজনায় শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে সমুদয় অঙ্গ কথিত হইয়াছে, মনীষিগণ রাগমার্গের সাধনায় সেগুলিকেও অঙ্গ বলিয়া জানিবেন।

শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী এই তিনটি বাক্য সর্ব্ববিধ রাগানুগ সাধকের পক্ষেই উপদেশ করিয়াছেন।

রাগানুগ সাধন-সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদিগের আর কিছুই বলিবার নাই।

আমাদের বক্তব্য এই যে, মানবাত্মার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা যদি না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম সাধনা নিতান্তই বিড়ম্বনা। রাগমার্গ মানুষকে এই স্বাধীনতা লাভের আদর্শ দিয়াছেন। ইহা যাবতীয় ধর্ম্মসাধনার চিরন্তন আদর্শ—বেদান্ত এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত যখন বেদান্তের ভাষ্য, তখন তিনি এই চিরন্তন আদর্শের অন্যথা করিতে পারেন না। এই মূল কথাটি ভুলিয়া গেলে, আমরা পথ ভ্রষ্ট হইব; এই জন্যই আমরা এই কথাটি সকল সময়ে সকলকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

ধারণা কি, আমরা তাহা বলিয়াছি, ধারণা সাধনের জন্য কি প্রয়োজন সে কথাও বলা হইয়াছে, রাগমার্গ-সাধন যে চরমকথা, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই—এই রাগমার্গ সাধনে শ্রবণাঙ্গ-সাধন বা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ যে প্রধান ও প্রথম অঙ্গ, তাহাও দেখা গেল। এই শ্রীমদ্ভাগবত কি, তাহা বলা হইয়াছে এবং কি প্রকারে শ্রবণ করিলে প্রকৃত শ্রবণ হইবে, তাহাও আলোচনা করা হইয়াছে। এই সমুদয় কথা একত্র করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলির জীবকে বা আমাদিগকে যে ভাগবতধর্ম্ম দিয়া গেলেন, সেই ভাগবতধর্ম্ম কি?

৭। স্বাধীনতার অর্থ

রাগমার্গের কথায় আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে একটি বিশেষ আশঙ্কার উদয় হইবে। আশঙ্কা যদি সত্যোপেত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের আশঙ্কা থাকাই প্রয়োজন। যাঁহারা নিজেদের কোনরূপ সামাজিক স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য সত্যের প্রসার বৃদ্ধির বিরোধী বা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার বিরোধী, বা মানবকে তাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য অধিকার হইতে চিরদিন বঞ্চিত রাখিবার প্রয়াসী, তাঁহাদের সহিত কোনরূপ আলোচনা করা অনাবশ্যক, কারণ তাঁহারা স্বভাবের গতির দ্বারাই ক্রমশঃ পরাজিত ও বিফলমনোরথ হইবেন। কিন্তু সত্যান্বেষী ও সত্যপ্রিয় অনেক ব্যক্তিও রাগমার্গের কথায় একটি আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদের সেই আপত্তি একটু আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। তাঁহারা বলেন—পৃথিবীতে অধিকাংশ মানব কাম, রাগ প্রভৃতি দোষের দ্বারা মলিন অবস্থায় রহিয়াছে—ইহারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে যথেচ্ছাচারের পথে যাইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত, তাহাদিগকে রাগমার্গের কথা বলিলে, তাহারা আর কোনরূপ নিয়মের শাসন

মানিবেন না, তাহা হইলে তাহাদের ইষ্ট না হইয়া প্রভূত অনিষ্টই হইবে এবং আমাদের সামাজিক জীবনও নষ্ট হইয়া যাইবে।

'স্বাধীনতা' এই কথাটি শুনিলেও অনেকে ঐরূপ ভয় পাইয়া থাকেন, কিন্তু 'স্বাধীনতা'—উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, যথেচ্ছাচারও নহে। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে—'স্বাধীনতা' 'অনধীনতা' নহে। 'স্ব'-এর অধীনতার নাম স্বাধীনতা। অতএব সর্ব্বপ্রথমে 'স্ব'কে জানিতে হইবে। 'স্ব'-কে জানিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, যদিও কোন মানুষ হঠাৎ একদিনে বা এক জীবনে এই 'স্ব' কে জানিয়া ফেলিবে না। কিন্তু এই 'স্ব'-কে জানিবার এবং 'স্ব'-কে অনুবর্ত্তন করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। এই অধিকার হইতে কেহ অপর কাহাকেও বঞ্চিত করিবে না, এমন কি বঞ্চিত করিবার কল্পনাও করিবে না। আমি যেমন আমার 'স্ব'-এর অনুবর্ত্তন করিতে চাই, এবং এই অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই 'স্ব'-কে জানিতে চাই, আপনিও সেইরূপ এই 'স্ব'-কে অনুবর্ত্তন করিতে ও জানিতে চাহেন। এই বহুজনের বহুমুখী চেষ্টা, ইহার মধ্যে বিরোধ যাহাতে না হয়, তাহারই জন্য বিধি। সুতরাং বিধি কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতার খর্ব্বতা-সাধক বা সঙ্কোচক নহে, পরন্তু প্রসারক ও রক্ষক। ইহাই বিধির উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা সামাজিক বিধান-সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আধ্যাত্মিক সাধন-রাজ্যে বিধিমার্গ ও রাগমার্গ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ঠিক্ এই কথা।

"রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা"-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—বস্তুতস্তু লোভ প্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে বিধি প্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনঞ্চ বিধিমার্গ ইতি—অর্থাৎ লোভ প্রবর্ত্তিত বিধিমার্গের দ্বারা সেবনই রাগমার্গ, আর বিধি প্রবর্ত্তিত বিধিমার্গ দ্বারা সেবনই বিধিমার্গ। অবিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে তাহা হইতে কল্যাণ না হইয়া, অকল্যাণ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইল এই। মানুষকে কোন অবস্থায় একেবারে অবিশ্বাস করিবেন না। জীবনের যাহা সর্ব্বোত্তম লক্ষ্য, অথবা চরম ও পরম প্রাপ্তব্য বস্তু, নিজের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাহা বুঝিবার অধিকার ও সামর্থ্য প্রত্যেক মানবের আছে। মানুষ কেবল যে পরের কথায় তাহা বুঝিতে পারে তাহা নহে, তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া

হৃদয়ের দ্বারা তৎপ্রতি আকৃষ্টও হইতে পারে। যাহাতে প্রত্যেক মানুষের,—স্ত্রীলোকের ও পুরুষের,—এই প্রকারের অবস্থা হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই কারণে রাগমার্গের প্রথম অঙ্গ—শ্রবণ। প্রত্যেক মানুষ সৎশাস্ত্র উত্তমরূপে প্রতিনিয়ত শ্রবণ করুক। শ্রবণ করিতে করিতে তাহার মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি উত্তমরূপে মার্জ্জিত ও অনুশীলিত হইবে। কেবল শব্দ নহে, শব্দ, তত্ত্ব ও রস এই তিনই দিতে হইবে। এই প্রকারে প্রত্যেক মানবের নিজের ইষ্টের পরিচয় হইবে, তখন সে আপনা হইতেই ইষ্ট-লাভের জন্য ব্যাকুল হইবে। এই ব্যাকুলতা জন্মিলে মানব যে উচ্ছৃঙ্খল হইবে বা যথেচ্ছাচারী হইবে, তাহা নহে; সে বিধি বুঝিবে এবং আনন্দের সহিত বিধির অনুবর্ত্তন করিবে। মানবমাত্রেরই এই অধিকার আছে—এই অধিকার স্বীকার করিয়া চলিলেই, ভাগবতধর্ম্মের বা প্রেমধর্ম্মের প্রকৃত অনুশীলন হইবে।

মানব-প্রকৃতি তমোগুণে আচ্ছন্ন, সে জড়-স্বভাব, অলস, স্বাবলম্বনহীন, নিজের মঙ্গলামঙ্গল কিছুই জানে না, বোঝে না, এবং বুঝিবার কোন উপায়ও পায় না। এই প্রকারের মানুষকে বেদ 'পশু' বলিয়াছেন। 'স পশুরেব দেবানাম্'—বেদ বলেন সে দেবগণের পশু; আমরা বুঝি সুবিধাভোগী ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নিজ নিজ স্থানে দেবতাতুল্য। এই দেবতাধর্ম্মী মানবগণ, এই তমোগুণাচ্ছন্ন মানব-সন্তানকে পশুর মত নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধাসাধনে নিয়োজিত করিতেছে। তমোগুণের পর রজোগুণ, এই রজোগুণের দ্বারা মানবের চিত্ত যখন আক্ষিপ্ত, সে তখনও নিজের ও বিশ্বের প্রকৃত কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং মানবকে সর্ব্বপ্রথম এই তমোগুণ ও রজোগুণ হইতে পরিত্রাণ করিতে হইবে। তাহার পর এই সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, মানুষ এই সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থায় আসিলে, সে ধারণা করিবার অধিকারী হইবে, ধারণা করিতে করিতে ভক্তিস্বরূপ যোগ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ সাধকের ইষ্ট-প্রীতি জন্মিবে। এই ইষ্টে প্রীতিই সেই লোভ, যে লোভকে রাগমার্গের প্রাণ বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক এই—

যতঃ সন্ধার্য্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ।
আশু সংপদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ॥

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—যতো যস্যাং ধারণায়াং ক্রিয়মাণায়াং ভদ্রং সুখাত্মকং আশ্রয়ং বিষয়ং পশ্যতঃ তত্রৈব প্রীতির্ভবতি।

যিনি আশ্রয়, তিনি সুখাত্মক, তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহাতে প্রীতি জন্মে।" ধারণার দ্বারা যোগির বা সাধকের ভক্তিস্বরূপ যোগ আশু সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ঐ বিষয়ে প্রীতি জন্মে।

শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ দেহ-সম্পন্ন ভগবান্‌কে সর্ব্বপ্রথম ধারণার বিষয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। এই ধারণার দ্বারা মনের জয় হয়। তাহার পর অন্তর্যামী-ধারণা। বিরাট্ ধারণার দ্বারা মানব আত্মশক্তির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন অন্তর্যামী-ধারণা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয়। নিজের দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়রূপ অবকাশ আছে, এই অন্তর্যামি পুরুষ যেন তথায় বাস করিতেছেন। তিনি—প্রাদেশমাত্র পরিমাণ তিনি চতুর্ভুজ, ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান। তাঁহার বদন অতিশয় প্রসন্ন, নয়নদ্বয় নলিনতুল্য প্রফুল্ল, এবং আয়ত, বসন কদম্বফুলের কেশরের ন্যায় পীতবর্ণ এবং রত্নখচিত; তাঁহার স্বর্ণময় অঙ্গদ কিরীট ও কুণ্ডল অমূল্যরত্নে দেদীপ্যমান।

ইহা ইষ্ট-সম্বন্ধীয় ধারণা। আমরা ধারণা-সম্বন্ধীয় সাধারণ কথা আলোচনা করিয়াছি—উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত যখন শ্রীভগবানের বিগ্রহ-স্বরূপ, তখন আমরা এই সমগ্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় প্রথমতঃ সাধারণভাবে আয়ত্ত করিব। ইহার নাম ধারণা, তাহার পর সেই সমগ্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, বিষয়-বিশেষের বা শ্লোক-বিশেষের গভীর তাৎপর্য্য আলোচনা করিব। ইহার নাম ধ্যান। এই প্রণালী শাস্ত্র-সম্মত—ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই, অচিরেই এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হউক।

পুরুষাবতার ও সঙ্কর্ষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণনা করিবার সময় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্য-লীলায় যিনি শ্রীনিত্যানন্দ, ব্রজলীলায় তিনি, শ্রীবলরাম। তিনি স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্ব-অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ। তাঁহাদের উভয়ের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবলরামের স্বরূপ

এক, দেহ বা প্রকাশ ভিন্ন। বলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দ, আন্ত কায়ব্যূহ ও শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়। যিনি বলরাম, তিনি মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি পঞ্চরূপে অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। স্বয়ং অর্থাৎ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সাহায্য করেন, আর চারিমূর্ত্তি ধরিয়া সৃষ্টি-লীলার কার্য্য করিয়া থাকেন।

সৃষ্টী-লীলা-কার্য্যে যে চারিরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করেন, তাহার নাম—১। কারণ-তোয়-শায়ী ২। গর্ভোদকশায়ী ৩। পয়োব্ধিশায়ী বা ক্ষীরোদকশায়ী ৪। শেষ। এই চারিরূপের মধ্যে প্রথম তিনটিকে তিন পুরুষাবতার বলে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুরুষাবতার কথা বলিবার পূর্ব্বে, প্রকৃতির পরপারে পরব্যোমে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। পরব্যোমের বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় ধাম, তাহার বাহিরে কারণার্ণব। কারণার্ণবের জল চিন্ময়। সেই কারণার্ণবে সঙ্কর্ষণ আপনার এক অংশে শয়ন করেন। তিনি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণের যে অংশ কারণার্ণবে শয়ন করেন, তিনি মহৎস্রষ্টা পুরুষ এবং তিনিই জগৎকারণ। ইঁহাকে আদ্য-অবতার বলে। ইনি কারণার্ণবে শয়ন করিয়া, মায়াশক্তির উপর ঈক্ষণ করেন। মায়াশক্তি কারণার্ণবের বাহিরে, মায়া কারণার্ণবকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ প্রকাশ। প্রধান ও প্রকৃতি। প্রধান, জগতের উপাদান—প্রকৃতি, জড়রূপা সুতরাং তাহাকে জগৎকারণ বলা যায় না। শক্তি সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন। সুতরাং প্রকৃতি গৌণ কারণ, কৃষ্ণের শক্তি-সাহায্যে তাহার কারণত্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষাবতার জগতের নিমিত্ত-কারণ, কুম্ভকার যেমন ঘটের কর্ত্তা, সেইরূপ।

আদ্য-অবতার বা প্রথম পুরুষাবতার দূর হইতে মায়াতে ঈক্ষণ বা অবধান করেন এবং এই ঈক্ষণের দ্বারা মায়াতে জীবরূপ বীর্য্য আধান করেন। তাহার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়। এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড জন্মিবামাত্র পুরুষ বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রত্যেক অণ্ডে প্রবেশ করেন। অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, ভিতরে সমস্তই অন্ধকার, থাকিবার স্থান নাই। তখন আপনার অঙ্গের ঘর্ম্মজলে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক পূর্ণ করিলেন এবং সেই অর্দ্ধাংশে নিজের বাসস্থান করিলেন ও সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র বদন,

সহস্র নয়ন, সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ। এই সহস্র অবশ্য দশশত নহে, অসংখ্য। তিনি সকল অবতারের বীজ ও জগৎকারণ। তাঁহার নাভি হইতে এক পদ্ম উঠিল, এই পদ্মের মৃণালে চৌদ্দ ভুবন, এই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হইল। এই সহস্র মস্তক পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ, ইনি গর্ভোদকশায়ী ও হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী। এই নালের মধ্যে ধরণী, তাহাতে সাত সমুদ্র। ক্ষীরোদ সাগর তাহার অন্যতম, তথায় শ্বেতদ্বীপ। সকল জীবের অন্তর্যামী বিষ্ণু তথায় থাকেন, ইনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় সনাতন-শিক্ষার মধ্যে, অবতার কথা বলিবার সময় এই পুরুষাবতার-কথা আর একবার বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ, জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব, আর ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ। এই তিনের তিন শক্তি মিলিত হইয়া প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ বা বলরাম ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। তিনি প্রাকৃত ও অাকৃত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করেন। এই সঙ্কর্ষণই মায়ার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সমূহ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির জন্য যে মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়, সেই ঈশ্বর-মূর্ত্তির নাম অবতার। এই অবতারগণ মায়াতীত পরব্যোমে নিত্য অবস্থায় থাকেন, বিশ্বে অবতরণ করিয়া তাঁহারা অবতার নাম ধারণ করেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ মায়াকে অবলোকন করিবার জন্য, প্রথম পুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন। সেই পুরুষ বিরজাতে শয়ন করিয়া কারণার্ণবশায়ী নাম ধারণ করেন। মায়ার দুই বৃত্তি—মায়া ও প্রধান। মায়া নিমিত্ত হেতু, আর প্রধান বিশ্বের উপাদান। প্রথম সৃষ্টি মোহতত্ত্ব, মোহতত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার। তাহা হইতে দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতগ্রামের জন্ম। এই সমুদয় তত্ত্ব মিলিত হইলে ব্রহ্মাণ্ড-শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই পর্য্যন্ত প্রথম পুরুষ। তাহার পর দ্বিতীয় পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া শেষ-শয্যায় শয়ন করিলেন এবং তাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য ইনিই সাধন করেন, ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু হইয়া পালন করেন, রুদ্র হইয়া সংহার করেন। ইনি হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী, বেদ তাঁহাকে সহস্রশীর্ষা পুরুষ বলিয়াছেন, ইনি দ্বিতীয় পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, মায়ার আশ্রয়; কিন্তু মায়াতীত তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণাবতার, বিরাট্ ব্যষ্টিজীবের তিনি অন্তর্যামী, তিনি ক্ষীরোদক-শায়ী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সমুদয় বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি—সর্ব্বপ্রথম

সঙ্কর্ষণ বলিতে ক্রিয়াশক্তি বুঝায়। এখানে আমরা প্রথম ত্রিমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাই। ইচ্ছাশক্তি কৃষ্ণ, জ্ঞানশক্তি বাসুদেব, আর ক্রিয়াশক্তি সঙ্কর্ষণ। তাহার পর চতুর্ব্যূহ। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীর উপাখ্যানে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যিনি বাসুদেব, তিনি নিষ্ক্রিয় সনাতন পুরুষ। পৃথিবী জলে বিলীন হয়, জল জ্যোতিতে বিলীন হয়, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, আর মন অব্যক্তে বিলীন হয়। সেই অব্যক্ত যাহাতে বিলীন হয় তিনিই বাসুদেব। তিনি সর্ব্বভূতের আত্মভূত। পৃথিবী বায়ু, আকাশ, জলও জ্যোতিঃ এই পঞ্চ মহাভূত মিলিত হইলে শরীর হয়। এই শরীরে বাসুদেব যখন আবিষ্ট হন, তখন তিনি বিশ্ববিধারক সঙ্কর্ষণ ও শেষ-নামে সংখ্যাত হয়েন। সুতরাং বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণে তত্ত্বতঃ প্রভেদ নাই। ভগবান্ বাসুদেব ক্ষেত্রজ্ঞ ও নির্গুণ, তিনিই ব্যক্ত হইলে সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নই মন। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ—অনিরুদ্ধই অহঙ্কার।

শ্রীচৈতন্য লীলায় শ্রীনিত্যানন্দের যে লীলা ও তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে—তাহার ভিতরেও আমরা এই সমুদয় তত্ত্বের সমাবেশ দেখিতে পাইব।

ধর্ম্ম ও জাতীয় শিক্ষা

[গত অসহযোগ-অন্দোলনের সময়, কলিকাতায় যেদিন গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যার আয়তন প্রতিষ্ঠিত হয়—ঠিক তাহার পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নকালে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির হলে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং সেই রাত্রিতেই একজন বন্ধুর অনুরোধে, যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়াছিলাম। দৈবক্রমে হঠাৎ পুরাতন লেখাটি পাইয়া, তখন যেমন লিখিয়াছিলাম, ঠিক্ সেই অবস্থায় এতদিন পরে ছাপাইয়া দিলাম। সেদিনের উত্তেজনা চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু ইহাতে এমন অনেক কথা আছে, যাহা সব সময়েই আলোচনা করা আবশ্যক। এই জন্যই ইহা মুদ্রিত হইল। এখন হইতে প্রত্যেক মাসেই শিক্ষা সম্বন্ধে একটি করিয়া প্রবন্ধ থাকিবে—বাঃ-সম্পাদক।]

বিষম সমস্যা উপস্থিত। সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটা ভাঙ্গাগড়া আরম্ভ হইয়াছে যে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় স্বদেশপ্রাণ মনীষি সমগ্র পৃথিবীর যাহা বৃহত্তম সমস্যা, তাহার

মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে, ভারতবাসীর পক্ষে, খুব বড় আশা ও আনন্দের কথা। তিনি স্বদেশকে ভুলিয়া পৃথিবীর সমস্যার আলোচনা করেন নাই। ভারতের সমস্যা যে সমগ্র পৃথিবীর সমস্যার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ইহাই তিনি বুঝাইতেছেন। ভারতের সমস্যা অতি ভয়ঙ্কর। এমন অসহায় অবস্থায়, এমন গুরুতর কার্য্যে পৃথিবীতে কোন জাতি কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই। সমস্যা যে কি, তাহা সকলেই জানেন। প্রথম ও প্রধান সমস্যা—রাজনীতিক। ইহাই মূল সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসায় যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহাদের আহ্বানে ভারতের জনসঙ্ঘ নবচেতনায় জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের মতের সহিত আপনার মতের মিল হউক বা না হউক, তাঁহারা যে এক মহাশক্তি অবতারিত করিয়াছেন,—ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের নেতৃত্বে, সমাজ-জীবনের অন্যান্য বিভাগে যে সমস্যাগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে, সেগুলির মীমাংসায় সাধ্যমত হস্তক্ষেপ করিতে সকলেই বাধ্য। এখন এমন একটা দিন আসিয়াছে যে, কাহারও পক্ষে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। স্বপক্ষেই হউক, আর বিপক্ষেই হউক, কিছু করিতেই হইবে।

রাজনীতিক-সমস্যার পর শিক্ষাসমস্যা। রাজনীতিক-সমস্যার মীমাংসা সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক, শিক্ষার সমস্যা উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দলে দলে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষালয়ে তাহারা পড়িবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। যে সমুদয় লোক একেবারে জড়-ভাবাপন্ন, জগতের উচ্চতর কর্ম্মরাজ্যের সহিত যাহাদের কোনরকম সম্পর্ক নাই, এক কথায় যাহারা সমাজের ভার স্বরূপ, তাহারা মাতব্বরি করিয়া বলিতেছে—"ছেলেদের বড়ই অন্যায়, তাহারা অবাধ্য হইয়াছে—উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে।" কেবল ছেলেদের দোষ দিয়াই তাহারা নিরস্ত নহে—বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার জন্য যাহারা ছেলেদের উত্তেজিত করিতেছে, তাহারা তাহাদেরও গালাগালি করিতেছে। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায়, যে একদল রাজনীতিক নেতা অন্যায় কার্য্য করিতেছেন এবং যুবকেরা ও বালকেরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া আরও অন্যায় করিতেছে, তাহা হইলেও চুপ্ করিয়া বসিয়া বসিয়া গালাগালি করা যায় না। ছেলেরা বিদ্যালয় ছাড়িয়াছে ও ছাড়িতেছে। খবরের কাগজ পড়িয়া দেখিতেছি—প্রতিদিন নূতন নূতন শিক্ষালয় বন্ধ হইতেছে। যাঁহারা মনে করেন, ছেলেদের এই কার্য্য অন্যায়, তাঁহারা যদি সত্য সত্য নিজেদের মতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসের যদি অনুমাত্রও বল থাকে এবং দেশের জন্য যদি তাঁহাদের এককণাও মমতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন কেন? দেশের ভবিষ্যতের ভরসাস্থল,—এই বাঙ্গালী-জাতির পিণ্ডের অধিকারী যুবক ও বালকগণ,—তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিদ্যার্জ্জন ত্যাগ করিয়া, পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, তাঁহারা কোন্ প্রাণে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াও, আহার নিদ্রা ও নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসাধন লইয়া বসিয়া

রহিয়াছেন? তাঁহারা বাহির হইয়া আসুন। এই তুফানের মুখে বীরের মত দাঁড়াইয়া ইহার গতি-রোধ করুন। যদি বলেন,—ব্যাপার বড়ই কঠিন, কিছু বলিতে গেলে কেহ শুনিবেনা, অপমানিত হইতে হইবে—তাহা হইলে উত্তরে বলিব, তোমাদের বিশ্বাস নাই, বিশ্বাসের বল নাই এবং দেশের প্রতি মমতা নাই। তোমরা চালাকির পথে মানুষ ঠকাইতেছ, তোমরা জুয়াচুরি করিয়া উচ্চস্থান দখল করিয়াছ, তোমাদের কথার ও জীবনের কোন মূল্য নাই।

মহাত্মা গান্ধি ও চিত্তরঞ্জন দাসের কথা শুনিয়াই কেবল বক্তৃতার চোটে ছেলেরা বিদ্যালয় ছাড়িতেছে, উন্মাদ রোগগ্রস্ত লোক ছাড়া এমন কথা কেহই বলিবে না। আসল কথা, বর্ত্তমান শিক্ষা—ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা দারুণ আপত্তি অনেক দিন হইতে দেশে জাগিয়াছে। এই শিক্ষাপদ্ধতি কোন কোন দিকে আমাদের কিছু কিছু উপকার করিলেও, এখন আমরা যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে আর ইহার মধ্যে থাকা চলে না, এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, এই সব কথা দেশের সকলেই, অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গলা দেশের লোক, অনেকদিন আলোচনা করিয়া বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধির যে অতুলনীয় কৃতকার্য্যতা দেখা যাইতেছে, তাহারও মূল কথা, জমি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি আসিয়া বীজ ফেলিতে ফেলিতেই তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইল। যাহা হউক, রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। শিক্ষা-বিষয়ক সমস্যা—এই সব ছেলেদের লইয়া আমরা কি করিব? তাহারা যেমন ভাবে বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলিতে পড়াশুনা করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতেছিল, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব কিনা? কেহ কেহ বলিবেন,—কেবল সম্ভব নহে, ইহাই অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ এই সব ছেলেরা অল্পকিছুদিন পরে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবে, নেতৃগণের উত্তেজনা ও উষ্ণতা আপনা হইতেই কমিয়া আসিবে, তখন আর গোলযোগ থাকিবে না। কেবলমাত্র কতকগুলি অতি অগ্রসর যুবক, একুল ওকুল হারাইয়া বিপদ-সাগরে ভাসিবে।

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে এই প্রকারের অভিনয় আর একবার হইয়াছিল। তাহারও পরিণাম, এই প্রকারের একটা নিষ্ফলতায় আসিয়াছে। সুতরাং সেবারেও যেমন, এবারেও তেমনি হইবে। যাহারা নিজেদের খুব বেশী বিজ্ঞ বলিয়া মনে করেন, চোখ খুলিয়া বাহিরের কিছু দেখার প্রয়োজন যাঁহারা একেবারেই অনুভব করেন না, নিজেদের খেয়ালকে যাঁহারা বেদের অপেক্ষা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান ছাত্র-আন্দোলনের ভিতরের কথা অন্যরূপ। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে ভাবের বন্যা আসিয়াছিল, সেই বন্যার জল লইয়া যাঁহারা স্বচ্ছন্দে আপন আপন খিড়কির পুকুর পূর্ণ করিয়াছেন এবং নিজের নিজের জমি ভাল করিয়া

উর্ব্বরা করিয়া সেই পুকুরের ও জমির আয়ের উপর, আরাম করিয়া নিরাপদে বসিয়া রহিয়াছেন, এই প্রকারের কথা তাঁহাদের মুখে শুনা যাইতেছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে যে, ভাব-বন্যা আসিয়াছিল, আজও ঠিক্ সেই বন্যাই বহিতেছে, এই বন্যাস্রোত এক নিমিষের জন্যও থামে নাই। স্থানে স্থানে সাময়িক বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু ইহা শুকায় নাই। আজ, পাঞ্জাব ও তুর্কী হইতে দুইখানি বড় বড় বরফস্তূপ (avalanche) গড়াইয়া আসিয়া স্রোতের উদ্ভব স্থানে পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও ছোট বড় বরফস্তূপ যে পড়ে নাই তাহা নহে এবং যাঁহাদের চক্ষু আছে তাহারা দেখিতে পাইতেছেন, আজও স্রোতের বেগ বাড়াইবার উপকরণের অভাব হইতেছে না। চৌদ্দ বৎসরে যাহা থামে নাই, তাহার মূল নিরূপণ করাই উচিত, তাহা থামিয়া যাইবে মনে করা পাগলের খেয়াল মাত্র!

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি কি, তাহা সুবিধাভোগী প্রাজ্ঞগণ না বুঝিতেও পারেন এবং যাঁহারা চতুর, তাঁহারা স্বার্থের অনুরোধে বুঝিয়াও অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু যে সব ছেলেরা এই পদ্ধতির শাসনাধীন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই জানে এবং মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে যে, এই পদ্ধতি প্রাণঘাতক এবং জাতিনাশক (De-vitalising and de-racialising)। ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া যখন অনায়াসে বা অল্পায়াসে টাকা রোজগার করিয়া সুখেস্বচ্ছন্দে বাবুগিরি করিয়া দিন কাটাইতে পারা যাইত, তখন আমরা বুঝিতেই শিখি নাই যে, আমার এই সুবিধা আমারই সর্ব্বনাশের উপর প্রতিষ্ঠিত! মদ খাইলে মনে স্ফূর্ত্তি হয়, প্রাণে আনন্দ হয়। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভবিষ্যতের জন্য যে প্রাণশক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা অপব্যয় করিয়া এই আনন্দ হইয়া থাকে; অর্থাৎ বর্ত্তমানের আনন্দ, একটা বাহির হইতে সমাগত বা উপার্জ্জিত জিনিষ নহে। নিজেরই ভবিষ্যতের মাথা খাইয়া, বর্ত্তমানের এই ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বলতা সাধিত হইতেছে। অধিকাংশ ইংরাজী-নবিশের জীবনের যেটুকু সুবিধা, তাহা দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত করিয়াই হয়! দেশের সর্ব্বনাশ যে, পরিণামে আমার নিজেরই সর্ব্বনাশ, একথা বর্ত্তমানে আত্মহারা মাতালের মত, আমরা প্রথম প্রথম বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ভাবিয়া দেখুন, আমরা ইংরাজী শিখিয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে পণ্ডিত হইয়া কি করিব? প্রথমতঃ দেওয়ানি, ফৌজদারিতে কাজ করিব, না হয় ওকালতি করিব। কিন্তু এই তিন প্রকারের কাজ কি আমার দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করে না? গ্রাম নষ্ট হইয়া গেল, মামলা-মকদ্দমায় দেশের লোকের প্রবৃত্তি এতই কদর্য্য হইয়াছে যে, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, প্রত্যেকে অপরকে ঠকাইতে চাহে। সব বিষয়েই দলাদলি। পাঁচজনে মিলিয়া কোনই কাজ করিতে পারে না। আদালত কাছারীর সংখ্যা বাড়িতেছে, উকিলের সংখ্যা বাড়িতেছে। এক একটা জেলা ভাঙ্গিয়া চার পাঁচটা জেলা হইতেছে। কয়েকজন হাকিম, উকিল, আর কাছারীর আম্‌লা সহরে কিছু সুখে বাস করিতেছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই,—দেশ কোথায়? দেশের অধিকাংশ লোক কোথায়? তাহারা নিরুপায় হইয়া ক্রমে ক্রমে চা-বাগানে, কিংবা কয়লাখাতে, কিংবা পাটের কলে, না হয় ফিজিদ্বীপে বিদেশীর মূলধনীর ধন বৃদ্ধি করিতে চলিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা পাইয়া আমরা অনেকেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছি। কিন্তু তৃপ্তি-সহকারে যাহা খাই, তাহা যে আমারই দেশের লোকের রক্ত মাংস এবং আমাকে এক ছটাক খাইতে হইলে যে অন্যের হাতে এক সের তুলিয়া দিতে হয়—তাহা আমরা মোটেই ভাবি না!

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়া সরকারী চাকুরী বা ওকালতি করিবার অধিকার যাহারা না পায়, তাহারাই বা কি করে? দেশে যত ব্যবসায় বাণিজ্য, সমস্তই বিদেশের মূলধনে চালিত এবং তাহার শ্রেষ্ঠ লাভ বিদেশে চলিয়া যায়। তাহার শ্রীবৃদ্ধি আমাদিগকে শ্রীহীন করে, একথা আজকাল সামান্য লোকও বুঝিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, এই বর্ত্তমান আন্দোলন ভারতবর্ষকে বর্ত্তমান যুগের উন্নতিমুখী গতি হইতে সরাইয়া সুদূর অতীতে এক কল্পনা-রাজ্যের অভিমুখী করিতেছে। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যাহা কিছুর সাহায্যে বর্ত্তমান যুগে মানবজাতি প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণ লাভ করে, তাহা বিজ্ঞানের কৃপায় সাধিত হয়। বর্ত্তমান আন্দোলন ভারতবর্ষকে বিজ্ঞান-বিমুখ করিবে, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী কোন কোন লোক এমন কথাও বলিতেছেন। কিন্তু এই কথা মোটেই সত্য নহে। বিজ্ঞানের মূল্য ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে এবং বিজ্ঞানের পূজা ভারতবর্ষকে করিতেই হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও কার্য্যকরী শিক্ষা পাই না। যাহারা বিজ্ঞানে উপাধি লাভ করে, তাহারাও আইনের ব্যবসায় করিতে যায়! আর যদি বা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কোন কার্য্য করে, তাহাও স্বাধীনভাবে দেশের ধনবৃদ্ধি করিয়া নহে। কোন বৈদেশিকের অধীনে কেরাণীর মত কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর, আর একটি বড় গুরুতর কথা ভাবিবার আছে। কেবল ভারতবর্ষের নহে, পূর্ব্বদেশের অর্থাৎ এশিয়ার সভ্যতার একটা বিশিষ্টতা আছে। পূর্ব্বদেশ, পশ্চিমের মত মানুষকে সকল সময়, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমর-সজ্জায় রাখিয়া মানবের ভিতরে যে হিংস্র পশু রহিয়াছে, তাহাকে প্রশ্রয় দিতে চাহে না। এই পশুকে শাসন করাই পূর্ব্বদেশের মানবীয় সাধনার প্রধান লক্ষ্য। পশ্চিমদেশ, মুখের কথায় এই আদর্শ স্বীকার করিলেও, বাস্তব-জীবনে তাহা একেবারে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

মহাত্মা যিশুখৃষ্টের উপদেশ, দুই হাজার বৎসর কাল ইউরোপে প্রচারিত হইলেও ইউরোপের কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, কি রাজনীতিক কি আন্তর্জাতিক জীবনে এই শিক্ষা আদৌ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ইউরোপে হয়ত ইহা ভাল করিয়া বুঝিতেছে না, কিন্তু এশিয়ার অতি সামান্য লোকেও ইহা বুঝিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, ইহার সাহায্যে আমরা

যে সুবিধা পাই, সেই সুবিধা দেশের সর্ব্বনাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ, এই শিক্ষা পশ্চিমদেশের ছাঁচে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করায়, আমাদের জীবনে যাহা চিরন্তন বিশিষ্টতা, তাহা লোপ পাইতেছে এবং চাতুরী, ছলনা, মিথ্যাচার প্রভৃতির ধারায় নিতান্ত বাধ্য হইয়া এবং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমরা পশুত্বের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছি। এই অহিংসা, প্রেমের দেশে জন্মাইয়াও আমরা এতদিন ইহা বুঝিতে পারি নাই। আজ দেশের সাধারণ লোকেও তাহা বুঝিয়াছে। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া যাহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করে, তাহারাই কি সর্ব্বোত্তম ছাত্র? তাহারাই কি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে? একথা মোটেই সত্য নহে। পরীক্ষায় সফলতা, কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। কতকগুলি কৌশল ও চাতুরী জানিলেই জ্ঞানে কম হইয়াও পরীক্ষায় বড় হওয়া যায়। যেমন আদালতের বিচারে আমার দাবী ন্যায্য হইলেই যে আমি মোকদ্দমায় জয়ী হইব, তাহা নহে, তদ্বিরের কৌশলে সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যা সত্য হয়। ইহা দৈনন্দিন ঘটনা। বিটশন্ বেলের মত বড়লোক সাহেবেও ইহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক মুসলমান ইহা বুঝিতে পারে এবং এজন্য তাহাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রতিপদে আহত হইতেছে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায়ও ঠিক তাই। কৌশল করিয়া বাছিয়া বাছিয়া পরীক্ষক, কে কিরূপ প্রশ্ন দিতে পারে, তাহা নিরূপণ করিয়া তদনুযায়ী প্রস্তুত হইলে, সফলতা লাভ করা যায়। প্রশ্নপত্র বাহির করিতে পারিলে তো আর কথাই নাই। পরীক্ষককে বশীভূত করিতে পারিলে আরও ভাল। এই প্রকারে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম চলিতেছে। সত্য বা ন্যায়ের ইচ্ছায় নহে। চাকুরীর বাজারেও তাই। কৃতিত্ব পুরস্কৃত হয় না। মিথ্যাচার ও চতুরতা পুরস্কৃত! যে দেশের জমিতে বা যে দেশের মানব-প্রকৃতিতে এই পদ্ধতি জন্মাইয়াছে, সে দেশে ও সে প্রকৃতিতে হয়ত ইহা এত দূর অশোভন ও অহিতকর নহে। হয়তো সেখানে এই পদ্ধতির দোষ সংশোধনের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু আমাদের দেশের জমিতে এই পদ্ধতির কলমের চারা, একেবারে নিখুঁত বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। আমরা ইহা সংবর্দ্ধিত করিয়াছি, সুতরাং স্বয়ং ছেদন করা হয়তো শাস্ত্রানুসারে "অসাম্প্রত"; কিন্তু এই সব কথা জানিয়া দেশের ছেলেরা যদি এই গাছের ছায়ায় বসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ কি, ভাবিয়া পাই না। আরও যে কত দোষ আছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াও কাজ নাই।

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই গরীবের দেশে সরকারী সাহায্যে উহা যদি আত্মরক্ষা করিতে পারে থাকুক, কিন্তু দেশের প্রকৃত অবস্থা যাহারা জানেন, তাঁহারা এই শিক্ষা-পদ্ধতি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না। কেহ কেহ বলিবেন যে, একটা জিনিষ রহিয়াছে, ইহা ভাঙ্গিবার প্রয়োজন কি? ইহাকে ভিতর হইতে সারাইয়া লও।

বিশেষতঃ তোমরা যখন শিক্ষা বিভাগে কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছ, তখন ভিতর হইতে সারাইয়া লওয়া অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, ভিতর হইতে সারাইয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। যাঁহারা সম্ভব বলিয়া মনে করেন, করিয়া লউন আপত্তি নাই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকই মনে করে, অসম্ভব।

সুতরাং রাজনীতিক কারণে বা প্রকৃত সুশিক্ষা দান ব্যবস্থার অনুরোধে, বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলিকে ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করি বা না করি, একটা শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যখন ছাত্রগণ বিক্ষুব্ধচিত্তে নিজ নিজ শিক্ষালয় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে সকলে না হউক, অনেকে দেশের নেতৃগণকে সরলপ্রাণে ও করুণস্বরে বলিতেছে—"আপনারা আমাদের রক্ষা করুন, যে শিক্ষায় দেশের অকল্যাণ সে শিক্ষা হইতে আমাদের উদ্ধার করুন, যে প্রকারের শিক্ষা পাইলে, আমরা মাতৃভূমির সুপুত্র হইয়া মায়ের সেবা করিয়া মায়ের প্রসাদে ও দেশে ভ্রাতাভগ্নিগণের আশীর্ব্বাদে কৃতার্থ হইতে পারিব, আমাদের জন্য সে প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। আমরা উচ্ছৃঙ্খল নহি; আমরা সংযতভাবে সঙ্গত নিয়মের অধীনে শাসিত হইতে চাই, আমরা বিলাস চাই না, অলস ও স্বচ্ছন্দ জীবন চাহি না, আমরা কঠোর পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, আপনারা পিতার ন্যায়, গুরুর ন্যায় আমাদিগকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করুন।"

এই প্রকারের কথা যখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন কাহারও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। কর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য ও সুবিধা সকলের নাই। কিন্তু সঠিকভাবে চিন্তা করিয়া অপরকেও সেই সুচিন্তায় দীক্ষিত করিবার সামর্থ্য অনেকেরই আছে। ঠিকমত না বুঝিলে ঠিকমত কাজ হইবে না। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় শিক্ষার জন্য যে আয়োজন করা হইয়াছিল, আজও সেই আয়োজন রহিয়াছে, এবং আনন্দের কথা এই যে, ঐ আয়োজনের যাঁহারা কর্ত্তা, তাঁহারা বর্ত্তমান ভাববন্যার প্রবলতা ও প্রখরতা দেখিয়া নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতেছেন। ভগবান্ করুন, এতদিন তাঁহারা যাহা করিব বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আজ এই নূতন সুযোগে তাঁহারা তাহা করিবেন। চৌদ্দ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ঐ আয়োজনের কর্ম্ম-কর্ত্তৃগণ কি শিখিয়াছেন ও কি বুঝিয়াছেন, আজ সকলের নিকট তাঁহাদের তাহা নিবেদন করার দিন আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে তাহা করিতেছেন না কেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাতে দেশের লোকে একটি মাত্র কথা শুনিয়াছে—তাঁহাদের টাকার অভাব। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি, যাহা ছাড়িয়া ছেলেরা চলিয়া আসিতেছে,—সেখানেও ঐ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অভাব কেবল টাকার! চিন্তার নহে, সুচিন্তিত পদ্ধতির নহে, অভিজ্ঞতার নহে, জ্ঞান বা কর্ম্মশক্তির নহে, মানুষের নহে,—অভাব কেবল টাকার! আমি মনে করি যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের যে সমুদয় সর্ব্বনাশ করিয়াছে,

তাহার মধ্যে প্রধান সর্ব্বনাশ, এই শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে ভাবিতে শিখাইয়াছে, টাকার অভাবই একমাত্র অভাব;—টাকা হইলেই সব হয়! মনুষ্যত্ব কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, টাকা দিয়া সবই কিনিতে পারা যায়! এই উৎকট ও বিষময় ধারণা হইতে বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত ভারতবাসীকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, দেশের প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচিত মানুষের প্রয়োজন। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে যে আয়োজন হইয়াছিল, সেই আয়োজনে এই জিনিষটা ছিল কি না, ঠিক্ বলিতে পারি না। তাঁহারা অবশ্য অনেক কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু যতখানি করা সম্ভব ছিল, ততখানি করিতে পরিয়াছেন কিনা, সেকথা তাঁহারা বলেন নাই এবং আমারও আপাততঃ বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন যে শিক্ষা-পদ্ধতি আরম্ভ করিতে হইবে, দেশের প্রকৃত প্রয়োজনের প্রতি চাহিয়া সে পদ্ধতিকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করিয়া উপাধি দেওয়া হয়। পরীক্ষা দিয়া উপাধি পাওয়া বা পাশ করা, ছেলেদের একটা আকাঙ্ক্ষার জিনিষ। সুতরাং যে সব ছেলে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণে পরীক্ষা করিয়া উপাধি দেওয়া হইবে, বা তাহারা যে পাশ করিয়াছে তাহার একটি নিদর্শন পত্র বা সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে, এই প্রকারের বন্দোবস্ত যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যদি শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রে কার্য্য করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নকল করিয়া চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যে অংশ গঠিত হইয়াছিল, সে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে অংশের কিছু নূতনত্ব বা বিশেষত্ব ছিল, সেই অংশটুকু কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়াছে। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহাতে কি কিছুই ভুল হয় নাই? তাহার নেতৃগণ যদি নিজেদের অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা না করেন, অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া নিজেদের দোষ দেখিবার শক্তি যদি তাঁহাদের থাকে এবং নিজেদের দোষ অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করিবার সৎসাহস যদি তাঁহাদের চরিত্রে থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের ভ্রান্তি ও ত্রুটিসমূহ প্রচার করুন। তাহা করিলে তাঁহারা ছোট হইবেন না, বড় হইবেন এবং দেশেরও উপকার হইবে।

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, প্রথমেই ত্রিবিধ সমস্যা আমরা দেখিতে পাই। এই ত্রিবিধ সমস্যার মীমাংসার জন্য, তিন দল কর্ম্মী প্রস্তুত করাই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রথম সমস্যা—রাজনীতিগত। দ্বিতীয় সমস্যা—অর্থনীতিগত। আর তৃতীয় সমস্যা—ভাবগত। Political, Economical, Cultural—এই ত্রিবিধ উৎপাৎ বা ত্রিতাপ নিবারণ করাই, নূতন শিক্ষা

প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। যে সমুদয় যুবক পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া গ্রামের যাহাতে উন্নতি হয় সেজন্য ব্যবস্থা করা হইবে, এইরূপ কথা শুনা যাইতেছে। প্রস্তাব অত্যন্ত সাধু—কিন্তু কাজ অত্যন্ত কঠিন। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও গ্রামে গিয়া কোন কার্য্য করে নাই। চিন্তাশক্তিহীন কোন লোক হয়ত বলিবেন—ঝড়ের সময়, বন্যার সময়, গ্রামে গিয়া গ্রাম্য লোকদিগকে সাহায্য করা হইয়াছে। এ কার্য্য, কার্য্য নহে। অভাবের সময় চাঁদা তুলিয়া সাহায্য করা খুব মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন যে সব ছেলেরা গ্রামে যাইবে, তাহারা অন্ন বস্ত্র বিতরণ করিতে যাইবে না। তাহারা যাইবে, গ্রামবাসিগণের ভিতরে যে শক্তি নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, সেই শক্তি জাগাইতে। এ কার্য্য আমাদের পক্ষে নূতন। সুতরাং, বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত ও নির্ব্বাচনের পর বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবক ব্যতীত, অন্য কাহাকেও দল লইয়া গ্রামে কাজ করিতে পাঠাইলে, ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবে। এই সব যুবক নির্ব্বাচন করিবে কে? তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে কে? যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করিবে কে? এই কার্য্য তিনটি যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারা একত্র হইয়া একটি শিক্ষাগার করুন। মহাত্মা গোখ্‌লে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "Servant of India বা 'ভারতসেবক সমিতি' এই প্রকারের একটি জিনিষ। আমরাও কাগজে দেখিতেছি, "সমাজ সেবক-সঙ্ঘ" নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে কি ভাবে লোক লওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এ সমুদয় কথা কিছুই জানা যায় নাই।

দ্বিতীয় কার্য্য —অর্থনীতিগত। শিল্প বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয়, বাণিজ্য-বিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারা এই শ্রেণীর কার্য্য করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কেবল এই বিভাগে কিঞ্চিৎ কার্য্য করিয়াছেন। এই বিভাগের কার্য্যেই টাকার শক্তি কিছু বেশী।

এইবার তৃতীয় বিভাগের কার্য্যের কথা আলোচনা করা যাউক। আমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে পরায়ত্ত, অর্থনীতি ক্ষেত্রে লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত। এই দুইটি কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভাব-রাজ্যে আমরা কি প্রকারে নিজের বিশিষ্টতা হারাইয়া, আত্মমর্য্যাদা-বোধে বিসর্জ্জন দিয়া, একেবারে পরাজিত হইয়াছি, সে কথা বুঝাইয়া বলা বড়ই কঠিন। বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ লোকই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা না করিলে, ইহা বুঝিতে পারিবেন না। কাজেই তত্ত্বের দিক হইতে এই সমস্যা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, কার্য্যতঃ ইহার মীমাংসার জন্য কি করা যাইতে পারে, মোটামোটি তাহাই বলিতেছি।

শিক্ষাদান-কার্য্যে নেতৃত্ব করিবার জন্য কিরূপ লোকের দরকার, প্রথমে তাহাই নিরূপণ করা উচিত। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রচারিত করেন নাই। ইহা অতিশয় দুঃখের

কথা। আমরা বাধ্য হইয়া তাহার ভিতরের একটি কথা প্রকাশ করিতেছি। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ স্থাপিত হওয়ার পর কমিটির সভা বসিল। আলোচ্য বিষয়,—ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধর্ম্মশিক্ষা যে দিতে হইবে, ইহাতে মতভেদ নাই। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি, ধর্ম্মহীন ও নাস্তিক্য-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন। এমন কি, হাণ্টার সাহেবও বলিয়াছেন। হাণ্টার সাহেব কি অর্থে বলিয়াছেন এবং দেশের লোকই বা কি অর্থে বলে, তাহা অবশ্য অনেকেই জানে না। সেই কারণে, সেদিন একখানি গবমদলের ইংরাজী কাগজে হাণ্টার সাহেবের উক্তি আদর করিয়া ছাপান হইয়াছে দেখিলাম। যাহা হউক, কমিটিতে যখন ধর্ম্ম-শিক্ষার কথা উঠিল, তখন একজন সভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কি প্রকারের ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন? আমরা সহস্র প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কুসংস্কার হইতে বহু পরিশ্রমে এ জাতিকে উদ্ধার করিতেছি। আপনারা কি ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া, সেই প্রাচীন কুসংস্কারগুলি ফিরাইয়া আনিবেন?" অপর পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইল—"সেই কুসংস্কার গুলি কি?" উত্তর—"ঠাকুর পূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, গঙ্গাস্নান, তীর্থযাত্রা, উপবাস।" এইবার যুদ্ধং দেহি। দুই পক্ষে তর্ক লাগিয়া গেল। এ তর্কের যে শেষ নাই, তাহা সকলেই জানেন। ঝগড়া হইল, দলাদলি হইল। কতকগুলি টাকা শিক্ষাপরিষৎ পাইতেন, এই দলাদলির ফলে, সেই টাকা শিক্ষাপরিষদে আসিল না—অন্যদিকে চলিয়া গেল। বার বৎসর পূর্ব্বে বাংলায় যাহা হইয়াছিল, কিছুদিন ধূমায়িত হইতে হইতে ঠিক্ সেই আগুন, কাশীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেখানে প্রশ্ন,—"ব্রাহ্মণেতর জাতির লোককে ধর্ম্ম শিক্ষকের আসন দেওয়া হইবে কি না?" ব্রাহ্মণেরা হারিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি করিবার জন্য প্রকাশ্যে দলবদ্ধ হইয়াছেন। পরিণাম কি, তাহা ভগবান্ জানেন। মালব্য মহাশয় কি করিলেন, আমরা তাহাও জানি না। একভাবদ্ধ হইয়া বড় কাজ করিতে গেলে পদে পদে কত বাধা, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এই কথাটির উল্লেখ করিলাম। আমাদের সমষ্টি-জীবনের ভিতরে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি ও 'সাব্‌মেরিণ' লুকাইয়া রহিয়াছে। সহজ অবস্থায় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা অপ্রবিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব নিরূপণ করাই অসম্ভব। কিন্তু কথাটা বড়ই তীব্র সত্য। জাতীয় শিক্ষার জন্য আন্দোলন উঠিয়াছে, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি যাঁহারা রাখিতে চাহেন, তাহারা বলেন—"টাকা দাও, এই প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে তোমাদের ঠিক্ মনের মত করিব।" আবার যাহারা এই শিক্ষা-পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া মনের মত শিক্ষা-পদ্ধতি গড়িতে চাহেন, তাঁহারা বলিতেছেন —"প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি মনের মত হইতেই পারে না, ইহার আদি, অন্ত, মধ্য সর্ব্বত্রই গলদ। ইহার গঙ্গাযাত্রা করিয়া, এস, নূতন আয়তন প্রতিষ্ঠা করি। উহাদের টাকা দিওনা, আমাদের টাকা দাও।" টাকা আসিতে পারে। উত্তেজনা যেরূপ দেশব্যাপী,—সকলেরই হৃদয় মন যেরূপ নাচিয়া

উঠিয়াছে, তাহাতে কর্ম্মনিপুণ ও বিশ্বাসী লোকে চেষ্টা করিলে টাকা উঠিবে। অন্ততঃ পক্ষে যে পরিমাণ টাকার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিবার সামর্থ্য আমাদের আছে, সে পরিমাণ টাকার অভাব হইবে না। কিন্তু কি পরিমাণ টাকা আমরা ঠিক্‌মত সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তাহার জ্ঞান আমাদের দেশে সুলভ নহে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পদ্ধতি হইতে এই কথা সপ্রমাণ করিতে পারা যায়। এই জ্ঞানের অভাব, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি হইতে জন্মাইয়াছে। সুতরাং, এই অজ্ঞানতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, কর্ম্মকর্ত্তৃগণের সাধনা আবশ্যক।

টাকা আসিবে। হয়তো অনেক টাকা আসিবে। টাকার সঙ্গে যে শক্তি আসে, সে শক্তিও আসিবে—কিন্তু এই অর্থ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এমন সব লোক আসিয়া জুটিবে যে, তাহাদের লইয়া কাজ করা একেবারে অসম্ভব হইবে। বিরোধ বাধিয়া যাইবে। নিজে নিজে ঝগড়া করিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং উপায় কি? এখন একেবারে বড় কাজের কল্পনা না করিয়া, ছোট ছোট কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। এই কাজগুলি সদ্য সদ্য ফলপ্রসূত হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার যিনি ব্যবস্থাপক, তাঁহার পক্ষে শান্তিসংস্থাপক (Harmoniser) হওয়া আবশ্যক। নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা থাকিলে এই কার্য্য করা যায় না। গোঁড়া সংস্কারক হইলেও এই কার্য্য করা যায় না—অন্ততঃ-পক্ষে বৃহদাকারে করা যায় না। প্রকৃত স্থায়ী ও মহৎ কর্ম্ম করিতে হইলে, একটি কথা সর্ব্বদাই স্মরণীয়। যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া এই কার্য্য করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি? তাঁহারা সকলেই কি একটা সাধারণ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, জীবনে মরণে ব্রতধারণপূর্ব্বক এক হইয়াছেন, অথবা প্রত্যেকেই চতুর, প্রত্যেকেরই নিজের নিজের মতলব আছে? কেহই কাহাকেও প্রাণের ভিতরের কথা বলেন না। একটা সাময়িক উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়া একতাবদ্ধ হইয়াছেন এবং সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করিতেছেন? বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাষায় এই প্রশ্নটি নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে। ইহারা কি—"স্বরূপ বৈভবের মিত্র," না—"মায়া বৈভবের মিত্র?" ইঁহাদের সখ্য কি একটা 'রস' না 'ছায়া'? এই প্রশ্নের মীমাংসা বড়ই আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও শাসন-পদ্ধতির প্রভাবে, মানুষের সঙ্গে মানুষ, জীবনে মরণে ব্রতধারী হইয়া উচ্চ আদর্শের মন্দিরদ্বারে সম্মিলিত হইতে পারে না। এখনকার দিনে একসঙ্গে বন্ধুর মত দল বাঁধিয়া কাজ করিতে করিতে, কে যে কাহাকে কখন বিপন্ন করিবে, কে যে কাহাকে কখন অতিক্রম করিয়া নিজের স্বার্থ-সাধনের পথে বাহির হইয়া পড়িবে, তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ইতিহাসেও এঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু সে কথা সকলের জানা নাই। আমরাও তাহা প্রকাশ করিলাম না। বিলাতের রাজনীতিক দলাদলিতে ইহা দৈনন্দিন ঘটনা। তাহাদের ইহা সহিয়া গিয়াছে। তাহাদের যাহা আছে, আমাদেরও তাহাই হওয়া স্বাভাবিক, দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই

এইরূপ বিবেচনা করেন। ইহাতে তাঁহাদের দোষ নাই। যে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের মানসিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এইরূপ বিবেচনা করাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলনের ভিতরের কথা এই যে, ইংলণ্ডে যাহা হইয়াছে বা হয়, আমাদেরও যে ঠিক্ তাহাই হইবে, এরূপ মনে করা বিড়ম্বনা। তাহারা চলিবে তাহাদের মত, আমরা চলিব আমাদের মত। তাহারা ও আমরা, এই দুইয়ের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে; সেই স্বাতন্ত্র্যের সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেই স্বাতন্ত্র্যসূত্রই বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রাণ। সুতরাং, যাঁহারা দল বাঁধিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, ঠিক্ তাঁহারাই যে দল বাঁধিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। সহকর্ম্মীনির্ব্বাচনই প্রধান সমস্যা। সহকর্ম্মীনির্ব্বাচনের পর আদর্শ নির্দ্ধারণ, তাহার পর অন্তর্মুখী হইয়া আত্মশক্তি নিরূপণ করিতে হইবে। কর্ম্মের অধিকারী হইতে হইলে এইগুলি চাই। নতুবা, কর্ম্ম বিকর্ম্ম হইবে। বিকর্ম্ম অপেক্ষা অকর্ম্ম শ্রেয়স্কর।

একটা নকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু আজ দেশের হৃদয়, নকলে সন্তুষ্ট নহে। বক্তৃতামঞ্চ হইতে অনেকেই বলিতেছেন, আজ ভারতবর্ষ তাহার অন্তরাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছে। আমরা ভরসা করি এ কথাটি সত্য। কিন্তু কথাটি সত্য হইলেই চলিবে না। আমাদের কর্ম্মের দ্বারা এ কথাটিকে সত্য করিতে হইবে। নকল বিশ্ববিদ্যালয় শব্দের অর্থ—কতকগুলি নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ওয়ালা বা বিদেশে লেখাপড়া শিখিয়া অনেক লোক লইয়া—'সেনেট্' 'সিণ্ডিকেট্,' 'ফেকাল্টি' প্রভৃতি করিয়া সাধারণভাবে কতকগুলি আইন ছাপাইয়া দিয়া বলা হইল যে—মফঃস্বলের বিদ্যালয়সমূহ, যাহারা বাংলা বা উর্দ্দু বা হিন্দিতে ছেলেদের পড়াইবে, দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি পড়াইবে, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত হউক। এই প্রকারের গঠনের নাম—নকল বিশ্ববিদ্যালয় গঠন। কেন্দ্রে বসিয়া কাজ করিলে হইবে না। পরিধি পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া, দেশের বা পল্লীগ্রামের লোকের প্রকৃত অভাব ও প্রয়োজন নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, পরিধি হইতে কেন্দ্রের অভিমুখে ধীরে ধীরে গড়িয়া আসিতে হইবে।

হিন্দু সমাজের দিক্ হইতে এই কার্য্য কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। যে-কোন হিন্দুর বাড়ীতে যান্, তিনি আপনাকে 'পুরোহিতের বড়ই অভাব' এই কথা জানাইবেন। পুরোহিত যে দেশে নাই, তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ যে পুরোহিত পাওয়া যায়, তাহাতে দেশের অধিকাংশ লোক অসন্তুষ্ট। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে এফ, এ, বি, এ পড়া কয়েক সহস্র ব্রাহ্মণের ছেলে যদি গ্রামে পুরোহিতের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হয়, প্রকৃত পুরোহিত হইতে হইলে যে চরিত্র ও শিক্ষা প্রয়োজন, তাঁহাদের যদি সে চরিত্র থাকে এবং তাহাদিগকে যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা দেশের প্রকৃত সেবা করিয়া, সসম্মানে উদরান্নের সংস্থান করিতে

পারে। এখন নিরূপণ করিতে হইবে—বর্ত্তমান সময়ে গ্রামে গিয়া পুরোহিতের কার্য্য করিতে হইলে কি প্রকারের শিক্ষার প্রয়োজন। যিনি দেবতায় বিশ্বাস না করেন, মন্ত্রে বা ক্রিয়াকর্ম্মে বিশ্বাস না করেন, তিনি যেন সুবিধাজনক চাকুরী পাইব বলিয়া এই পথে না আসেন। এই কার্য্য যাঁহারা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে দশকর্ম্ম, আসন, মুদ্রা, ন্যাস, ব্যবহারিক স্মৃতি ও ব্যবহারিক জ্যোতিষ শিখিতে হইবে। তাহা ছাড়া, কিঞ্চিৎ আয়ুর্ব্বেদ ও শরীর তত্ব, গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান, সামান্ত কৃষিতত্ব ও আইন কানুন অর্থাৎ প্রজা সত্ব আইন প্রভৃতি জানিতে হইবে। গ্রাম্য পুরোহিত গ্রাম্য বিত্তালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিবেন। এই কার্য্য করার একটি সুবিধা আছে। হিন্দুসমাজে অনেক জাতি উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে রাজবংশীজাতির নাম করা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গে ও নিম্ন আসামে এই জাতি অত্যন্ত প্রবল। কিছুদিন হইতে ইহারা নিজেদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। রঙ্গপুর সরকারী বিত্তালয়ে ইহাদের একটি স্বতন্ত্র ছাত্রাবাসও আছে। এই জাতির সমিতির হাতে অনেক টাকা আছে। ইঁহারা যদি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত পান, তাহা হইলে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। যে সকল ব্রাহ্মণের ছেলেরা সাহেবের জুতার দোকানে পর্য্যন্ত চাকুরী করিতে প্রস্তুত হইয়া লেখাপড়া শিখিতে ছিল, তাহারা কি এই পৌরোহিত্য কাজ করিতে পারে না? কেবল রাজবংশীজাতি নহে, মাহিষ্য, সদ্গোপ, নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, প্রভৃতি অনেক জাতি পুরোহিত গ্রহণে প্রস্তুত। যাঁহারা এই কার্য্যে যাইবেন, তাঁহারা কেরাণী হইয়া জন্মিয়াছেন কিনা, ইহা দেখিতে হইবে। আসল কথা, যাহাই করি না কেন, টাকা ও ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা সত্য সত্য কিছু হইবে না। দেশের কাজ করিতে পারে—এই প্রকারের মানুষ কতগুলি আছে এবং কতগুলি গড়িতে পারা যায়, তাহাই দেখিতে হইবে।

এই প্রকারে কেবল পুরোহিত নহে—পুরোহিত, গুরু, পুরাণ-পাঠক, কীর্ত্তনের দল, চণ্ডীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল ও মনসামঙ্গলের দল প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সমুদয় লোক কর্ম্মীরূপে দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে এবং ইহারা একটা সাধারণ আদর্শ বা ভাবের দ্বারা কর্ম্মরত হইলে, প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিত্তালয় গঠনের সুবিধা হইবে। দেশে মঠ, মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহ, শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই দেওয়া হইয়াছিল। তীর্থস্থানগুলি বিত্তা ও ধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্র। সন্ন্যাসীগণ ধর্ম্ম ও শিক্ষা-প্রচারক। এই সমুদয় ব্যাপারের ভিতর অল্প সময়ের মধ্যেই নবজীবনের বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু কেবল মুখের কথায় নহে, প্রকৃত সাধনার ভাব লইয়া দেশের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। তারকেশ্বরে, চন্দ্রনাথে, পুরীর এমার মঠে, সপ্তগ্রামে, নবদ্বীপে, খেতরী ও রামকেলিতে, জয়দেবে, কেন বড় বড় জাতীয় বিত্তালয় হইবে না? হিন্দু জনসাধারণ জাগ্রত হইলেই ইহা অনায়াস-সাধ্য।

আমরা হিন্দুর পক্ষ হইতে কথাগুলি বলিলাম, ইহার সকল কথাই মুসলমান সমাজ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় নারী-শক্তির জাগরণ বিশেষভাবে আবশ্যক। মার্কিন দেশে জনসাধারণের শিক্ষা, স্ত্রীলোকের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে ও সুলভে সাধিত হইয়া থাকে। মন্দিরে দেববিগ্রহপূজার অধিকার, স্ত্রীলোকের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে অল্প দিনেই শিক্ষিত করিয়া তোলা যায়। এই প্রকারে শিক্ষাগ্রহণে প্রস্তুত, সহস্র সহস্র যুবতী নারী অসহায় অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে। আহ্বান করিলে তাহারা এখনই অগ্রসর হইবে। জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণের এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

নকল বিশ্ববিদ্যালয় করার বিপক্ষে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বিশেষ কারণ আছে। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়, তাহার শিক্ষাদান কার্য্য যে সমুদয় লোকের দ্বারা পরিচালনা করিতেছেন, সে সমুদয় লোক অপেক্ষা উপযুক্ততর লোক আমাদের হাতে আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। স্বীকার করিলাম যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষাদান করিতেছেন, তাঁহারা বৈদেশিক চিন্তা-পদ্ধতি দ্বারা একেবারে অভিভূত। তাঁহাদের শিক্ষাধীনে থাকিয়া কেবল ক্রীতদাস প্রস্তুত হয়—মানুষ প্রস্তুত হয় না। আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া মানুষ প্রস্তুত করিতে চাই। কিন্তু আমরা 'জাতীয়' এই কথাটি বলিতেছি বলিয়াই যে, বৈদেশিক চিন্তার মোহপাশ হইতে নির্মুক্ত হইয়াছি, তাহা কে বলিল? পূর্ব্বে যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, তখন অধিকাংশ শিক্ষক কিরূপ প্রকৃতি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আজ বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। অনধিকারী লোক বড় বড় কাজ করিতে যায়; কাজ হয় না। তখন তাহারা নিজেদের দোষ দেখিতেই পায় না, যত দোষ অন্য লোকের উপর চাপাইয়া দেয়। ইহার ফল বড়ই ভয়াবহ। ইহাতে দেশের চিত্তে নৈরাশ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতেই হইবে, এবং আমি বিশ্বাস করি এই কার্য্য আমরা করিতেও পারিব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় করিবার জন্য যাঁহারা সকলের আগে ছুটিতে ছুটিতে আসিবেন, তাঁহাদের অনেককেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া সরাইয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধি-ওয়ালা লোকেরা কেবল মাত্র সেই উপাধির জোরে যদি নূতন শিক্ষালয়ে উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপকতা পান, তাহা হইলে আবার আমাদের নকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাকাল সহিতে হইবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিভাগ কিরূপ হইবে, একটি উদাহরণের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতেছি। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটএ, ইংলণ্ডের মহাকবি টেনিশনের স্মরণে একটি সান্ধ্য-সম্মিলন হইয়াছিল। অধ্যাপক ক্যানিংহাম, এখন যিনি আসামে রহিয়াছেন, তিনি তখন নূতন এদেশে আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। এই সাহেবটি

সান্ধ্য-সম্মিলনের আলোচনা-সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রশংশার সহিত এম, এ-বি,এ পাশ করা ছেলেরা কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িলেন। প্রবন্ধগুলি শুনিয়া সভাপতি বলিলেন—"আমি বালক কাল হইতে টেনিশনকে বড় ভালবাসি। ভারতবর্ষের প্রতিও আমার গভীর অনুরাগ আছে। এই দেশ, একটি প্রাচীন সভ্যদেশ। ইহাদের বহু প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতি আছে। আমি যখন শুনিলাম যে টেনিশন্ সম্বন্ধে এদেশের ছেলেরা আলোচনা করিবে, তখন খুব আশা ও কৌতূহলের সহিত সভায় যোগদান করিলাম। আমাদের দেশের কবি টেনিশন—আমরা তাহাকে একরূপ বুঝিয়াছি, ভারতবাসী তাহাকে কিরূপ ভাবে বুঝে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছিল এবং আশা হইয়াছিল যে নূতন কিছু শুনিতে পাইব। বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমি একেবারেই নিরাশ হইয়াছি। বিলাতের সাধারণ সমালোচকেরা যাহা বলে, তাহারই প্রতিধ্বনী মাত্র শুনিলাম। ভারতবর্ষীয় চিত্ত বলিয়া যে একটি জিনিষ আছে, তাহার অনুমাত্রও পরিচয় পাইলাম না।"

এই প্রবন্ধ যাঁহারা পড়িয়াছিলেন তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র। অন্য স্থানে তাঁহারা যদি চাকুরি না পান এবং যদি দেখিতে পান যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক টাকা উঠিয়াছে, তাহা হইলে যোগাড়ের জোরে, খোসামুদির জোরে, আনুগত্য ও সুপারিশ পত্রের জোরে, তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবেন। তাঁহারা যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক, ইহা দেখাইবার জন্য হয়ত টিকি রাখিবেন, লোক দেখাইবার জন্য কোশা কুশি হাতে করিয়া গঙ্গাস্নান করিবেন। কিন্তু ভাব-জীবনে ও শক্তিতে তাহারা যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিয়া যাইবেন। ইহারই নাম—নকল বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগ বা সাহিত্যিক বিভাগ দাঁড় করাইতে পারি, এ প্রকারের লোকবল যে আমাদের আছে, তাহা আমরা এই মুহূর্ত্ত হইতে সপ্রমাণ করি না কেন? সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—এই সব বিষয়ে চিত্ত ও ভারতীয় চক্ষুর সাহায্যে আমরা কি বলিতে পারি—তাহা আমাদের প্রদর্শন করা উচিত। নতুবা একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারে না। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা চাকুরী না পাইবে তাহারা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবে। আবার নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে, প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বেশী টাকা দিয়া লইয়া যাইবে। হয়ত এই প্রকারে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক, পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সেলার হইবার আশা পাইলে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অনিষ্ট করিয়া পুরাতনে চলিয়া যাইবে।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিক কারণে যাহারা ভাঙ্গিতে চাহে, তাহাদের প্রতি আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা পড়িতে চাহেন, তাঁহারা সহিষ্ণুভাবে আমার কথাগুলি শুনিলে, আমি পরম বাধিত হইব এবং আমার আরো যাহা বলিবার আছে, তাহা সত্বর নিবেদন করিব।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবারের দুইজন কবি

মাধবাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে যে সকল মহাপুরুষের শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ জনসাধারণ মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্যালক, মাধবাচার্য্য তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মাধবাচার্য্য, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর খুল্লতাত কালিদাস মিশ্রের পুত্র। ইঁহার গ্রন্থের নাম—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল,' যথা—

চিন্তিয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ শ্রীমাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥

কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের শেষার্দ্ধে 'ভাগবত সার' নামে ভনিতা আছে, যথা—

(১) শুন শুন ভক্তজন হয়ে একমন।
ভাগবত সার দ্বিজ মাধব রচন॥

(২) পরাশর নামে দ্বিজ কুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ মাত্র ভরসা আমার।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ ভাগবত সার॥

'কৃষ্ণ মঙ্গল' নাম দিয়া জীবন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীখণ্ড নিবাসী কবি নিত্যানন্দ বা বলরাম দাস বিরচিত 'প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থে, মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

'দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥
সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া। এক কন্যা প্রসবিল নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম। শ্রীযাদব নাম তার হয় আখ্যান॥

কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্ব গুণধাম॥

* * * *

শ্রীমৎভাগবতের শ্রী[illegible] স্কন্ধ। গীত বর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ॥
রাখিল গ্রন্থের নাম [illegible]কৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতন্য পদে তাহা সমর্পণ কৈল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে [illegible] অনুগ্রহ। সর্ব্বভক্তগণে তারে করিলেক স্নেহ॥

১৯শ বিলাশ ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'—৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৮)

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতে আমরা এইরূপ বংশতালিকা প্রাপ্ত হইতেছি—
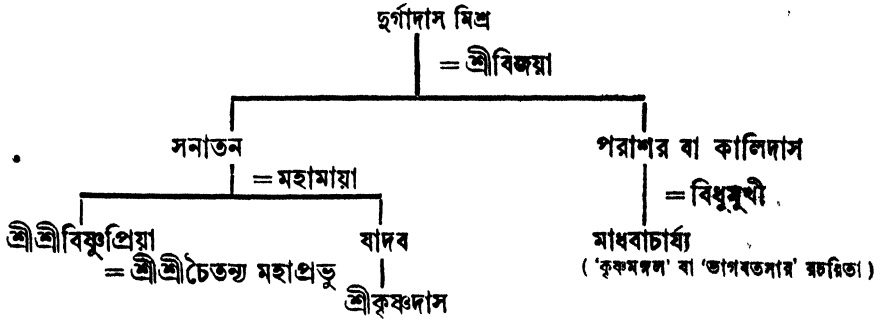
('কৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা)

এই বংশ-তালিকায়, আমরা 'যাদব নন্দন' শ্রীকৃষ্ণদাসের নাম অতিরিক্ত সংযুক্ত করিয়াছি। এই কৃষ্ণদাসের সহিত, এতদিন সাধারণের পরিচয় ছিল না; এমন কি, যাঁহারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী পরিবার বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারাও, ইঁহার পরিচয় বা নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন ('শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিচয়'—৯৮ পৃঃ, ইত্যাদি)। আমরা, এই যাদব-নন্দন কৃষ্ণদাসের কথাই বলিব।

মহাপ্রভু-পত্নী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত-পুত্র মাধবাচার্য্য এবং ভ্রাতা যাদবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণদাস উভয়েই সমবিষয়াবলম্বনে, একই নাম দিয়া বিভিন্ন সময়ে, দুইখানি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস বিরচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' পুস্তক, এ যাবত মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি—কৃষ্ণদাস প্রণীত পুস্তক সম্বন্ধে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক কোন পুস্তক বা প্রবন্ধেও আলোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত ও আর একখানি সম্পূর্ণ হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি— (সিউড়ী 'রতন'-লাইব্রেরী' পুঁথি নং ১০৯ ও ১৫৫)

বন্দনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস, মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল। তাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছে আচার্য্য গোসাঞী। মনে অনুমানি সেই অনুসারে যাই॥
লিখিতে না পারি মনে সদাই তরাস। না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাশ॥
আচার্য্য দেখিঞা গ্রন্থ করিল বাখান। রস পাঞা গান করে অমৃত সমান॥
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার। হেতাতে গাইতে, গ্রন্থ রহিল আমার॥
তাল জন্ত্র ধরে জেবা জন গান করে। তাহার চরণ বন্দ সভার ভিতরে॥' ইত্যাদি

গ্রন্থে ভনিতা এইরূপ—

(১) মায়ের বচনে আখি করে ছলছল। কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
(২) অমিয়া অধিক তার বদনের হাস। চরণ নিছনি লঞা গায় কৃষ্ণদাস॥
(৩) এই মত আনন্দে সানন্দে দিন যায়। ব্রজলীলা বিস্তারিঞা কৃষ্ণদাস গায়॥
(৪) পঞ্চামৃত অন্নব্যঞ্জন করিলা ভোজন। কৃষ্ণদাস করে আশ পাদ সম্বাহন॥
(৫) বৎসপুচ্ছধরি, গোলকের হরি, ফিরএ বালক বেশে।
যাদব-নন্দন, করে নিবেদন, মোর কিবা শেষে॥

কৃষ্ণদাস, স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা করিলেও, অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ ভনিতা লিখয়াছেন—

(১) নন্দের মন্দিরে হরি করিলা প্রকাশ। মাধব রচিত গীত গায় কৃষ্ণদাস॥
(২) শুনি আনন্দিত হৈলা রাজা পরীক্ষিত। কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব রচিত॥
(৩) মাধব রচিত গান, ভকতজনের প্রাণ, কান্দে কৃষ্ণদাসের সহিত॥
(৪) মাধবচরণ রেণু, আর না রাখিব তনু, বিরচিল যাদব নন্দন॥

সুতরাং, আমরা নিসংশয়ে কৃষ্ণদাসের নাম, এই বংশতালিকায় সংযুক্ত করিতে সাহসী হইলাম। গ্রন্থকার, পূর্ব্বোক্ত ভনিতা ব্যতীত, গ্রন্থ মধ্যে অপর কোনরূপ বিস্তারিতভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই।

কৃষ্ণদাস ও মাধবাচার্য্যের রচনার তুলনা, স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়। এইস্থলে, কৃষ্ণদাসের রচনার আদর্শ স্বরূপ আমরা যথেচ্ছভাবে, পুঁথির একস্থল হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

'কান্দে নন্দ নিরানন্দ যত ব্রজবাসী। কার বোলে বিষ জলে প্রবেশিলে আসি॥
পিতাবলি মুখ তুলি চাহ একবার। তোমা বিনে বৃন্দাবনে হৈল অন্ধকার॥
কোনকালে উদুখলে বান্ধ্যাছিল তোরে। জলে থাকি দেখাদেহ প্রাণনাথ মোরে॥
তোমা বিনে এতদিনে মরিব সর্ব্বথা। নহে বাপ ঘুচা তাপ মোরে কহ কথা॥

রাণী কহে কালীদহে মজিল কানাঞী। মা বলিতে ত্রিজগতে আর কেহ নাঞি॥
ফাটে বুক তোর মুখ না দেখিলে মরি। না দেখিব না শুনিব বচন মাধুরী॥
তোর শোকে হানে বুকে ব্রজগোপী যত। তোল গা' বোল মা জনমের মত॥
দুলালিয়া মা বলিয়া আইস মোর কোলে। নহে বাপ দিব ঝাপ্ এই বিষ-জলে॥
ক্ষীর চাঁছি আনিয়াছি কে খাইবে আর। পড়ে আছে মোর পাছে সঙ্গতি তোমার॥
উনমত গোপী যত হরি না দেখিয়া। মরে রাণী অনাথিনী বুক বিদরিয়া॥

সে হেন সুন্দর মুখে নাহি দিব চুম্ব। আজি হৈতে শূন্য হৈল কালিন্দি কদম্ব॥
ও চাঁদ বদনের বাণী অমিয়ার ধার। শুনিতে জুড়ায় হিয়া বচন তোমার॥
প্রথমে পুতনা আসি কক্ষি বিষস্তন। তাহাতে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥
সকট ভাঙ্গিয়া যবে পড়েছিল গায়। বাঁচিল তোমার প্রাণ হরির কৃপায়॥
ভাঙ্গিল জমলয় তরু পড়িল উপর। তাহাতে করিল রক্ষা ভবানী শঙ্কর॥
বারে বারে রক্ষা পাইলে দেব অনুগ্রহে। এবার ঠেকিলা বাছা পাপ কালিদহে॥
উপরে না উড়ে পক্ষী প্রাণী নাহি আইসে। বিষজলে ঝাঁপ দিলে কেমন সাহসে॥
বিষের জলেতে যবে প্রাণ হৈল হত। অভাগিনী মা বলিয়া কান্দিয়াছ কত॥
ননীর পুতলি তনু রৌদ্রে মিলায়। পরশে আলুয়া গেল বিষের জ্বালায়॥
আর না উঠিবে বাছা না খাইবা ননী। আর না বাঁচিবে বাছা তোমার জননী॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে না চরাবে ধেণু। গড়াগড়ি যায় কুলে তোর সিঙ্গা বেণু॥
এতেক বিলাপ করি দঢ়াইল চিতে। নিশ্চয়ে চলিলা সভে জলে ঝাঁপ দিতে॥' ইত্যাদি

গ্রন্থখানি গীত হইবার জন্য রচিত। মধ্যে মধ্যে—কর্ণাট রাগ, গৌরী রাগ, শ্রীরাগ, বড়ারি রাগ—ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এই অপ্রকাশিত প্রাচীন সুন্দর গ্রন্থখানি অচিরে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গ্রন্থখানি, বৃহৎ পুঁথির আকারে ১২৪ পৃষ্ঠা পরিমিত।

আমরা উপরে যে বংশ-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে মতভেদ আছে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে, 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থের ১৯শ অধ্যায় হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে—

আর এক পুত্র হৈল অতি গুণবান।
শ্রীমাদব নাম তার হয় আখ্যান॥

এই শ্লোকটি, শ্রীযশোদালাল তালুকদার-সম্পাদিত 'প্রেম বিলাস' গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৩-৮৪, ২৪০-৪২, ৩২৮, ৩৩৮) নাই। 'শ্রীনবদ্বীপ দর্পণ' পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশেও, এই শ্লোকটি পাইতেছি না।

এতৎ প্রসঙ্গে 'শ্রীনবদ্বীপ দর্পণ'-রচয়িতা বলিতেছেন—

"প্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন অনুসারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহোদর ভ্রাতার কোন প্রসঙ্গ নাই। খুড়তুতো ভ্রাতা শ্রীমাধবাচার্য্যের নাম পাওয়া গেল। এই মাধবাচার্য্য বিবাহ না করিয়াই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। এদিকে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইত গোসাঞীগণ আপনাদিগকে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহোদর ভ্রাতার বংশধর বলিয়া, ও 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার, অর্থাৎ তদীয় শিষ্যানুশিষ্য বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু এতদ্‌সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কোন 'গুরুপ্রণালী' তালিকা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কিম্বা শ্রীমহাপ্রভুর সম্পর্কিত কোন প্রাচীন বস্তুও পাওয়া গেল না। আবার তাঁহাদের যে যে বংশ-তালিকা আছে, তাহাতেও বিভিন্নমত পরিলক্ষিত হইতেছে। সেবাইত শ্রীপ্যারীলাল গোস্বামীর নিকট হইতে যে তালিকা পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে—'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতার নাম শ্রীযাদবাচার্য্য, ইহার পুত্র মাধবাচার্য্য।' অপর সেবাইত শ্রীল শরচ্চন্দ্র গোস্বামীর নব্যপ্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিচয়' গ্রন্থে যে বংশাবলীর বিষয় বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতা শ্রীমাধবাচার্য্য, ইঁহার পুত্র শ্রীযাদবাচার্য্য। সেবাইত গোস্বামিগণের কোন্ বংশাবলী সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যাহা হউক, নিম্নে তিনটি তালিকা উঠাইয়া দেওয়া গেল—

(১) 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে—
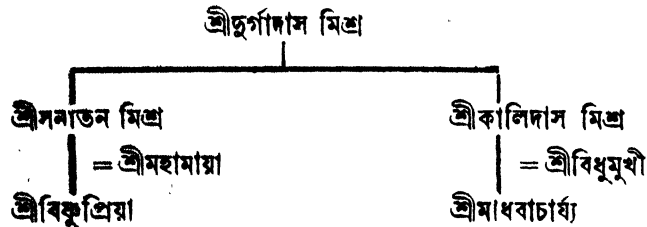
(২) শ্রীপ্যারীলাল গোস্বামীর নিকট প্রাপ্ত—
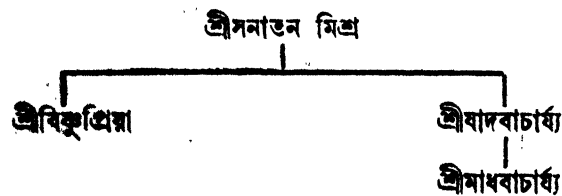
(৩) শ্রীশরচ্চন্দ্র গোস্বামীর নিকট প্রাপ্ত—
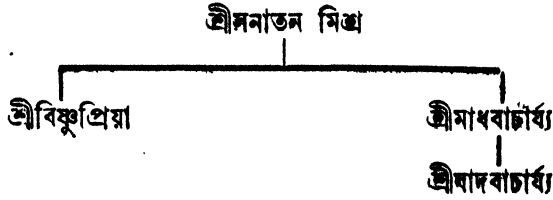
'নবদ্বীপদর্পণ'-গ্রন্থের এই অংশটুকু প্রথমে ১৩২৪ সালের ৩রা কার্ত্তিক তারিখের 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৫ই অগ্রহায়ণের কাগজে, নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল দেবশর্ম্মা-লিখিত এতৎসম্বন্ধে যে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়, আমরা এইস্থানে তাহা সন্নিবেশিত করিলাম—

"বাবাজী মহাশয় প্রেমবিলাসের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু পুরাতন প্রেমবিলাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রের আর একটি পুত্র ছিলেন, যাঁহার নাম শ্রীযাদব মিশ্র। যথা—

"সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আর এক পুত্র হইল অতি গুণধাম।
শ্রীযাদব মিশ্র নাম তাহার হয় আখ্যান॥"

শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষাতে যথা—

"তবে প্রভু শ্রীযাদব মিশ্রের নন্দনে।
নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে॥"

৺পণ্ডিত প্যারীলাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয়ের লিখিত বংশ-তালিকা ও 'শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব দীপিকা' প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীশশীভূষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয়ের লিখিত বংশ-তালিকার সহিত সম্পূর্ণ মিল আছে। শ্রীশরৎচন্দ্র গোস্বামীর মহাশয়ের শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীশ্রীমূর্ত্তি-পরিচয় গ্রন্থে ছাপার ভ্রমবশতঃ শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রের পুত্র যাদবাচার্য্যের স্থানে মাধবাচার্য্য হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইবে। দাস মহাশয় শ্রীধাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ গত আশ্বিনের 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।"

'শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিচয়'-পুস্তকে লিখিত আছে—

কিছুদিন পর তিনি (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী) স্বকীয় পুত্র প্রতিম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযাদবাচার্য্যকে দীক্ষা

প্রদান করিয়া শ্রীমূর্ত্তিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীধামের শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তির সেবা পূজাদি শ্রীমদ্মাধবাচার্য্যের বংশধরগণই করিয়া আসিতেছেন। * * * শ্রীমাধবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করায়, তদীয় বংশধরগণ 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার' বলিয়া খ্যাত। শ্রীমাধবাচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর ছিলেন।' ইত্যাদি (পৃঃ ৯৮)

এখন, আমাদের প্রদত্ত বংশ-তালিকা এবং 'নবদ্বীপদর্পণ' পুস্তকে প্রদত্ত তিনটি বংশতালিকা—ইহার মধ্যে কোন্‌টি প্রামাণ্য, তাহার নিরূপণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য, আমরা 'কৃষ্ণ-মঙ্গল'—রচয়িতা কৃষ্ণদাসের ভনিতা এবং 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ অবলম্বনে যে বংশ-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে, উপযুক্ত ও সুদৃঢ় প্রমাণ দ্বারা কেহ আমাদের মত খণ্ডন বা পোষণ করিতে অগ্রসর হইলে, কৃতার্থ হইব।

শ্রীশিবরতন মিত্র

আলোচনা ও অনুশীলন

সাহিত্য-সম্মিলনের একদিক্

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বৎসর বৎসর যেরূপ লিখিয়া থাকেন, সেইরূপ, "নৈহাটি বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি শ্রাবণ মাসের নব্যভারত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তাঁহার যাহা লেখা উচিত, তাহাই লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের পাদটীকা হইতে নিম্নের অংশটুকু আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম—

"কেবল একটি প্রস্তাব বিষয়-নির্ব্বাচক-সমিতিতে পরিগৃহীত হইলেও প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় সাধারণ সভায় উহা উপস্থাপিত করিলেন না। প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য; মর্ম্ম এই ছিল,—সম্প্রতি আর্ট ও বিজ্ঞানের নামে যে সব দুর্নীতি ও কুরুচি গ্রন্থাদিতে প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহার প্রতিকারার্থ যত্ন করিতে হইবে। (ঠিক কথাগুলি স্মরণ নাই।) জানি না কেন এইরূপ সৎপ্রস্তাব সহসা প্রত্যাহৃত হইল।"

এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়া ভালই হইয়াছে। কারণ, সম্মিলন দায়িত্ব-অধিকার-সম্পন্ন প্রতিনিধি গণের সভা নহে,—এই শ্রেণীর গ্রন্থ-প্রচার, যে সামাজিক কারণে সম্ভব হইয়াছে, সাহিত্য-সম্মিলন সেই কারণ নির্মুক্ত নহে। প্রস্তাবটি ভাল হইতে পারে—সাধারণ সভায় উপস্থাপিত হইলে তাহা উপযুক্ত পাত্র-কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিত।

বীরভূমি ৬—৫

গীতার ধর্ম্ম ও তাহার অধিকার

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে জগদ্গুরু শ্রীভগবান্, গীতাশাস্ত্রের উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন এই উপদেশের শ্রোতা। অর্জ্জুন যখন এই উপদেশ শোনেন, তখন তাঁহার সংসার ছাড়িয়া বনে যাইবার সময় নহে। মানুষকে সংসারে আসিয়া অনেক কর্ম্ম করিতে হয়, অনেক প্রকারের সঙ্কটে ও পরীক্ষায় পড়িতে হয়। এই সঙ্কট ও পরীক্ষা যাহার জীবনে যত বেশী, আমরা তাহাকেই তত বড় লোক বলিয়া স্বীকার করি। নানারূপ সঙ্কট, বিপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া জীবনের পথে চলিতে চলিতে, কোন কোন ভাগ্যবান্ ও বীরপ্রকৃতি-সম্পন্ন চিহ্নিত মানবের জীবনে, এমন একটা সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিরই জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা নহে,—সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। অর্জ্জুনের জীবনে এই প্রকারের ঘটনা একবার ঘটিয়াছিল,—মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার অমরগ্রন্থ মহাভারতে, এই ঘটনাটিকে অমরতা ও নিত্যতা দান করিয়াছেন; আর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার উপদেশ অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া জগতে প্রচারিত করিয়াছেন। আজ ভগবদ্গীতা সমগ্র পৃথিবীর আদরের বস্তু, এমন সভ্য দেশ নাই যেখানে গীতার সমাদর হয় নাই, এমন উন্নত ভাষা নাই, যে ভাষায় গীতার উপদেশ বিস্তারিতরূপে প্রচারিত হয় নাই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে এই গীতার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। যিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন, তিনি একজন যোদ্ধা ও কর্ম্মী এবং এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপথ আশ্রয় করেন নাই, তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন,—সংসারে বীরের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন। অতএব এই কলিকাতা মহানগরীতে গীতাশাস্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই মহানগরীও কুরুক্ষেত্র, এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই যোদ্ধা এবং এই যোদ্ধগণের মধ্যে অনেকেই আশাপূর্ণ-হৃদয়ে যুদ্ধ করিতে আসিয়া নানাবিধ

কারণে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। অবস্থা অর্জ্জুনেরই তুল্য—তবে ক্ষুদ্র আকারে। কিন্তু অভাব এই,—অর্জ্জুনের রথে সারথী ছিলেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আমাদেরও রথে তিনি আছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, তাঁহার হস্তে মনের লাগাম তুলিয়া দিয়া, তাঁহার শরণাগত হইয়া বলিতে পারিতেছি না—

শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

হে কৃষ্ণ, হে চির-সারথী, আমি তোমার শাসনার্হ, আমি তোমার শরণাগত, আমায় শিক্ষা দাও, যাহাতে আমার প্রকৃত কল্যাণ হয়।

আমাদের সকলেরই অবস্থা যখন এইরূপ, তখন গীতাশ্রবণ ব্যতীত আর ঔষধ কি? গীতার কথা শুনিতে হইলে প্রারম্ভে মনে রাখিতে হইবে—তামাসা-হিসাবে বা তরলচিত্তে গীতার কথা শুনিব না। ইহা গীতারই উপদেশ। গীতার শেষ অধ্যায় অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকটির অর্থ আলোচনা করিলেই আমরা জানিতে পারিব,—এই উপদেশ শ্রবণ করিবার অধিকারী কে?—এবং কিরূপ হৃদয়-মন লইয়া গীতার উপদেশ শ্রবণ করিলে, এই উপদেশ আমাদের জীবনে প্রকৃত সুফল-প্রসূ হইবে ও আমরা জীবনে প্রকৃত বিজয়-গৌরব লাভ করিতে পারিব।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শ্লোকটির তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

গীতার্থতত্ত্ব শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ মানবজগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন আবশ্যক। এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের নিয়ম বলিতেছেন। "এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ।"

গীতার শিক্ষা মানবসমাজে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে সম্প্রদায় গঠিত হইবে, তাহা অবশ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শাক্ত-সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বা Sect নহে। গীতার শিক্ষা সার্ব্বজনীন, সুতরাং এই সম্প্রদায়ও, সাধারণতঃ সম্প্রদায় বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতে বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইবে। এই সম্প্রদায়ের লক্ষণ কি, এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারীই বা কে, তাহা

আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব। প্রথমে ভাবিয়া দেখিতে হইবে—সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনই বা কেন, আর এই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের নিয়ম করাই বা কেন?

সুনির্ব্বাচিত ও অধিকার-সম্পন্ন কতকগুলি লোককে একত্র করিয়া, তাহাদের দ্বারা সাধনা না করাইলে এবং তাহারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তাহাদের দ্বারা—প্রধানতঃ প্রথমতঃ তাহাদের জীবনের দ্বারা,—তাহার পর তাহাদের বাক্যের দ্বারা প্রচারিত না করাইলে, কোন বড় শিক্ষা জগতে দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্যই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন। কিন্তু এই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন বড়ই কঠিন কাজ। উত্তমরূপে বাছিয়া উপযুক্ত অধিকারী লোককে না লইয়া, যদি অনুপযুক্ত লোককে সম্প্রদায়ের মধ্যে লওয়া হয়, তাহা হইলে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের দ্বারা ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যাঁহারা কোন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া বা কোন মহৎ আদর্শের অনুসরণ করিয়া সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য যে সাধু, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং নানা সম্প্রদায়ের দ্বারা জগতে নানারূপ মঙ্গলও সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমশঃ অনেক স্থলেই পার্থিব শক্তি লাভ করিবার জন্য, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনেক অনুপযুক্ত লোককে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। তাহাতে কখনও কোন মহাপুরুষের নামের দোহাই দিয়া, কখনও কোন বড় লক্ষ্যের দোহাই দিয়া, দল বাঁধিয়া জগতের ও মানবের অনিষ্ট করা হয়।

গীতার সম্প্রদায় অন্য প্রকারের ব্যাপার। ইহা একটি পার্থিব মণ্ডলী নহে। গীতার নামে ভারতবর্ষে কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই, আজ পর্য্যন্ত কোন মঠ, মন্দির বা মোহান্ত সৃষ্টি হয় নাই। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়, এই গীতাকে নিজেদের গ্রন্থ বলিয়া সাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই গীতার বিশিষ্টতা। এইবার সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের নিয়মগুলি আলোচনা করা যাউক।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে বলিয়াছেন—"ন অতপস্কায় বাচ্যং"। শ্রীধরস্বামী অর্থ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীন অর্থাৎ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাকে গীতা বলিবে না, তাহাকে গীতা বলা নিষ্ফল, কোনই ফল হইবে না। যে ব্যক্তি তাহার নিজের স্বধর্ম্ম কি, তাহা জানে না, তাহা জানিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করে না, তাহার নিকট এই গীতার উপদেশের কোনই মূল্য নাই, এবং সে লোকের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। ইহাই প্রথম কথা। সহজ কথা নহে, খুবই কঠিন কথা। বর্ত্তমান সময়ে

আমাদের দেশে এই স্বধর্ম্মের নির্দ্ধারণ ও প্রতিপালন বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তেমন শিক্ষা ও উপদেশ পাই না, যাহাতে স্বধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে পারি; তেমন উদাহরণ দেখিতে পাই না, যাহাতে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারি; এমন সব অভ্যাস—দৈহিক ও মানসিক—গঠিত হয় না, যাহাতে এই স্বধর্ম্মনির্দ্ধারণ স্বাভাবিক হয় এবং এই স্বধর্ম্ম প্রতিপালন সুখকর হয়। বর্ত্তমান সময়ে কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল জাতির দুর্দ্দশার ইহাই প্রথম ও প্রধান হেতু।

স্বধর্ম্ম কি, কি প্রকারে ইহা বুঝিব, এবং কি প্রকারেই বা ইহা প্রতিপালন করিব, ইহাই গীতার উপদেশের আলোচনায় প্রথম প্রশ্ন। আমাদের শাস্ত্রে এই প্রশ্নের অতীব বিশদ আলোচনা এবং অবিসম্বাদী মীমাংসা আছে; ভগবদ্গীতাতেও তাহার মীমাংসা আছে। ভগবদ্গীতার এই মীমাংসা আলোচনা করা যাউক।

অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবেন বলিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত, উভয়পক্ষের সৈন্যসামন্ত সমবেত, অল্পক্ষণ পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। পাণ্ডবপক্ষে অর্জ্জুনই প্রধান যোদ্ধা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথের সারথি। যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন আপত্তি উত্থাপন করিলেন, বলিলেন—'আমি যুদ্ধ করিব না।' তাঁহার প্রধান আপত্তি—এই যুদ্ধে তাঁহাদের বংশনাশ হইবে, আর বংশনাশ হইলে যে সব অমঙ্গল হইয়া থাকে, সেই অমঙ্গলগুলি ঘটিবে। সেই সব অমঙ্গল বড়ই ভয়ানক। ভবিষ্যতের সেই অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করিয়া, অর্জ্জুনের চিত্ত অতিমাত্রায় আকুল হইয়াছে, আর অর্জ্জুন একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং কাতর-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—'আমি যুদ্ধ করিব না।' যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয় এবং তজ্জাত অমঙ্গলসমূহ গীতায় বর্ণিত হইয়াছে—

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥
অধর্ম্মাঽভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।

স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি বলিতে পার—'যুদ্ধের ফলে বংশ নাশ হইবে এবং তাহার ফলে দারুণ অমঙ্গল হইবে'—ইহা বুঝিয়া তোমার শত্রুপক্ষের লোকেরা যখন সাধ্য থাকিতেও যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল না, তখন তুমি তাহা ভাবিয়া কি করিবে? অমঙ্গল তো উভয় পক্ষেরই হইবে। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই—আমাদের শত্রুপক্ষীয়গণের চিত্ত লোভের দ্বারা একেবারে অভীভূত হইয়াছে, তাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। এই কারণে তাহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু, হে জনার্দ্দন, আমরা তো উহাদের মত অভিভূত হই নাই, আমরা সেই কুলক্ষয়জনিত দোষ সুস্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং আমরা এই পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত হইব না? দেখ কৃষ্ণ, কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাপ্রাপ্ত সনাতন ধর্ম্মসমূহ নষ্ট হয় এবং ঐ ক্ষয়ের পর যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহারা অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হয়। অধর্ম্মের দ্বারা সকলে অভিভূত হইলে, কুলস্ত্রীগণ বিশেষভাবে দূষিত হয়। হে বৃষ্ণিবংশাবতংশ শ্রীকৃষ্ণ, কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্করের জন্ম হয়। বর্ণসঙ্কর কুলক্ষয়কারকদিগের নরকেরই হেতু হয়, পিণ্ডতর্পণাদি ক্রিয়াসমূহ লুপ্ত হওয়ায়, উহাদের পিতৃপিতামহগণ গতিভ্রষ্ট হইয়া নরকে নিপতিত হন। নিজের দোষে যাহারা এই প্রকারে কুল নষ্ট করে, তাহাদের কুলনাশক ও বর্ণসঙ্করকারক এই সকল পাপের জন্য সনাতন বা পরম্পরাপ্রাপ্ত জাতিধর্ম্ম বা বর্ণধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম এবং আশ্রম-ধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। হে জনার্দ্দন, আমরা শুনিয়াছি—যাহাদের কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, তাহাদের চিরদিন নরকে বাস করিতে হয়। শাস্ত্রে আছে—

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষ্বভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥
(শ্রীধর স্বামীর টীকায় উদ্ধৃত বচন)

পাপে অভিরত ব্যক্তি, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে না বা অনুতপ্ত হয় না, তাহারা দারুণ নরকসমূহে গমন করে।

অর্জ্জুন এই হেতুবাদ উত্থাপন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে চাহিয়াছিলেন। সমগ্র গীতা পাঠ করিলে দেখিবেন—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অবসাদ দূরীভূত করিলেন, এবং অর্জ্জুনের দ্বারা যুদ্ধও করাইলেন। যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয় যে হইল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কুলক্ষয় হইলে যাহা হয়, সংকরের উৎপত্তি, জাতিধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মের নাশ, তাহাও হইল। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র গীতাশাস্ত্রের ভিতর অর্জ্জুনকে এমন কথা বলেন নাই যে যুদ্ধ কর, কুলক্ষয় হউক, সঙ্করের উৎপত্তির দ্বারা জাতিধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না। অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা যে অমূলক, এমন কথা শ্রীকৃষ্ণ কুত্রাপি বলেন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাপারগুলিকে—সঙ্করের উৎপত্তি এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মের বিনাশকে—অবশম্ভাবী অশুভরূপে স্বীকার করিয়া লইলেন। অর্জ্জুনে ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভেদ এই যে, অর্জ্জুন এই অশুভ স্মরণ করিয়া ভয় পাইয়াছিলেন ও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে ভয়ও পাইলেন না, অবসন্নও হইলেন না, এবং এমন শিক্ষা দিলেন যে, শেষে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের মতই অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে যুদ্ধ করিলেন।

যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাকে স্বীকার করিয়া, তাহা যদি অশুভ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রতিকার করাই বীরত্বের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূরীভূত করিয়া, তাঁহাকে এই বীরত্ব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

মানবসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে কাল ও কর্ম্ম, এই উভয়েরই বিচার করিতে হইবে। বিচার বড়ই কঠিন, কিন্তু আর্য্যঋষিগণের প্রতিভার আলোকে এই অতি কঠিন সমস্যারও মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্য্যোধন ও তাঁহার আশ্রিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বীরগণ, আসুর-শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। কাহার বা কাহাদের কর্ম্মদোষে এই অসুরগণের রাজবংশে জন্ম হইল, তাহারও বিচার

পৌরাণিক ঋষিগণ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম অনাদি ; অতএব এই নিস্ফল আলোচনায় প্রয়োজন নাই, ইহার মূল পাওয়া যাইবেনা, শেষে ক্লান্ত হইয়া বলিতে হইবে—বিশ্বনাথের লীলা ! সুতরাং বলুন, কালের প্রভাবে অসুরের আবির্ভাব হইয়াছে, এই অসুরগণ একতা-বদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং দেবাসুরের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু যতদিন অসুর ও দেবতা আছেন, বিশ্ব সৃষ্টির মূলে যতদিন নিত্য সমুদ্রমন্থন চলিতেছে, ততদিন বিষ ও অমৃত একত্রে মিলিত হয় নাই, ততদিন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—কাহারও সাধ্য নাই তাহা নিবারণ করে। এই যুদ্ধে ধর্ম্মের পক্ষে,—দেবতার পক্ষে যাঁহার দাঁড়াইবার ও পরিশ্রম করিবার সুবিধা হইবে, তিনি ভাগ্যবান, আর যিনি ধর্ম্মবুদ্ধিতে, নিজের লাভালাভ, সুখদুঃখ বা জয় পরাজয়ের হিসাব না করিয়া, এই যুদ্ধে নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিবেন, তাঁহার ভাগ্যের সীমা নাই, ইহা অপেক্ষা মানবজীবনে আর অধিকতর গৌরবের বিষয় বা আকাঙ্খার বস্তু আর কিছুই নাই। অর্জ্জুনের ভাগ্যে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল।

যুদ্ধ হইবে, নরহত্যা হইবে। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হইবে, যাহারা প্রিয়, অতি-প্রিয়, প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়, যাহাদের ভাল বাসিয়া দুর্ব্বহ জীবনভার বহনীয় হইয়াছে, তাহা-দের ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইবে, তাহাদের রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষ রঞ্জিত হইবে, তাহা-দের মৃতদেহ শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে। চক্ষুর সম্মুখে এই সব শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইবে। ঘরে ঘরে আনন্দের আলো নিভিয়া যাইবে, উৎসবের বাদ্যভাণ্ড থামিয়া যাইবে, উল্লাসের হর্ষগীতি স্তব্ধ হইবে। তাহার স্থলে—অসহায় পিতৃহীন বালকবালিকার আর্ত্তনাদের সহিত পতিহীনা বালবিধবার মর্ম্মন্তুদ করুণ ক্রন্দনধ্বনি জাগিয়া উঠিবে, পুত্রহীন ও অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতার হৃদয়ভেদী রোদনধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে হা-হা-রোলের প্রতিধ্বনি জাগরিত করিবে। বসন্তের প্রভাতী কুসুম-সম কত নবযুবকের সংসারের সুখস্বপ্ন ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, কত সাধের নন্দনবনে শ্মশানের বিভীষিকা ছড়াইয়া দিয়া, দুর্নিবার মহাযুদ্ধ আসিতেছে। কাহার সাধ্য ইহার গতিরোধ করে ? ইহা অবশ্যম্ভাবী,—ইহা তোমাদের, আমাদের সকলের কর্ম্মফল, ইহা অবশ্যম্ভাবী—ইহা বিধির বিধান, ইহা নিষ্ঠুর, ইহা ভীষণ—কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী। অলঙ্ঘ্য এ বিধান, কি করিবে ? যতদিন নিবারণের অণুমাত্রও সম্ভাবনা বা উপায় ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ততদিন মানবজাতির প্রতিনিধি হইয়া, মানবজাতিকে বিশ্ববিধানের সনাতন নীতি শিখাইবার জন্য ইহার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করিয়াছেন ; কিন্তু আর উপায়

নাই, যুদ্ধ হইবেই। কারণ-জগতে যুদ্ধ যে হইয়া গিয়াছে, কার্য্য-জগতে তাহা ফুটিয়া উঠিবে—ইহা অনিবার্য্য।

এখন কি করিবে? ভীষণ আসিয়াছে, রুদ্র আসিয়াছে—হস্তে তাহার বজ্র, ললাটে তাহার বিদ্যুৎ, নয়নে তাহার অগ্নি, চরণ-তলে বিশ্ব চূর্ণিত ও বিধ্বস্ত! ইহারই নাম—রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য। আমরাই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, হয়ত না জানিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আজ তিনি আসিয়াছেন—ঐ বিকট, ঐ ভীষণ, এখন কি করিবে? হাত কাঁপিতেছে, হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িতেছে, পা কাঁপিতেছে, দাঁড়াইতে পারিতেছ না, বুক কাঁপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, বসিয়া পড়িবে, মূর্চ্ছা যাইবে, পলায়ন করিতে চাহিতেছ, এড়াইতে চাহিতেছ? কিন্তু উপায় নাই,—একেবারেই উপায় নাই! এখন বীরের মত দৃপ্তবক্ষে ও উন্নতশিরে দাঁড়াও, দৃঢ়হস্তে অস্ত্র ধারণ কর, অবশ্যম্ভাবীকে বীরের মত বরণ করিয়া লও, পরে কি হইবে তাহা এখন ভাবিবার সময় নাই—অতএব

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!

তুমি যে শত্রুদমন, তুমি যে বীর, তোমার এ দুর্ব্বলতা পুরুষত্বহীনতা কেন, পরিত্যাগ কর এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা হৃদয়ের, বীরের ন্যায় উত্থিত হও।

যুদ্ধ করিতেই হইবে, এড়াইবার উপায় নাই, যে দিক্ দিয়াই দেখ পলাইবার পথ নাই।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥

তুমি যে ক্ষত্রিয়, রাজটীকা তোমার কপালে শোভা পাইতেছে, আর্ত্ত ত্রাণ যে তোমার স্বধর্ম্ম, আজ সমগ্র সমাজ নিপীড়িত হইয়া কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর তোমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—তুমি তোমার স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, বিচলিত হওয়া তোমার উচিত নহে। ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক আর কিছুই নাই।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

হে পার্থ, অপ্রার্থিত হইয়া আপনা হইতে এমন যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে,—ইহা যে উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বার, ভাগ্যবান ক্ষত্রিয় বীরগণের ভাগ্যেই এমন যুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।

অতএব যুদ্ধ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ, এই প্রকারের একটি ঘটনা। সুবিপুল ঝঞ্ঝা, সুভীষণ বন্যা—পরিণামে কি হইবে, শ্রীকৃষ্ণই জানিতেন, আজ পর্য্যন্ত তাহার পরিণাম কেবল শ্রীকৃষ্ণই জানেন। অর্জ্জুন সেদিন গীতা শুনিয়া তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিয়াছিলেন—কিন্তু সে পরিণাম এতই সুদূর-প্রসারী যে, শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রাপ্ত সে দিনের সে বোধ অর্জ্জুনও রক্ষা করিতে পারেন নাই—প্রমাণ উত্তরগীতা। এই বন্যায় অনেক জিনিস, ভাল এবং মন্দ, ছোট এবং বড়, ভাসিয়া যাইবে। ভাল হইলেও ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। এখানে আমাদের মত ছোট ছোট মানুষের ইচ্ছা বা অভিলাষ পর্য্যুদস্ত ও স্তম্ভিত—সমগ্র মানবের বিভিন্নমুখী বিবিধপ্রকারের ইচ্ছার পশ্চাতে এক মহীয়সী ইচ্ছা লুকাইয়া রহিয়াছে—সে ইচ্ছা আমাদের ধারণার অতীত, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের ন্যায় ঘটনায় সেই ইচ্ছা প্রকট হইয়া মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম বড়ই সুন্দর জিনিস। এমন সুন্দর শান্তিরসপূর্ণ, উদ্বেগহীন মধুর ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, প্রতিযোগিতা নাই, আপন আপন স্থানে বসিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, সন্তোষের অমৃতরস পানে সকলেই সুতৃপ্ত—কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না—এপ্রকারের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা চিরদিনই মানবের আকাঙ্খার বস্তু। এই প্রকারের ব্যবস্থা প্রকৃতির বিধানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে—অবশ্য সমগ্র ভারতব্যাপীও নহে, দীর্ঘকালব্যাপীও নহে—হয়ত এই প্রকারের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ছিল। 'হয়ত' বলিলাম এই জন্য যে, অনেক পণ্ডিত বলেন—ঐ প্রকারের ব্যবস্থা চিরদিনই একটি কল্পনার বিষয়, একটি আদর্শমাত্র,—চিরদিনই একটি সাধ্য বিষয়, বাস্তবজগতে উহা কখনও সুপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। এ সম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজন নাই—ঐ অবস্থা বড়ই সুন্দর। সেখানে সংগ্রাম নাই, ঈর্ষ্যা নাই, উদ্বেগ নাই; লোভ নাই, জিগীষা নাই, দ্বন্দ্ব নাই। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সময়, যে সময়ে গীতা কথিত হয়, সে সময়ে আমাদের সমাজের বাহ্যদেহে এই প্রকারের ব্যবস্থা কিয়ৎপরিমাণে ছিল। কিন্তু তাহা কেবল বাহিরে, সমাজের ভিতরে কি বিষময় হিংসা বিদ্বেষ ও অত্যাচার অনাচার

চলিতেছিল, দুর্য্যোধনের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। কিন্তু মানুষ জড়ত্বপ্রিয়, বাহির দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া অবিবেচক হওয়া, অনেক স্থলেই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ—অর্জ্জুনের কথাই তাহার প্রমাণ। শঙ্করের উৎপত্তি হইবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নষ্ট হইবে, অতএব দুর্য্যোধন ও তাহার দলের সর্ব্ববিধ পাপাচরণ সমাজে অবাধে চলিতে থাকুক, যুদ্ধ করিয়া আর সমাজে গোলযোগ আনিয়া কাজ নাই—ইহাই অর্জ্জুনের পরামর্শ। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ ইহার বিপরীত। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয় হইবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় হইবে, সে অবস্থা যখন ঘটিবে তখন সমর্থ ও শক্তিশালী মানবেরা সে অবস্থায় কি করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিবে—এখন তাহা ভাবিলে চলিবে না—এখন যে পাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, ধরণী এ পাপভার সহ্য করিতে পারিতেছেন না, অতএব প্রাণপণ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাউক। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ।

এইবার আমাদের মনে একটি অতি ভয়ানক রকমের প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ কি, কৌরব পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যখন নিরাশ হইলেন—দুর্য্যোধন ও তাহার সহচর এবং অনুচরগণকে যখন কোনরূপ ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসায় আনিতে পারিলেন না, তখন কি তিনি ক্রোধের দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন? তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে গিয়া যদি সমাজের ধ্বংস হয়, জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম প্রভৃতি সমাজের প্রাচীন বন্ধনগুলি যদি চূর্ণ ও ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার জন্যও তিনি প্রস্তুত হইলেন? অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ কি ধ্বংসমূলক বিপ্লবের উপদেষ্টা? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর সমগ্র গীতাগ্রন্থ উত্তমরূপে আলোচনা করিলে পাওয়া যাইবে। সংক্ষেপে সে উত্তর এই—সমাজ চাই, সমাজের বন্ধন চাই। সমাজ না থাকিলে মানুষের ধর্ম্ম সাধন হয় না, সুতরাং প্রকৃত কল্যাণও হয় না। সমাজ বন্ধনের কতকগুলি শাশ্বত বিধান আছে। সমাজ নিত্য, সমাজের বন্ধনও নিত্য, কিন্তু এই বন্ধন চিরকাল একরূপ নহে। যে বন্ধন, যে ব্যবস্থা ও যে বিধি একযুগে কল্যাণ সাধন করিয়াছে, অপর যুগে মানবের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন, সেই বন্ধন ও ব্যবস্থা অনিষ্টকর হইয়া পড়ে। এই একটি সত্য, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই জানা উচিত। সুতরাং যাহারা বীর ও সত্যদর্শী, যাহারা লোক সংগ্রহের আদর্শে জীবন চালাইতে চাহে, তাহারা প্রয়োজন হইলে ভাঙ্গিতে ভয় পাইবে না।

কিন্তু ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে গড়িবার উপযুক্ততা লাভ করিতে হইবে। গড়িবার উপযুক্ততা কি, কি প্রকারের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে মানুষ নেতৃত্বলাভের উপযুক্ত হয়, ব্যক্তির জীবন, সমাজের জীবন পুনর্গঠিত করিতে গেলে, কি কি শাশ্বত বিধানের পরিচয় আবশ্যক, ভগবদ্গীতায় সেই সমস্ত কথা আছে। গীতার প্রারম্ভে যখন অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের বিভীষিকা চিন্তা করিয়া আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িব, তখন এই পুনর্গঠনের শাশ্বত বিধানগুলি আমাদিগকে নববলে বলিয়ান্ করিবে। পুনর্গঠনের এই শাশ্বত বিধানগুলিই ভগবদ্গীতার শিক্ষা। আমরা স্বধর্ম্ম-নির্দ্ধারণে এই বিধানগুলির আলোচনা করিব।

জন্মান্তরবাদ গীতার একটি প্রধান শিক্ষা। মানুষ দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ নহে, মন বা বুদ্ধি নহে। দেহ ও দেহী পৃথক্, ইহা গীতার প্রাথমিক শিক্ষা। দেহী নিত্য ও অবধ্য, দেহ পরিবর্ত্তনশীল। ইহা ব্যক্তির পক্ষেও সত্য, সমাজের পক্ষেও সত্য। আমরা প্রত্যেকেই জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতেছি। সকলেই এখনও তুল্যরূপ অভিজ্ঞতা বা বিকাশ লাভ করে নাই, সুতরাং জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফলে মানুষে মানুষে অধিকারগত, শক্তি সামর্থ্যগত, ও রুচিগত প্রভেদ চিরদিনই থাকিবে। এই মহাসত্য ভুলিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ,—ব্যক্তিরও সর্ব্বনাশ, সমাজেরও সর্ব্বনাশ। আমি কি জানি, তাহা জানা, তত কঠিন নহে ; কিন্তু আমি কি জানি না, তাহা জানা বড়ই কঠিন। আমি কি পারি, তাহা জানা, তত কঠিন নহে ; কিন্তু আমি কি পারি না, তাহা জানা বড়ই কঠিন। আমি কি জানি না, এবং আমি কি পারি না, ইহা প্রত্যেকের জানা দরকার। কিন্তু ইহা জানিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন, সদ্গুরুর আনুগত্য প্রয়োজন, সামাজিক প্রতিবেশের (Social environments) প্রয়োজন। আমি যেদিন আমার অধিকার, দেহী বা আত্মার ভূমি হইতে বুঝিয়া আমার অধিকারানুযায়ী কর্ত্তব্যপালনে লিপ্ত হইব, সেই দিন আমি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইব। কিন্তু ইহা যে বড়ই কঠিন।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা বড় সুন্দর। গুণ ও কর্ম্মের তারতম্য-নিবন্ধন সামাজিক মানুষ যে চারিশ্রেণীতে স্বভাবতঃই বিভক্ত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা উন্নততর শ্রেণীর মানব বা দ্বিজ, তাহাদের ক্রমোন্নতি সমাজের মধ্য দিয়া অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের প্রত্যেকের জীবন যে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করা আবশ্যক, ইহাও

সাধারণ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং, প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমাজ। মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের শাশ্বত বিধান, যাহা ভগবদ্গীতায় ও অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে আলোচনা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার তুলনা নাই। ব্রাহ্মণ সংযতভাবে পরিবার রক্ষা করিবেন, ধর্ম্মবুদ্ধিতে বংশ রক্ষা করিবেন, ব্রাহ্মণের ঘরে যে পুত্র জন্মিবে, সে জন্মান্তরীণ কর্ম্মের প্রভাবে প্রকৃত ব্রাহ্মণই হইবে। এই প্রকারে ক্ষত্রিয়ের গৃহে ক্ষত্রিয়; বৈশ্যের গৃহে বৈশ্য এবং শূদ্রের গৃহে শূদ্র আকৃষ্ট হইয়া আপনা হইতেই জন্মলাভ করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি কামাদি রিপুর দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে তাহার গৃহে ব্রহ্মবন্ধু, শূদ্র ও রাক্ষসের জন্ম হইবে। ক্ষত্রিয় যদি স্বার্থপর হয়, তাহার গৃহে অসুরের জন্ম হইবে; বৈশ্যের ও শূদ্রের গৃহে রাক্ষসের ও পিশাচের জন্ম হইবে। আবার ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে, শূদ্র বা বৈশ্যের গৃহে ব্রাহ্মণের জন্ম হইতে পারে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের গৃহে দেবতারও মহর্ষির জন্ম হইতে পারে। রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করিলে দেখিবেন—কালচক্রের আবর্ত্তনে ঠিক্ তাহাই হইয়াছে। বিশ্বরূপ, বৃত্রাসুর, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি একদিকে,—আর শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, বিদুর, বৃন্দাবনের গোপ গোপী, এমন কি হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতি,—ইহাদের জন্ম-কথা আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, পৌরাণিক মহর্ষিগণ কি বলিতে চাহেন। তাহা হইলেই আমরা গীতার প্রথম সামাজিক সমস্যা—অর্থাৎ সঙ্করের উৎপত্তি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মের বিনাশ এবং স্বধর্ম্মপরায়ণতা—এই সকলের রহস্য যথার্থরূপে বুঝিতে পারিব।

অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—কুলক্ষয় হইবে, প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্ম্মসাধন-প্রণালী ভাঙ্গিয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিবাদ করেন নাই। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে প্রাচীন সমাজের বন্ধন ও ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারাও বুঝিতে পারা যাইতেছে, শাস্ত্রীয় মীমাংসার দ্বারাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার যাহা মূলভিত্তি বা শাশ্বত বিধান, তাহা সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং, ঐ আদর্শ আমরা কিছুতেই ভুলিব না, ঐ

আদর্শের অভিমুখে সমাজকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু সকল সময়েই জানিয়া রাখিব, সে ব্যবস্থা এখন নাই।

কলিযুগ আসিয়াছে, কলিযুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। সুতরাং এখন আমাদের বিশেষভাবে সাবধান হইতে হইবে, প্রত্যেককে আত্মচিন্তা করিতে হইবে। অন্যের উপর ভার দিয়া চোখ বুজিয়া, গতানুগতিকের অনুবর্ত্তন করিলে যুগধর্ম্ম সাধন হইবে না। কে কাহার কথা শুনিবে? আমার স্বধর্ম্ম কি, আমাকেই তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যিনি শিক্ষক ও গুরু, যিনি আমার কল্যাণকামী, তিনি আমার জীবনের প্রথম হইতে এমন সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে আমি যৌবনে পদার্পণ করিবার সময়ে বুঝিতে পারিব, আমার দ্বারা কি কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে এবং কি কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। তাহা হইলে আমি সাহসী ও তেজস্বী হইব, কিন্তু উদ্ধত ও অবিনয়ী হইব না—তাহা হইলে আমি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পরিশ্রমী হইব এবং স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ হইব। ইহাই গীতার প্রথম কথা।

তাহা হইলে গীতাশ্রবণের অধিকারী হইতে হইলে, যখন স্বধর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে, তখন নিম্নলিখিত কথাগুলি আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এই যুগের নাম কলিযুগ। কিছুদিন আমাদের দেশে এবং সমগ্র পৃথিবীতে কলির প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইতেছে। কলির প্রভাব বর্ত্তমান সময়ে যেভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে ইহাও হইতে পারে যে কলির পরমায়ু শেষ হইয়া আসিতেছে—হয়ত পৃথিবীতে অচির-ভবিষ্যতে একটা ভাল যুগ আসিতেছে—অন্ততঃপক্ষে আমাদের আশা করা যাউক, ভরসা রাখা যাউক, এবং প্রার্থনা ও চেষ্টা করা যাউক, যেন সেই নবযুগের আবির্ভাব হয়। কলিযুগের লক্ষণসমূহ খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, যাঁহারা আত্মরক্ষায় চেষ্টাপরায়ণ হইবেন, তাঁহাদের কোনই ভয়ের কারণ নাই; কিন্তু সতর্ক না হইলেই বিপদ। এই কলিযুগে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সকল বিষয়েই বাস্তব অবস্থাসমূহ যথার্থভাবে জানিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—এ যুগ, বিজ্ঞাপন ও প্রশংসাপত্রের যুগ; সুতরাং কোনও বিষয়ে সত্য নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন কাজ। তাহার পর বিচারণা-শক্তির অনুশীলন আবশ্যক। ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের মতের দ্বারা নিশ্চেষ্টভাবে চালিত হইলে, এই কলিযুগে বঞ্চিত হইবারই সম্ভাবনা অধিক। আমরা

শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়া রাখিয়াছি যে, ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে বিশ্বাস করিতে হইবে, —গুরুপাদাশ্রয় করিতে হইবে। এই দুইটি কথা সত্য। কিন্তু যখন মানুষ মানুষকে ঠকাইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত, তখন কাহাকে বিশ্বাস করিব? গুরুগিরি যে ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে—কেবল ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবসায় নহে, রীতিমত কোম্পানি গড়িয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া, দালাল লাগাইয়া, সংবাদপত্র ভাড়া করিয়া, বখরার বন্দোবস্ত করিয়া, এই ব্যবসায় চলিতেছে —সুতরাং বিশ্বাসই বা করিব কি, আশ্রয়ই বা করিব কাহাকে? অতএব—"সাধু সাবধান"।

আমরা সকল বিষয়েই অনুসন্ধিৎসু হইব, সকল বিষয়েরই আদ্যন্ত অনুধাবনপূর্ব্বক জানিতে চেষ্টা করিব। আমি কলিকাতায় বক্তৃতা করিতে আসিয়াছি, আপনারা দয়া করিয়া আমার বক্তৃতা শুনিতেছেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে অনেকেই কিছুই জানেন না। আমি কেন এই বক্তৃতা করিতে আসিয়াছি, কেহ আমাকে অর্থ দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে কি না, আমার ইহা চাকুরী কি না, কোন দলের আমি এজেণ্ট কি না, আমি কি করি, কেন ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করি, আমার বিশেষ কিছু মত আছে কি না—এই সকল কথা অনুসন্ধান করিয়া জানা উচিত। আমি যাহা বলিব, তাহা কদাচ মাথা পাতিয়া মানিয়া লইবেন না—তাহা শাস্ত্র সঙ্গত ও সুযুক্তিসিদ্ধ কিনা, তাহা বেশ ভাল করিয়া যাচাই করিয়া দেখিবেন। আমাকে যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে নিঃসঙ্কোচে বলিবেন। আমি কোনও অলৌকিক শক্তির সাহায্যে, কোনও অভ্রান্ত সত্য প্রচার করিয়া, আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সুগম মোক্ষপথ দেখাইতে আসি নাই।

আমার কথা শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, ইহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। গীতায় আছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ১৬—২৩,২৪

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী প্রথমেই বলিলেন—"কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতি"—কামাদি পরিত্যাগ স্বধর্ম্মাচরণ ব্যতীত সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি

উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বেদবিহিত ধর্ম্ম ছাড়িয়া, যথেচ্ছাচারের পথে কার্য্য করে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না, সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি, সুখ ও পরমাগতি লাভ করিতে পারে না। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান অবগত হইয়া স্বীয় অধিকারানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

তাহা হইলে, শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিব, কিন্তু বুদ্ধি ও হৃদয় শাস্ত্রের শিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত হওয়া চাই। ভারতবর্ষের লোক ধর্ম্ম ভালবাসে, ধর্ম্মকথা বলিলে ভারতবর্ষের লোক শীঘ্র শীঘ্র বাধ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং জননায়ক হইয়া শক্তিশালী হইতে হইলে, ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়। এই প্রকারের কথা কিছুদিন হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক নূতন নূতন ধর্ম্মোপদেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালী মঠমন্দির বড় একটা করে নাই, বাঙ্গালী জাতীর প্রকৃতি চিরকালই সুবৃহৎ মঠমন্দির গঠনের বিরোধী, কিন্তু এখন বাঙ্গালী চারিদিকেই মঠমন্দির গড়িতেছে। যাহা হইবার তাহা হইবে—কিন্তু ধর্ম্মকথা বলিলে লোক আকৃষ্ট হয় ও বাধ্য হয়, অতএব ধর্ম্মকথা বলা যাউক, ধর্ম্মের ভাণ করা যাউক, এই যে পন্থা,—ইহাকে ছলধর্ম্ম বলে। সৎশাস্ত্রের সহিত যাহারা পরিচিত নহে বা পরিচিত হইতে চেষ্টা করে না, তাহাদের ছলধর্ম্মের দ্বারা বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা খুবই অধিক।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই ভগবৎগীতার প্রথম ও প্রধান কথা, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে স্বধর্ম্মবিনির্ণয় বড়ই কঠিন, এই কারণে আমরা এ সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। অন্যান্য কথা যাহা জানা আবশ্যক, তাহা গীতার মধ্যেই আছে।

প্রত্যেক মানুষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইবে বা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবে, ইহাই গীতার উপদেশ। মানুষের জীবন, ইহলোকে—এই একজীবনেই শেষ নহে। আমরা বহুবার সংসারে আসিয়াছি, এখনও আমাদের অনেককে বহুবার আসিতে হইবে। আমি যখন সংসারে আসিয়াছি, তখন কিছু পুঁজি বা মূলধন লইয়া আসিয়াছি। এই পুঁজি বা মূলধন সকলের একরূপ নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের দ্বারা আমার এই মূলধন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমার এই কর্ম্মকে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। অবশ্য এই কর্ম্ম যে আমাকে সহায়হীন বা স্বাধীন—ইচ্ছাশক্তিহীন করিয়াছে, তাহা নহে। আমার স্বাধীনতা

আছে, আমি এই অদৃষ্টকে পরাজিত করিতে পারি, কিন্তু যথেচ্ছাচারী হইয়া গোঁয়ারের মত জীবনের পথে অগ্রসর হইলে, আমি কিছুতেই এই অদৃষ্টকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিব না। কিছুদিন লাফালাফি করিব, নিজের অধিকার বহির্ভূত বড় বড় শেখা কথা আওড়াইয়া নিজেকেও ঠকাইব, জগৎকেও ঠকাইব, কিন্তু সে আর কয়দিন ? কিছুদিন পরেই, আমার স্বভাবজ কর্ম্ম এবং প্রকৃতি, আমাকে বাধ্য করিয়া আমার যথেচ্ছাচার বন্ধ করিয়া দিবে। আমাদের শাস্ত্রের ইহাই প্রধান কথা। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষাংশে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন তুমি যদি অহঙ্কারযুক্ত হইয়া কিম্বা মোহাচ্ছন্ন হইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তুমি জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হইবে। প্রকৃতি তোমায় পরাজিত করিবে, তোমার স্বভাবজ কর্ম্ম তোমায় পরাজিত করিবে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং কাতরহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহা হইলে উপায় কি ? তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে অর্জ্জুন ভয় পাইও না, উদ্বিগ্ন হইও না—ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়-দেশে রহিয়াছেন, তিনি সমুদয় পরিচালনা করিতেছেন—তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহারই শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদে তুমি জীবনযুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া পরমাশান্তি লাভ করিবে। ইহাই গীতার শেষ কথা, ইহাই গীতার ঈশ্বর-বাদ। গীতার প্রথম কথা স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, আর শেষ কথা ঈশ্বর-নিষ্ঠা। এই দুই কথা, একই কথার দুই দিক্—ইহাদের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। গীতা বলিলেন—'ঈশ্বরের শরণাগত হও'—এই ঈশ্বর কোন পুরোহিত বা গুরুর ঈশ্বর নহেন, কোনও সম্প্রদায় বা তীর্থের ঈশ্বর নহেন—এই ঈশ্বর আমার ঈশ্বর,—আমারই হৃদয়মধ্যে তিনি রহিয়াছেন। গীতা বলিতেছেন—"সর্ব্বভাবে" তাঁহার শরণাগত হও। ইহাই স্বধর্ম্মনিষ্ঠা। আমাকে আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, অতএব অন্তর্মুখী হইতে হইবে। বাহিরে এ যুগের এই অগণ্য নরনারী,—ইহারা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিপথগামী পুত্র দুর্য্যোধনের দলভুক্ত হইয়াছে, ইহারা এই সংসারের রাজ্য ও ভোগসুখ চাহে—লালসার দ্বারা চালিত হওয়ায় ইহারা বিবেকহীন হইয়াছে—ন্যায়, সত্য, অধিকার, ঈশ্বর প্রভৃতি কোন কথাই ইহারা শুনিতে প্রস্তুত নহে, এ সব কথা বলিলে ইহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। এ সব কথা বলিলে ইহারা বলে, ওসব কথা সে কালের কুসংস্কার ; পূর্ব্বকালের মানুষেরা মূর্খ ছিল, তাই তাহারা এই সব ভুল কথায় বিশ্বাস করিত। স্বয়ং

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—ওগো, এ সব সেকালের কথা, ভুল কথা নহে—এই সব কথাই, মানবের জ্ঞাতব্যের ভিতর চরম কথা, সার কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথাও ইহারা শোনে নাই। সেই সব কুরুক্ষেত্রের দুর্য্যোধনের দলভুক্ত লোকেরা আজিও সংসারে রহিয়াছে, আজিও কুরুক্ষেত্র চালাইতেছে। যে মানুষ না ভাবিয়া, ইহাদের দলে মিশিয়াছে বা মিশিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, গীতার উপদেশ তাহার জন্য নহে। প্রত্যেক মানুষ বুঝিতে চেষ্টা করুক—তাহার একটি নিজস্ব আছে, একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ জানিতে চেষ্টা কর, সেই বৈশিষ্ট্যের অনুবর্ত্তন করিয়া, সেই বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করিতে চেষ্টা কর—ইহাই স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, ইহাই প্রকৃত ঈশ্বর-নিষ্ঠা।

যেদিন গীতার ধর্ম্ম ভারতের ধর্ম্ম হইবে, সেদিন আমাদের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুকে—বালক ও বালিকাকে—তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষক, এমনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইবেন যে, তাহারা সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইবে। শাস্ত্রানুসারে স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে প্রত্যেক গৃহস্থ, কাম ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপু সমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, শুদ্ধচিত্তে সাংসারিক কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিবে। রাজবিধি ও সমাজবিধি প্রত্যেক গৃহস্থকে তাহার স্বধর্ম্মে রক্ষা করিবে। এই প্রকারে গার্হস্থ্যজীবন শেষ করিয়া প্রত্যেক কৃতী মানব এবং মানবী, বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের ভিতর দিয়া, ব্রহ্মপদে বা শ্রীভগবানের চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করিবে। ইহাই স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বহৃদয়বাসী-ঈশ্বরনিষ্ঠা।

সুতরাং গীতার শিক্ষা, ভাঙ্গিবার উপদেশ নহে—ইহাতে ভাঙ্গিবার কথা আছে—খুব স্পষ্টভাবেই আছে, কিন্তু নূতন করিয়া গড়িয়া, ভাল করিয়া তুলিবার জন্যই, এই ভাঙ্গি-বার আয়োজন। ভাঙ্গিবার সাহস যাহার নাই, সে গলিত, ঘৃণ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত প্রাণহীন দেহ লইয়া নরকের পথে—আঁধার ও আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হউক। কিন্তু যে বীর বাঁচিতে চাহে—গৌরবে শ্রীকৃষ্ণের রথের রথী হইয়া, সংগ্রামশীল শ্রীভগবানের সৈনিক হইয়া, তাঁহার নেতৃত্বাধীনে জীবনের পথে চলিয়া, দেহের জীবনে নহে, ইন্দ্রিয়ের জীবনে নহে, মন বা অহঙ্কারের জীবনে নহে, আত্মার জীবনে বা নিত্যজীবনে সগৌরবে বাঁচিতে চাহে—তাহারা ভাঙ্গিতে ভয় পাইবে না। কিন্তু আসুরিক দুর্ব্বুদ্ধি-তাড়িত হইয়া, কামলোভ প্রভৃতি

রিপুর তাড়নায়, এই ভাঙ্গাগড়ার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। তাহা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে—তোমারও সর্ব্বনাশ হইবে, জগতেরও সর্ব্বনাশ হইবে। ভাঙ্গা-গড়ার কাজ ঈশ্বরের কাজ—তোমার ভিতরে ঈশ্বর রহিয়াছেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি যিনি,—তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিতে হইবে না, তিনি তোমারই হৃদয়মাঝে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে জাগাইয়া, তাঁহাকে সারথি করিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া, তাঁহারই কৃপায় তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া—যুদ্ধের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধের ভিতর ধ্বংশ আছে—পুনর্গঠন আছে। ভগবদ্গীতায় এই পুনর্গঠনের যে ব্যবস্থা আছে—তাহা উত্তমরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত জীবনের পুনর্গঠন আবশ্যক—স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠাই এই পুনর্গঠন—Reconstruction of Individual Life—তাহার পর ধর্ম্ম-ব্যবস্থারও যুগে যুগে পুনর্গঠন করিয়া, যুগধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত করা আবশ্যক—Reconstruction of Religious Life। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনীতি, শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তেরই পুনর্গঠন আবশ্যক—ভগবদ্গীতার শিক্ষা এই পুনর্গঠনে আমাদের কি প্রকারে সাহায্য করিবে, তাহা বিবেচনার বিষয়।

স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠার কথা যাহা বলা হইল, তাহা ঠিক্ মত বুঝিতে হইলে এবং কি কারণে এই স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা প্রত্যেক নরনারীর জন্য একান্তভাবে আবশ্যক তাহা বুঝিতে হইলে, একটি প্রাথমিক কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। একটি কথাটি বুঝিতে না পারায়, বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ নরনারীর জীবনের শেষ, একটি শোচনীয় পরাজয় মাত্র হইয়া পড়িতেছে। সেই কথাটি যদি ইংরাজী ভাষায় বলি, তাহা হইলে বলিব—The Reality of the Larger Consciousness। ঠিক্ কথাটি এই—আমি এখন আমার জাগ্রত অবস্থায় যে জ্ঞানে জ্ঞানী, তাহাই আমার সমগ্র জ্ঞান নহে। আমরা সর্ব্বদাই বলি—"আমার জ্ঞান"—কিন্তু এই কথাটা ঠিক নহে—কারণ, আমি জ্ঞানরূপ। জ্ঞানই আমার স্বরূপ—ইহা আমাকে ধারণা ও ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। জ্ঞানই আমার স্বরূপ। আমি দেহ নই, আমি ইন্দ্রিয় নই, আমি মন নই, অহঙ্কার নই, বুদ্ধি নই—আমি নিত্য জ্ঞানরূপ। অতএব আমি নিত্য বস্তু, আমার ধ্বংশ নাই—আমি ছিলাম, আমি আছি এবং আমি থাকিব। এই যে আমার স্বরূপ অর্থাৎ পূর্ণ, নিত্য ও শুদ্ধজ্ঞান, ইহা এখন আমার জাগ্রত অবস্থায়, আমার ভিতর প্রকাশিত হয় না বা ক্রিয়া করে না। সাধনার

দ্বারা—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, সদাচার প্রভৃতির দ্বারা আমার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন, যে পরিমাণে শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইবে, সেই পরিমাণে সেই পূর্ণ ও শুদ্ধজ্ঞান অর্থাৎ আমার স্বরূপ বা আমার আসল আমি—The Real Self—The Spiritual Self প্রকট হইবে। এই তত্ত্বটি, অর্থাৎ এই বৃহত্তর চৈতন্য—The Larger Consciousness যে সত্য, গীতা বা কোন্ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের গ্রন্থ যথার্থরূপে বুঝিতে গেলে, এই কথাটি সর্ব্বাগ্রে অতি-উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। এমনভাবে বুঝিতে হইবে, যেন ইহাতে কোনোরূপ সন্দেহ না থাকে। তাহার পর আধ্যাত্ম-জীবনের দুইটি নিয়ম জানিতে হইবে—স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা। ইংরাজী ভাষায় বলিতে পারি—The Law of Duty, আর The Law of Sacrifice—প্রথমে কর্ত্তব্যপালন বা ঋণ-পরিশোধ, তাহার পর ত্যাগ বা প্রেম।

আমাদের শাস্ত্রমতে আমরা প্রত্যেকেই ঋণী। দেবতার নিকট বা দেবগণের নিকট ঋণী, পিতৃলোকের নিকট বা পিতৃগণের নিকট ঋণী, এবং ঋষিগণের নিকট ঋণী। এই তিন প্রকারের ঋণ সর্ব্বাগ্রে পরিশোধ করিতে হইবে। যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ; দানকর্ম্মের দ্বারা ঋষিঋণ; গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিয়া, উপযুক্ত পুত্রোৎপাদন-পূর্ব্বক তাহাদের সুশিক্ষা-বিধানের দ্বারা, পিতৃলোকের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। জীবন-ধারণ করিতে গেলে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়, সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। ইহার নাম পঞ্চযজ্ঞ। উদূখল (ঢেঁকি), জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ, সর্ম্মার্জ্জনী প্রভৃতির দ্বারা বহু বহু জীব প্রত্যহ বিনষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই দ্রব্যগুলি ব্যবহার না করিলেও গৃহস্থের চলে না। অতএব প্রতিদিনই হিংসা করিতেছি। এই হিংসাজাত পাপের নাম পঞ্চসূনা। এই 'পঞ্চসূনা' হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা। ১। দেবযজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি ২। ঋষিযজ্ঞ—বেদাধ্যয়নাদি ৩। ভূতযজ্ঞ—বলিবৈশ্যাদি ৪। মনুষ্যযজ্ঞ—অতিথিসেবাদি ৫। পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি। এই কার্য্যগুলি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে করিতে হইবে। এইগুলি সাধারণভাবে মানব-মাত্রেরই স্বধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি, কর্ত্তব্যবিধি বা The Law of Duty.

গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে এই শিক্ষা অতি উত্তমরূপেই দেওয়া হইয়াছে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি, যজ্ঞের অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনের ব্যবস্থা সহ প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া বলিলেন—এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞই তোমাদিগকে ফল প্রদান করিবে। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণকে পোষণ কর, দেবগণও তোমাদিগকে পোষণ করিবে। এই প্রকারের পরস্পর পরিপোষণের দ্বারা (The law of Inter-dependence and mutual service) তোমরা পরম মঙ্গল লাভ কর। যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবতারা তোমাদিগকে অভীষ্ট ফল দান করিবেন। তাঁহারা যাহা দিবেন, তাঁহাদিগকে না দিয়া তাহা নিজে যে ভোগ করিবে, সে চোর। যজ্ঞ করার পর যাহা বাকি থাকিবে, তাহাই স্বয়ং ভোগ করিবে বা ভোজন করিবে। তাহা হইলে তুমি সাধু, তুমি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। কেবল নিজের জন্য যে পাক করে, সে পাপিষ্ঠ, সে পাপই ভোজন করে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবিধি বা ঋণবাদের ইহাই শেষ কথা। এই বিধি যে না বুঝিয়াছে, তাহার কোনই জ্ঞান হয় নাই, সে নিতান্তই মূঢ়, তাহার জীবন বিফল।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

যে ব্যক্তি এইরূপে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, সে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সে পাপ-জীবন বৃথা ধারণ করে।

রায় রামানন্দের সহিত পরবর্ত্তীকালে গোদাবরী তীরে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে ধর্ম্মসাধনার বা সাধ্যনির্ণয়ের যে স্তরগুলি পরপর কথিত হইয়াছে—তাহাতেও ঠিক্ এই কথাই বলা হইয়াছে। প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, তাহার পর কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ও স্বধর্ম্মত্যাগ। যাহা হউক, একথা পরে আলোচ্য। গীতার আলোচনার

প্রারম্ভে, বৃহত্তর চৈতন্যের সত্যতা বুঝিয়া কর্ত্তব্যবিধি ও ত্যাগবিধি অবগত হইতে হইবে। গীতার ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে—গীতার ধর্ম্মের যথার্থ অধিকারী হইতে হইলে—ইহাই প্রথম কথা।

গীতার উপদেশ যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে হইলে যে যে সদগুণ থাকা আবশ্যক, তাহার প্রথমটি বলা হইল। দ্বিতীয় কথা—"না ভক্তায় বাচ্যং", যে ব্যক্তি ভক্ত নহে অভক্ত, তাহাকে গীতা বলিবে না। এইবার এই দ্বিতীয় কথাটি আলোচনা করা যাউক।

শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—যাহার গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তি নাই, তাহাকে গীতা বলিবে না। এখানে ভক্তি বলিতে মানবের হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক অবস্থার কথাই বলা হইয়াছে। খুব যে একটা গূঢ় কথা বলা হইয়াছে, তাহা নহে। আমাদের মধ্যে সত্য সত্যই ভাল হইতে কয়জন লোক চাহে? অন্যলোকের কথা আলোচনা করিয়া দরকার নাই, নিজেকেই প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করা যাউক, ভাল হইতে চাই কিনা? ভাল হওয়া কথার অর্থ অতিরিক্ত ভোগসুখের জন্য লোলুপ হইব না, পরের অনিষ্ট করিব না, সাধ্যমত পরের অপকার করিব না, অসৎ পথে চলিব না, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা অবলম্বন করিব না,—এই প্রকারের তীব্র আকাঙ্খা কয়জনের আছে? যাহাদের আছে, তাহারা গীতা শ্রবণের অধিকারী। এখনকার দিনে সাধারণ মানুষ বড়ই কদর্য্যভাবে দিন যাপন করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্থার্জ্জনের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বিসর্জ্জন দেওয়ার উদাহরণ চারিদিকেই সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সমাজের এই প্রকারের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এই প্রকারে সদসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করিয়া কোন প্রকারে কিছু ভোগ বিলাস করিয়া দিন কাটাইবার ইচ্ছা ব্যতীত, যাহাদের হৃদয়ে কোন প্রকারের উন্নততর অভিলাষ জাগ্রত হয় না, তাহারা গীতাশ্রবণের অধিকারী নহে।

ভগবদগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে, ভক্তিযোগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—উত্তমব্যক্তির প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে, সমান ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী-সম্পন্ন হইবে, অধমের প্রতি করুণা করিবে, ক্ষমাশীল হইবে, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত হইবে—ইত্যাদি। সমগ্র গীতাশাস্ত্রের আলোচনা ব্যতিরেকে, গীতার ভক্তিযোগ যথার্থরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং, বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। প্রধান কথা এই জীবনে উন্নততর লক্ষ্য থাকা চাই, সেই লক্ষ্যসাধনে দৃঢ়ব্রত হওয়া চাই। আমার চারিদিকে সকলে

যাহা করিতেছে, তাহা ভাল কি মন্দ, এ বিষয়ে আমরা বালককাল হইতে বিচারই করি না। এ প্রকারে চলিলে মানুষ কিছুতেই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিবে না। আমার গ্রামের হাজার লোকে যাহা করিতেছে, আমি যেদিন বুঝিব তাহা অন্যায়, সেইদিনই, সেই মুহূর্ত্তেই, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব। তাহার প্রতিবাদ করিব এবং নিজে প্রাণ গেলেও তাহা করিব না। এই প্রকারের সুতীব্র হৃদয়াবেগ যাহার আছে, ঈশ্বরে ও গুরুতে তাহারই যথার্থ ভক্তি আছে।

তৃতীয় কথা, যে শুশ্রূষাহীন—অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিচর্য্যা বা সেবা করে না, বা করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহাকে গীতার শিক্ষা দিবে না। এই পরিচর্য্যা বা সেবা কাহার সেবা, তাহাও আলোচনা করা দরকার। গুরু ও ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ভগবদ্গীতা যে ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই সেবক, কেহই সেব্য নহে। রাজর্ষি জনক প্রভৃতি লোকসংগ্রহের আদর্শ লইয়া, অর্থাৎ সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন—পরমেশ্বর নিজে বিশ্বকল্যাণের ব্রত লইয়া জগতের হিতকামনায় অনলসভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। ইহাই গীতার আদর্শ। অতএব আমরা কখনই সংসারে অন্যায্য সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতে ইচ্ছা করিব না, আমরা সকল সময়েই পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব—ইহাই গীতার শিক্ষা।

এই তিনটি কথা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, গুরুতে ঈশ্বরে ভক্তি, ও পরিচর্য্যা—এই তিনটি কথা আলোচনা করিয়া আমরা যাহা পাইলাম, তাহার সার মর্ম্ম এই—আমাদিগকে চিন্তাশীল হইতে হইবে, অন্তর্মুখী হইয়া নিজের অধিকার ও সামর্থ্য অবধারণ করিব, এবং বাহিরের যাবতীয় ব্যাপারও উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিব। নিজে নিজে বিচার করিতে গিয়া অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইব না, শাস্ত্রের সহিত গভীররূপে পরিচিত হইব। আমরা সরলচিত্তে ও তীব্র আবেগের সহিত উন্নততর আদর্শের অভিমুখী হইব—গতানুগতিক হইয়া দুর্ল্লভ মানব জীবনের অপব্যয় করিব না। আমরা জগতের হিতসাধনের জন্য চেষ্টা করিব, জগৎ ও মানবজাতি অসত্য ও অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে মঙ্গলের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, পরমেশ্বর স্বয়ং এই সংগ্রামের সারথি ও পরিচালক, আমরা সকলেই তাঁহার সৈনিক, ইহাই আমাদের সর্ব্বোত্তম পরিচয়, আমরা সেই যুদ্ধে আপনাকে সমর্পণ করিব। এই প্রকারের সংকল্প

যাহাদের আছে, গীতার উপদেশ তাহাদের জীবনে সুফল-প্রসূ হইবে। জড়স্বভাব মানুষ, গতানুগতিকের অনুবর্ত্তন করিতেছে, চিন্তা করিবার সাহস নাই, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নাই—তাহাদের জন্য ভগবদ্গীতা নহে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থকথা—"ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি"—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি আমার প্রতি অসূয়া-সম্পন্ন তাহাকে গীতা বলিবে না। এই কথাটির অর্থ বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি", শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিতেছেন—"মাং পরমেশ্বরং মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি"—আমি পরমেশ্বর, আমাকে সামান্য মানুষ বলিয়া মনে করে এবং নানারূপ দোষারোপ করিয়া নিন্দা করে। যাহারা এই প্রকারের লোক, তাহাদিগকে গীতা বলিবে না।

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার যুগে অনেকেই বুঝিতে পারে নাই, আবার অনেকেই তাঁহার কার্য্যাবলী উল্টা করিয়া বুঝিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অনেক স্থলে অনেক প্রকারে, এই সব বিরোধী লোকেদের কথা বলিয়াছেন। যথা—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসী মাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

সেদিন ভারতবর্ষের একদল লোক শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া আজ সকল দেবতার পরম দেবতা যিনি, সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর যিনি, তাঁহারই বাণী ও লীলা প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছে—কিন্তু একদল লোক কিছুতেই তাহা বুঝিল না। তাহারা 'মোঘাশা'—কৃষ্ণ আসিয়াছেন, তাঁহাকে না চিনিয়া অন্যদেবতার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিল, ভাবিতে লাগিল—এই দেবতার দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র সফলতা লাভ করিব—কিন্তু তাহাদের এই আশা নিষ্ফল। এই সব লোক, "মোঘকর্ম্মাণো"—তাহাদের কর্ম্মও নিষ্ফল হইতেছে। ইহারা 'মোঘজ্ঞানা'—ইহারা যাহাকে শাস্ত্রজ্ঞান বলে, তাহা সত্যজ্ঞান নহে, তাহা বিবিধ প্রকারের কুতর্কপরিপূর্ণ। ইহারা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত। ইহারা রাক্ষসী অর্থাৎ হিংসাদি-প্রচুর তামসী, আর আসুরী অর্থাৎ কামদর্পাদিপ্রচুর রাজসী, আর বুদ্ধিভ্রংশকরী প্রকৃতি

আশ্রয় করিয়াছে। এই কারণে ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিল না। ফলে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বভূতমহেশ্বর শুদ্ধ-সত্বময় বিগ্রহ—ভক্তের ইচ্ছাবশে তিনি যে মানবীয় মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া আজ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিল।

এই শ্লোক দুইটি গীতার নবম অধ্যায়ের শ্লোক। গীতায় অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়াছেন। অন্যান্য দেবতার পূজাকারিগণ শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করে নাই—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে দলবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ইহারা মন্দবুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥

আমি অব্যক্ত—প্রপঞ্চাতীত। মৎস্যকূর্ম্মাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত বা প্রকটিত হয়। অল্পবুদ্ধিগণ আমার নিত্য ও সর্ব্বোত্তম স্বরূপ না জানায়, আমাকে স্বকর্ম্মনির্ম্মিত ভৌতিক দেহ-সম্পন্ন অন্য দেবতা বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের এই অজ্ঞানের অবশ্য হেতু আছে। আমি যোগমায়া-সমাবৃত—এক অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসচাতুর্য্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন—এই কারণে মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপ-অবধারণে অক্ষম হইয়া, আমাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া বুঝিতে পারে না। হে শত্রুদমন অর্জ্জুন—প্রাণিগণের যখন এই স্থূল দেহের উৎপত্তি হয়, তখন তাহারা অনুকূল বিষয়ে আসক্তি আর প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ—এই যে দ্বন্দ্ব, আর সেই দ্বন্দ্ব হইতে সমুদ্ভূত যে মোহ, সেই মোহের দ্বারা সম্যকরূপে অধিকৃত। এই কারণেই আমাকে চিনিল না!

যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণকে চিনিয়াছিলেন। মহারাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর বিবাহের অল্পকাল পরেই বিদুরকে বলিয়াছিলেন—পুরুষোত্তম বাসুদেব, পাণ্ডবগণের যেরূপ মঙ্গল চিন্তা করেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেরূপ করিতে পারেন না। মহাত্মা

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, সে পক্ষ নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। এই সব কথা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হওয়ার ঠিক্ পরের কথা। যাঁহাদের বুঝিবার শক্তি ছিল তাঁহারা তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, তখনকার ভারতবর্ষে সকল দিকে অতি ভয়ানক যে-সকল সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই সমুদয় সমস্যার যথার্থ মীমাংসা করিবার সামর্থ্য যদি কাহারও থাকে, তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই আছে। মহামতি ভীষ্ম তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই কারণে রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতামহ, সভায় যাঁহারা উপস্থিত আছেন, ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—"জ্যোতিস্ক সমুদয়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতিশায়িনী, সেইরূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন অন্ধকারময় স্থানে সূর্য্যরশ্মি সমাগত হইলে সকলের অন্তকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন বায়ুপ্রবাহহীন স্থানে বায়ু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে আমাদের সভা উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্য-প্রদান কর্ত্তব্য।" ভীষ্মের কথায় সহদেব, শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্য-প্রদান করিয়াছিলেন।

সেইদিন হইতেই ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে গৃহবিবাদের আগুণ বেশ ভাল করিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের এই পূজা, শিশুপাল সহ্য করিতে পারিলেন না—তিনি সদর্পে সভামধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিলেন, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিলেন। ভীষ্ম সেই সময়েই অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই মহতী সভায়—সেদিনকার ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান প্রধান সজ্জনবর্গের সম্মুখে তিনি অকুতোভয়ে ঘোষণাও করিয়াছিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা।

শ্রীকৃষ্ণলীলা বা শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার ভারতবর্ষের সাহিত্যে নাই, পৃথিবীর সাহিত্যে নাই। সমাজে, গৃহে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, সাংসারিক ব্যবহারে যত প্রকারের সমস্যা হইতে পারে—হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে—শ্রীকৃষ্ণের লীলায় তাহার প্রত্যেকটরই মীমাংসা আছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বা বিশ্বজনীন পরম চৈতন্যের পূর্ণ প্রতিবিম্ব-পাত, ভারতের সেদিনের এবং তাহার পরবর্ত্তীকালের মণীষিগণ এই শ্রীকৃষ্ণলীলাতেই দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই লীলা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন কথা—সুদীর্ঘ

কালব্যাপী সাধনা এবং অন্তর্দৃষ্টির বা প্রজ্ঞাশক্তির অনুশীলন ব্যতিরেকে, শ্রীকৃষ্ণ লীলার এই গূঢ় রহস্য কেহ বুঝিতে পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝিতে হইলে, তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও অনুভব-প্রণালী জানিতে হইবে। ঐতিহাসিকের কৃষ্ণ, পৌরাণিকের কৃষ্ণ, আর ভাবুকের কৃষ্ণ—ইতিহাস, লীলা, আর নিত্য-লীলা, এই তিনটি জিনিস বুঝিতে হইবে। ইতিহাস বুঝি—ভাবুকতাও হয়ত কিছু কিছু অনুভব করি—কিন্তু পুরাণের সহিত এযুগের মানুষের অর্থাৎ আমাদের পরিচয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই তিন প্রকারের চিন্তায় যিনি অভ্যস্ত, তিনি সাধনার দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন। নরলীলা রহস্যের শীর্ষ-সীমা। আজ আমরা ইহা বুঝিতে অক্ষম—তাহা হইলে কি গীতার উপদেশ শুনিতে পাইব না? শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কেহ যৎকিঞ্চিৎ প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন—চাকুরীর চেষ্টায়। তিনি বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বা পুরাণ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সব জানিয়া ফেলিয়াছি। অনেকে না বুঝিয়াই তাহাদের কথা শিরোধার্য্য করিতেছে। কেহ কল্পনা করিয়া রূপক ব্যাখ্যা করিতেছে—অনেকে স্তম্ভিত হইয়া তাহাই মানিয়া লইতেছে। দেশের ভক্ত ও সাধুগণ নীরব—সৎশাস্ত্র উপেক্ষিত। এযে বড় ভয়ানক অবস্থা! আমরা এখনও শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারি নাই—শ্রদ্ধান্বিত-হৃদয়ে তপস্যাপরায়ণ হইয়া সাধুসঙ্গে শাস্ত্রসাহায্যে ধীরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিব, এই প্রকারের অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষা যাঁহার আছে, তিনি গীতা শ্রবণ করুন, গীতার ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে সফল হইবে।

এই কারণেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

> ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
> ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি

এই গীতা শাস্ত্র—তপস্যাহীন, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন, গুরু শুশ্রূষারহিত এবং আমার প্রতি অসূয়াপর ব্যক্তিকে কদাচ বলিবে না।

> য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষভিধাস্যতি।
> ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য-শাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি

আমাতে পরম ভক্তিমান্ হওয়ায় সন্দেহহীন হইবেন এবং আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

মনুষ্যলোকমধ্যে গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতা অপেক্ষা, অধিক প্রিয় আমার আর কেহ নাই, আর কখনও পৃথিবীতে তদপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় কেহ হইবেও না।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥

যিনি আমাদিগের এই ধর্ম্মসঙ্গত গীতাশাস্ত্র-কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকেই পূজা করিবেন, ইহাই আমার অভিমত।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মাদিগের ভোগ্য শুভলোক লাভ করেন ॥

পূর্ণাঙ্গ-যোগ ও যুগল-উপাসনা

বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু ভগবদ্গীতার যুগে আমাদের ধর্ম্মজীবনে যে সমুদয় সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং যে সমুদয় সমস্যার মীমাংসার জন্যই ভগবদ্গীতার আবির্ভাব, এখনও সেই সমুদয় সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। কবে হইবে, জানি না; কিন্তু মীমাংসার যে প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম ও প্রধান সমস্যা যোগ ও যোগ-সাধনা লইয়া। সকলেই শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে—যোগ শিক্ষা করিতে হইবে,—যোগী হইতে হইবে। ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য। যোগের দ্বারা কেবল পরলোকে নহে, ইহলোকেও মানুষ বিশেষরূপে লাভবান্ হইবে। যোগাভ্যাস করিলে, অলৌকিক শক্তিলাভ হইবে,—অসম্ভব সম্ভব হইবে। কিন্তু যোগ কি এবং ইহার সাধনাই বা কিরূপ?

কেহ মনে করেন, নেতি-ধৌতি-প্রভৃতি কতকগুলি হঠক্রিয়াই যোগ। আবার কেহ বলেন—নানা প্রকারের আসন অভ্যাস করিলেই যোগসিদ্ধি হইবে। কেহ মনে করেন—মুদ্রাই প্রধান কার্য্য, নানা প্রকারের মুদ্রা শিখিলেই আর কিছু আবশ্যক হইবে না। কেহ কেহ প্রাণায়ামের অতিমাত্রায় ভক্ত; তাঁহারা বিবেচনা করেন, প্রাণায়াম করিলেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি। কেহ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন, কেহ বা জ্রমধ্য দর্শনের জন্য চেষ্টান্বিত। কেহ চক্ষু দুইটী চাপিয়া ধরিয়া অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কর্ণ দুইটী বন্ধ করিয়া মহাভূতের বা ভুবর্লোকের ধ্বনি বা স্পন্দন শুনিবার জন্য লালায়িত। আবার কেহ বা কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র ও সহস্রার ধ্যান করিতেছেন। এই প্রকারের বহুবিধ যোগক্রিয়া তখনও প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে।

এই সমুদয় প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন একটির নিয়মিতভাবে ও উত্তমরূপে অভ্যাস করিলে যে, কোনরূপ ফল হইবে না, তাহা নহে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের কোন একটি, দুইটি বা তিনটি প্রকৃত বা পূর্ণাঙ্গ-যোগ নহে। যোগ যদি এই প্রকারের একটি অতি-সামান্য শারীরিক ক্রিয়ামাত্রই হইত, তাহা হইলে, সকলেই যোগী হইত। পূর্ণাঙ্গ-যোগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত, আমাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তাহার ফলে যিনি জ্ঞানী অথবা যিনি নিজেকে জ্ঞানযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি কর্ম্মযোগী ও অভ্যাসযোগীর পরিশ্রম দেখিয়া উপহাস করেন এবং বিবেচনা করেন, উহা পণ্ডশ্রম মাত্র। আবার কর্ম্মযোগী বা অভ্যাসযোগী, জ্ঞানীকে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই বিবেচনা করেন। আবার আজকালকার প্রচলিত যোগসাধক, জ্ঞানীকে বা ভক্তকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আবার যিনি নিজকে ভক্ত বা উপাসক বলিয়া মনে করেন, তিনি অন্য সকলকে মনে মনে ঘৃণা করেন। ইহাই এখন চলিতেছে—কিন্তু এই অবাঞ্ছনীয় দুরবস্থার প্রকৃত মীমাংসা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় রহিয়াছে। যোগের যে সমুদয় ক্রিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কেহ যদি সেই সমুদয় ক্রিয়ার কোন একটির অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া, কোনরূপে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে, লোকে বলে যে, কলিযুগে যোগ-সাধনা হয় না—কলিযুগে যোগ-সাধনা শিক্ষা দিবার গুরু নাই। এখন যে অবস্থা হইয়াছে, দ্বাপর যুগের শেষেও ঠিক সেই প্রকারেরই অবস্থা হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সাধন-প্রক্রিয়ার প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া, পূর্ণাঙ্গ-যোগের প্রকৃত আদর্শ জগতকে বুঝাইয়া দিবার জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবির্ভাব। ভগবদ্গীতায় এই সার্ব্বভৌমিকত্ব সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। বিশেষ একটি পথের বা মতের সমর্থক বলিয়া, ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সদ্ব্যাখ্যা হইবে না।

আমরা ভগবদ্গীতা হইতে চারি প্রকারের যোগের তত্ত্ব আলোচনা করিলে, পূর্ণাঙ্গ-যোগের যাহা আদর্শ, তাহার পরিচয় পাইব। এই চারিটি যোগের নাম কর্ম্মযোগ, অভ্যাসযোগ, জ্ঞানযোগ ও

ভক্তিযোগ। এই যে চারি প্রকারের যোগ, ইহাদের মধ্যে কোনটি অপরগুলি হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ কেহই স্বতঃসম্পূর্ণ নহে। একটির সহিত অপর প্রত্যেকটির অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই চারিটির একত্র মিলন হইলেই, প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ সাধনা হইবে। এই চারিটির মধ্যে কেবলমাত্র একটি অপূর্ণ। প্রত্যেক সাধককে এই চারিটিরই অভ্যাস করিতে হইবে। কেহ যেন বিবেচনা না করেন যে, এই চারি প্রকারের সাধন একটির পর একটি করিয়া পর পর ক্রমান্বয়ে করিতে হইবে—সমুদয়গুলির অভ্যাস এক সঙ্গে একই সময়ে করিতে হইবে না। প্রকৃত কথা—এই পূর্ণাঙ্গ-যোগ-সাধনার প্রথম স্তরে কর্ম্ম প্রধান অঙ্গ। দ্বিতীয় স্তরে অভ্যাস, তৃতীয় স্তরে জ্ঞান, আর চতুর্থ স্তরে ভক্তি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু চারিটি অঙ্গই একত্র অনুষ্ঠেয়।

নিষ্কাম ও পরোপকারমূলক কর্ম্ম দ্বারা যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে, তখনই অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে একাগ্র ও স্থির করিতে পারা যাইবে। শুদ্ধ, একাগ্র, স্থির ও শান্ত-চিত্ত-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মা ও অনাত্মার বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ সম্ভবপর। সাধক যখন জ্ঞানের দ্বারা আত্মার পরিচয় পাইবেন, অর্থাৎ শরীর হইতে পৃথক্ বলিয়া যখন নিজেকে বুঝিতে পারিবেন, তখনই পরমাত্মাকে জানিবার ও পাইবার প্রকৃত অধিকার হইবে এবং তখনই পরমাত্মা শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির উদয় হইবে। প্রেমের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত যে মিলন, তাহাই চরম কথা।

শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারাই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। যিনি নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধচিত্তে ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিবেন এবং সকল সময়েই, চিত্ত ভগবানে একাগ্রভাবে সংলগ্ন করিয়া রাখিবেন, তিনি জ্ঞানযোগ ব্যতীতও ভক্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বোত্তম।

তেষাং জ্ঞানী নিত্য যুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাঁহারা পুণ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের ভজনা করেন। এই কৃতপুণ্য বা সুকৃতিশালী পুরুষেরা চারি প্রকার। আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে যে ভগবদ্ভজনা করে। জিজ্ঞাসু—আত্ম-জ্ঞানেচ্ছু। অর্থার্থী—ইহলোকে ও পরলোকে ভোগের সাধনভূত অর্থের জন্য লোভযুক্ত। জ্ঞানী—আত্মবিৎ। এই চারি প্রকারের ভজনাকারীর মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি একমাত্র শ্রীভগবানেই নিষ্ঠাযুক্ত—তাঁহার দেহাদিতে অভিমান না থাকায়, চিত্তের বিক্ষেপ নাই। ভগবান্ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও ভগবানের প্রিয়। এই চারিটি কারণে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ।

এইবার তত্ত্বের আলোচনা করা যাউক। মানুষ একটি জটিল ও বিমিশ্র বস্তু। ইহা দেহী ও

দেহের একত্র মিলন। দেহকে জানিতে হইবে। এই দেহতত্ত্বের বিচারে কোন কোন শাস্ত্র স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ,—এই ত্রিবিধ দেহের, আবার কোন কোন শাস্ত্র অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোষের উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষ যদি সাধনার দ্বারা নিজের কল্যাণ সাধন করিতে চায়, তাহা হইলে, এই দেহগুলির প্রত্যেকটিরই শুদ্ধি ও উন্নতিসাধন আবশ্যক। প্রত্যেক দেহকে নিজের বশে আনিতে হইবে। দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি ব্যতীত, আত্মার পূর্ণ বিকাশ হয় না। এই দেহসমূহের মধ্যে যদি কোনও একটা দেহের উন্নতি সাধন করা যায়, তাহা হইলেও, পূর্ণ সিদ্ধি হইবে না। এখন এই দেহগুলির উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে? প্রথমেই স্থূলশরীর। সদাচার ও কর্ম্মযোগ দ্বারা এই স্থূল শরীরের শুদ্ধি ও উন্নতি হইয়া থাকে। অভ্যাসযোগ দ্বারা সূক্ষ্মদেহের কামাংশের বা ইন্দ্রিয়াংশের অর্থাৎ মনোময় কোষ বা বিষয়াসক্ত মন ও চিত্তের শুদ্ধি ও উন্নতি হয়। জ্ঞানযোগ দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ বা বুদ্ধির শুদ্ধি ও উন্নতি হয়—জ্ঞানীর সমদৃষ্টি ও নিঃসঙ্গভাব সিদ্ধ হয়। জ্ঞানী সর্ব্বভূতের হিতসাধনে আপনাকে সমর্পণ করেন, তাহার ফলে কারণ-শরীর বা আনন্দময় কোষের উন্নতি হয়। ইহার পর সাধকের দৈবীপ্রকৃতি লাভ হয়—ইহা ভক্তি ব্যতীত আর অন্য কোন উপায়ে হয় না। এই দৈবীপ্রকৃতি লাভ না হইলে, মহেশ্বরকে যথার্থরূপে পাওয়া যায় না। অতএব ঈশ্বর-লাভের জন্য ভক্তি আবশ্যক। "ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান।"

এই ভক্তি প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তিলাভের জন্য, উপাসক যুগল মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীসীতারাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীগৌরীশঙ্কর প্রভৃতি যুগলতত্ত্বের উপাসনায় সীতা, রাধা, লক্ষ্মী, গৌরী প্রভৃতি দৈবীপ্রকৃতি অর্থাৎ উপাস্য পরমেশ্বরের গায়ত্রী শক্তি। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত, কোনরূপ সাধন দ্বারা প্রেমভক্তি লাভ হয় না। পরমেশ্বরের কৃপালাভের জন্য এই দৈবীপ্রকৃতির বা গায়ত্রীর উপাসনা একান্তরূপে আবশ্যক। এই দৈবীপ্রকৃতিকে গায়ত্রী, চিৎশক্তি, পরমাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, উমা, হৈমবতী প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

আচরণ শুদ্ধ হওয়া চাই, মন নির্ম্মল রাখা চাই। নিঃস্বার্থভাবে সকলের সহিত সমভাব হইয়া, দয়া ও প্রেমের অনুশীলন করিতে হইবে—আর উপাস্য পরমেশ্বরে প্রেমভক্তিসম্পন্ন হইয়া পরমেশ্বরের জন্য পরোপকারব্রত গ্রহণপূর্ব্বক, নিজের সর্ব্বস্ব প্রসন্নচিত্তে তাঁহার ও তাঁহার জগতের সেবায় সমর্পণ করিতে হইবে। ইহাই সাধনার মুখ্য অঙ্গ। প্রেমভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ এবং উহাই প্রয়োজন। প্রেমভক্তির জন্য যুগল-উপাসনাই স্বাভাবিক—কিন্তু যদি অন্যান্য অঙ্গের সাধন উপেক্ষা করিয়া আমরা যুগল-উপাসনা করি, তাহা হইলে, সত্য করিয়া যুগল-উপাসনা হইবে না।

দান ও পরোপকার একই কথা। দানের মধ্যে বিদ্যাদান ও ব্রহ্মদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে সদাচার, জ্ঞান ও ভক্তির প্রবর্ত্তনের নাম ব্রহ্মদান। সদাচার, জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা মানুষ তাপত্রয়

হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। ব্রহ্মানন্দ-লাভ ব্যতীত, দুঃখত্রয়ের অত্যন্তাভাব হয় না। সুতরাং মানুষ যাহাতে ঈশ্বরমুখীন হয় এবং সদাচার, সত্য, দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি লাভ করে, সে জন্য যিনি চেষ্টা করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও পরোপকারী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মানুষের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বিদ্যা না থাকিলে, সত্য ধর্ম্ম বুঝিয়া লওয়া ও তাহার অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। অসংখ্য ছল-ধর্ম্মে দেশ ছাইয়া গিয়াছে—অতএব বিস্তার প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষ, যাহাতে চিন্তাপূর্ব্বক ও বিচারপূর্ব্বক পারমার্থিক জীবনের সাধন-রহস্য বুঝিয়া লইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন। নতুবা এই কলিযুগে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা।

অতএব মানুষকে বিদ্যাদান করিতে হইবে। কিন্তু বিদ্যালাভের অন্তরায় আছে। দেহ রুগ্ন ও অপটু, মানুষ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট ও বিব্রত। আত্মশক্তির উপর মানুষ বিশ্বাস হারাইয়াছে; সুতরাং মানুষকে এই আত্মশক্তির সুস্পষ্ট বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার দেহ যাহাতে সুস্থ হয় ও সুস্থ অবস্থায় থাকে, ইন্দ্রিয়গুলি যাহাতে সবল ও সক্ষম অবস্থায় থাকে, মন যাহাতে বিচারপূর্ব্বক সত্য গ্রহণ করিতে পারে, বুদ্ধি যাহাতে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইহাই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মের আদর্শ যুগল-উপাসনা—এই পূর্ণাঙ্গ-ধর্ম্মের শেষ সীমা।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত

স্বরূপ নির্ণয়

সমালোচনা করিতে হইলে, যাহার সমালোচনা করিতে হইবে, সমালোচককে তাহার নিকট যাইতে হইবে। সমালোচক যদি ইচ্ছা করেন যে, সমালোচ্য বস্তু বা ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসুক, তাহা হইলে সে সমালোচনা ভ্রান্ত হইবে। অক্ষয়কুমার দত্ত কি ছিলেন না, কি হইলেই বা ভাল হইত, সে আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু তিনি কি ছিলেন, এবং যাহা ছিলেন, কেনই বা তাহা হইয়াছিলেন—এ আলোচনা আদৌ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

অক্ষয়কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা ষোল আনাই ছিলেন। তবে পাশ্চাত্য দেশের অনেক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁহার যে সমুদয় প্রভেদ, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজের লোক বলিয়াই, তাঁহার ভিতর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কি, একথা

বুঝাইয়া বলা বড়ই কঠিন। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকতার আবির্ভাবের অল্পদিন পরেই, ইউরোপ হইতে এমন অনেক আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহা দেখিতে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক কি না সন্দেহ। অন্ততঃপক্ষে, বৈজ্ঞানিকতায় উন্নত ইউরোপে বা মার্কিনে, সেই সব চিন্তা-পদ্ধতি যদিই বা বৈজ্ঞানিক হয়, আমাদের দেশে তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপে আমরা প্রেততত্ত্ববাদ (spiritualism) এবং নব্য-ব্রহ্মবিদ্যার (Theosophy) নাম করিতে পারি।

এই দুই প্রকারের চিন্তা-পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিকতায় অভ্যস্ত ও সংস্কারমুক্ত এবং স্বাধীন চিন্তার পথে বীরের ন্যায় অগ্রসর ইউরোপবাসীর নিকট বৈজ্ঞানিক হইলেও, আমাদের দেশের ঐ চিন্তা পদ্ধতি বা আন্দোলন, বৈজ্ঞানিকতার বিরুদ্ধতা করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে, বিদেশ হইতে mysticism বা ভাবুকতার তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের চিন্তার মধ্যে অনেক সময় একটা অস্পষ্টতা ও জড়তা আসিয়াছে। ইহা ও বৈজ্ঞানিকতার বিরোধী। স্পষ্টভাবে চিন্তা করিব, সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিব, প্রত্যেক বিষয় ও ব্যাপারকে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব, কোথাও ভয় পাইব না—ইহাই বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ। অক্ষয়কুমারের চরিত্রে এই লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমারের উদ্ভবের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে সুদীর্ঘকাল আমরা ইউরোপের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছি। ইউরোপের বিদ্যায় আমাদের মস্তিষ্ক স্ফীত হইয়াছে, মুখের জোর অর্থাৎ তর্ক করিবার ও বক্তৃতা করিবার শক্তি খুব বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু হস্তপদ ও বক্ষ ক্রমশঃ তুলনায় দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। বহুদিন পর দেশে কথা উঠিল—এ শিক্ষায় আমাদের উপকার নাই, ইহা আমাদের অপকার করিয়াছে—আমাদের শিল্প-শিক্ষা চাই, বিজ্ঞান-শিক্ষা চাই। এই আন্দোলন আজও চলিতেছে।

শিল্প ও বিজ্ঞান-শিক্ষা সার্ব্বজনীন শিক্ষা। কাব্য ও দর্শনের উচ্চশিক্ষা উচ্চাধিকারীর শিক্ষা। এই সিদ্ধান্ত যে আধুনিক যুগের সিদ্ধান্ত, তাহা নহে—প্রাচীন ভারতেও শিক্ষা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত ছিল। অকর্ম্মণ্য মানুষ, বড় বড় শেখা-কথা না বুঝিয়াই আবৃত্তি করে—মনে করে, কাব্যরস আস্বাদন করিতেছি, অথবা দার্শনিক বিচার করিতেছি। কাব্য ও দর্শন, অধিকারী পুরুষের নিকট উচ্চতম ও পবিত্রতম বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাবলম্বনহীন স্বাধীন চিন্তায় অনভ্যস্ত অলস ব্যক্তির পক্ষে ইহা একটি দুঃস্বপ্ন মাত্র। সুতরাং বৈজ্ঞানিকতায় অনভ্যস্ত স্বাবলম্বনহীন কোন জাতিকে অতিমাত্রায় কাব্যচর্চ্চায় অভ্যস্ত করা, তাহাকে মৃত্যুমুখে পরিচালনা করা একই কথা।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, কি পদ্ধতিতে দেশের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করিতে হইবে, তাহার

ব্যবস্থা-পত্র দিয়া গিয়াছেন—সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু আজ সে কথা খুব ভাল করিয়া আলোচনা করা দরকার। তিনি প্রথমে ভাষা শিক্ষা ও লিপি অভ্যাসের কথা বলিয়াছেন; তাহার পর ক্রমে ক্রমে—পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত, তাহার পর ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, রসায়ন, শরীর স্থান ও শরীর-বিধান, তৎপরে পদার্থবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, লোক-যাত্রা-বিধান, মনোবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, পরমার্থ বিদ্যা, সাহিত্য, তাহার পর চিত্র-বিদ্যাদি ও শিল্প-বিদ্যা। তাঁহার সঙ্কলিত তালিকায়, 'সাহিত্য' দ্বাদশ স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাব্যরস আস্বাদন করিবার পূর্ব্বে, যদি জীর্ণ করিবার শক্তি না জন্মায়, তাহা হইলে অজীর্ণতার বাষ্পোদ্গম নামক ব্যাধি (Intellectual Tox[illegible]) জন্মাইবে। আমাদের দেশে তাহা জন্মাইয়াছে কি না, সুধিবৃন্দ তাহা চিন্তা করিবেন। আর যদি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সুতীব্র জীবন-সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের যুগে, বৈজ্ঞানিকতাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া অপরিমিত কাব্যদর্শনের সেবা এবং তাহার ফলে মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিসমূহের প্রকৃত ভারকেন্দ্রের অভাব, ইহার হেতু কি না, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

আমাদের সাহিত্যালোচনায় অক্ষয়কুমারের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং তাঁহার সাধন ও ধারা যথাযথ রক্ষিত হয় নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে বৈজ্ঞানিকতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন শিক্ষা-পদ্ধতি তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আমরাও বুঝিয়াছি, বৈজ্ঞানিকতার পথে অগ্রসর না হইলে, আমাদের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। সুতরাং অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারার পুনরুত্থান অসম্ভব নহে।*

শ্রীশিবরতন মিত্র।

---

* 'নব ভারত'—(ভাদ্র ১৩৩০) হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শিক্ষা-সমস্যা

শিক্ষা ও শিক্ষাবিস্তার,—কি শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব এবং কাহাকে কতদূর শিখাইব, এই সমস্যা, সকল দেশেই সকলের চেয়ে বড় সমস্যা। দেশের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে হইবে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ঠিক্‌মত লেখাপড়া শিখাইতে হইলে ও মানুষ করিতে হইলে তাহাদের বাপ মা-দেরও অনেক নূতন নূতন জিনিস শিখাইয়া তাহাদিগকেও গড়িয়া তুলিতে হইবে। লেখা-পড়া শেখানো তত কঠিন ব্যাপার নহে, কিন্তু মানুষ করা খুবই কঠিন। "মানুষ করা" এই কথাটার অর্থ লইয়াই গোলোযোগ ও মতভেদ, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত চিরকালই আছে। বিস্তৃতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে অনেক লোককে একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে; কাজেই "মানুষ করা" এই ব্যাপারটার চরম অর্থ লইয়া মতভেদ থাকিলেও একটা মোটামুটি ও কার্য্যকরী অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

শিক্ষার সমস্যা যে কত বড় সমস্যা একটিমাত্র ঘটনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। গত মহাযুদ্ধ যে সময়ে বেশ সজোরে চলিতেছে, ইংলণ্ড একেবারে বিব্রত ও বিপন্ন, কখন কি হয়, কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তখনও ইংলণ্ডে শিক্ষা-সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছিল এবং সেই আন্দোলনের ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি নূতন আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। সেই আইনের দ্বারা শিক্ষাদানের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শিক্ষা-সমস্যা কত দরকারী, জাতীয় জীবনের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যবস্থা, এই আন্দোলন ও আইন-পাশ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

আমাদের দেশেও ভাললোকমাত্রেরই মনে শিক্ষা-সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেকে অনেক প্রকারের কথা বলিতেছেন, এবং অনেকে অনেক প্রকারের কাজও করিতেছেন। এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা, কেবল একদিনে নহে, কখনই হইবে না। কিন্তু সমস্যাটি কি, তাহা বুঝিয়া তাহার মীমাংসার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করা খুবই দরকার হইয়া পড়িয়াছে। কেবল যে কয়েক-জন বিশেষজ্ঞ এই কার্য্য করিবেন তাহা নহে, প্রত্যেক পিতামাতা এ বিষয়ে চিন্তা করিতে ও সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। শিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকার সময় নাই। যে সমাজে চিন্তাশীল ও কর্ম্মনিপুণ লোকেরা একতাবদ্ধ হইয়া নিজেদের বংশধরগণের শিক্ষালাভ-সম্বন্ধে চিন্তা করে না ও কোনরূপ ব্যবস্থা করে না, সে সমাজ অসভ্য

সমাজ এবং তাহার কোনরূপ মঙ্গলের আশা নাই। আজকালকার জীবন-সংগ্রামে সে সমাজের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অন্য কারণেও অতিশয় আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সরকার, শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় মন্ত্রী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সভার হাতে কাগজে কলমে কিয়ৎপরিমাণে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পরে হয়ত শিক্ষা বিভাগের ষোল-আনা ভারই সত্য করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। তাহার পর, কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে 'জাতীয় শিক্ষা'র কথা উঠিয়াছে। সকলকেই ভাবিতে হইবে জাতীয় শিক্ষার অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, আর তাহা প্রবর্ত্তিত করিবার উপায় কি? 'শিক্ষা' ব্যাপারটাই বা কি, আর শিক্ষাদান-ব্যবস্থা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে উহাকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিলে সমগ্র ব্যাপারটা বেশ পরিস্কার করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মোটামুটি সকলদেশেই একরূপ। প্রত্যেক বালকবালিকাকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহার যাবতীয় সদ্বৃত্তি ও প্রয়োজনীয় শক্তি এমনভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহাকে পদে পদে উৎসাহিত করিয়া তাহার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি-সমূহের বিকাশ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্র বা ছাত্রী, সমাজের শক্তিশালী ও কৃতী সেবক হইয়া দেশের ও জগতের হিতসাধন করিতে পারে। সকল দেশেই শিক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য; প্রত্যেক নরনারীকে A good citizen, valuable to the Nation হইতে হইবে। প্রত্যেক দেশেই শিক্ষাদান-ব্যবস্থা, এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কতকগুলি শক্তি ও প্রবৃত্তির বীজ সঙ্গে লইয়া আসে। এই শক্তি ও প্রবৃত্তিবীজ যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে ও কার্য্যকরী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাকে সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে, যাহাতে তাহার যাবতীয় শক্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে। ইহারই নাম মানুষ করা। কেবলমাত্র কতকগুলি কথা মুখস্ত করাইয়া শিক্ষার্থীর মাথা বোঝাই করিয়া দিলেই শিক্ষা দেওয়া হইল না। কতকগুলি বিষয় মুখস্ত করিয়া রাখাকেই অনেকে শিক্ষালাভ করা বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিষয় মুখস্ত করা শক্তির অপব্যয়মাত্র। যে সকল বিষয় দরকারী, সেগুলি মুখস্ত করিতে হইবে, কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যাহা কোষগ্রন্থ বা অভিধানের সাহায্যে ব্যবহার করা যায়।

সদ্যুক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক বিষয় বুঝিবার যে ক্ষমতা, ইংরাজীতে তাহাকে Reason বলে— আমরা ইহাকে বুদ্ধি বলিতে পারি। এই বুদ্ধি স্পর্শমণির তুল্য। এই বুদ্ধির বিকাশই শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনে অনেক সমস্যা ও পরীক্ষাস্থল আছে, সুনিপুণভাবে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করিয়া

সেই সমুদায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। জীবনে নানা প্রকারের সঙ্কট আছে, সেই সঙ্কটের সময় নিজেকে উপযুক্তভাবে চালাইতে হইবে; সাহসের সহিত, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত সঙ্কটে বিজয়লাভ করিতে হইবে। জীবনের পথে চলিবার সময় কেবল ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া চলিলে হইবে না, বাহিরের ঘটনা ও অবস্থাকে নিজের প্রয়োজনমত গড়িয়া লইতে হইবে; এইগুলিই শিক্ষালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এইগুলি শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সাধারণ কথা। এইবার আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ কথা, যাহা ক্রমশঃ পৃথিবীর সকল দেশেরই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আলোচনা করিয়া বুঝিতেছেন, তাহা মনে রাখিতে হইবে। মানুষ কেবলমাত্র এই শরীর নহে। মানুষমাত্রেই নিত্য আত্মবস্তু বা জ্ঞানরূপ। প্রত্যেকেরই অতীতের বহু বহুকালের একটি ইতিহাস আছে, আবার প্রত্যেকেরই সম্মুখে বহু বহু যুগব্যাপী সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র আছে। আজ যে মানবশিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল, সে এই পৃথিবীর ঠিক্ একজন নবাগত আগন্তুক-মাত্র নহে, সে যে এই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে আসিল তাহা নহে। সে ইহার পূর্ব্বে আরও অনেকবার এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, এবং এই পৃথিবীর সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছে। যখনই একটি শিশু আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, সে যে শুধুহাতে আসে, তাহা নহে, সে পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতাসমূহকে সংস্কাররূপে লইয়া আসে। ইহার নাম জন্মান্তরীণ সংস্কার, এই সংস্কার-সমষ্টির জন্যই শিশুতে শিশুতে প্রভেদ। এই সংস্কারপুঞ্জের দ্বারা প্রত্যেক মানবের 'স্বধর্ম্ম' নির্দ্ধারিত হয়—এই সংস্কারপুঞ্জের সাহায্যে প্রত্যেক মানুষের অতীত ইতিহাস, তাহার ক্রমবিকাশের পথ ও প্রণালী, সে এখন অভিব্যক্তির কোন্ স্থানে রহিয়াছে, কোন্ পথেই বা সে বিকশিত হইবে, এই সমুদয় তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং কোনও শিশুকে প্রকৃত সুশিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষককে এবং পিতামাতা বা অভিভাবককে শিক্ষার্থী শিশু-সম্বন্ধে মোটামুটি এই কথাগুলি বুঝিতে হইবে বা ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

পৃথিবীর সকল দেশের লোক এই জন্মান্তরবাদ মানে না। তবে যত দিন যাইতেছে, অন্তর্জগতের কথা যতই নানা দিক্ দিয়া নানা প্রকারে আলোচিত হইতেছে, ততই অধিকসংখ্যক লোক এই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতেছে, কারণ জন্মান্তরবাদের সাহায্য ব্যতীত জীবনের অনেক সমস্যার মীমাংসা করা কঠিন হইয়া পড়ে। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা মানবে মানবে আজন্মসিদ্ধ প্রবৃত্তি রুচিগত ও সামর্থ্যগত প্রভেদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য পুরুষানুক্রমিকতা বা Heridityর দোহাই দিয়া থাকেন। তাঁহারাও বলেন যে মানবশিশু একেবারে শূন্য-হস্তে পৃথিবীতে আসে না, সে তাহার জাতির ও পূর্ব্বপুরুষগণের রুচি, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। অবশ্য জন্মান্তরবাদ সত্য, কি পুরুষানুক্রমিকতা সত্য, কিম্বা উভয়ই সত্য, এখানে সে বিচারের প্রয়োজন

নাই। শিশুকে প্রকৃত সুশিক্ষা দিবার জন্য যে-প্রথম কথাটি স্বীকার করা দরকার সে সম্বন্ধে কোন-রূপ মতভেদ নাই। উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে প্রত্যেক শিশু সমান নহে, মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, রুচি ও বিবিধ প্রকারের সামর্থ্য এক একটি শিশুর এক এক রকমের, আর যিনি শিক্ষক, তাঁহাকে প্রত্যেক শিশুর এই বিশিষ্টতা নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে।

আমরা প্রত্যেকেই এক একটি রাজ্যের লোক, আমরা প্রত্যেকেই এক একটি রাজশক্তির অধীন। এই রাজশক্তির নাম ষ্টেট্। প্রাচীনকালে এই রাজশক্তি বা শাসক-সম্প্রদায় নির্দ্ধারণ করিতেন তাঁহার রাজ্যের শিশুগণকে কি প্রকারে শিক্ষা দিলে, ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা রাজ্যের প্রকৃত উপকার হইবে। শিক্ষকগণ রাজশক্তি বা ষ্টেট্ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে শিক্ষাদান করিতেন। প্রাচীন-কালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই প্রকারের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রকারের ব্যবস্থা এখনও অনেক স্থানে চলি-তেছে। কিন্তু এখন ক্রমশঃ লোকে বুঝিতেছে, এই পদ্ধতি ঠিক্ সঙ্গত নহে। শিশুকে সুশিক্ষা দিতে হইলে সেই শিশুর স্বধর্ম্ম ও অধিকার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শিক্ষককে ধীরভাবে বুঝিতে হইবে, শিশু কি শিখিতে চাহে, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে কতদূর শিক্ষালাভ তাহার সামর্থ্যে কুলাইবে—তাহার পর দেখিতে হইবে শিশুর যে সমুদয় অক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার কতগুলি কতদূর পর্য্যন্ত দূর করিতে বা সারাইয়া দিতে পারা যায়। শিক্ষা-সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে ইহাই প্রথম ও প্রধান কথা। আমাদের দেশে আমরা জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের অন্তর্নিহিত রহস্য জানিয়া তাহার সাহায্যে প্রত্যেক শিশুর অধিকার ও স্বধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাকে শিক্ষাদান করিব। প্রতীচ্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে সমষ্টিগত পুরুষানুক্রমিকতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া (On the scientific basis of collective heridity) শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের সুবিপুল চেষ্টা হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমে ঠিক্ করিতে হইবে জাতিরূপে আমরা কি প্রকারের মানুষ চাই, যাহাকে শিক্ষাদান করিতেছি সে কি প্রকারের মানুষ হইলে আমাদের জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে পারিবারে বাস করিতে হইবে, সুতরাং প্রত্যেকেরই কতক-গুলি পারিবারিক কর্ত্তব্য আছে। প্রত্যেক মানুষকে সমাজে বা গ্রামে বাস করিতে হইবে, প্রত্যেকেরই সেই সমাজ বা গ্রামের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, তাহার পর প্রাদেশিক কর্ত্তব্য, তাহার পর দেশের প্রতি বা জাতির প্রতি কর্ত্তব্য। কিন্তু এইখানেই মানুষের কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। পৃথিবীতে অনেক জাতির বাস, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সম্বন্ধও আছে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জাতীয় কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তব্যও আছে। এতগুলি কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য এখনকার দিনে মানুষকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিশুই যে এই বিবিধপ্রকারের কর্ত্তব্যপালনে সমানরূপ উপযুক্ততা লাভ

করিবে তাহা নহে, শিশু যে অন্তর্নিহিত শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে, সেই শক্তির যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা এই কর্ত্তব্যসমূহ যতদুর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার সুবিধা ও সাহায্য প্রত্যেক শিশুকে দিতে হইবে। শিশু যে অবস্থায় আছে, তাহার সেই অবস্থা মানিয়া লইয়া তদনুসারে তাহাকে সুশিক্ষাদান করিতে হইবে। কেহ গরিব, কেহ ধনী, কেহ সমুজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন, কেহ বোকা, কেহ প্রতিভাশালী, কেহ অতি নিস্তেজ মস্তিষ্কবিশিষ্ট। শিক্ষককে বুঝিতে হইবে, তাহার কি আছে, এবং তাহার যাহা আছে তাহারই সম্যক্ সদ্ব্যবহার যাহাতে হয়, শিক্ষাদানকার্য্যে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষক ছাত্রের সামর্থ্য বুঝিবেন, রুচি বুঝিবেন, ছাত্রের স্বধর্ম্ম বুঝিবেন, এবং শিক্ষককেই সর্ব্বতোভাবে ছাত্রের উপযুক্ত হইতে হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইলে, ইহাই একালের প্রধান কথা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যেক ছাত্রের উপযোগী হইবে, ছাত্রকে জোর করিয়া কোনও যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষার উপযোগী করিতে চেষ্টা করিলে সে শিক্ষা নিস্ফল হইবে।

স্বদেশের মঙ্গলসাধনের যতদুর উপযুক্ত করা সম্ভব, ততদুর উপযুক্ত করিয়া প্রত্যেক শিশুকে গড়িয়া তোলাই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কোন দেশের শিক্ষাদান-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার সেই দেশের লোকের হস্তেই থাকা আবশ্যক। স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রীতি যাহার নাই সে নগণ্য মানুষ। প্রত্যেক মানুষ নিজের অধিকার অনুভব করিবে ও বুঝিয়া লইবে এবং সে যে দেশের অধিবাসী সেই দেশের প্রতি তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারিবে এবং যথাযথ প্রতিপালন করিবে। এই কারণেই কোন দেশের পক্ষে কি প্রকারের শিক্ষা প্রকৃতপ্রস্তাবে উপযোগী, তাহা সেই দেশের লোকেরাই নির্দ্ধারণ করিতে পারে। বিদেশের যে সব বিষয় আমাদের শিখিতে হইবে, তাহা শিখাইবার জন্য যদি দেশে ভাল লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য বিদেশ হইতে বিদেশী উপযুক্ত শিক্ষক আনিতে হইবে, তাহাতে আপত্তি নাই। আমাদের ফরাসী ভাষা শিখিতে হইবে, সেজন্য ফরাসী দেশ হইতে একজন অধ্যাপক লইয়া আসা হইল। আমাদিগকে যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিতে হইবে, সেজন্য আমেরিকা বা জার্ম্মানি হইতে একজন শিক্ষক আনা হইল, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার মূলভার, নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেশের লোকের হাতে থাকিবে এবং অধিকাংশ শিক্ষক দেশেরই লোক হইবে। আমরা যাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া জননায়ক, রাজনীতিবিৎ, ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবি, বা চিকিৎসক করিব তাহারা আমাদের দেশের প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হইবে এবং আমাদের দেশের জনসাধারণের কল্যাণসাধনের জন্য সেই বিদ্যা ব্যবহার করিবে। ইহাই সার কথা।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে দুই প্রকারের শিক্ষা-পদ্ধতি চলিতেছে, তাহার কোনটিকেই 'জাতীয়' বলা যায় না। সরকারী পদ্ধতিও জাতীয় নহে, খৃষ্টান্ পাদ্রিদের পদ্ধতিও জাতীয় পদ্ধতি

নহে। সরকারী ব্যবস্থা অবশ্য পাদ্রিদের ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল, কারণ সরকারী ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করে না। বিদ্যালয়ে কোন ধর্ম্মের শিক্ষা না হয়, সে একরকম ভাল, কিন্তু যে ধর্ম্ম বালকের বাড়ীর ধর্ম্ম নহে, এমন কি বালকের বাড়ীর ধর্ম্মের বিরোধী, বিদ্যালয়ে অপরিণত-বুদ্ধি বালক-বালিকাকে সে ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া বড়ই বিপদজনক। পাদ্রিসাহেবের বিদ্যালয়ে খৃষ্টানধর্ম্মের শিক্ষা পাইয়া হিন্দু মুসলমানের ছেলে যে খৃষ্টান হয় তাহা নহে, সে ধর্ম্ম-বিদ্বেষী হয়—তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিই অঙ্কুরে বাধা পাইয়া চাপা পড়িয়া যায়।

যাহা হউক জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে সচ্চিন্তা জাগ্রত হউক!

সহজিয়া

১

বৈষ্ণব সহজিয়াগন নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে তাঁহাদের গুরু-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা—আদিগুরু স্বরূপদামোদর, তাঁহার শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপের শিষ্য রঘুনাথ দাস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ দাস গোস্বামী, তাঁহার শিষ্য কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস। ইনিই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের রচয়িতা। কৃষ্ণদাসের শিষ্যের নাম মুকুন্দদেব। ইনি সিদ্ধ মুকুন্দদেব নামে খ্যাত। বলিতে গেলে এই মুকুন্দ-দেবই বৈষ্ণব সহজিয়া গানের আদিগুরু। বৈষ্ণব সহজিয়া মতের ইনিই সর্ব্বপ্রধান উপদেষ্টা এবং বোধ হয় ইঁহাকেই বৈষ্ণব সহজ মতের প্রবর্ত্তক বলিতে পারা যায়। কথিত আছে, কবিরাজ গোস্বামী যখন চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার লেখনী ধারণের ক্ষমতা ছিল না। এই মুকুন্দদেবই চরিতামৃত গ্রন্থের লিপিকার্য্য সমাধা করেন। স্বরূপ, শ্রীরূপ, দাস রঘুনাথ অথবা কবিরাজ গোস্বামী সহজধর্ম্ম সম্বন্ধে কি মত পোষণ করিতেন আমরা জানি না। তবে সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে যাহা বর্ণন করিতে পারেন নাই, সেই অতি গূঢ় সহজধর্ম্ম মুকুন্দদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। মুকুন্দদেবের শিষ্য-পরম্পরা ক্রমে তাহা পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মুকুন্দদেবের চারিজন শিষ্যের নাম, নৃসিংহানন্দ, রাধাচরণ, গোকুল বাউল ও মথুরানাথ। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সহজিয়াগণ শাখাভেদে এই চারিজনের একজনকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

২

একখানি পুরাণো পুঁথিতে এইরূপ লেখা আছে—

"সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল।
সহজ না জন্মিলে জন্ম অসার্থক হৈল॥
বস্তু প্রকাশিব আমি যেই যেই হয়।
শ্রীমুকুন্দ লেখাঞাছেন হঞা সদয়॥
কবিরাজ গোসাঞিকে যবে প্রভু আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থ বর্ণন কর তাঁহারে কহিল॥
গোসাঞি কহেন মুঞি করি নিবেদন।
মোর শক্তে গ্রন্থে না যায় বর্ণন॥
নিতাই কহেন তুমি ভরসা কর মনে।
চৈতন্য লেখাবে তোরে আসিঞা আপনে॥
তাঁহার আজ্ঞা লঞা কৈল গ্রন্থের চিন্তন।
যে লিখাইল নিতাই তাহা করিল লিখন॥
তার মধ্যে এক বস্তু পাল্য সার।
প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা হইল তাহার॥
তাহা লাগি সব তত্ত্ব করিল প্রচার।
নিষেধ করিল নিতাই না লিখিল আর॥
ভক্তিকল্পলতিকাতে দেখ বিচার কর‍্যা।
সহজ ভাঙ্গিতে প্রভু কলম নিল কাড়্যা॥
চৈতন্য-চরিতামৃতে সহজ সংক্ষেপে লিখিল।
জীবের ডরে গোসাঞি জিউ লিখিঞা ঢাকিল॥

* * * *

প্রেম রত্নাবলিতে সংক্ষেপে ভাঙ্গিতে।
অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে॥
দিবা রাত্রি বঞা গেল কিছুই না জানে।
আপনে নিতাই আসি কহিলা স্বপনে॥

দেখিঞা তাহার দশা আজ্ঞা কৈল তারে।
সহজ বস্তু পৃথক কর্যা করহ প্রচারে॥
তবে শ্রীরূপ ঠাঁই আজ্ঞা মাগি নিলা।
যেই বাঞ্ছা হয় লেখ তাঁরে আজ্ঞা দিলা॥
চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্ব স্বরূপ গোসাঞি জানে।
রঘুনাথে শিখাইলা করিঞা যতনে॥
সেই রঘুনাথ দাস তাঁরে কৃপা কৈলা।
কৃপা আজ্ঞা পাঞা গোসাঞি মুকুন্দে কহিলা॥
মুকুন্দদেব তবে গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা
সহজ বস্তু লিখিলেন নমস্কার করিঞা॥"

• এই পুঁথিখানির নাম নাই, কে রচয়িতা তাঁহারো কোনো পরিচয় নাই, একটি উপাখ্যানের সঙ্গে সহজ বর্ণনাই পুঁথিখানির উদ্দেশ্য। ৭ খানি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

মুকুন্দরাম দাস নামে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার "আদ্য সারস্বত কারিকা" "অমৃতাবলী" ও "ভৃঙ্গ রত্নাবলী" নামে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে ইঁহার রচিত কয়েকটি পদও পাওয়া গিয়াছে। মুকুন্দরাম দাসের "ভৃঙ্গরত্নাবলী" গ্রন্থে লিখিত আছে—

গোসাঞি মুকুন্দদেব কবিরাজ আশ্রয়।
তাঁর কৃপা হৈল যারে তিঁহ মহাশয়॥
দেখ দেখি মুকুন্দদেব রাজপুত্র ছিলা।
সকল ছাড়িয়া তিঁহ আশ্রয় হইলা॥
ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তিঁহ বৈরাগ্য লইলা।
তবে কৃষ্ণদাস তারে বহু কৃপা কৈলা॥
সেই মুকুন্দ গোসাঞি কৈলা গ্রন্থের বর্ণন।
সংস্কার গ্রন্থ কৈলা পটল নিরূপন॥
তথাহি গৌতম তন্ত্রে—
রসরাজঃ কবিরাজঃ কৃষ্ণদাস সুদুর্লভং।
শ্রীমুকুন্দদেব সিদ্ধানাং গ্রন্থকার স বর্ত্ততে॥

বলা বাহুল্য মুকুন্দরাম দাসের গ্রন্থাবলী সহজ-সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ, সুতরাং

সহজিয়াগণের অতি আদরের বস্তু। 'মুকুন্দরাম দাস বোধ হয় "গোসাঞি মুকুন্দদেবের" শিষ্য ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"আমার গুরুর গুরু কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত করিলা প্রকাশ॥"

"বৈষ্ণবামৃত" গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে কথা; এ বৈষ্ণবামৃত বোধ হয় এই মুকুন্দরাম দাসের কৃত। গ্রন্থশেষে ভনিতা আছে—"শ্রীকৃষ্ণ চরণে কহে এ মুকুন্দ দাস।"

৩

বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহির ঠাকুর বাড়ীর নাম বহু পরিচিত। মঙ্গলডিহির ঠাকুরগণের অনেক শিষ্য আছে। ইহাঁদের মূল পুরুষের নাম শ্রীপর্ণি গোপাল বা পানুয়া ঠাকুর। ইহাদের গুরু প্রণালী এইরূপ; সিদ্ধ মুকুন্দদেবের শিষ্য ঠাকুর সুন্দরানন্দ, সুন্দরানন্দের শিষ্য পানুয়াঠাকুর। ঠাকুর সুন্দরানন্দের শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রজের সুচন্দ্র রাখাল নাম ছিল, বৈষ্ণবগণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সহজিয়াগণের "নিগম" নামক একখানি গ্রন্থে এইরূপ প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায় "জন্ম কোথা? পিতা মাতার ঔরসে। কিসে জন্ম? দুগ্ধ সমুদ্রে। তার লক্ষণ কি? শোণিত শুক্র। পিতা কে? সুচন্দ্র গোপ। মাতা কে? বিদগ্ধা গোপী। তুমি কে? তস্য সুত। তোমার নাম কি? সুচন্দ্র সুত। বাস কোথা? ব্রজারণ্যে। কোন জাতি? বৈশ্য জাতি। তোমার করণ কি? মানসিক বিষয় কি? আহার, নিদ্রা, শৃঙ্গার। বয়স কি? নব কৈশোর।"

আহার নিদ্রা শৃঙ্গার এককথায় বুঝাইতে হইলে "সহজ" বলা হয়। প্রবাদ আছে পর্ণিগোপাল ঠাকুরের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি "নাদপুত্র" (দত্তক পুত্র?) রূপে পাঁচটি শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। ইহারা সকলেই "সুচন্দ্র সুত" বা সুন্দরানন্দের পরিবার-রূপে পরিচিত ছিলেন। এখনো ঠাকুরগণ সুন্দরানন্দের পরিবার বলিয়া পরিচয় দেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় —ভেকধারী আউল-বাউলগোছের সহজিয়া ভিন্ন অনেক গৃহস্থও সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মঙ্গলডিহিতে শ্রীশ্যামচাঁদ ও বলরাম প্রভু জিউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং ঠাকুরগণ সখ্যভাবের উপাসক। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ; ইহাঁদের বহু দৌহিত্র ফুলিয়া এবং খড়দহ মেলের কুলীন; তজ্জন্য ঠাকুরগণের সামাজিক সম্মানও যথেষ্ট।

৪

কিরূপে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, সহজের মূল কি, সহজ মতের আদি প্রবর্ত্তক কে,—

আমরা জানি না। তবে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধ জ্ঞান ও দোঁহা" হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে খৃঃ—দশম শতাব্দীতে সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ রাঢ়ে সহজধর্ম্ম প্রচার করেন। লুইপাদের শিষ্য—প্রশিষ্যগণের চেষ্টায়, এই ধর্ম্ম বহুলরূপে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ সহজ-ধর্ম্মের স্বরূপ—

"যাবন্নোপততি প্রভাস্বর ময়ঃ শীতাংশু ধারা দ্রবো
দেবী পদ্মদলোদরে সমরসীভূতো জিনানাং গনৈঃ
স্ফুর্জ্জদ্ বজ্র শিখাগ্রতঃ করুণয়া ভিন্নং জগৎ কারণং
গর্জ্জন্তী করুণা বলস্য সহজং জানীহি রূপং বিভোঃ।"

সহজ ধর্ম্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই, * * ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভাব ও নির্ব্বাণে কোনো প্রভেদ নাই। * * * আপনিও পরে ভ্রান্তি করিও না। দুইই এক; সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্ম্মল পরম পদ্মরূপ—চিত্ত স্বভাবতঃই শুদ্ধ।"

(বৌদ্ধগান ও দোঁহা)

৫

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াগণের সাধন প্রণালীর মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। নিগম গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

অতি সে নিগূঢ় হয় নিত্যের প্রসঙ্গ।
নিত্য শব্দে বস্তু কহে প্রেমের তরঙ্গ॥
তাহার স্বরূপ হয় স্বয়ং ভগবান।
তাহার দ্বিতীয় সম কেবা আছে আন॥
রসে বীজে এক মূর্ত্তি নাম তার কাম।
সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষক সর্ব্বানন্দ ধাম॥
* * * *
অনন্ত মূরতি হয় নাম তার কাম।
অপ্রাকৃত প্রাকৃত রূপে তার অবস্থান॥
অপ্রাকৃত তত্ত্ব শুন এই নিরূপন।
রসরাজ স্বরূপ যাতে করয়ে সৃজন॥
পঞ্চবাণ সন্ধান করি আছে যোগাসনে।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিল তিন বাণে॥

দুই বাণ রাখিলেন আপনার স্থানে।
নিত্যের নিকট হয় এই ত প্রমাণে ॥

চম্পক কলিকা গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

যখন আছিল সব ঘোর অন্ধকার।
চম্পক কলিকা নাম সূর্য্যের আকার ॥
নপুংসক মূর্ত্তি আপনে একেশ্বর।
রসবীজ মূর্ত্তি অঙ্গ লাবণ্য সুন্দর ॥
তাহার উপরে আছে গুপ্ত চন্দ্রগ্রাম।
সেইখানে আছে চম্পক কলিকা নাম

*   *   *   *

*   *   *   *

চম্পক কলিকা নাম চারি বেদের পর।
সেই শরীর হইতে হয় যুগল কিশোর ॥

সহজিয়াগণের পুঁথি প্রায়ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। বর্ত্তমান, অনুমান, নিত্য, চিত্রপট, চম্পক, কলিকা, রস, বীজ প্রভৃতি কথা সেই সমস্ত পুঁথির পারিভাষিক শব্দ,—এক একটি সঙ্কেত। পুঁথিতে এই শব্দ গুলির ব্যাখ্যাও আছে। মোটের উপর "রসে বীজে সাধন" সহজিয়া সাধনের প্রধান কথা। এই সঙ্কেতের সঙ্গে "যাবয় পততি" শ্লোকটির ব্যাখ্যায় কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। সহজিয়াগণ বলেন—"টলে বীজ অটলে ঈশ্বর। মাঝে মাঝে খেলা করে রসিক শেখর ॥" ইহার ব্যাখ্যা হয় না। পঙ্কমালা গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

"সহজ কাথে বলি? আহার নিদ্রা শৃঙ্গারকে বলি। থাকেন কোথায়? কৈশোরে। কৈশোর তিন অক্ষর থাকেন কোথা? না যৌবনে। যৌবন তিন অক্ষর থাকেন কোথা? স্বরূপে। স্বরূপ তিন অক্ষরের জন্ম কিসে? এক অক্ষর বংশীধ্বনি, এক অক্ষর চিত্রপট, এক অক্ষর হঠৎকার দুতিমুখে মিলন।"

আত্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

"ভাব্য কি? বর্ত্তমান। অদৃষ্টভাবনা, যাকে দেখি নাঞি তাকে কিরূপে ভাবিব? যাকে দেখিতে পাই তাকেই ভাবি।

যেরূপ নেত্রে দেখে। সেইরূপ হৃদয়ে থাকে ॥
বর্ত্তমান হৃদয়ে রয়। দুইরে বুঝ কিবা হয় ॥

বর্ত্তমান জানিব কিসে ? শ্রবণে দর্শনে লোভ। লোভ হয় কাথে? যে মন হরে। মন হরে কে? সহজ জানায় যে। প্রাপ্তি কি? সহজ বস্তু। সহজ বস্তু বল্‌তে কিসে? সহজ মানুষ পুষ্টি যাতে। সহজ মানুষ বর্ত্তমান। গূঢ়রূপ অবর্ত্তমান। গূঢ়রূপের স্থিতি কোথায়? বর্ত্তমানে। বর্ত্তমান কি? মানুষ। মানুষ কি। তিন। কি কি? যোনীসম্ভব, অযোনীসম্ভব, স্বতঃসিদ্ধ। যোনীসম্ভব বর্ত্তমান, অযোনীসম্ভব গোলকে, স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবৃন্দাবনে।

৬

সহজিয়াগণের সন্ধ্যাভাষার উদাহরণ দিই। উপনিষদের "দ্বা সপুর্ণায়" কথা এবং গীতার "উৰ্দ্ধমূল মধ্যঃশাখ" বৃক্ষটির বিষয় পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত নাই। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের "কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল। চঞ্চল চিয়ে পৈঠো কাল॥" পদটী অনেকেই অবগত আছেন। এইবার সহজিয়াগণের একটি গাথা ও একটি গীত শুনুন।

"উৰ্দ্ধমূল অধঃশাখ দেহ বৃক্ষ হয়।

* * * *

ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে দেখ আছে এক বৃক্ষ।
তাহাতে আছয়ে সব দেবের যে লক্ষ্য॥
তিন মুল চারি রস।
পাতা তার দশ॥
নয় কটী শত ছাল।
দুই ফল পাঁচ ডাল॥
তাথে থাকে দুটি পক্ষ।
একটি খায় আরটীর ভক্ষ্য॥
একটি ভাবে আরটা থাকে।
সুখ পায় তারা অমৃত ভক্ষ্যে॥
ভিন্ন হঞা চরে যবে।
জালে বন্দী হয় তবে॥
জালে বন্দী গাছে গাছে। শ্রীরাম বলেন ফিরি তায় পাছে পাছে।
জীবন লাগিয়া, আমি জীবনকে যাব।
জীবন পরষ করি জীবন হারাব॥

জীবনের সঙ্গে যদি না যায় জীবন।
তার সঙ্গে সঙ্গ করি তেজিব জীবন॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি এই রস গূঢ়।
বুঝয়ে রসিক জন না বুঝয়ে মূঢ়॥

এই গাথায় শ্রীরাম ও বিদ্যাপতির ভনিতাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। গানটিতে গোসাঞী আনন্দ চাঁদের ভনিতা আছে। অনেকেই বলেন ইনিই ক্ষ্যাপাচাঁদ বাউল নামে প্রসিদ্ধ। গানটী এইরূপ—

"গাছের নাম চম্পক কলি পাতার নাম তার হেম।
এক ডালে তার রসের কলি আর ডালে তার প্রেম॥
আকাশে শিকড় তার জমিন পানে ডাল।
ফল ছাড়া ফল তার পাতা ছাড়া ডাল॥
এক ডালে তিন ফুল ফুটিল কমল।
হরিনাম মহামন্ত্র কোন্ গাছের ফল॥
তেকোণা পৃথিবী তার এককোণে জল।
দেব আদি তিন লোক করে টল মল॥
গোঁসাঞি আনন্দচাঁদ বলে নিগুড় রসের কথা।
বর্ত্তমানে বস্তু আছে, খুঁজলে পাবি কোথা।"

এ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক, পরে বলিবার বাসনা রহিল।*

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

* ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

আলোচনা ও অনুশীলন

নূতন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত—

প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয় এখন মালদহে আছেন। তিনি মালদহের প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, এ বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতাও আছে। অনুসন্ধানের ফলে তিনি কয়েকটি নূতন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। গত ৭ই শ্রাবণ তারিখের "গৌড়দূত" পত্র হইতে সিদ্ধান্তগুলি উদ্ধৃত হইল, ঐতিহাসিকগণ ধীরভাবে আলোচনা করিবেন। মালদহ জেলা বাঙ্গালার ইতিহাসের যুগবিশেষের সূতিকাগৃহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(১) বক্তিয়ার খিলিজী লক্ষণ সেনের জীবনকাল মধ্যে গৌড়ে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন্ নাই।

(২) মালদহ থানার অন্তর্গত বর্ত্তমান নঘরিয়ার প্রাচীন নাম ছিল "নয়গড়" অথবা "নয়াগড়" উহা নয়পাল রাজার রাজ্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৩) পিসলি গঙ্গারামপুর পাল রাজগণের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল। পিসলি গঙ্গারামপুর ও বর্ত্তমান গৌড়ের মধ্যে সুপরিসর পদ্মা বা গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল। উহাই বর্ত্তমানে গোন্দয়াইলের বিল বলিয়া উক্ত হয়। বক্তিয়ার খিলিজি পালরাজগণের পতনের প্রায় দুইশত বৎসর পরে পিসলি গঙ্গারাম-পুর দখল করেন। সে সময় তথায় কোনও সৈন্য সামন্ত ছিল না।

(৪) বক্তিয়ার খিলিজীর নবদ্বীপ আক্রমণের বৃত্তান্ত সর্ব্বৈব মিথ্যা। বক্তিয়ার কদাচ নবদ্বীপ দখল করেন নাই। পিসলি গঙ্গারামপুরের সন্নিকটবর্ত্তী "দিয়ারে নৌ" বা "নৌ দিয়ার" নামক স্থান দখল করিয়াছিলেন,—উহাই আবুল ফজল কর্ত্তৃক নবদ্বীপ নামে সংজ্ঞাযুক্ত হইয়াছে।

(৫) বর্ত্তমান গৌড়ের পশ্চিম উত্তর কোণে অবস্থিত গড়বন্দি প্রাচীন গ্রাম "রামাভিটা চণ্ডিপুর" রামপালের রাজধানী "রামাবতী নগর।"

(৬) প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি এবং দাউদকররাণীর কর্ম্মচারী শ্রীহরি কদাচ এক ব্যক্তি নহেন। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য কোন বাদসাহী-সনন্দ লব্ধ নহে। প্রতাপ স্বশক্তিতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব ও ঈশ্বরবাদ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের "ব্রহ্মদর্শন" নামক পুস্তকের সমালোচনার শেষাংশে আমরা বলিয়াছিলাম—"বুদ্ধদেব ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেন কিছু বলেন নাই, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর"। এই অংশ পড়িয়া কেহ কেহ জানিতে চাহিয়াছেন সেই সিদ্ধান্ত কি? তাঁহারা সমালোচিত গ্রন্থখানি পড়িলেও পারিতেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিতেছি। ধর্ম্মশিক্ষার দুইটি বিভিন্ন প্রণালী হইতে পারে। প্রথম প্রণালীতে প্রথমেই ঈশ্বরকে মানিয়া লইতে বলা হয়, ইহাই প্রচলিত প্রণালী। মানবশিক্ষার অধিকাংশ প্রণালীই এইরূপ। বুদ্ধদেব আর এক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি "শিক্ষার্থীকে বলিলেন, চরিত্র নির্ম্মল কর, বাসনা প্রবৃত্তি দমন কর, জ্ঞান ও চিন্তা মার্জ্জিত কর। সম্ভবতঃ তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, হৃদয় নির্ম্মল হইলে আপনা হইতেই ব্রহ্মদর্শন হইবে; তখন আর তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে ঈশ্বর আছেন, বা ঈশ্বর মানিয়া লও। তখন আর চিন্তা বা কল্পনার স্থান থাকিবে না, তর্কযুক্তির প্রয়োজন হইবে না। অষ্টাঙ্গ সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত; প্রবৃত্তি দমন এবং বাসনা-নির্ব্বাণ হইলে সেই নির্ম্মলচিত্তে ঈশ্বর সত্ত্বা আপনিই প্রকাশিত হইবে। * * Creed of Buddha নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।"

গীতার ধর্ম্ম ও তাহার সাধন

["গীতার ধর্ম্ম ও তাহার অধিকার" সম্বন্ধে গতবারে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম:—গীতার প্রথম উপদেশ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হও। কিন্তু স্বধর্ম্ম-নির্দ্ধারণ কঠিন ব্যাপার। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই আমাদের সমাজ বিশেষরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে, প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভাঙ্গিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পুনর্গঠনের সনাতন উপকরণ-সমূহ নিজের জীবন ও উপদেশের দ্বারা ভারতবর্ষকে দিয়া গিয়াছেন। পুনর্গঠনের চেষ্টা গত পাঁচহাজার বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আজিও তাহার মীমাংসা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে মনে হইয়াছে, মীমাংসা বুঝি হইয়া গেল, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গিয়াছে, মীমাংসা হয় নাই। পুনর্গঠনের সমস্যা আজিও আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। কলিযুগ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। এযুগে প্রত্যেক নরনারীকে স্বাবলম্বী ও অন্তর্মুখী হইয়া নিজের স্বধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মবাদ, দেহতত্ত্ব ও লোকতত্ত্ব না বুঝিলে এবং অন্তর্মুখী চিন্তায় অভ্যস্ত না হইলে, কেহ যথার্থরূপে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে পারে না। স্বধর্ম্মাচরণ গীতার প্রথম ও প্রধান কথা। দ্বিতীয় কথা,—গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তি-সম্পন্ন হও। একথার প্রথম অর্থ,—জীবনে উন্নততর লক্ষ্য থাকা চাই, আর সেই লক্ষ্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হওয়া চাই। দ্বিতীয় অর্থ,—অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইয়া চলিতে হইবে, স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য শ্রদ্ধাহীন হইবে না। গীতার তৃতীয় কথা—পরিচর্য্যাশীল হও। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই সেবক, কেহই সেব্য নহে। পরমেশ্বর নিজে বিশ্বকল্যাণের ব্রত লইয়া, জগতের হিত কামনায় অনলসভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। জগৎ ও মানবজাতি অসত্য ও অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে মঙ্গলের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; পরমেশ্বর স্বয়ং এই সংগ্রামের সারথি ও পরিচালক; আমরা সকলেই তাঁহার সৈনিক। গীতার চতুর্থ কথা—শ্রীভগবানের প্রাকট্য বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝিতে হইলে তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও অনুভব-প্রণালী জানিতে হইবে। ঐতিহাসিকের কৃষ্ণ, পৌরাণিকের কৃষ্ণ, আর ভাবুকের কৃষ্ণ—ইতিহাস, লীলা, আর নিত্যলীলা—এই তিনটি ব্যাপার বুঝিতে হইবে। গীতার প্রথম কথা—স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, আর শেষ কথা—ঈশ্বর-নিষ্ঠা। এই দুই কথা, একই কথার দুইদিক্। ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। "ঈশ্বরের শরণাগত হও"—এই ঈশ্বর কোন গুরু বা পুরোহিতের ঈশ্বর নহেন, কোনও সম্প্রদায় বা তীর্থের ঈশ্বর নহেন—এই ঈশ্বর আমার ঈশ্বর—আমারই হৃদয় মধ্যে রহিয়াছেন। তাহার পর—তিনি সকলের ঈশ্বর।"]

১। তান্ত্রিক আচমন ও তত্ত্বত্রয়

তান্ত্রিক আচমনে, প্রথমে বলিতে হয়—"আত্মতত্ত্বায় স্বাহা," পরে বলিতে হয়—"বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা," তাহার পর বলিতে হয়—"শিবতত্ত্বায় স্বাহা"। অগ্নিদেবের স্ত্রীর নাম স্বাহা। অগ্নি হব্যবাহন। স্বাহা অগ্নির শক্তি। যত কিছু রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন, অগ্নির দ্বারাই হইয়া থাকে। আমি এখন যে অবস্থায় আছি, তাহা আমার স্বরূপ বা ঠিক্ অবস্থা নহে। যেমন আছি তেমন থাকিলে চলিবে না। আমাকে রূপান্তরিত হইতে হইবে, পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে। এইজন্যই ধর্ম্ম চাই, শিক্ষা চাই, অভ্যাস চাই, তপস্যা ও সাধনা চাই। সাধনার প্রারম্ভেই আত্মতত্ত্বের চিন্তা আবশ্যক। আমার স্বরূপ কি, আমি প্রকৃত প্রস্তাবে কি, তাহা মোটামুটি বুঝিয়া লইতে হইবে। সাধনার প্রারম্ভেই ইহা আবশ্যক। প্রথমেই আত্মতত্ত্ব—আত্মজ্ঞান। আমি কি, যখন সামান্যরূপে তাহা বুঝিব, তখন 'বিদ্যা' আমায় বুঝাইয়া দিবেন, কেন এবং কি প্রকারে আমি এমন হইলাম; এবং কি প্রকারেই বা আমি আমার স্বরূপে আবার ফিরিয়া যাইতে পারি। ইহাই "বিদ্যাতত্ত্ব"। কিন্তু আত্মতত্ত্বের নির্দ্ধারণ না হইলে, বিদ্যাতত্ত্বের কোনই প্রয়োজন নাই। "শিবতত্ত্ব" শেষ কথা।

প্রথমেই আত্মতত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতেও ঠিক্ তাই। প্রথমেই সাংখ্যযোগ। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। প্রাচীন টীকাকার যামুনমুনি গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

> অস্থানস্নেহকারুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মধিয়া কুলম্।
> পার্থং প্রপন্নমুদ্দিশ্য শাস্ত্রাবতরণং কৃতম্॥
> নিত্যাত্মা সঙ্গকর্ম্মেহাগোচরা সাঙ্খ্য যোগধীঃ।
> দ্বিতীয়ে স্থিতধী লক্ষ্যা প্রোক্তা তন্মোহশান্তয়ে॥

গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায়, অস্থানে অর্থাৎ যেখানে সঙ্গত নহে, সেইখানে স্নেহ ও কারুণ্য সম্পন্ন হওয়ায়, অর্জ্জুনের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। সেই অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া, শ্রীভগবান কর্ত্তৃক এই গীতাশাস্ত্রের অবতারণা।

মোহ দূর করিয়া অর্জ্জুনকে শান্ত করিবার জন্য আত্মার নিত্যত্ব, এবং নিষ্কাম কর্ম্মরূপ সাঙ্খ্যযোগ ও স্থিতধীর লক্ষণ, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি বিষয় আছে। প্রথম সাঙ্খ্যবুদ্ধি, দ্বিতীয় যোগবুদ্ধি বা নিষ্কামকর্ম্ম, আর তৃতীয় স্থিতধীর লক্ষণ।

২। সাংখ্যবুদ্ধি

সাঙ্খ্যবুদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯এর শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—

"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্জ্ঞানং, তস্যাং প্রকাশমান-মাত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যং, তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা। এবমভিহিতায়ামপি তব চেদা-ত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন ভবতি তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগেত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু, যয়া বুদ্ধ্যাযুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সৎপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষ-জ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি।"

উদ্ধৃত অংশে শ্রীধরস্বামী প্রথমেই বুঝাইয়াছেন—সাঙ্খ্য ও সাঙ্খ্যবুদ্ধি কি। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম সংখ্যা বা সম্যক্জ্ঞান। এই সম্যক্-জ্ঞানে যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহার নাম সাঙ্খ্য, সেই সাঙ্খ্যে যে বুদ্ধি করণীয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথমতঃ তাহাই বলিলেন। অর্জ্জুন বা অন্য কোন শ্রোতা এই আত্মতত্ত্ব শুনিয়া যদি তাহা যথার্থরূপে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই শ্রোতার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ। প্রথমে তাহার অন্তঃকরণের শুদ্ধি-সাধন আবশ্যক। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, এই আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারা যাইবে। কর্ম্ম-যোগের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। কর্ম্মযোগের বুদ্ধি এই, পরমেশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিতে হইবে। তাহা করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে এবং পরমেশ্বরের কৃপায় যে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিবে, তাহার দ্বারা কর্ম্মজাত বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—জ্ঞানযোগ বলার পর ভগবান্ সেই জ্ঞানের সাধন কর্ম্মযোগ বলিতেছেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতি মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিতেছেন—সকলেই বিদ্বান্ নহে। যেমন

বিদ্বান্ আছে, তেমনি অবিদ্বান্‌ও আছে। "বিদ্বদবিদ্বদবস্থাভেদেন জ্ঞানকর্ম্মোপদেশোপপত্তি"—বিদ্বানের জন্য জ্ঞানের উপদেশ, কিন্তু অবিদ্বান্ ব্যক্তি এই জ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবেনা, সেইজন্যই কর্ম্মের উপদেশ। কর্ম্মের উপদেশ যথাযথ পালন করিলে জ্ঞানলাভ হইবে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাঙ্খ্যযোগ ; এই কারণে মহর্ষি কপিলের যে সাঙ্খ্যদর্শন, সাধারণের মনে সেই সাঙ্খ্যদর্শনের কথা জাগিয়া উঠে। কিন্তু প্রাচীন টীকাকার বা ভাষ্যকারগণ কেহই এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে সাঙ্খ্যদর্শনের নামোল্লেখ করেন নাই। কোন কোন আচার্য্য সংখ্যা-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—উপনিষৎ, আর সাঙ্খ্য-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ঔপনিষদ পুরুষ'—অর্থাৎ উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পুরুষ। সেই পুরুষমাত্র বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। 'সাঙ্খ্য-বুদ্ধি' বলিলে, সেই জ্ঞান বুঝায়। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের টীকার ইহাই অভিপ্রায়। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানই, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শনের সহিত এই অংশের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম যে, প্রথমে আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা চরম ও পরম কথা, তাহাই কথিত হইয়াছে। এই অংশকে আমরা ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে পারি। তাহার পর ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বা যোগ। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়েই এই দুইটি বিভাগ আছে, এক অংশ ব্রহ্মবিদ্যা বা Science, আর এক অংশ যোগ বা Art। এক অংশে যাহা চরম সত্য তাহাই বর্ণিত হইতেছে, অপর অংশে সেই চরম সত্য কি প্রকারে আয়ত্ত করা যায়, তাহার সাধন বলা হইতেছে। এই দুইটি প্রধান বিভাগ, তাহা ছাড়া আর একটি বিভাগ আছে। আমি কি হইব বা আমাকে কি হইতে হইবে, আমার গম্য স্থান কি, তাহাও জানিতে হইবে, কেবল সামান্যভাবে জানা নহে, সর্ব্বদা দৃঢ়রূপে তাহা ধ্যান করিতে হইবে। এই কারণেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে 'স্থিতধী'র লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগকে 'স্থিতধী' হইতে হইবে—ইহাই আদর্শ। এই আদর্শের বা লক্ষ্যের দ্বারা আমাদের জীবন পরিচালিত হইবে।

৩। তান্ত্রিক গায়ত্রী

তন্ত্রে প্রত্যেক দেবতার গায়ত্রী আছে এবং দীক্ষিত ব্যক্তিকে নিজের ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। এই গায়ত্রীর প্রথম কথা—'বিদ্মহে', দ্বিতীয় কথা—'ধীমহি', আর তৃতীয় কথা—'প্রচোদয়াৎ'। প্রথমে জানা, পরে ধ্যান করা, তাহার পর পরিচালিত হওয়া। আচমনের তত্ত্ব যাহা প্রথমে বলা হইয়াছে, গায়ত্রীর তত্ত্ব ঠিক্ তাহাই। এই তন্ত্রের পদ্ধতি-অনুসারে গীতার আলোচনা করিলে, গীতার উপদেশ আমাদের জীবনে অতি অল্পদিনেই সফল হইবে। এই তিন অংশই জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। ভক্তির শেষ কথা আত্মনিবেদন এবং ভাবের দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

৪। গীতা ও সাংখ্যদর্শন

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশের সহিত সাঙ্খ্যদর্শনের কোনরূপ সম্বন্ধ যে প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে কেহই একেবারে অনুসন্ধান করেন নাই, তাহা নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় সাংখ্য-কারিকার প্রথম দুইটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সূত্র দুইটির অর্থ-বিচার করিলে সাংখ্যমত কি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সূত্র দুইটি এই—

> দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
> দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥১
> দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
> তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ ॥২

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক, এই তিন প্রকারের দুঃখের তাড়নায় মানুষ মাত্রেই পীড়িত—এই দুঃখত্রয় যাহাতে বিনষ্ট হয় সে জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এই তিন প্রকারের দুঃখ বিনাশ করিবার জন্য দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়-সমূহ রহিয়াছে। যেমন, শারীরিক দুঃখ বিনাশের জন্য ঔষধ রহিয়াছে, মানসিক দুঃখনাশের জন্য উত্তম খাওয়া পরা আমোদ-প্রমোদ রহিয়াছে, আধিভৌতিক দুঃখ নাশের জন্য মণি, মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি

রহিয়াছে। এ সকলের দ্বারা ও যদি দুঃখনাশ না হয়, তাহা হইলে আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদোক্ত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। বেদে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। সেই যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়। স্বর্গ সুখধাম, সেখানে দুঃখ নাই। সুতরাং বেদোক্ত যজ্ঞাদির দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু তাহা হইবে না। লৌকিক বা দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা রোগ, ক্ষুধা প্রভৃতির নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। কখন রোগ সারে, কখন সারে না। আবার কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য নিবৃত্তি হয়, কিন্তু চিরকালের জন্য হয় না। লৌকিক উপায়ে যে দোষ বা অভাব আছে, বৈদিক উপায়েও সেই সব দোষ ও অভাব আছে। বৈদিক যজ্ঞ করিতে হইলে প্রাণী হিংসা করিতে হয়, সুতরাং উহাতে হিংসা আছে, উহা বিশুদ্ধ নহে। পশুবধ করিলে পাপ হয়। আবার স্বর্গসুখ চিরস্থায়ী নহে। পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে আবার মর্ত্ত্যে আসিতে হয়, অতএব বৈদিক উপায়েও দুঃখত্রয়ের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। তাহা হইলে উপায় কি? সাংখ্যসূত্র বলিতেছেন—"ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" ব্যক্ত (কার্য্যজগৎ), অব্যক্ত (প্রকৃতি), জ্ঞ (পুরুষ, জ্ঞাতা),—এই তিনের যদি বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহা হইলে, দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত ও একান্ত বিনাশ হইতে পারে। ইহাই সাংখ্যদর্শনের অভিপ্রায়। সাংখ্যদর্শনে এই ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ সম্বন্ধে সমুদয় কথা, অর্থাৎ তাহার লক্ষণাদি বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতাতেও এ সমুদয় কথা আছে এবং স্বর্গ অনিত্য, আর যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি হয় না, এ সমুদয় কথাও আছে। কিন্তু এই সমুদয় কথা উপনিষদেও আছে। এই কারণে গীতার সাংখ্য-বুদ্ধি, উপনিষদ প্রতিপাদিত আত্মতত্ত্ব বা পরমার্থতত্ত্ব, এইরূপই মনে করা উচিত।

৫। অর্জ্জুনের বিশেষ অধিকার

গীতাশাস্ত্রের অধীকারী কে, সাধারণভাবে সে কথা বলা হইয়াছে। অর্জ্জুন গীতা-শাস্ত্র শ্রবণ করিলেন, সুতরাং অর্জ্জুন কি প্রকারে ইহা শুনিবার অধিকারী হইলেন, ইহাও আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাচীন টীকাকারগণ ইহা বেশ বিস্তারিতরূপেই আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক এবং ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রাচীন আচার্য্যগণ যাহা বলিয়াছেন, প্রথমেই তাহার আলোচনা করা যাউক।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥

অর্জ্জুন কৃপার দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছেন। এই কৃপা স্নেহ, দয়া নহে। পরের দুঃখ দূর করিবার প্রবল ইচ্ছার নাম দয়া। অর্জ্জুনের চিত্তে যে দয়ার উদয় হয় নাই, তাহা প্রাচীন টীকাকার নীলকণ্ঠ সপ্রমাণ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মনে আশঙ্কা হইতেছে, যদি আমরা পরাজিত হই, আবার মনে হইতেছে, যাহাদের বধ করিলে, আর বাঁচিবার ইচ্ছাই হয় না, তাহাদের সহিত বা তাহাদের লইয়া কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? এই সব ব্যাকুলতা-পূর্ণ সংশয় অর্জ্জুনের মনে জাগিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, অর্জ্জুন দয়ার দ্বারা আবিষ্ট হন নাই—তদপেক্ষা নিম্নতর বৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন। এই বৃত্তির নাম স্নেহ। অর্জ্জুনের চক্ষু দুইটি অশ্রুপরিপূর্ণ ও অত্যন্ত কাতর, তিনি বিষণ্ণ। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পশ্চাল্লিখিত কথা বলিলেন।

এই শ্লোকটির ভিতরের যে-সব কথা প্রাচীন আচার্য্যগণ আবিষ্কার করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন, সে গুলি আলোচ্য। আনন্দগিরি বলিতেছেন,—ভগবান্ উপেক্ষা করেন না। যদিও পরমেশ্বর অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্যে বা স্বধর্ম্মপালনে নিযুক্ত করিতেছেন, তথাপি অর্জ্জুন কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইয়াছেন, আর দারুণ শোকে অতিমাত্রায় মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, তথাপি ভগবান্ তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন না; সদুপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটি আনন্দগিরি বলিয়াছেন। ইহা হইতে আমাদের মনে গুরুরূপী পরমেশ্বরের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তার উদয় হওয়া আবশ্যক। যদি সেই সুচিন্তা আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত না হয়, তাহা হইলে আমরা গীতার উপদেশের দ্বারা উপকৃত হইতে পারিব না। সে সুচিন্তা এই—শ্রীভগবানের গুরুশক্তি সকল সময়েই জাগ্রত ও ক্রিয়ান্বিত; আমরা অহঙ্কারের হস্ত হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া যদি শান্তহৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হই, তাহা হইলে দারুণ শোক, মোহ এবং অতি ভীষণ সঙ্কট, সংশয় ও পরীক্ষার সময়, আমরা সেই বাণী শুনিতে পাই। ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ প্রকট হইয়া কার্য্য করিতেছেন, আর নিত্য কুরুক্ষেত্রে অপ্রকট নিত্যলীলায় তিনি বুদ্ধিরূপ সারথি (বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি) হইয়া

কার্য্য করিতেছেন। এই জন্যই গীতার প্রধান শিক্ষা—'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'—বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর। অতএব সকল সময়েই এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া জীবন-সংগ্রামে কর্ম্মরত হইতে হইবে,—ভগবান্ উপেক্ষা করেন না। আর, সকল সময়েই গুরুরূপী ভগবানের বাণী শুনিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে বাণী নিশ্চয়ই শুনিতে পাইব, কারণ তিনি উপেক্ষা করেন না। এই বাণী শুনিবার জন্য যাঁহার চেষ্টা নাই, গীতা পড়িয়া কতকগুলি কথা শিখিয়া তাঁহার উপকার হইবে না, অপকার হইবে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের ভিতর আর একটি রহস্য আছে—শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূল শ্লোকে একটি পদ আছে—"বিষীদন্তম্"। "অত্র বিষাদস্য কর্ম্মত্বেনার্জ্জুনস্য কর্তৃত্বেন চ তস্যাগন্তুকত্বং সূচিতম্।" এই পদটিতে 'বিষাদ' কর্ম্মকারক, আর অর্জ্জুন কর্তৃকারক, অতএব বিষাদ আগন্তুক। যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে গীতার রহস্য বিশ্লেষণ (psychological analysis) করিয়া, গীতার শিক্ষা নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করিয়া লাভবান্ হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই কথাটি বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুন বিষণ্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এই যে বিষাদ, ইহা আগন্তুক। অর্জ্জুনের স্থায়ীভাব নহে। অর্জ্জুন যে সকল সময়েই বিষাদে অভিভূত হইয়া নিতান্ত প্রাকৃতব্যক্তির ন্যায় মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন, তাহা নহে। এখন যে তাঁহার বিষাদ আসিয়াছে, ইহা একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র।

৬। মনের পাঁচ অবস্থা

যোগশাস্ত্রে মানব-মনের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। ইহার মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অধ্যাত্ম-সাধনা আরম্ভ হয়। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় এই সাধনা একেবারে অসম্ভব। অর্জ্জুনের মানসিক অবস্থা কিরূপ, তাহা চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে। বাহিরের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মনের উপর ক্রিয়া করিতেছে—মন সেই ক্রিয়ার ফলে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইতেছে। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন সুখ পায়, কখনও দুঃখ পায়। এই গেল এক অবস্থা। ইহা ছাড়া, আর এক রকমের অবস্থা আছে। সংসারে যাহা চলিতেছে, তাহারই সঙ্গে চলিতেছি; সকলেই যাহা বলিতেছে, তাহাই বলিতেছি, সকলেই যাহা করিতেছে তাহাই করিতেছি; মনের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। যাহাদের মনের অবস্থা এইরূপ, তাহাদের নিকট গীতার

উপদেশ একেবারেই নিষ্ফল। আর এক প্রকারের লোক আছেন, তাঁহাদেরও মনের উপর বাহিরের জগৎ ক্রিয়া করিতেছে, সেই ক্রিয়ার ফলে তাঁহাদের মনে নানারূপ পরিবর্ত্তনও হইতেছে; তাঁহারা সংসারের সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়াও আছেন, কিন্তু আত্মহারা নহেন। তাঁহারা ভোগের পথে সাধারণ মানুষের সহিত চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া যান, এবং নিজে যাহা করিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন বা আস্বাদন করিতেছেন, সেই সমুদয়ের তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করেন। তাঁহারা ভোগের মধ্যে বা গতানুগতিকের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন না। এই সমুদয় লোকের বুদ্ধির সারথি জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইঁহারা ভীরু নহেন। এই প্রকারের লোক অনেক সময়ে শোক, মোহ বা কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া পড়েন, কিন্তু এই অবস্থা তাঁহাদের সাময়িক বা আগন্তুক অবস্থা। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিতেছেন, অর্জ্জুন এই শ্রেণীর সাধক। এই কথাটি আমাদিগকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখিতে হইবে, এবং আমরা কিয়ৎপরিমাণে এই প্রকারের অবস্থায় আসিয়াছি কিনা, অন্তর্মুখী হইয়া সর্ব্বদাই তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

৭। কুড়িটি সদ্‌গুণ ও তাহার সাধন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নানাস্থানে যে সাধনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে পূর্ব্বের কথাগুলি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যিনি গীতা শাস্ত্রের দ্বারা উপকৃত হইতে চাহেন, এই শ্লোকগুলি আয়ত্ত করিয়া তাঁহার এই মুহূর্ত্ত হইতেই এই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥

এই শ্লোকগুলির ব্যখ্যা করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর যে ভূমিকা করিয়াছেন, তাহাই বলা **হইতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞের পরিজ্ঞানের দ্বারা** অমৃতত্ব লাভ হইবে, অর্থাৎ মানুষ তাহার জীবনের **চরম সার্থকতা** লাভ করিবে, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই জ্ঞানলাভ করিতে গেলে সাধন **চাই।** শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—নিম্নলিখিত সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন কর, তাহা হইলে সেই **জ্ঞান পাইবে।** এইবার এই সদ্‌গুণগুলির বিষয় আলোচনা করা যাউক। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের ব্যাখ্যা-অনুসারে ব্যখ্যা করিলে, এই শ্লোকগুলি আমরা সহজে বুঝিতে পারিব।

ক। অমানিত্ব—মানুষ নিজের প্রশংসা করে। যে গুণবান্ সেও নিজের প্রশংসা করে, যাহার কোন গুণ নাই, সেও নিজের প্রশংসা করিয়া বেড়ায়, ইহার নাম মানিত্ব। এই মানিত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই উপদেশ, একটি নিতান্ত সুপরিচিত নীতি-উপদেশ। আমরা বাল্যকাল হইতে এই উপদেশ পড়িয়া আসিতেছি, মুখস্থ করিয়া আসিতেছি ও প্রচার করিয়া আসিতেছি। গীতাও আজকাল অধিকাংশ ভদ্রলোকে মানেন, গীতার ধর্ম্ম যে যুগধর্ম্ম তাহা সকলে বলেন, গীতা পাঠও করেন অনেকে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই উপদেশ যে কত বড় ভয়ানক উপদেশ, তাহা কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহার ভিত্তিই বদ্‌লাইয়া যাইবে, যদি কতকগুলি লোক সত্য করিয়া এই উপদেশ প্রতিপালন করে। আর এই উপদেশ প্রতিপালন করেই বা কে? সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া কেবল বিজ্ঞাপন, নিজের প্রশংসা প্রচার করাইতে সকলেই ব্যস্ত। সমগ্র পৃথিবী এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা চলিতেছে। যাহার গুণ নাই, শক্তি নাই, সে বেচারা কি করিবে? কিন্তু গুণ আছে, শক্তি আছে, কাজ করিতেছেন, কিন্তু নিজেকে একেবারে গোপন করিয়া রাখেন, এ প্রকারের লোক কি আপনারা দেখিয়াছেন? তাহার পর এ প্রকারের লোক কি আপনারা কেহ চিনিতে পারেন? বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, এ প্রকারের লোক আছে বা থাকিতে পারে, ইহা আপনারা বিশ্বাস করিতে পারেন? খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া এই কথার উত্তর দিবেন।

দেশের কাজ করিতেছে বহু বহু লোক, সকলেই ত্যাগশীল কর্ম্মযোগী; দেশের জন্য, সত্যের জন্য, কতলোক কত কষ্ট স্বীকার করিতেছে। এই সব বাজার-চলতি কথায় হঠাৎ বিশ্বাস করিবেন না। যদি বিশ্বাস করেন, গীতা বুঝিতে পারিবেন না, বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভুল বুঝিবেন, বঞ্চিত হইবেন, বঞ্চক হইবেন। অতএব সাবধান! খবরের কাগজে খবর বাহির হইবে না, সস্তায় লোকের চোখে ধূলি দিয়া রাতারাতি হোম্‌রা চোম্‌রা একটা কিছু হইয়া নিজের সুবিধা করার আদৌ কোনরূপ সুবিধা নাই, এই প্রকারের ব্যবস্থা করুন, করিয়া দেখুন—কয়জন শক্তিশালী লোক সত্য সত্য দেশের জন্য, পরের জন্য পরিশ্রম করে। এইভাবে যাহারা কাজ করে, তাহারা ধর্ম্মপথের পথিক। তাহারাই অমানিত্বের সাধন করিতেছে, তাহারা অমৃতত্ব লাভ করিবে। ইহারই নাম অধ্যাত্ম-সাধন, ইহাই গীতার উপদেশ, এখানে কোনরূপ ফাঁকি নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে 'সভ্যতা' বলি, তাহার মূলমন্ত্র ধাক্কাধাক্কি। ধাক্কা দিয়া অগ্রসর হও, তাহা হইলেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবে। ধাক্কা দিবার জন্য ঘৃণিত ও অসৎ উপায় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। মানুষ অনায়াসে সেই সমুদয় উপায় অবলম্বন করিতেছে। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় চলিতেছে কত? অতএব ভাবিয়া দেখিবেন, এই উপদেশের তাৎপর্য্য কি। আর, এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া সংসারে চলিতে আরম্ভ করিবেন। ইহাই যুগধর্ম্ম, ইহাই গীতার ধর্ম্ম।

খ। অদম্ভিত্ব—লাভ, পূজা ও খ্যাতির জন্য যে স্বধর্ম্ম-প্রকটীকরণ, তাহার নাম দম্ভিত্ব। মানুষ এই প্রত্যক্ষ সংসারকেই একমাত্র সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। দু-একটা ভাল কাজ করে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া নহে। কারণ যাহাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বলে, তাহা আজকালকার মানুষের প্রায় নাই বলিলেও হয়। সুতরাং হিসাব করিয়া, লোক দেখাইয়া, ঢাক বাজাইয়া, দু একটা ভাল কাজ করিয়াই লোকে কতকগুলি চেলা ভাড়া করে। চেলারা চারিদিকে প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার করে —তাহাতে লাভ আছে,সম্মান আছে। বোকা লোককে ঠকাইয়া অনেক প্রকারের সুবিধা করিতে পারা যায়। ইহাতে দলপতিরও সুবিধা, চেলাদেরও সুবিধা। ইহাই চলিতেছে, সুতরাং গীতার ধর্ম্ম প্রচার করিবার ক্ষেত্র কোথায়? গীতার ব্যাখ্যার বই লিখিলাম, খুব বড় বই, অনেক দাম। বই কিনিবে কে! পড়িবে না কেহই, পড়িলে উপকারও হইবে না। কিন্তু কিনিবার লোকত চাই, চেলা

পাঠাইয়া সংসারের সুবিধাভোগী লোক যাহারা, তাহাদের শরণাগত হইলাম, নিজেও তাহাদের দলে মিশিলাম। ইহার নাম ধর্ম্ম নহে, ইহার নাম চালাকি। সরল নাস্তিকতা অপেক্ষা, ইহা সহস্রগুণে খারাপ। আমি যাহা করিব, ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিব। যাহা কর্ত্তব্য বা স্বধর্ম্ম বলিয়া বুঝিব, তাহা করিব। তোমরা তাহা জানিলে বা না জানিলে, তোমরা সংসারের দশজন ভাগ্যবান্ লোক, তোমরা সুখে আছ, সুখেই থাক—তোমাদের তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের তিরস্কার বা পুরস্কার একেবারে অলীক, তাহার কোনই মূল্য নাই। যিনি পুরস্কার-দাতা, তিনি আমার ভিতরে রহিয়াছেন, সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু সকল সময়েই নিমেষশূন্য। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াই ধন্য হইয়াছি। ইহারই নাম অদম্ভিত্ব। জীবনে অনুষ্ঠান না করিলে, এই গুণগুলি যে কি, তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না।

গ। অহিংসা—কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা যে প্রাণিপীড়ন, তাহার নাম হিংসা। এই হিংসা ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা দিনরাত্রি আমাদের কার্য্যের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও চিন্তার দ্বারা কত প্রকারে অপরকে কষ্ট দিতেছি, অপরের সর্ব্বনাশ করিতেছি, সংসারে অশান্তির দাবানল প্রজ্বালিত করিতেছি, তাহার হিসাবই বা রাখে কে, আর তাহা বুঝিতেই বা পারে কয়জন? চিন্তা যে কত বড় ভয়ানক জিনিস, তাহা এ কালের অধিকাংশ লোক একেবারেই জানে না। ক্রোধান্ধ হইয়া একজন লোক নরহত্যা করিল, অথবা লোভের দ্বারা চালিত হইয়া একটা গোটা জাতি, যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়া মানব জাতির সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, চারিদিকে পাপ ও দুর্দ্দশার বিষ ছড়াইয়া পড়িল। এত বড় একটা কাণ্ড যে ঘটিল, ইহা একদিনে ঘটে নাই। এত বড় একটা সর্ব্বনাশকর ব্যাপার যে হইল, তাহা কেবলমাত্র কয়েকজন লোকের চিন্তা বা চেষ্টার ফলে হয় নাই। আমি ভাবিতেছি, আমি সাধু। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে আমারও দায়িত্ব আছে। আমি মনে মনে ক্রোধ ও হিংসার ভাব পোষণ করি, প্রতিদিনই করি। হয়ত বাক্য বা কার্য্যের দ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু আমার এই চিন্তা, ইহারও যে ধ্বংস নাই; আমার চিন্তা অন্য দশজনের ঐ প্রকারের হিংসা ও ক্রোধময় চিন্তার সহিত ক্রমাগত মিশিতেছে। চিন্তা-জগৎ বলিয়া যে সত্যকার একটা জগৎ আছে—সেখানে আমাদের যাবতীয় অসৎ চিন্তা ও দুর্ব্বাসনা একত্রে মিলিত, অতি ভয়ানক প্রবল মূর্ত্তি ধারণ

করিতেছে। সেই জগতে প্রচণ্ড তরঙ্গ-সমূহ সর্ব্বদাই জাগিয়া উঠিতেছে। সূক্ষ্ম জগৎ হইতে আসিয়া সেই তরঙ্গ-সমূহ আমার স্থূল জগতে আঘাত করিতেছে। আমাদের স্থূল জগতের অবিকশিতবুদ্ধি নরনারী সেই আঘাতে আত্মহারা হইয়া নাচিতে নাচিতে অসৎ কার্য্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। আসুরিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন নেতৃগণ স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছে। এই প্রকারে জগতে প্রতিনিয়ত যে সকল অসৎ কার্য্য সাধিত হইতেছে তাহার প্রত্যেকটিতেই আমার দায়িত্ব রহিয়াছে—এবং আমাকে আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগও করিতে হইবে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, চিন্তা-সংযমন কত আবশ্যক। হিংসার প্রত্যুত্তরে মানুষ হিংসাই দিতেছে। ইহার ফলে জগতে সর্ব্বদাই অশান্তি ও দুঃখের আগুন জ্বলিতেছে, ইহার শেষ কোথায়? বাক্যের দ্বারা আমরা কিরূপ প্রাণীপীড়ন করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত মিথ্যা অপবাদই না আমরা রটনা করিতেছে! আমাদের মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া সহস্র প্রকারের মিথ্যা, সত্যকে তাড়াইয়া দিয়া জগতে রাজ্য বিস্তার করিতেছে। এই পুঞ্জীভূত মিথ্যার হস্তে কে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে?

ঘ। ক্ষান্তি—অন্য লোক অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে আমার চিত্ত বিকারের হেতু রহিয়াছে, কিন্তু সে অবস্থাতেও চিত্তের বিকার হইবে না—নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার অপরাধ সহ্য করিব। ইহারই নাম ক্ষান্তি। কেবলমাত্র বাহিরে সহ্য করিয়া যাওয়ারই নাম ক্ষান্তি নহে, চিত্তের নির্ব্বিকারতাই প্রধান কথা। ভীরু এবং দুর্ব্বল অপমানিত হইয়া সহ্য করে, যে লোভী সেও স্বার্থের জন্য সহস্র অপমান সহ্য করে, কিন্তু ইহা ক্ষান্তি নহে। চিত্তকে নির্ব্বিকার করিতে হইবে।

ঙ। আর্জ্জব—অকুটিলতা। যথা-হৃদয় ব্যবহরণ, পরপ্রতারণা রাহিত্য। হৃদয়ের ভাব চাপিয়া চলা, নিজেকে গোপণ করিয়া চলা, ইহাই বর্ত্তমান জগতের মূলমন্ত্র। অন্যকে যিনি যত ঠকাইতে পারিবেন, তিনিই তত বাহাদুর। এই শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। অধিকাংশ মানুষই তোষামোদ-জীবি। সুতরাং এই সদ্গুণের অনুশীলন করিতে হইলে এখনকার দিনে ভদ্রসমাজে বাস করাই কঠিন। আর ভদ্রসমাজে যদি কতকগুলি লোক এই উপদেশ অনুসারে চলা-ফেরা করে বা করিতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীই বদলাইয়া যাইবে। আমি জানি তুমি অত্যাচারী, পরপীড়ক ও দস্যু।

আমি জানি কেবল তুমি নও, তোমরা পুরুষানুক্রমে দস্যুতা করিতেছ। আমি ইহা জানি, অন্য সকলেও ইহা জানে। কিন্তু তুমি ধনী, অতএব আমরা সে কথা জানিয়াও চাপিয়া যাইব, দিনরাত্রি তোমার গুণগান করিব, তোমাকে সাধু বানাইব, তোমাকে দেবতা বানাইব, তোমার পূজা করিব। তোমার জীবনচরিত লিখিয়া তোমার গুণগান করিব। কারণ তুমি ধনী—তোমার নিকট আমার অর্থ-প্রাপ্তি আশা আছে। তুমি মূর্খ, চিরকালের বকেয়া মূর্খ—তুমি অন্য লোক দিয়া বই লেখাইয়া গ্রন্থকার হইয়াছ। আমার কাগজ আছে, আমি জানি, খুব ভাল করিয়াই জানি, তুমি মূর্খ, অথচ তোমার গুণগান করিয়া সর্ব্বসাধারণকে মিথ্যার অন্ধকারে পরিচালিত করিব, কারণ তোমার অর্থ আছে, আমারও কিছু পাইবার সম্ভাবনা আছে। আমি একা তোমার গুণগান করিব না, দল বাঁধিয়া তোমাকে অভিনন্দন দিব, তোমাকে মাথায় করিয়া নাচিব—সকলেই জানে তুমি দেশদ্রোহী, কিন্তু আমরা দল বাঁধিয়া পেটের দায়ে তোমাকে দেশহিতৈষী বানাইব। অতএব 'আর্জ্জব' কোথায়? ব্যক্তির জীবনেই বা কোথায় আর জাতির জীবনেই বা কোথায়? চাকুরী করিয়া খাইতে হয়, মুনিবের মন যোগাইতে হয়। মুনিব সাধুপুরুষও নহেন, আর নিত্যই নূতন নূতন মুনিব। এক একজনের এক এক ভাব। সুতরাং আর্জ্জবের সাধনা কি প্রকারে হইবে?

গীতায় উল্লিখিত ও উপদিষ্ট সদ্‌গুণগুলির প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বহু কথাই বলিতে পারা যায়; এবং বর্ত্তমান সময়ে এই সমুদয় কথা নির্ভয়ে বলাই প্রয়োজন—কিন্তু আমরা সমুদয় কথা না বলিয়া কেবলমাত্র কয়েকটি প্রধান প্রধান কথা বলিতেছি। আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সকলের মনে চিন্তার উদ্রেক হউক। কোথায় গীতার শিক্ষা আর কোথায় এখনকার সভ্যজগৎ ও সভ্যসমাজ, তাহা লোকে বুঝিতে আরম্ভ করুক মিথ্যা ধর্ম্মে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। সকলেই গীতার দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় একটা মিথ্যা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বিষয়ী ও সুবিধাভোগী লোকের তোষামোদ মাত্রই করা হইয়া থাকে। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক।

চ। আচার্য্যোপাসনং—এখানে মোক্ষসাধনের উপদেষ্টার কথা বলা হয় নাই; মনু যে উপনীয় অধ্যাপকের কথা বলিয়াছেন—সেই অধ্যাপককেই এখানে আচার্য্য বলা হইয়াছে। সেই অধ্যাপকের শুশ্রূষা করিতে হইবে, নমস্কারাদি প্রয়োগের দ্বারা তাঁহার

সেবা করিতে হইবে। ইহা কি বর্ত্তমান সময়ে সম্ভব? অর্থলোলুপ, চরিত্রহীন, বেতনভুক্ শিক্ষক, আর মিথ্যাকথার বেশাতি করিবার ছাত্র তাহাকে পয়সা দিয়া ভাড়া করিয়া তাহার নিকট কতকগুলি ফন্দি শিখিতে আসিয়াছে। এখানে কে কাহাকে ভক্তি করিবে?

ছ। শৌচং—বাহিরে শরীরের মল, মাটি ও জল দিয়া ক্ষালন করিতে হইবে, ভিতরে মনের মল, বিষয়ের দোষ দর্শনরূপ প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা ক্ষালন করিতে হইবে। ইহারই নাম শৌচ।

শৌচ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কেবল একটি কথা বিশেষরূপে বলা আবশ্যক। আমরা অন্যদেশের লোকের অনুকরণ করিয়া এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বদা জুতা, মোজা ও জামা ব্যবহার করি। শরীরের ময়লা এই সকল ব্যবহৃত জিনিসে সর্ব্বদাই জমিতেছে, এগুলিকে নিয়মিতভাবে পরিস্কার রাখিবার সামর্থ্য আমাদের অধিকাংশ লোকেরই নাই, সুতরাং আমাদের এ বিড়ম্বনা কেন?

জ। স্থৈর্য্য—মানুষ যখন মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইবে বা উন্নততর জীবন-পথের পথিক হইবে, তখন শত শত বিঘ্ন আসিয়া মানুষকে আক্রমণ করিবে। সর্ব্বদাই নূতন নূতন রকমের আক্রমণ হইবে। এই সমুদয় স্থিরভাবে সহ্য করিতে হইবে। যে গুণগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই গুণগুলির সাধনে প্রবৃত্ত হইলে যত প্রকারের বিঘ্ন ও অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং স্থৈর্য্যের আবশ্যক। শত সহস্র বিঘ্ন আসিলেও, মোক্ষসাধনের চেস্টা পরিত্যাগ করিব না। যতই বিঘ্ন আসিবে ততই অধিক পরিমাণে যত্ন করিব। ইহারই নাম স্থৈর্য্য।

ঝ। আত্মবিনিগ্রহ—দেহ ও ইন্দ্রিয় সংঘাত-নিবন্ধন আমার এমনই অবস্থা হইয়াছে যে আমার মধ্যে স্বভাবতঃই মোক্ষের প্রতিকূল প্রবৃত্তি সমূহ জাগরিত হইতেছে। সেই প্রবৃত্তি সমূহকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদা অনলসভাবে চেস্টা করিতে হইবে, ইহারই নাম আত্মবিনিগ্রহ। সকল সময়েই মনের উপর খুব কড়া পাহারা দেওয়া আবশ্যক, সামান্য মাত্র অসতর্ক হইলেই সর্ব্বনাশ।

ঞ। ইন্দ্রিয়ার্থসমূহে বৈরাগ্য—ইহলোকে এবং পরলোকে শব্দস্পর্শ প্রভৃতি যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় আছে, তৎসমুদয়ে অনাসক্তিময়ী চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে।

ট। অনহঙ্কার—অহঙ্কার পরিত্যাগ বড়ই কঠিন। আমি আত্মশ্লাঘা ছাড়িয়া দিলাম—তখন আমার মনে হইবে আমি যখন আত্মশ্লাঘা ছাড়িয়াছি, তখন আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট,—আমার ন্যায় ভাল লোক আর নাই। এই প্রকারে গর্ব্ব আবার ফিরিয়া আসিবে। এই গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ঠ। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি আমাদের সকলেরই নিত্যসঙ্গী। এগুলি আমাদের সকলেরই অদৃষ্টে ঘটিবে। ইহাদের হস্তে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। এই সকলের মধ্যে যে দুঃখ রহিয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাহা চিন্তা করিতে হইবে। এই দুঃখ সর্ব্বদা চিন্তা করিলে বিষয় সমূহে স্বভাবতঃই বৈরাগ্য জন্মিবে এবং আত্মদর্শনের সাহায্য হইবে।

ড-ঢ। পুত্র, স্ত্রী, গৃহ, ভৃত্য প্রভৃতি, যাবতীয় স্নেহবিষয়ে অসক্তি ও অনভিষঙ্গ। এই জিনিষটি আমার, এই জিনিসে আমার প্রীতি, ইহার নাম সক্তি। এই সক্তি-ত্যাগের নাম অসক্তি। আমি এই' 'আমি আর কিছু নয়' এই প্রকারে কোন বিষয়ে যখন খুব বেশী রকমের প্রীতি হয়, তখন সেই প্রীতিকে অভিষঙ্গ বলে। সক্তি ও অভিষঙ্গের ফলে মানুষ নিজেকে হারাইয়া ফেলে—তখন অন্যের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করে। এই যে অবস্থা, ইহা মানবের পরাজয়ের অবস্থা—বন্ধনের চরম অবস্থা। পুত্র, দার, গৃহ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে।

ণ। ইষ্টই হউক আর অনিষ্টই হউক সর্ব্বদা সমচিত্ত অর্থাৎ হর্ষবিষাদশূন্য হইতে হইবে।

ত। ভগবান বাসুদেব ব্যতীত আর গতি নাই, জ্ঞানের দ্বারা ইহা সুনিশ্চিতরূপে বুঝিয়া সেই পরমেশ্বরে এমন প্রীতি করিতে হইবে যাহা কোন প্রতিকূল ঘটনার দ্বারা কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না।

থ। বেশ শুদ্ধ, পবিত্র, মনোরম ও নির্জ্জন স্থানে সর্ব্বদা থাকিতে হইবে।

দ। বিষয়ভোগ লইয়া যাহারা দিনরাত্রি মারামারি করিতেছে, বিষয়চর্চ্চা ব্যতীত যাহাদের অন্য কথা নাই, সেই সমুদয় ভোগ-লম্পট অথচ বাচাল লোকের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ধ। অধ্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিষ্ঠা।

ন। তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন।

এই সদ্‌গুণগুলির সংখ্যা কুড়ি। এইগুলিই পরমার্থজ্ঞান বা ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানের সাধন।

৮। ভক্তি ও জ্ঞানে সামান্য মতভেদ

সাধকগণের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদ আছে—কেহ জ্ঞানী, কেহ ভক্ত। কিন্তু এই সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন-সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ মতভেদ নাই সামান্য একটু মতভেদ আছে, তাহাও এই স্থলে আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবমতের পক্ষ হইতে ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন—এই কুড়িটি সদ্‌গুণের মধ্যে প্রথম আঠারটি জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েরই পক্ষে সাধারণ। শেষের দুইটি, অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন—এই দুইটি কেবল জ্ঞানীর জন্য। বিশ্বনাথ আরও বলেন, এই আঠারটি গুণের মধ্যে—"আমাতে (শ্রীভগবানে) অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি"—এই গুণটির অনুশীলন জন্য ভক্তগণ যত্ন করিবেন। এই গুণের যিনি অভ্যাস করিবেন, অপরাপর সতরটিগুণ আপনা হইতেই তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন হইবে। শ্রীল বিশ্বনাথ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—'ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ'।

শ্রীল রামানুজাচার্য্য তাঁহার টীকায় এমন কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, যাহা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'অমানিত্ব' কথার অর্থ—উৎকৃষ্ট জনেষু অবধীরণা-রাহিত্যং। ইহার অর্থ, যাঁহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ নিম্নবংশীয় লোকের নিকট সম্মান পাইবার জন্য চেষ্টা করেন—ইহারই নাম মানিত্ব। এই মানিত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। ধার্ম্মিক বলিয়া জনসমাজে খ্যাতি হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারই নাম দম্ভিত্ব। এই দম্ভিত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৯। নীতিমূলক ধর্ম্মত্যাগ ও ধর্ম্মের গ্লানি

চিন্তা করিলেই মানুষ বুঝিতে পারিবে, বর্ত্তমান সময়ে সমাজে ভদ্রলোকের ন্যায় মানসম্ভ্রমে বাস করিতে হইলে, বা দশের ও দেশের কাজ করিতে হইলে, এই সমুদয়

নৈতিক উপদেশ প্রতিপালন করা যায় না। সুতরাং এই নীতিমূলক-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে মানুষ অক্ষম। কাজেই ধর্ম্মাচার্য্যগণ অন্য প্রকারের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিলেন। মানুষকে তাঁহারা নৈতিক জীবন গঠন করিতে উপদেশ দিলেন না। তীর্থযাত্রা বা ব্যয়সাধ্য মঠ-মন্দিরনির্ম্মাণাদি কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন, বুঝাইয়া দিলেন—এই সমুদয় কার্য্য করিলে কেবল এই জন্মের নহে, শত শত জন্মের পাপ দূরীভূত হইবে। ফলে মানুষের পাপের ভয়, পরকালের ভয় বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল, ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে গেলে নৈতিক জীবন গঠনের আবশ্যকতা মানুষ ভুলিয়া, ধর্ম্ম একটা পয়সা দিয়া বেচাকেনা করিবার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। ইহার নাম ধর্ম্মের গ্লানি। এই গ্লানির জন্য আচার্য্যগণ দায়ী। তাঁহারা সাহস করিয়া ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিতে পারিলেন না। বিষয়ীলোকের আনুগত্য না করিলে, অত্যাচারী পরপীড়ককে সাধু বানাইতে না পারিলে, পয়সা আসে না, পয়সা না আসিলে বড় বড় মঠ মন্দির হয় না, সেবাদাসীর অলঙ্কার হয় না, নিজেরও বিলাস-ভোগ চলে না। এই সব দুশ্চিন্তায় সত্য ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল, মণ্ডলীর স্বার্থের জন্য প্রচারিত মিথ্যাধর্ম্ম ব্যর্থ আড়ম্বর লইয়া জগতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মবিস্মৃত মানব মিথ্যাধর্ম্মের নিগড়ে আপনাকে বাঁধিয়া তমোগুণের মধ্য দিয়া আত্মহত্যার অভিমুখে ধাবিত হইল।

পৃথিবীর সকলদেশেই এই প্রকারে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে। ভগবদ্গীতার ধর্ম্ম যদি এযুগে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে এই গ্লানি দূরীভূত হইতে পারে।

১০। কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা

পূর্ব্বে যে সমুদয় সদ্গুণের অনুশীলনের কথা বলা হইল, সাধারণ মানুষ তাহা করিতে পারে না। তাহা হইলে কি সে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকিবে? ইহার উত্তর আছে। সে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকিবে না। তাহার জন্য নানা প্রকারের কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে। সে ব্যক্তি যদি সেই সমুদয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সদাচারপরায়ণ হয়, আর তাহার জীবনে অনেক দোষ আছে, ইহা যদি সত্য সত্য অনুভব করে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার দেহ শুদ্ধ হইবে, ইন্দ্রিয়গণের লালসা ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে, ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া আসিবে, দম্ভ-অহঙ্কার ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। এই প্রকারে

চিত্ত শুদ্ধ হইলে তখন ক্রমশঃ শক্তিও বাড়িবে আর পরমার্থজ্ঞানেরও উদয় হইবে। ইহাই আমাদের চিরন্তন সাধন-প্রণালী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্মকাণ্ড ও সদাচার একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, মানুষ ক্রমশঃ গৃহহীন ও সমাজহীন হইয়া প্রত্যেকেই পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে। পল্লী নাই, সমাজ নাই, স্বাধীন জীবিকা নাই, কাজেই সদাচারও নাই। পিতৃকৃত্য, দেবকৃত্য লোপ পাইতে বসিয়াছে, মন্ত্র, দ্রব্য, কাল—সকলই অশুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইবার যে উপায় ও সম্ভাবনা ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে।

যাহারা চাকুরীজীবি, ধাক্কাধাক্কি করিয়া যাহাদের উদরান্ন সংগ্রহ করিতে হয়, তাহারা কি করিবে। নিজেকে গুণবান্ বলিয়া সর্ব্বদা ঘোষণা না করিলে, নিজের গুণের ও কৃতিত্বের নিদর্শন-পত্র সংগ্রহ করিয়া উপরওয়ালার নিকট সর্ব্বদা তাহা দাখিল না করিলে, তাহার যে উপায় নাই! সুতরাং গীতা যে নৈতিক জীবনের আদর্শ ধরিয়াছেন, তাহা তাঁহার অবলম্বনীয় নহে। কাজেই ব্যাপার যে বড়ই কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১১। আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন

এইবার আর একটি কথা। মানুষ ভাল হইবে কেন? মানিত্ব, দম্ভিত্ব প্রভৃতি সে কেন পরিত্যাগ করিবে। ইহার উত্তর—মানুষ যতক্ষণ নিজেকে নিত্য বলিয়া না বুঝিয়াছে, ততক্ষণ সে সত্য সত্য ত্যাগ ও সংযমের সাধন করিতে পারে না।

প্রত্যেক মানুষকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, আমি মরিব, মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। আমি মরিব, এই দেহ থাকিবে না, এই আত্মীয়-স্বজন, এই ধন-দৌলত কিছুই থাকিবে না। আমি মরিব, নিশ্চয়ই মরিব,—কিন্তু মরিয়াও মরিব না। দেহ যাইবে, আত্মীয়-স্বজন, ধন-দৌলত কিছুই থাকিবে না, কিন্তু আমি থাকিব। অন্য দেহ লইয়া অন্য লোকে আমি থাকিব, আমাকে আমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। এই মূল্য সত্য, প্রধান সত্য, যিনি হৃদয়ঙ্গম না করিয়াছেন, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সেবামূলক পারমার্থিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। গীতার ধর্ম্মে তাঁহার একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। বিদ্যাপতির এই পদটির তত্ত্ব সকল সময়েই আলোচনা করা দরকার—

যতেক যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু, মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই, করম সঙ্গে চলি যায়॥

দেহ ধ্বংশ হইলে মানুষের ধ্বংশ হয় না, মৃত্যুর পরও মানুষ থাকে, আর এই দৃশ্যমান স্থূল জগৎ ছাড়া আরও সূক্ষ্মতর নূতন নূতন জগৎ আছে,—এ সমুদয় কথা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার ফলে, মৃত্যুর পর জীবের কি হয়, সে সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন কথা জানিতে পারা যাইতেছে। যে সব মানুষ এই জীবনে লালসাকে দমন করিতে পারে নাই, কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুকে সংযত করিতে পারে নাই, মৃত্যুর পর তাহাদের ভয়ানক দুর্দ্দশা হয়, ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। এ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। সূক্ষ্মজগতে যে সমুদয় প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের ছবি পর্য্যন্ত আজ কাল লওয়া হইতেছে— সুতরাং অন্য দেহে অন্য লোকে যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে এখনকার দিনে আমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকা উচিত নহে। আত্মার অনশ্বরত্ব বা জন্মান্তর অবশ্য এই সমুদয় প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তবে মৃত্যুর পরও জীব সুখদুঃখের অনুভূতি লইয়া থাকে, এই কথাটিতে বিশ্বাস জন্মাইলে মানুষ যদি সতর্ক হয়, কিয়ৎপরিমাণে অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন হয় এবং গভীর-রূপে আত্মচিন্তা করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে এই সব ব্যাপারে মানুষের আর অনুমাত্রও সন্দেহ থাকিবে না। তখন মানুষ স্বভাবতঃই সতর্ক হইবে এবং পরমার্থ ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইবে এবং সেই ধর্ম্মের সাধনার জন্যও চেষ্টান্বিত হইবে।

ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগে মানবাত্মার এই অনশ্বরত্ব, জন্মান্তরবাদ আর কর্ম্মবাদ বলা হইয়াছে প্রধানরূপে বলা হইয়াছে—আত্মার স্বরূপ।

আমি এই দেহ নই, ইন্দ্রিয় নই, মন নই, বুদ্ধি নই—আমি আত্মা, ইহাই প্রত্যেককে প্রত্যহ ধ্যানযুক্ত হইয়া সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। ইহাই গীতার সাংখ্য-যোগ। সেইজন্য গীতার প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥

আমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না, তাহা নহে। তুমি যে পূর্ব্বে ছিলে না, তাহা নহে। এই

সব রাজারা যে পূর্ব্বে ছিলেন না, তাহা নহে। আবার আমি যে ভবিষ্যতে থাকিব না, তাহা নহে, তুমি যে ভবিষ্যতে থাকিবে না, তাহা নহে, এই সব রাজারা যে ভবিষ্যতে থাকিবে না, তাহা নহে। আমরা সকলেই অতীতে ছিলাম, এবং চিরভবিষ্যতে থাকিব, এখন এই বর্ত্তমানে আমরা যেমন সকলেই আছি।

এই সত্যটি সর্ব্বপ্রথম সুদৃঢ় চিন্তার দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। আমি ও আমরা সকলেই ত্রিকালসত্য। মরণ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মরণকে ধ্বংশ মনে করিয়া যাহারা ভয় পায়, তাহারা এখনও মিথ্যার গভীর অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে। জীবনের উন্নততর মহিমার ঊষালোক এখনও তাহাদের জ্ঞানচক্ষুতে লাগে নাই। তোমরা সর্ব্বপ্রথমে বীরের ন্যায় মৃত্যুভয় পরিত্যাগ কর। মৃত্যু কিছুই নহে, একটি অবস্থান্তর মাত্র; ইহাই মৃত্যু সম্বন্ধে প্রথমেই বুঝিয়া লইয়া সাহসী হইতে হইবে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র নমুহ্যতি।

আমি দেহী, দেহ আমার পুর বা গৃহ, আমি সেই দেহের অধিকারী ও অধিবাসী, আমি পুরুষ। এই দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। বাল্য যৌবন জরা যেমন এই দেহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, মৃত্যুও ঠিক্ তেমনি। অতএব যাঁহারা ধীর, শান্তচিত্ত ও জ্ঞানী, তাঁহারা মরণে কোনরূপ মোহাচ্ছন্ন, ভীত বা বিচলিত হন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ গ্রহণ করে।

দেহ যায়, ইন্দ্রিয় যায়, অনেকবার গিয়াছে, অনেকবার যাইবে। কিন্তু যিনি দেহী, তাহার ধ্বংশও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

অস্ত্রের দ্বারা ইঁহাকে ছেদন করা যায় না, আগুনে ইঁহাকে দগ্ধ করা যায় না, জল ইঁহাকে ভিজাইয়া পচাইতে পারে না, বায়ু ইঁহাকে শুকাইতে পারে না। ইনি ছিন্ন, ক্লিন্ন, দগ্ধ বা শুষ্ক হইবার বস্তু নহেন। ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব, সর্ব্বদা একরূপ এবং অনাদি।

ইহাই আত্মতত্ত্বের ভূমি। এই ভূমিতে দাঁড়াইয়া এই মহাসত্যের আলোকে জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিনির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু একবার শুনিলেই মানুষ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। হৃদয়ঙ্গম করাতো অনেক দূরের কথা, একথা শুনিলে মানুষ একেবারে অবাক্ হইয়া যায়। এইজন্যই গীতা বলিয়াছেন—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্য বদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্য্য বচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

কেহ কেহ অবাক্ হইয়া ইহা দেখেন, কেহ কেহ অবাক্ হইয়া ইহার কথা বলেন, কেহ কেহ বিস্ময়ের সহিত ইহা শুনিয়াও কিছু বুঝিতে পারেন না।

১১। আত্মজ্ঞান ও স্বধর্ম্ম

এই কারণে সাধারণ মানুষকে একেবারে আত্মতত্ত্বের কথা না বলিয়া স্বধর্ম্মের কথা বলা আবশ্যক। ভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে তাহাই বলিলেন। যদি পণ্ডিত হও আত্মতত্ত্ব বুঝিয়া সেই আত্মতত্ত্বের আলোকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, আর সে শক্তি যদি না থাকে, তবে বৃথা অহঙ্কার করিয়া আত্মঘাতী হইও না, নিজের স্বধর্ম্ম বুঝিয়া স্বধর্ম্মের অনুসরণ কর।

এই গেল ধর্ম্মরাজ্যের দুই দিক্। নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া এই দুইদিকের একদিকে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্মের আহ্বান আসিয়াছে, এখন বসিয়া বসিয়া বাজে কথা কহিবারও সময় নহে; অবসন্ন হইয়া শোক মোহের বশীভূত হইবারও সময় নহে। যাহা হউক একদিকে দাঁড়াইয়া পড়। ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ।

বর্ত্তমান সময়েও ঠিক্ এই কথাই গুরুরূপী শ্রীভগবান্ আমাদিগকে বলিতেছেন—আমরা যদি জ্ঞানী হই—তিনি জ্ঞানের চরম কথা, আত্মতত্ত্বের কথা বলিলেন। সেই আলোকে পথ দেখিয়া চল, আর যদি বল সে আলোকে চোখ পুড়িয়া যাইতেছে, তবে বেশী

লাফালাফি করিও না, ধোঁড়াইয়া বড় হইও না, নিজের জায়গায় দাঁড়াইয়া দেখ তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তোমার সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে, তোমার স্বধর্ম্ম তোমায় আহ্বান করিতেছে, সাময়িক উত্তেজনায় অন্ধ বা মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জীবনের পথে চল।

১২। নিরুপায় কে ?

এই দুই প্রকারের লোকের উপায় আছে। আর যাহারা জ্ঞানী না হইয়াও নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করে, নিম্নাধিকারী হইয়াও নিজেকে উচ্চাধিকারী বলিয়া মনে করে, ভিতরে বাহিরে ক্রীতদাসের ক্রীতদাস হইয়াও স্বাধীনতার দুঃস্বপ্ন দেখে, তাহার আর উপায় নাই। তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥

যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া ইহার আচরণ না করে, সেই সমুদয় অবিবেকী ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়।

ইহাই গীতার ধর্ম্ম ও তাহার সাধন। ইহাই শ্রীভগবানের যুগবাণী—এই যুগবাণী সকলের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করুক।

পূর্ব্বে যে কুড়িটি সদ্‌গুণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেই সদ্‌গুণগুলির অনুশীলনের কথা ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে। সেই অধ্যায়ের নাম "ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ"-যোগ। দেহই ক্ষেত্র, আর ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবান্ সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ। সাংখ্য-যোগ ও এই যোগ, একই। সাংখ্যযোগে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহাই এখানে বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে। এই জ্ঞানই পরমজ্ঞান, পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন সেই পরমজ্ঞানলাভের উপায়।

১৩। ভক্তিপথে সুবিধা ও অসুবিধা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই কুড়িটি গুণের মধ্যে ভক্তগণকে আঠারটি অনুশীলন করিতে হইবে, শেষ দুইটির অনুশীলন ভক্তগণের জন্য নহে, কেবল জ্ঞানীদিগের জন্য। ইহা ছাড়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর একটি কথা বলিয়াছেন,

তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তির সাধনের জন্য ভক্তগণ চেষ্টা করিবেন—তাহা হইলে অন্যান্য সদ্‌গুণগুলি আপনিই আসিবে। এই কথা অতিশয় সত্য, এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার সমর্থক অনেক শ্লোক আছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। ভক্তির সাধন করিলে এই গুণগুলি আপনি আসিবে, কিন্তু যদি দেখি, একজন লোক বাহিরে ভক্তির সাধন করিতেছে, অথচ এই গুণগুলি আসিতেছে না, তাহা হইলে কি বলিব? তাহা হইলে কি বলিব যে, ভক্তির সাধন যেমন চলিতেছে চলুক, তাহার প্রশংসা কর, ঐ গুণগুলি পরে আসিবে? তাহা নহে। তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঠিক্ ঠিক্ ভক্তির সাধন হইতেছে না, সাধনের ভিতরে গোল আছে। যদি ঠিক্ সাধন হইত, তাহা হইলে, ঐ গুণগুলি নিশ্চয়ই আসিত। ঐ গুণগুলি না আসাতেই বুঝিতে হইবে, ভক্তিসাধনার ভ্রান্তপথ ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ভ্রান্তপথে যাইতে পারেন। অতএব প্রার্থনা করা যাউক, ভগবান্ এই ভ্রান্তি হইতে আমাদের সকলকে রক্ষা করুন।

১৪। জ্ঞান ও তাহার অধিকার

গীতার ধর্ম্ম ও তাহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে কয়েকটি কথা বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারাই যাহা কিছু জগতে আছে, সমুদয় জানা যায়। অতএব জ্ঞানের অনুশীলনে সকলকেই সর্ব্বদা বিশেষভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে। ইহা ধর্ম্ম সাধনার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ। অবশ্য আমরা সচরাচর সংসারে যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা আংশিক জ্ঞান বা অসম্যক্ জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞানও প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন, আমরা ভক্তিমার্গের পথিক আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। এরূপ ধারণা একেবারেই ভুল। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—'নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-লক্ষণ' যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের অনুশীলন, ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। জ্ঞান-চর্চ্চা যে নিষিদ্ধ, এমন কথা কোন আচার্য্যই কোন স্থানে বলেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত ভক্তিমার্গের আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, ভক্তিও এক প্রকার জ্ঞান। অতএব ভক্তিমার্গের দোহাই দিয়া যাহারা জ্ঞান-চর্চ্চা নিষেধ করে, এবং মানুষকে প্রকারান্তরে মূর্খ করিতে চায়, তাহারা নিজেরাই মূর্খ এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন,

সেই সমুদয় মূর্খের অপব্যাখ্যা শুনিলে ধর্ম্মহানি হয় ও অকল্যাণ হয়। এই অকল্যাণ আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে, অতএব এ বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান হওয়া দরকার।

যে জ্ঞান কেবল শুষ্ক তর্ক, যে আলোচনা দ্বারা মানুষের হৃদয় মার্জ্জিত হয় না, হৃদয় সরস হয় না, হৃদয়বৃত্তিসমূহ সতেজ হয় না, যে জ্ঞান ও অনুশীলনের দ্বারা মানুষ দাম্ভিক হয়, অপরের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে সক্ষম হয় না, যে জ্ঞানে বিনয় নাই, ভক্তি নাই, প্রেম নাই, দয়া নাই, সেবা নাই, সেই জ্ঞান নিষিদ্ধ। জ্ঞান নিষিদ্ধ নহে।

জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি সকলকেই মনে রাখিতে হইবে।

> ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
> তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে।

বিষয়-জ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানকে অপরা-বিদ্যা বলে—এই অপরা-বিদ্যাও প্রয়োজন। একেবারে পরাবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান বা সম্যক্‌জ্ঞান সম্ভব নহে। অতএব জ্ঞানচর্চ্চা নিতান্তই আবশ্যক। ধর্ম্মসাধনার ইহাই প্রথম ও প্রধান অঙ্গ।

কিন্তু ভগবদ্গীতা এই জ্ঞানলাভ-সম্বন্ধে একটি বড়ই মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, সেই কথাটি এযুগে সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। যাহার চিত্ত শুদ্ধ নহে, সে ব্যক্তি সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করিতেই পারে না, কতকগুলি বড় বড় কথা শিখিয়া সে হয়ত মনে করে আমি পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, কিন্তু সে কেবল তাহার মনে করা মাত্র। যাহার চিত্ত শুদ্ধ নহে, সে সহস্র চেষ্টা করিলেও আত্মজ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এই গেল প্রথম কথা। ইহার সহিত আর একটি অতি গুরুতর কথা আছে। আংশিক জ্ঞানও যদি অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি লাভ করে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপকার হইবে না, অপকার হইবে। ইহার উদাহরণের অভাব নাই। এই ব্যাপারটি বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই বুঝিতে পারা আবশ্যক। মনে করুন, চিকিৎসা বিদ্যা। ইহা অপরা-বিদ্যা হইলেও অতি উচ্চাঙ্গের বিদ্যা। অনন্তদেব

নিজে এই বিদ্যার প্রবর্ত্তক। এই বিদ্যার অনুশীলন করিবার অধিকারী কে, তাহা আমাদের শাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এখন, অধিকারী অনধিকারী নাই, সকলেই এই বিদ্যা লাভ করিয়া ব্যবসায় করিতেছে। তাহার ফলে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত প্রকারের বঞ্চনা এই ব্যবসায়ের মধ্যে ঢুকিয়াছে, অশুদ্ধচরিত্র, ভোগপরায়ণ, স্বার্থপর ও চরিত্রহীন ব্যক্তিগণ, এই ব্যবসায়ের অধিকার পাইয়া মানবের কতদূর অনিষ্ট করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্যবহার-শাস্ত্র বা আইন—জটিল সামাজিক জীবনের সমস্যাসমূহের মীমাংসার জন্য, এই বিদ্যার নিতান্ত প্রয়োজন, সুতরাং এই বিদ্যাও একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যা। কিন্তু এই বিদ্যাও অশুদ্ধচিত্ত অনধিকারীর হস্তে পড়িয়াছে, তাহাতে সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অধিকপরিমাণে অনিষ্টই হইতেছে।

এই অবস্থা যে কেবল ভারতবর্ষেই হইয়াছে তাহা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই হইয়াছে। অন্ধভাবে না বুঝিয়া আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহার একটি প্রধান অঙ্গই এই সমুদয় প্রয়োজনীয় বিদ্যার অনধিকারী কর্ত্তৃক অপব্যবহার। সুতরাং আমাদের মতে ইহা সভ্যতা নহে—বর্ব্বরতা, আসুরিকতা। বৈজ্ঞানিকের বিদ্যা, নরহত্যার নব নব উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত, অর্থনৈতিকের বিদ্যা, দুর্ব্বল ও মূর্খের ধন লুণ্ঠনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত; শিল্পীর বুদ্ধি নকল ও বাজে জিনিসের উদ্ভাবন করিয়া সরলচিত্ত লোককে কিরূপে ঠকাইতে পারা যায়, তাহারই চিন্তায় ব্যস্ত; কেবল বিজ্ঞাপনের বহর, অযোগ্যের প্রতিষ্ঠা, যোগ্যের পরাজয়, মিথ্যার গৌরব, সত্যের অগৌরব—ইহাই বর্ত্তমান যুগের লক্ষণ। ভগবদ্গীতা বলিলেন,—চিত্ত যাহার শুদ্ধ নহে, যে অধিকারী নহে, সে জ্ঞান পাইবে না। কিন্তু এই উপদেশ পালিত হইতেছে না। এই উপদেশ পালিত না হইলে কেবল ভারতের নহে, মানবজাতির কল্যাণের কোনই আশা নাই।

সনাতন ধর্ম্ম

১। হিন্দু

আমরা হিন্দু-নামে পরিচিত ; আর, আমাদের ধর্ম্ম আমাদের নিকট ও অন্যের নিকট হিন্দু-ধর্ম্ম নামে পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু নামে আমরা ও আমাদের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু এই পরিচয়, সঙ্গত পরিচয় কিনা সন্দেহ।

হিন্দু-নামের অর্থ

ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা বলেন, সিন্ধুনদের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশসমূহ অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদেশীয়গণের নিকট সাধারণতঃ সিন্ধুস্থান বা সিন্ধুপ্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। পারস্থ ভাষার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যবশতঃ সিন্ধুস্থানের নাম হইয়া গেল হিন্দুস্থান। সুতরাং হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা হইলেন, হিন্দুস্থানী—সংক্ষেপে হিন্দু।

সিন্ধুনদ

সিন্ধুনদকে প্রাচীনকালে পারস্থ ভাষায় বলিত হিন্দু, আর গ্রীক্ ভাষায় বলিত ইন্দুস্। গ্রীক্ ভাষার উচ্চারণের অনুবর্ত্তনে লাটিন্ ভাষায় ভারতবর্ষের নাম ইণ্ডিয়া। এখন বৈদেশিকগণের নিকট আমাদের দেশ ভারতবষ, 'ইণ্ডিয়া' নামেই পরিচিত।

'হিন্দু' কথার আর এক অর্থ হইতে পারে। পারস্থ ভাষায় 'হিন্দু' শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণবর্ণ'। সিন্ধুদেশের অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে হিন্দু' এই নাম দিয়াছেন কিনা, তাহাও আমাদের চিন্তা করা উচিত।

হিন্দু-কৃষ্ণবর্ণ

পূর্ব্বকালে মুসলমানেরা আফ্রিকাদেশ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস লইয়া আসিতেন। কৃষ্ণবর্ণ দাসগণ 'হিন্দু' নামে পরিচিত ছিল—বিজয়ী মুসলমানেরা ঘৃণা করিয়া সিন্ধুদেশের অধিবাসিগণকে হিন্দু বা ক্রীতদাস বলিতেন কিনা, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

হিন্দু দাস

'মেরুতন্ত্র' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, ঐ গ্রন্থে হিন্দু শব্দের এক ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে।

হীনং দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

হীন অর্থাৎ নিকৃষ্ট আচার-ব্যবহারকে ঘৃণা করে বলিয়া 'হিন্দু' এই নাম হইয়াছে। মেরুতন্ত্রে লণ্ডন-নগরের উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন মেরুতন্ত্র নিতান্তই আধুনিক গ্রন্থ। মেরুতন্ত্র আধুনিকই হউক আর প্রাচীনই হউক, 'হিন্দু' এই নাম মেরু-

মেরুতন্ত্রের মত

তন্ত্র ব্যতীত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। মেরুতন্ত্রের বচনও অন্য কোন গ্রন্থে নাই, অতএব হিন্দু নাম আমাদের গৌরবের বিষয় কিনা সন্দেহ।

আর্য্য ও সনাতন

আমাদের নাম আর্য্য। বেদাদি শাস্ত্রে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগকে এই নামে অভিহিত করিতেন। আর আমাদের ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম।

সনাতন ধর্ম্ম ও বেদ

সনাতন ধর্ম্ম বেদ-প্রণিহিত অর্থাৎ বেদ এই ধর্ম্মের ভিত্তি; অতএব এই ধর্ম্মের অপর নাম বৈদিক ধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যত প্রকারের ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে এই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেবল যে প্রাচীন, তাহা নহে, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত এই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের যদি অপক্ষপাতে তুলনা করিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে এই ধর্ম্মের শাস্ত্র-সমূহে তত্ত্বজ্ঞানের যে গভীরতা ও মহত্ত্ব আছে তাহার তুলনা নাই। এই ধর্ম্মের নীতি-উপদেশ অপেক্ষা পবিত্রতর ও উন্নততর নীতি-উপদেশ আর কোথায়ও নাই। তাহার পর এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সমূহের বৈচিত্র্য একেবারে অতুলনীয়। সকল মানুষের রুচি ও অধিকার একরূপ নহে, বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-সমূহের বৈচিত্র্য এমনই অদ্ভুত যে সকল প্রকারের অধিকার ও রুচিসম্পন্ন মানুষ, এই ধর্ম্মে নিজের উপযুক্ত অনুষ্ঠান পাইবে এবং সেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তের শুদ্ধিসাধন করিয়া সোপানের পর সোপান অতিক্রমপূর্ব্বক, চরম ও পরম তত্ত্বজ্ঞানে আরোহণ করিয়া পরমার্থ লাভ করিবে। এই প্রকারের সুবিধা-জনক ব্যবস্থা অন্যান্য ধর্ম্মে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অধিকার ভেদ

সনাতন ধর্ম্ম প্রাচীনতম ও অতুলনীয়

'সনাতন' কথার অর্থ চিরন্তন। যাহা সত্য তাহা চিরকালই আছে। এই ধর্ম্ম অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান এবং অনন্তকালই থাকিবে বলিয়া ইহার নাম 'সনাতন'।

২। ধর্ম্মের সংজ্ঞা ও পরিচয়

ধর্ম্ম কি? মহাভারতে আছে—

'ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তি প্রজাঃ।' কর্ণপর্ব্ব ৫৯ অধ্যায়

যিনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে এক সুমহান্ সম্বন্ধসূত্রে গাঁথিয়া যিনি রক্ষা করিতেছেন বা পালন করিতেছেন তিনিই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে যে সমুদয় সংজ্ঞা বা লক্ষণ পাওয়া যায় তাহার কতকগুলির আলোচনা আবশ্যক।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা

বেদে আছে—

ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা,
লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি,
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি।

বেদ

ধর্ম্মই বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা বা আধার। সংসারের জীব সমুদয় ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া পরম্পর পরস্পরের অনুসরণ করিতেছে, অর্থাৎ ধর্ম্মপথে প্রবাহক্রমে পর পর চলিয়া উন্নতি ও মঙ্গল লাভ করিতেছে। ধর্ম্মের দ্বারা পাপ দূরীভূত হয়। ধর্ম্মের উপরেই যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই কারণেই বলা হইয়া থাকে ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মহাভারত

মহাভারতে অন্য স্থানে আছে—

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥”

ধারণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম ধর্ম্ম, সমুদয় প্রজা ধর্ম্মের দ্বারা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিলোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে আছে—

ধর্ম্মঃ সতাং হিতঃ পুংসাং ধর্ম্মশ্চৈবাশ্রয় সতাম্।
ধর্ম্মাল্লোকাস্ত্রয় স্তাত প্রবৃত্তা সচরাচরাঃ॥

ধর্ম্মই সাধু পুরুষগণের হিত, ধর্ম্মই সাধু পুরুষগণের আশ্রয়। হে বৎস, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক লোকত্রয় ধর্ম্মের দ্বারাই বা ধর্ম্ম হইতেই চলিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে ধর্ম্ম দেবতা-বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হইতে তাঁহার উৎপত্তি, দক্ষপ্রজাপতির ত্রয়োদশটি কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। এই ত্রয়োদশ ভার্য্যার গর্ভে চতুর্দ্দশটি পুত্রের উৎপত্তি হয়। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের বর্ণনা।

পত্নীর নাম শ্রদ্ধা তাঁহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র ঋত
" " মৈত্রী " " " " প্রসাদ
" " দয়া " " " " অভয়
" " শান্তি " " " " সুখ
" " তুষ্টি " " " " উৎ
" " পুষ্টি " " " " গর্ব্ব
" " ক্রিয়া " " " " যোগ
" " উন্নতি " " " " দর্প
" " বুদ্ধি " " " " অর্থ
" " মেধা " " " " স্মৃতি
" " মূর্ত্তি " " " " নর, নারায়ণ
" " তিতিক্ষা " " " " ক্ষেম
" " হ্রী " " " " প্রশ্রয়

অন্যত্র আছে—

শ্রদ্ধালক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টীর্মেধা তথা ক্রিয়া।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী॥
পত্ন্যার্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়নীঃ প্রভুঃ।

বিষ্ণু পুরাণে 'সিদ্ধি'—স্থানে 'ঋদ্ধি' বলা হইয়াছে। অন্যগুলি অভিন্ন। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এইরূপ বিবরণ ও তালিকা আছে।

ধর্ম্মের বংশ তালিকার সঙ্গে অধর্ম্মের বংশ তালিকাও জানা আবশ্যক। অধর্ম্মের পত্নীর নাম হিংসা। তাহাদের একটি পুত্র আর একটি কন্যা। পুত্রের নাম অনৃত, আর কন্যার নাম নিকৃতি। তাহারা স্বামী স্ত্রী। তাহাদের দুই পুত্র নরক ও ভয়, আর দুই কন্যা মায়া ও বেদনা। নরকের ঔরসে মায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন মৃত্যু। বেদনার গর্ভে জন্মাইলেন দুঃখ।

অধর্ম্মের বংশ তালিকা।

বরাহ পুরাণে ধর্ম্মের উৎপত্তি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ভগবান্ প্রজা সৃষ্টির

ধর্ম্মের উৎপত্তি বরাহ পুরাণ।

অভিপ্রায় করিয়া সর্ব্বপ্রথমে চিন্তা করিলেন, প্রজাগণকে পালন করিবেন কে ? তিনি যেমন এই চিন্তা করিতেছেন অমনি

তস্য চিন্তয়তস্ত্বঙ্গাদ্দক্ষিণাচ্ছ্বেতকুণ্ডলঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব পুরুষঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনঃ॥
তং দৃষ্টোবাচ ভগবাংশ্চতুষ্পাৎ ত্বাং কৃতেযুগে।
ত্রেতায়াং ত্রিপদশ্চাসৌ দ্বিপদো দ্বাপরেঽভবৎ॥
কলাবেকেন পাদেন প্রজাঃ পালয়তে প্রভুঃ।
গুণ দ্রব্য ক্রিয়া জাতি চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ত্রিশৃঙ্গোঽসৌ স্মৃতো বেদে সসংহিতপদক্রমঃ।
তথা আদ্যন্তওঙ্কারদ্বিশিরাঃ সপ্তহস্তবান্॥
উদাত্তাদি ত্রিভির্বদ্ধ এবং ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ হইতে শ্বেতকুণ্ডল ও শ্বেতমাল্যশোভিত, শ্বেতচন্দনলিপ্ত এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন—সত্যযুগে তোমার চারিটি চরণ হইবে, ত্রেতাযুগে তিনটি, দ্বাপরে দুইটি, আর কলিতে একটি চরণ হইবে। এই প্রকারে তুমি প্রভু হইয়া প্রজাসমূহকে পালন করিবে। গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি, এই চারিটি চরণ। সংহিতা, পদ ও ক্রম বেদে কথিত হইয়াছে, এই তিনটি ধর্ম্মের শৃঙ্গ। ইঁহার আদি ও অন্ত, প্রণব। ইঁহার দুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বরে তিনি বদ্ধ, এই প্রকারে ধর্ম্ম বিরাজমান।

বরাহ পুরাণেই কথিত হইয়াছে ত্রয়োদশী তিথিতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই কারণেই ত্রয়োদশী তিথি সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী।

ধর্ম্মের স্ত্রী ও পুত্রগণের পরিচয় আমরা কয়েকটি পুরাণ হইতে পূর্ব্বে দিয়াছি।

ধর্ম্মের স্ত্রী পুত্র —বামন পুরাণ।

বামন-পুরাণে এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও স্মরণীয়। ধর্ম্মের স্ত্রীর নাম অহিংসা। তাঁহার গর্ভে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই যোগশাস্ত্র-বিচারক। তাঁহাদের নাম সনৎকুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দন। কপিল, বোঢ়ু, আসুরি, পঞ্চশিখ, ইঁহারা জ্ঞানযোগ-প্রচারক। ইঁহারাও ধর্ম্মের পুত্র।

ধর্ম্মের লক্ষণ।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে ধর্ম্মের ছয় প্রকার লক্ষণ বলা হইয়াছে।

সৎপাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চপূজনম্।
শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধঃ ধর্ম্মলক্ষণম্॥

সৎপাত্রে দান, কৃষ্ণে মতি, পিতামাতার পূজা, শ্রাদ্ধ, বলি, গোগ্রাসদান, ধর্ম্মের এই ছয় লক্ষণ।

ধর্ম্মের অঙ্গ

পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ডে ধর্ম্মের দশটি অঙ্গ কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে॥

ব্রহ্মচর্য্যা, সত্য, তপস্যা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, সুশান্তি, অচৌর্য্য।

মৎস্য পুরাণে কথিত হইয়াছে—অদ্রোহ, অলোভ, দম, ভূতদয়া, তপঃ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনমুক্রোশ, ক্ষমা ও ধৃতি এইগুলি সনাতন ধর্ম্মের মূল।

ধর্ম্মের মূল

প্রত্যেক পুরাণেই ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু বহু কথা বলা হইয়াছে। আমরা সেই সব কথা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিলে পরম উপকার লাভ করিব।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আরও কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

আমরা সকলেই সুখে রক্ষিত হইতে চাই। কিন্তু সকল দিকেই বিপদ ও পতনের সম্ভাবনা।

ধর্ম্মের মহিমা

কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বুঝিতে পারা যায় কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম নহে। ধন জন পিতা মাতা পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু, জাতি কুল বিদ্যা রাজ্য ঐশ্বর্য্য কেহই চিরদিন আমাদের আয়ত্তাধীন নহে এবং বিপদকালে কাহারও সাধ্য নাই যে আমাদিগকে রক্ষা করে। একমাত্র ধর্ম্মই আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমরা যদি ধর্ম্মকে রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের কোনই ভয় নাই—আমরা চিরদিন সুরক্ষিত হইবে। জৈমিনির মতে আমাদের নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় হইবে। কিন্তু এই ধর্ম্মকে যদি রক্ষা না করি আমাদের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনে হপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥
গর্ভস্থস্য যঃ পূর্ব্বং বৃত্তিঃ কল্পিতবান্ পয়ঃ।
শেষবৃত্তিবিধানায় স কিং সুপ্তোহথবা মৃতঃ ॥

ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্, মৃত্যুর পর কেহই সঙ্গে যাইবে না—একমাত্র ধর্ম্মই সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। শিশু গর্ভে রহিয়াছে, ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার ক্ষুধা পাইবে, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে মাতৃস্তন্যে যিনি দুগ্ধ রাখিয়াছেন তিনিই ধর্ম্ম। অতএব তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যুর পরেও যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি সুপ্তও নহেন, মৃতও নহেন।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের যে উক্তি-সমূহ উদ্ধৃত হইল, তৎসমুদয়ের অর্থ গভীররূপে ও শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে কেবলমাত্র কয়েকটি কথায়, মতে বা সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করাই ধর্ম্ম নহে। আমাদের সমগ্র জীবনকে, জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় ব্যাপারকে ধর্ম্মের শাসনাধীন করিতে হইবে। আমাদের আহার নিদ্রা, আমাদের সর্ব্ববিধ ব্যবহার, আমাদের চিন্তা কল্পনা চেষ্টা সকলের মধ্যেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

বৈদিক ঋষিগণ আমাদের আদিপুরুষ। আমরা সকলেই সেই ঋষিদিগের বংশধর। যাঁহার গোত্র আছে, তিনিই ঋষির বংশধর। শিষ্য বলিলেই পুত্র বুঝায়। দেহের যেমন পুত্র আছে, মনেরও তেমনি পুত্র আছে। শিষ্য মানসপুত্র। বেদের ঋষিগণ বেদ পাইয়াছিলেন,—ইহার অর্থ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান্ বৈদিক ঋষিগণের নিকট জ্ঞানরূপে ধরা দিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ বিশ্বনাথ ঋষিগণের উপর একটি বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। ঋষিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিতেছেন। এই ভার কি? মানবকে ও জগৎকে কতকগুলি মহাসত্য জীবনের দ্বারা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিতে হইবে। এই কার্য্য সাধন করিতে হইলে কঠোর তপস্যা প্রয়োজন, ঋষিগণ সেই তপস্যা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের বংশধর, আমাদের উপরেও তাঁহারা সেই কার্য্যের ভার দিয়াছেন। সেই ভার পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের জীবনের গৌরব। মানব জন্মই গৌরবময়, আবার দেবনির্ম্মিত কর্ম্মভূমি এই ভারতবর্ষে মানবজন্ম আরও দুর্ল্লভ। আবার এই ভারতবর্ষে বৈদিক আর্য্য ঋষিগণের সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম-সম্পদের

উত্তরাধিকারী হইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের ও গৌরবের সীমা নাই। ভাগ্যদোষে আমরা আমাদের সে সৌভাগ্যের কথা ও গৌরবের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। বেদের ঋষি জগতে যে মহাসত্যের প্রতিষ্ঠা করিবার ভার পাইয়াছিলেন, যে সত্যের সাধনায় তাঁহারা দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি আত্মা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন—সেই সত্যের ও সাধনার পতাকা আজও আমাদের হস্তে রহিয়াছে—ঋষিদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা সেই ভার ও সেই পতাকা পাইয়াছি। এই কথা যতদিন সমাজের মনে থাকিবে, এবং এই মহাব্রত পালনের জন্য আমরা যতদিন চেষ্টা করিব, সেই বেদপুরুষ ব্রাহ্মণ্যদেব শ্রীভগবান্ ততদিন আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু সে কথা ভুলিলেই সর্ব্বনাশ।

৩। বেদ ও ধর্ম্ম

বেদ

শ্রুতি বা চতুর্ব্বেদ সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান সম্যক্‌জ্ঞান। এই বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষকর্তৃক রচিত হয় নাই। বেদ নিত্য। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমশ্লোকে আছে—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ॥ যে বেদে বিদ্বান্‌গণও মোহিত হন, সেই বেদ, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ পরমেশ্বর আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রসারিত করিলেন। ব্রহ্মার পরে, ঋষিগণ পর পর এই বেদমন্ত্র দর্শন করিলেন অর্থাৎ ঋষিগণের দিব্যজ্ঞানের নিকট বেদের মন্ত্রসমূহ প্রকাশিত হইলেন। বেদ পূর্ব্বকালে কখনও লিপিবদ্ধ হইত না। শিষ্যগণ গুরুর মুখে শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করিতেন। এই কারণে বেদের নাম শ্রুতি। বৈদিক কর্ম্মের নাম আনুশ্রবিক কর্ম্ম।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—এবং বলিয়াছেন শ্লোকটি শ্রীব্যাসদেবের বাক্য।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বম্ অনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

বেদের রূপভেদ।

যুগের শেষে বেদ ও ইতিহাস-সমূহ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ ব্রহ্মাকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তপস্যার দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা প্রাপ্ত হইলেন।

মানবের অধিকারানুসারে যুগভেদে এই বেদের কিছু কিছু রূপান্তর হইয়াছে। দেবী ভাগবতে আছে—

বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাময়া।
অল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বা কলাবথ।

কলিযুগে বিষ্ণু ব্যাসরূপে বেদকে বহুভাগে বিভক্ত করিলেন। মানবের হিতসাধনের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বুঝিলেন ব্রাহ্মণদিগের পরমায়ুও কমিয়া গিয়াছে, বুদ্ধিও কমিয়া গিয়াছে। কাজেই এখন আর তাঁহারা সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে পারিবেন না।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য পুরাণের অন্যান্য শিক্ষার সহিত মিলাইয়া আলোচনা করিলে আমরা একটি মহাসত্য বা বিশ্বব্যবস্থায় একটি অতি প্রয়োজনীয় রহস্য বুঝিতে পারিব।

সিদ্ধ মহর্ষিগণের অভিভাবকতা।

সিদ্ধ মহর্ষিগণ এখনও রহিয়াছেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই অনলসভাবে এই জগতের যাবতীয় ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারাই মানবের অধিকার ও প্রয়োজন বুঝিয়া যুগে যুগে শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা এই মানব-জগতের অভিমুখে সচ্চিন্তার তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন। যাঁহারা উপযুক্ত অধিকারী, তাঁহারা এই সচ্চিন্তার তরঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নবজাগরণে জাগ্রত হইয়া শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া মানবের সুশিক্ষা বিধান করিতেছেন।

যেমন মহর্ষিগণ রহিয়াছেন, তেমনি পিতৃগণ রহিয়াছেন, দেবতাগণও রহিয়াছেন। ইহা কল্পনা নহে, ইহা সত্য। দেবতাগণ ও পিতৃগণ মানবের সেবা করিতেছেন বা হিতসাধন করিতেছেন। পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদে আমাদের দেহ, মন ও প্রাণশক্তি উপযুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। দেবতাগণের কৃপায় আমাদের চারিদিকের প্রাকৃতিক অবস্থা বেশ অনুকূল অবস্থায় রহিয়াছে। বিশ্বের ব্যবস্থা এই যে মানুষ এই পিতৃগণ ও দেবগণের সেবা করিবে, আর এই দেবগণ ও পিতৃগণ মানবের সেবা করিবেন। ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই সকলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া নাই, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। বিশ্ব দৃষ্ট ও অদৃষ্ট—স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম জগৎ বা সেই জগতের অধিবাসীগণকে আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ক্রমশঃ যখন বিকশিত

পিতৃগণ

দেবতাগণ

দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জগৎ

হইবে, আমরা তখন এই সূক্ষ্ম জগৎ ও তাহার অধিবাসীগণকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে ও তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডে কে কি কাজ করিতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারিব।

ধর্ম্মের মহিমা ও বিশ্ব বিধান।

ধর্ম্মই বন্ধন, ধর্ম্মই যোগসূত্র। এই ধর্ম্মই স্থূল, সূক্ষ্ম সমুদয় জগৎকে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। আমি মানুষ ভূলোকে রহিয়াছি, আর দেবগণ স্বর্লোকে রহিয়াছেন, আমি এখান হইতে 'স্বাহা' এই মন্ত্রে যজ্ঞে হবিঃ দান করিতেছি আর স্বর্গের দেবতা তাহা পাইতেছেন। তিনি আমার দেওয়া এই উপহার পাইয়া তুষ্ট হইতেছেন, পুষ্ট হইতেছেন ; তাঁহার এই তুষ্টি ও পুষ্টি আমার উপরে ও আমাদের এই পৃথিবীর উপরে ক্রিয়া করিতেছে, তাহার ফলে পৃথিবীর কল্যাণ হইতেছে।

দেবলোক, নরলোক পিতৃলোকে মধ্যে আদান-প্রদান ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

সময়ে বৃষ্টি হইতেছে, নদীতে উপযুক্ত বন্যা হইতেছে, উপযুক্তরূপ ফল শস্য প্রভৃতি হইতেছে। সেইরূপ আমি এখান হইতে 'স্বধা' এই মন্ত্র বলিয়া পিতৃলোককে কব্য প্রদান করিতেছি, তাঁহারা তাহা পাইতেছেন এবং পাইয়া তুষ্ট ও পুষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের এই তুষ্টি ও পুষ্টি আমার উপর ক্রিয়া করিতেছে, আমার দেহযন্ত্র ও মন তাঁহাদের শক্তিতে পুষ্ট ও সুরক্ষিত হইতেছে। এই প্রকারে লোকলোকান্তরের মধ্যে আদান প্রদান চলিতেছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ছোট বড় সকলেই এক বিরাট্ ও মহান্ সম্বন্ধসূত্রে গাঁথা হইয়া স্ব স্ব মর্য্যাদা পালনপূর্ব্বক ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। এই মহাসত্য সকলে বুঝিতে পারে না আসুরি-প্রকৃতিসম্পন্ন লোক ইহা বুঝিবার জন্য চেষ্টাও করে না।

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই মহাসত্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তান্ প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

পুরাকালে ভগবান্ প্রজাপতি প্রজাসমূহকে যজ্ঞসহ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন,
গীতার প্রমাণ —হে প্রজাগণ তোমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। যজ্ঞ তোমাদের বাসনা পূর্ণ করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে বর্দ্ধিত কর, দেবগণও তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন। এই প্রকারে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম কল্যাণ লাভ করিবে। দেবতা-সমূহ যজ্ঞের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভিমত ভোগ্যবস্তুসকল দান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবপ্রদত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ দেবতা-দিগকে দান না করিয়া ভোগ করে, সে ব্যক্তি চোর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাধুগণ যজ্ঞ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভোজন করিয়া যাবতীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাহারা আপনার জন্য খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করে সেই পাপাত্মাগণ পাপই ভোজন করে। এই শ্লোকগুলির আলোচনাকালে মনে রাখিতে হইবে, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম একার্থবাচক।

চণ্ডীর প্রমাণ মার্কণ্ডের চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে অর্থাৎ মধুকৈটভবধের পূর্ব্বে ব্রহ্মা যখন দেবীর স্তব করিতেছেন, তখন প্রথমেই বলিতেছেন—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥

হে নিত্যে, অক্ষরে—ব্রহ্মস্বরূপে, তুমি স্বাহা,—দেবতাদিগকে হবিঃদানের মন্ত্ররূপা, তুমি স্বধা—পিতৃলোকের কব্যদানের মন্ত্ররূপা, তুমি বষট্‌কার ইন্দ্রকে হবিঃদানের মন্ত্ররূপা, তুমি উদাত্তাদি স্বরের আত্মা স্বরূপা, তুমি অমৃতরূপা। তুমি অকার, উকার ও মকার-রূপা। তুমি সত্বরজস্তমোময়ী।

এই প্রার্থনায় দেবীকে প্রধানতঃ মন্ত্রস্বরূপা বলা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্ররূপে বা শব্দরূপে তিনি কি করিতেছেন? তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন, আর তিনি এইভাবে আছেন বলিয়াই মানব, পিতৃগণ, দেবগণ, সকলেই এক সূত্রে গাঁথা হইয়া, একই মহাজীবনের অংশী হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মকে সেতু বলা হইয়াছে আর পরমেশ্বরকে সেই সেতুর কর্ত্তা, বক্তা
ধর্ম্ম সেতু। ও অভিরক্ষিতা বলা হইয়াছে।

স ধর্ম্মসেতুনাং কর্ত্তাবক্তাভিরক্ষিতা।

এখানে ধর্ম্মকে সেতু বা সাঁকো বলা হইয়াছে। যেমন মধ্যে একটি বড় নদী আর দুই পারে দুইটি গ্রাম। এক গ্রামের লোকের সহিত অন্য গ্রামের লোকের কোন সম্বন্ধ নাই। যাওয়া আসা নাই, দেখা শোনা নাই, দেওয়া নেওয়া নাই, এককথায় কোনই সম্পর্ক বা সম্বন্ধ নাই, কারণ নদী খুব বড়, পারাপারের উপায় নাই। তাহার পর সেই নদীতে সাঁকো হইল। যেমন সাঁকো হওয়া, অমনি দুই গ্রামের মধ্যে নদীর ব্যবধানসত্ত্বেও তাহারা এক হইয়া গেল।

তেমনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দ্দশ ভুবন। একটি ব্রহ্মাণ্ড নহে, এমন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। দেবী-ভাগবতে আছে সমুদ্রের তীরে বসিয়া একজন বালুকাকণার সংখ্যা গণনা করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা যে কত, তাহা কেহ গণনা করিতে পারে না। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল। দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, ঋষি, মুনি, ভূত, প্রেত, পিশাচ, নাগ, বেতাল, বটুক, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী ডাকিনী, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, গ্রহ, উপগ্রহ, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, বর্ষ, মরুভূমি, ধাতু, প্রস্তর, উদ্ভিদ কত কি রহিয়াছে, সীমা নাই, সংখ্যা নাই। কাহারও শক্তি নাই এই সমুদয় একসঙ্গে ধারণা করে। কিন্তু এই সমুদয় একসঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে; এক ইচ্ছায় এক জ্ঞানে একই সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একই লক্ষ্যের অভিমুখে সকলেই চলিয়াছে। এই যে সম্বন্ধ এই সম্বন্ধই ধর্ম্ম, ইনিই সেতু।

ধর্ম্মকে এই কারণে সেতু বলা হইল। ধর্ম্ম সকলকে একসঙ্গে ধারণ করিয়া পালন করিতেছেন। 'সেতু' কথাটি শ্রীমদ্ভাগবতে বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, এই ধর্ম্ম সনাতন, এবং এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি যুগভেদে মানুষের রুচি ও অধিকার-ভেদ নিবন্ধন আপনাকে ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই কারণেই শিবমহিম্নস্তোত্রে কথিত হইয়াছে—

রুচিভেদে সাধনপথের ভিন্নতা, কিন্তু লক্ষ্য এক।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

ধর্ম্মের বিবিধরূপ সাধন-পথ রহিয়াছে। কেহ ত্রয়ী বা বেদের কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি

লইয়া ব্যস্ত, কেহ কর্ম্মকাণ্ডের দিকে বড় একটা যান না, সাংখ্য বা আত্মতত্ত্ব লইয়া রহিয়াছেন। কেহ যোগী, কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব। এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন পথ। রুচিভেদ-নিবন্ধন মানুষ ঋজু ও কুটিল, নানারূপ পথ ধরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বশেষে সকলেই তোমাকেই লাভ করে, যেমন নদীসকল সোজা বা বাঁকা যে পথ দিয়াই যাউক, সর্ব্বশেষে একই মহাসমুদ্রে পতিত হয়।

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে আছে—

ভিন্ন ভিন্ন আগমের দ্বারা সিদ্ধির পথ নানারূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু জাহ্নবীর বহুধারা যেমন একই সাগরে পতিত হয়, সেইরূপ সমুদয় সাধন-পথই সাধককে এক তোমাতেই লইয়া যায়।

বেদান্তের একটি সূত্র আছে—অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টে

ইহার ভাষ্যে আমরা জানিতে পারি—রৈক্য, বাচক্নবি প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচার বিহীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

হে ভগবান্, তুমি সুভদ্রশ্রবা, অর্থাৎ তোমার কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইয়া থাকে। কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, সুহ্ম, যবন, খশ আদি জাতি এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তি তোমার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হইয়াছে অতএব তোমাকে প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার অনুবাদ আছে

আমারে তো যে যে ভক্ত, ভজে যে যে ভাবে।
আমি সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

শ্রীভগবান্ তাহার পর বলিতেছেন—সকল পথই আমার।

এই সমুদয় উক্তি সনাতন ধর্ম্মের উদারতার পরিচায়ক। এ প্রকারের উদারতা পৃথিবীতে প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম্মেই নাই।

এই কারণেই ধর্ম্মসেতু এই কথাটি বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকটি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে শ্রীভগবান্ এই ধর্ম্মসেতু-সমূহের কর্ত্তা। তিনি প্রজাসৃষ্টির জন্য ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে পালন করিবার জন্য ধর্ম্মকে অবতারিত করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করিয়া যে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে।

শ্রীভগবানের ধর্ম্মরক্ষা।

তিনি এই ধর্ম্ম-সেতু-সমূহের বক্তা। ইহার অর্থ এই, তিনি নিজের শক্তিতে আচার্য্যগণকে সক্ষম করিয়া যুগে যুগে এই, ধর্ম্ম মানবকে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেবলই তাহাই নহে, তিনি "অভিরক্ষিতা"। তিনি সর্ব্বদাই জাগ্রত। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখনই তিনি আসেন এবং এই ধর্ম্মকে তিনি রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন, আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, অসাধুদের বিনাশের জন্য, এবং ধর্ম্মসংরক্ষণ বা সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পর মহাদেবী দেবগণকে বলিয়াছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

এইরূপে যখন যখন অসুরগণকর্ত্তৃক উৎপাত ঘটিবে, তখনি তখনি আমি আবির্ভূত হইয়া শত্রুসংহার করিব। গীতা ও চণ্ডী উভয়েরেই কথা এক।

অবতার-কথা বেদে আছে। তবে বৈদিক সাহিত্যের যে অংশ আমরা পাইয়াছি তাহাতে অবতার-কথা খুব সংক্ষেপে আছে। এখনকার দিনে পাশ্চাত্য-বিদ্যা-বিড়ম্বিত-বুদ্ধি অনেক লোক বলেন অবতার-বাদ সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ইহা পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই কথা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়।

ভগবানের অবতার হয়, ভগবতীর অবতার হয়, শিব, অনন্ত, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতির অবতার হয়। তাহা ছাড়া সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কখন অবতীর্ণ হইয়া, আবার কখন উপযুক্ত পাত্রে আবেশ করিয়া মানবের হিতার্থে কার্য্য করেন। ইঁহাদের সকলেরই কার্য্য ধর্ম্মরক্ষা ও মানবের হিতসাধন। এই মহাসত্য ভুলিয়া গেলে ভগবান্ কেমন করিয়া এই বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন তাহাই আমরা বুঝিতে পারিব না। মনু, সপ্তঋষি, দেবতা প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির সেবা করিতেছেন। শাস্ত্রের আলোচনা করিলে মানুষ ইহা বুঝিতে পারিবে, আর সাধনপথে অল্পমাত্র অগ্রসর হইলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে।

৪। বেদের পরিচয়।

সনাতন ধর্ম্ম বৈদিক। বেদ এই ধর্ম্মের ভিত্তি। বেদ চারিটি—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ। প্রত্যেক বেদ তিন ভাগে বিভক্ত। ১। মন্ত্র বা সংহিতা, ২। ব্রাহ্মণ, ৩। উপনিষৎ। মন্ত্র অংশে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রযোজ্য সুসম্বদ্ধ বাক্যাবলী আছে। তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্রে শব্দগুলি বা ধ্বনি এমনভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে এই মন্ত্রগুলি যথারীতি উচ্চারণ করিতে পারিলে বিশেষ ফল, এমন কি অতি আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন হয়। মন্ত্রের বিশেষ শক্তি আছে। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

চারিবেদ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের বিধিসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে বা সংহিতা অংশে যে সমুদয় মন্ত্র আছে, তাহা কোথায় কিরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে, ব্রাহ্মণ-অংশে তাহার উপদেশ ও ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ অংশে অনেক উপাখ্যানও আছে। উপাখ্যানের দ্বারা উপদেশগুলি সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।

বেদের তৃতীয় অংশের নাম উপনিষৎ। উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, মানব ও বিশ্ব, বন্ধ মোক্ষ আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে চরম মীমাংসা কথিত হইয়াছে।

এই তিনটি অংশ ছাড়া পুরাকালে বেদের আরও একটি অংশ ছিল। তাহার নাম উপবেদ বা তন্ত্র। বর্ত্তমান-সময়ে সমুদয় তন্ত্র-সাহিত্য পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের মানুষ তন্ত্রের অপব্যবহার করিবে বলিয়া ধর্ম্মের অভিভাবক ত্রিকালদর্শী

তন্ত্র বা উপবেদ

মহর্ষিগণ উহার অনেক অংশ আপাততঃ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকারে অনেক শাস্ত্রই গোপন করা হইয়াছে। মানুষ উপযুক্ত হইলে আবার এই সমুদয় শাস্ত্র জনসমাজে প্রচারিত হইবে।

শ্রুতির মতই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায়ের লোকই শ্রুতির মীমাংসা অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শ্রুতির সাহায্যে কোনরূপ মীমাংসা করা একেবারেই অসম্ভব। প্রথমতঃ শ্রুতির অর্থবোধ অত্যন্ত কঠিন। সাধন-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত শ্রুতির তাৎপর্য্য কেহ নিরূপণ করিতে পারে না। তাহার পর সমগ্র শ্রুতি বা বৈদিক সাহিত্য বর্ত্তমান সময়ে জনসমাজে প্রচলিত নাই। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বৈদিক সাহিত্যের যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় আমরা অতি অল্পাংশই বর্ত্তমান সময়ে পাইয়াছি। মহাভাষ্যে কথিত হইয়াছে ঋগ্বেদের ২১ শাখা, যজুর্ব্বেদের ১০০ শাখা, সামবেদের ১০০০ শাখা আর অথর্ব্ববেদের ৯টি শাখা। মুক্তিকোপনিষদে বলা হইয়াছে ঋগ্বেদের ২১ শাখা, যজুর্ব্বেদের ১০৯ শাখা, সামবেদের ১০০০ শাখা, আর অথর্ব্ববেদের ৫০ শাখা।

বৈদিক সাহিত্যের পরিমাণ

বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক সাহিত্য, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিচয় আবশ্যক। ঋগ্বেদ দশ মণ্ডলে বিভক্ত, ইহার সূক্ত সংখ্যা ১০১৭। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের নাম হোতা—তিনি যজ্ঞে হবিঃদান করেন। যজুর্ব্বেদের ৪০টি অধ্যায়, ইহাতে ১৮৮৬টি শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলির প্রায় অর্দ্ধেক ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। যজুর্ব্বেদের দুইটি প্রধান বিভাগ। কৃষ্ণ বা তৈত্তিরীয়, আর শুক্ল বা বাজসেনেয়। যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের নাম অধ্বর্য্যু—তিনি যজ্ঞের কাজকর্ম্ম পরিচালনা করেন। সামবেদের ১২টি খণ্ড—উহা বত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। সামবেদে ৪৬০টি মন্ত্র আছে। ৭৫টি মন্ত্র ব্যতীত অন্য সমুদয় মন্ত্রই ঋগ্বেদে আছে। সামবেদী ব্রাহ্মণের নাম উদ্গাতা। সোমযাগে তাঁহার কার্য্য গান করা। অথর্ব্ববেদ ২০ কাণ্ডে বিভক্ত, উহাতে ৭৩১টি মন্ত্র আছে। অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণের নাম ব্রহ্মা, যজ্ঞে ইনিই প্রধান পুরোহিত। হোতা, উদ্গাতা অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃক কোন ভুল হইলে ইনি তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। অথর্ব্ববেদের আর একটি নাম ব্রহ্মবেদ।

বর্ত্তমান বৈদিক সাহিত্য

ঋগ্বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ আছে। প্রথমটির নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণে

৪০টি অধ্যায় আছে। ইহাতে সোমযাগ, অগ্নিহোত্র ও রাজসূয় যজ্ঞের বিধান আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক অংশ ঐতরেয় আরণ্যক। এই আরণ্যকেই ঐতরেয় উপনিষৎ আছে। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নাম কৌষিতকি ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের অপর নাম সাংখ্যায়ন। ইহাতে ৩০টি অধ্যায় আছে। সোমযাগ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণে কৌষিতকি উপনিষৎ ও আরও আটখানি ছোট উপনিষৎ আছে।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। অনেকে ইহার গদ্যাংশ পৃথক করিয়া বলেন, ইহাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ অংশ তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ও তৈত্তরীয় উপনিষৎ আছে। কঠোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ এবং ৩১ খানি ক্ষুদ্র উপনিষৎ কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ১০০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার আরণ্যক অংশে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ আছে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদের অপর নাম বাজসেনেয় উপনিষৎ। এই বেদের শেষ অংশে ঈশোপনিষৎ। ইহা ছাড়া আরও ১৭ খানি ক্ষুদ্র উপনিষৎ আছে।

সামবেদে তিনটি ব্রাহ্মণ আছে। প্রথম, তলবকার ব্রাহ্মণ, কেনোপনিষৎ ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয়, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ইহা ২৫ অংশে বিভক্ত। তৃতীয়, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, ইহার অন্তর্গত। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ছাড়া ইহাতে আরও ১৪ খানি উপনিষৎ আছে।

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত গোপথ ব্রাহ্মণ। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। এই বেদে অনেক উপনিষৎ আছে। মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন, ইহার অন্তর্গত। ইহা ছাড়া আরও ৩১ খানি ছোট উপনিষৎ আছে।

মুক্তিকোপনিষদে ১০০ খানি উপনিষদের নাম আছে। ইহাদের মধ্যে ১২ খানি প্রধান। এই ১২ খানির নাম—ঐতরেয়, কৌষিতকি, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, ঈশ, কেন, ছান্দোগ্য, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস

বঙ্গের অন্যতম জাতীয় কবি, সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরে, ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে সুকবি গোবিন্দচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত সংক্ষেপে প্রকাশিত করিয়াছি। সেই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যাহা বলিয়াছিলাম, বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার প্রথমাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম—

'বর্ত্তমান বঙ্গের কবি-কানন হইতে একটি কলকণ্ঠ বিহঙ্গ উড়িয়া গেল! বিষাদময় জীবনের দুঃখ-কাহিনী, আমরণ মর্ম্মন্তুদ ভাষায় মর্ম্মভেদী সুরে গাহিয়া গাহিয়া অবসন্নদেহে অনাঘ্রাত ও অনাদৃত ভাবে, আমাদের এই গায়ক-পক্ষীটি কোথায় লুটাইয়া পড়িল! আমাদের পল্লীজীবনের আত্মকথা, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, হিংসা দ্বেষ কলুষিত গার্হস্থ্য-জীবন, বিয়োগ-বিধুর পল্লীবাসীর হৃদ্গত ভাব মহিলার প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ইত্যাদি আমাদের প্রত্যেক পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন বিষাদ-গাথা, দগ্ধ ও নিষ্পেষিতের আর্ত্তসুরে উচ্চকণ্ঠে ঊর্দ্ধমুখে গাহিয়া গাহিয়া, আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিতে করিতে এবং পরে দূরান্তস্থিত পল্লীজীবনের নিরাশ্রয়তার ভাব জাগাইতে জাগাইতে, কোথায় হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

'বাল্যজীবনে যে সুর কণ্ঠ হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল, সেই সুর মানবজীবনে সম্ভাব্য যাবতীয় উত্থান পতন, অনাচার অত্যাচার, দ্বেষ হিংসার মধ্য দিয়াও, সমভাবে আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া—শতাব্দীর প্রায় একতৃতীয়াংশকাল, আমাদের কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত করিয়া—কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিগত আশ্বিন মাসে চিরতরে নীরব হইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের অভাবে, বঙ্গীয় কবি-কাননের এক অংশ পরিশূন্য হইল। আমাদের দুরদৃষ্ট, কবির জীবিতকালে আমরা তাঁহার প্রতি প্রায় একে-

---

* এই প্রবন্ধটি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিত 'স্বভাব কবি গোবিন্দদাস' নামক গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ লিখিত। গ্রন্থের আকার ডঃ ক্রাঃ ষোড়শাংশিত প্রায় ৩২০ পৃষ্ঠা; সুন্দর বাঁধাই ও চিত্র সম্বলিত; মূল্য—২ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান- শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বড়তলা পোষ্ট, ২৪ পরগণা। এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা, পরবর্ত্তী কোন সংখ্যা 'বীরভূমিতে' প্রকাশিত হইবে—লেখক।

বারেই অনবহিত ছিলাম—তাঁহার জীবনান্তেও কি তাঁহার তিল-কাঞ্চনের ব্যবস্থা হইবে না ?—তাঁহার স্মৃতি উদ্দেশে, তাহা চিতাভস্মের উপর মঠ রচনা ত দূরের কথা' !

মাত্র পাঁচ বৎসর হইল, গোবিন্দচন্দ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। আজ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, কবির জীবন ও কাব্যের সমালোচনা, বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন—ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়। বঙ্গের সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ যে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, কবি গোবিন্দচন্দ্রের জীবনী লিখিবার প্রকৃষ্ট অধিকারী ব্যক্তি। ঘটনাচক্রে—গ্রন্থকারের ও বঙ্গের পাঠকপাঠিকাগণের সৌভাগ্যবশতঃ হেমবাবু কবি গোবিন্দচন্দ্রের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পরিচয়, ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। আমি নিজে হেমবাবুকে বিশেষভাবেই জানি—বন্ধুতাক্ষেত্রে তিনি প্রাচীনপন্থীর লোক। অর্থাৎ, একালের কেবল মৌখিক বা সভাসমিতির আলাপ পরিচয় বা প্রশংসাদিতে তাঁহার সাধ পূর্ণ হয় না—তিনি যাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাকে সেকালের গ্রাম্যভাবে আপনার করিয়া লইতে চাহেন। নিজের ভাতের থালার অর্দ্ধেক অংশ বন্ধুর মুখে তুলিয়া দিতে না পারিলে, তাঁহার আশা পূর্ণ হয় না। হেমবাবুর চরিত্রের এই বিশিষ্টতাটুকু আমি নিজে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ, তাহাও এই ভাবের অনুরাগ। হেমবাবু নিজে ধনী নহেন—আমাদেরই মত একজন সাধারণ 'শ্রমজীবী' মাত্র! তিনি সুদীর্ঘকাল সুদূর ব্রহ্মসীমান্ত হইতে, কবি গোবিন্দচন্দ্রের সহিত পত্রাদি ব্যবহার করিয়াছেন,—সুবিধামত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছেন—কবির জীবনের যাবতীয় সংগ্রাম, কবি-হৃদয়ের সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্য—নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। এই কারণেই বলিতেছি—তিনি গোবিন্দচন্দ্রের জীবনী লিখিবার উপযুক্ত অধিকারী।

এই প্রকারের অধিকারী পুরুষ, বর্ত্তমান যুগে নিতান্তই দুর্ল্লভ। এখনকার দিনে, মানুষের বাহজীবন ও অন্তর্জীবন বা সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন—এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া যাইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে, নামজাদা লোকের সহিত, পরিচিত হইবার সুযোগ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রসার (complexity) ইহার কারণ। সুতরাং জীবন-চরিত লেখাও ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

হেমবাবুর এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে, আমি কিছুই বলিব না—দরকার হইলে অন্য কোন সময়ে বলিব। বর্ত্তমান ভূমিকায় আমার বলিবার প্রধান কথা এই যে, সুপ্রসিদ্ধ জীবন-চরিতাখ্যায়ক বস্‌ওয়েল্, যেমন

জনসনকে, তাঁহার উপাস্য দেবতা (Hero) করিয়া জনসনের জীবনচরিত লিখিবার জন্য অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সুদীর্ঘকাল সাধনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই গ্রন্থের লেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও, সুদীর্ঘকাল কবি গোবিন্দচন্দ্রকে বুঝিবার জন্য এবং প্রয়োজন হইলে, সাধারণের নিকট তাহা বুঝাইবার জন্য, যথারীতি সাধনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি যে সাধনার ফল ও তপস্যার ধন, তাহা আমি অসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক জীবনচরিত—হরাতি রচনা। এই সমুদয় গ্রন্থের লেখকগণ প্রায়ই মনীষি ব্যক্তি। সুতরাং, এই সমুদয় গ্রন্থে অনেক বড় বড় তত্ত্বকথা, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও ঔপন্যাসিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনচরিত হিসাবে, ঐ সমুদয় গ্রন্থের স্থান মোটেই উচ্চ নহে। কারণ, ঐ সমুদয় গ্রন্থে অনেক স্থলেই আসল মানুষটি হারাইয়া যায়। লেখকের সহিত, যাঁহার জীবনী, তাঁহার সহিত ভালরূপ ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকায়, এইরূপ হইয়া থাকে। বড় বড় তত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্যক্তিবিশেষের জীবনকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই মানবতার যুগে, প্রথম আবশ্যক—মানুষকে তাহার ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ও জয়-পরাজয়ের মধ্যে দেখা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই গ্রন্থ, কবি গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ। কবি গোবিন্দচন্দ্রকে বাঙ্গালী জাতি, যদি উপযুক্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর, এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নানাদিক হইতে নানারূপ আলোচনা হইবে। সেই আলোচনার ফলে, আমরা ক্রমশঃ গোবিন্দচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য-সাধনাকে যথার্থরূপে আমাদের আপনার করিয়া লইতে পারিব।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে, কবির ব্যক্তিত্ব লইয়া আলোচনা ছিল না। পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থে, বহু কবির কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে এবং রসতত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম বিধানের অনুবর্ত্তনে, কবিতাগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ কবিকে, ধরিবার ও দেখিবার উপায় নাই। এখন সাহিত্যে, সমাজে ও মানব-জীবনে যে যুগ চলিতেছে, তাহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। মানুষ, মানুষকে বুঝিতে চাহে—ইহাই এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। গোবিন্দচন্দ্র কবি—কিন্তু প্রথমে আমরা তাহাকে মানুষ বলিয়া ধরিতে ও বুঝিতে চাই। তাঁহার কাব্য সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর, তাঁহার কবি প্রতিভার ক্রমবিকাশ, তাঁহার কবিহৃদয়ের বিভিন্নমুখী গতি প্রভৃতি আমরাও 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের সাহিত্য সভাসমূহে যদি বৎসর বৎসর গোবিন্দদাসের স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়, বঙ্গের কাব্য সমালোচকগণ ও কাব্য রসবিদ্‌গণ যদি গোবিন্দচন্দ্রের রচনার প্রতি মনোযোগী হন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যের ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা ক্রমেই অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইব। কিন্তু কবির পরলোক গমনের অল্পদিন পরে, এই শ্রেণীর একখানি

জীবনচরিত গ্রন্থ—কবিকে ভালরূপে জানিতেন এবং পূর্ব্ব হইতে নিঃস্বার্থভাবে বিশুদ্ধ অনুরাগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন—এই প্রকারের কোন অনুরক্ত লেখক কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রচারিত না হইলে আমাদের ভবিষ্যতের আলোচনা বিশেষরূপ অসুবিধাজনক হইত।

লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এই গ্রন্থখানি রচনা ও প্রচারিত করিয়া, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মানুষ মাত্রেরই জীবন, একটি দুরধিগম্য রহস্য! একজন লোক, কোন মানুষের জীবন সম্বন্ধে, সবকথা বলিতে পারে না। আমরা প্রকৃতই বহুরূপী। কাজেই, যাঁহাদের জীবনের ঘটনা আমাদের বলিবার বিষয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি লোক যদি, নিজ নিজ মন্তব্য ও ধারণা প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে ভবিষ্য যুগের উপকার হয় এবং মানবজাতির জ্ঞানোন্নতির সাহায্য হইয়া থাকে। হেমবাবু যাহা জানেন এবং যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন। এখনও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে পর, তাঁহারা যদি নিজ নিজ অভিমত প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান গ্রন্থকারেরও উপকার—আমাদেরও সকলেরই উপকার হয়।

এই ভূমিকার উপসংহারে, একটি কথা বিশেষভাবে হৃদয়মধ্যে জাগরিত হইয়া আমাকে ব্যথিত করিতেছে। 'নব্যভারতের' সম্পাদক, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থের ভূমিকা তাঁহার দ্বারা লেখাইয়া লইলে ঠিক্ হইত। আমি নিজে হেমবাবুর সহিত গোবিন্দচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা অনেকদিন হইতেই জানি। আর গোবিন্দচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে না জানিলেও, তাঁহার স্বচ্ছ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন কবিতাগুলি নিয়মিতভাবে উপভোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং তাঁহার জীবনের সুখদুঃখও যতদূর সম্ভব, দূরে বসিয়া জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে নরপূজার অভাব নাই—ইহা সুলক্ষণ। কিন্তু এই পূজায় নিষ্কামতা কতখানি, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। কেবল নিষ্কামতা নহে, নিরপেক্ষতা কতখানি তাহাও দেখিতে হইবে। গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন—তাঁহার কোন প্রতিপত্তিশালী উত্তরাধিকারী বা আত্মীয় নাই। সুতরাং তাঁহার স্মৃতি সভাই বা কে করে—আর উপযুক্ত লোকদ্বারা জীবনচরিত লেখার ব্যবস্থাই বা করে কে? তিনি দরিদ্র ছিলেন—অন্নাভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাহার উপর নিতান্ত 'গ্রাম্য' লোক ছিলেন। সুতরাং ভবিষ্যতে জীবনচরিত লিখিতে হইবে বলিয়া যে তাহার উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সযত্নে রাখিয়া যান নাই, তাহা সুনিশ্চিত সত্য। এই অবস্থায় কবির মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে, হেমবাবুর ন্যায় একজন দরিদ্রব্যক্তি, দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন এবং নিজের অবস্থার অতীত অর্থব্যয় করিয়া, এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন,

ইহা বড় কম কথা নহে! আবার ভূমিকা লিখিবার জন্ত, আমার ন্তায় সামান্ত ব্যক্তির শরণাগত হওয়া —ইহাও তাঁহার অতি দুঃসাহসের পরিচয়!

আমি তাঁহার নিরপেক্ষতা ও নিষ্কামতার প্রশংসা করিতেছি—আশা করি, বঙ্গীয় পাঠকগণ এই গ্রন্থখানিকে সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিবেন।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

মাসিক সাহিত্য

চিকিৎসক—গত বৈশাখ মাস হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক এই মাসিকপত্রখানি বোলপুর হইতে অতি সুনিয়মিতভাবে ও দক্ষতার সহিত প্রকাশিত হইতেছে। ডাক্তার শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ ইহার সম্পাদক; আর ডাক্তার শ্রীরাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা আট আনা। 'আমাদের সমগ্র কর্ম্মজীবন ও চিন্তাজীবন কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত হওয়া ভাল নহে, মফঃস্বলে কর্ম্মের ও চিন্তার স্বাধীন কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হউক'—আমাদের এই সঙ্কল্প যে সকল হইবে—তাহার প্রমাণ, এই চিকিৎসক। যেরূপ দক্ষতার সহিত কাগজখানি চলিতেছে, তাহাতে দেশে যদি গুণের আদর থাকে, তাহা হইলে অচিরেই এই কাগজখানির বহুল প্রচার হইবে। চিকিৎসকগণের একটি সংঘও এই পত্রখানিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধা-প্রসঙ্গ

ভূমিকা

ভাগবত-সম্প্রদায় ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা-সম্বন্ধে এ কালের প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহার ফলে অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে। আমরা যখন একালের লোক তখন এই সব আলোচনা ও সিদ্ধান্তের খবর রাখা আবশ্যক।

একটি মত, শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা ও ভাগবত-সম্প্রদায়ের 'ঐকান্তিন্' নামক শাখা, মূলে ভারতবর্ষের নিজের জিনিষ নহে। ইহা মূলতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। প্রতীচ্য পণ্ডিত গ্রিয়ার্‌সন্, বেবার প্রভৃতি এই মতের প্রচারক। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ তাঁহারা মহাভারত হইতে বাহির করিয়াছেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীয় উপাখ্যানে আছে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপে—(পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে সিরিয়ায়)—প্রথম যুগের খৃষ্ট-উপাসনা দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান হইতেই পণ্ডিতেরা বলিতেছেন—ভারতের কৃষ্ণ-উপাসনা ও ভক্তিবাদ খৃষ্ট-উপাসনারই রূপান্তর-মাত্র। এই মত একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-কর্ত্তৃক এই মতের অযৌক্তিকতা অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর ভাস-কবির নাটকসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই প্রকারের কথা আর কেহই বলিবেন না। কারণ ভাস-কবি খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহার নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক কিনা—একথা লইয়াও অনেক আলোচনা হইয়াছে—অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত দেখাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ মোটেই ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন। সমুদয় ব্যাপার কাল্পনিক বা রূপক-মাত্র। কেহ বলেন মথুরার বৃষ্ণি-বংশীয় বাসুদেব ঐতিহাসিক পুরুষ, কিন্তু তিনি বৈষ্ণবদের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ নহেন। আবার কেহ বলেন বৈষ্ণবধর্ম্মের

বাসুদেব আর বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব পৃথক্। কেহ বলেন বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, সূর্য্য-উপাসনারই প্রকারভেদ—ইহার সহিত কোন ঐতিহাসিক ব্যাপারের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণ একজন জাতীয় দেবতা Tribal God। কেহ বলেন তিনি উদ্ভিদ্-জন্মের দেবতা Vegetation Deity। আধুনিক পণ্ডিতগণের এই সমুদয় সিদ্ধান্তের ভিতর কিছু কিছু সত্য আছে। কিন্তু তাঁহারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কখনই সারোদ্ধার হইবে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিন প্রকারের চিন্তা ও অনুভবপ্রণালী, শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার ভিতর মিশিয়া রহিয়াছে। ঐতিহাসিকের কৃষ্ণ, পৌরাণিকের কৃষ্ণ, আর ভাবুকের কৃষ্ণ। ইতিহাস, লীলা আর নিত্যলীলা, এই তিনটি ব্যাপার বুঝিতে হইবে।

পুরাণে, সূর্য্যপূজা এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ ও বর্ষের উপাসনা-পদ্ধতি সম্মিলিত অবস্থায় রহিয়াছে। আবার ভাবুকের পদ্ধতি অন্যরূপ। আমরা তাড়াতাড়ি যাহা হউক একটা কিছু মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যদি চেষ্টা না করি, প্রাচীন আচার্য্যগণ পুরাণ ও কৃষ্ণকথা যেভাবে বুঝাইয়াছেন, ভক্তভাবুকগণ এই কথা বা লীলা যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন, যদি অধ্যবসায়-সহকারে ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাহার সংবাদ লই, তাহা হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে এমন অনেক মহাসত্যের পরিচয় পাইব, যাহার অতিক্ষীণ আভাস মাত্র একালের পাণ্ডিত্যের নিকট প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু ধরা পড়িতেছে না।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার পর আরও অনেক পণ্ডিত দেখাইয়াছেন—মূলে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ইতিহাসের সহিত অনেক রূপকথা, উদ্ভট চিন্তা প্রভৃতি মিশিয়া এখনকার প্রচলিত কৃষ্ণকথা গড়িয়া তুলিয়াছে। নানাপ্রকারের প্রচীন গ্রন্থ শিলালিপি প্রভৃতি অন্বেষণ করিয়া এই যে আলোচনা, ইহা নিন্দনীয়ও নহে, উপেক্ষণীয়ও নহে, ইহার বিশেষ মূল্য আছে। তবে এই আলোচনা-সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা, এই আলোচনায় তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে—কারণ প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের—যথেষ্ট পরিমাণে এখনও পাওয়া যায় নাই। আবার প্রতীচ্য দেশের পণ্ডিতেরা কেবল ভারতের নহে, ব্যাবিলন্, আসিরিয়া, মিশর, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীনকালের সকল দেশেরই ইতিহাসের আলোচনায়, কতকগুলি বদ্ধ সংস্কার ও পূর্ব্বপোষিত ধারণা লইয়া

অনুসন্ধান ও আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে, তাঁহাদেরই শিষ্য। আবার অনেকে তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারী, অথবা অধীন কর্ম্মচারীগণের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কর্ম্মচারী হইবার জন্য চেষ্টিত। কাজেই অনেক সময়েই আমাদের অজ্ঞাতসারে এই সমুদয় সংস্কার আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। খুব সাবধান হওয়া উচিত, সকল দিকের সকল কথা শুনিয়া, সব দিক্ ভাবিয়া ও বুঝিয়া আলোচনায় অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। মানসিক জীবনে ক্রীতদাস হওয়াই মানসিক আত্মহত্যা।

ইহা ছাড়া আর একটি খুব বড় কথা আছে—ঐতিহাসিকের বা প্রত্নতত্ত্ববিদের কৃষ্ণ আর উপাসক বা সাধকের কৃষ্ণ, ঠিক্ এক নহে। উভয়ের মধ্যে কিছু সম্বন্ধ অবশ্য আছে—বা পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই—থাকিলেও অতি সামান্য।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নিজেদের পথে অগ্রসর হউন, কিন্তু উপাসনার কৃষ্ণ বলিতে কি বুঝায়, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা না বুঝিয়া যেন মনে না করেন, যে ঐতিহাসিকের আলোচনা-পদ্ধতি আর ধর্ম্মব্যাখ্যাতার আলোচনা-পদ্ধতি একরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র এইস্থানে একটি ভয়ানক ভুল করিয়া গিয়াছেন—বড়লোকের বড় ভুলের প্রেতাত্মা আমাদের অনেককেই পাইয়া বসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ছাত্রগণকে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। স্বল্পশিক্ষিত ও ব্যবসায়ী প্রত্নতাত্ত্বিককে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া খুব কঠিন, অসম্ভব বলিলেও হয়।

যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, মূলে শ্রীকৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক পুরুষ—তবে তাঁহার ইতিহাসের সহিত পৌরাণিক কিম্বদন্তী, রূপকথা, কবির উদ্ভট কল্পনা প্রভৃতি মিশিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই মতেরই প্রচারক।

আমরা বলিতে চাই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, পৌরাণিক কৃষ্ণ, আর ভাবুকের কৃষ্ণ এই তিনটিকে পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে। ইতিহাস কি, তাহা আমরা জানি। কিন্তু পুরাণই বা কি, আর ভাবুকতাই বা কি, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রশ্নের চাকা ঘুরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র মনোযোগ-

সহকারে আগাগোড়া পড়ুন বা না পড়ুন, এই প্রশ্নটি অনেকেরই জানা আছে। কেহ পড়িয়াছেন, কেহ বা শুনিয়া শিখিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রশ্নটি প্রায়ই জিজ্ঞাসিত হয়। কেন জিজ্ঞাসিত হয় তাহা বুঝা যায় না। যিনি প্রশ্ন করেন, তিনি হয়ত জানাইতে চাহেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন, অথবা তিনি জানাইতে চাহেন শ্রীকৃষ্ণ-কথা বা শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার ভিতর অপ্রামাণিকতা আছে, ইহা তিনি জানেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, নামও নাই গন্ধও নাই। কিন্তু 'গন্ধ' খুব ভালরকমই আছে, আর নামের আভাস আছে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—এবং তাহার মীমাংসাও করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম স্পষ্টভাবে নাই—ইঙ্গিতে অবশ্য আছে। স্পষ্ট-ভাবে নাম নাই—কিন্তু শ্রীরাধার প্রসঙ্গ আছে—এবং ভালরূপেই আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কি প্রকারে শ্রীরাধার কথা আছে তাহাই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে।

১। রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার গভীর রহস্য বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঁচটি অধ্যায়, যাহা শ্রীশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায় নামে পরিচিত, তাহার বিশেষরূপ আলোচনা করা আবশ্যক। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের যেটি প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধের উনত্রিশের অধ্যায়, তাহার শেষের শ্লোক অর্থাৎ আটচল্লিশের শ্লোকটির অর্থ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্লোকটি এই—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

তাসাং—তাহাদিগের—সেই ব্রজসুন্দরিগণের, তৎ—সেই—সৌভগমদং—সৌভাগ্য হইতে উৎপাদিত যে গর্ব্ব, তাহা—বীক্ষ্য—দেখিয়া, মানঞ্চ মানকে দেখিয়া, কেশবঃ—শ্রীকৃষ্ণ, প্রশমায়—যাহাদের গর্ব্ব হইয়াছে তাহাদের সেই গর্ব্ব প্রশমিত করিবার জন্য, প্রসাদায় —যাহার বা যাহাদের মান হইয়াছে, সেই মান প্রসাদিত করিবার জন্য, তত্র এব—সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ইহার পূর্ব্বে যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যদিও আত্মারাম, তথাপি ব্রজগোপি-গণের প্রেম-বৈক্লব্যময় কথা শুনিয়া আহ্লাদের সহিত সদয়ভাবে তাহাদের সহিত খেলা করিতেছিলেন। সেই খেলাও শ্রীমদ্ভাগবত চারিটি শ্লোকে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া-ছেন ; যথা

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাস দ্বিজ-কুন্দ-দীধিতি
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
জুষ্টং তত্তরলানন্দিকমলামোদবায়ুনা ॥
বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরু
নীবি-স্তনালভন-নর্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের প্রিয়তম। সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপরামাগণ উৎফুল্লমুখী ও সম্যক্‌ভাবে মিলিতা হইয়াছেন। সেই গোপাঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত, ভক্ত-গণের অভীষ্টদায়ক ভগবান্ অচ্যুত (সর্ব্বশোভাময়, সর্ব্বরসময়) উদারহৃদয়ে হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই হাস্যে তাঁহার দন্তশ্রেণী সুবিকশিত মল্লিকাপুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, আর সেই দন্তশ্রেণীর বিমল ও স্নিগ্ধ কিরণের দ্বারা, যদিও শ্রীভগবান্ অনন্তসৌন্দর্য্যময়, তথাপি তাঁহার শোভা যেন আরও বাড়িয়া গেল।

শত শত রমণীগণের নায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন, গোপাঙ্গনা-গণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া সেই গানের অনুবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা। (পঞ্চবর্ণ পুষ্পের দ্বারা রচিত মালা) বনভূমি বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত। এই অবস্থায় তাঁহারা সেই বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

যমুনানদীর বুকে তরঙ্গমালা সুখে নৃত্য করিতেছে, সেই তরঙ্গ-স্পৃষ্ট সুশীতল বায়ু বিকশিত পদ্মের সৌরভ বহন করিয়া বালুকাময় পরম-মনোরম পুলিনদেশে প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বনভ্রমণ করিয়া গোপললনাগণ-সহ সেই পুলিনে আসিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ বাহু-প্রসারণ, আলিঙ্গন, করগ্রহণ, অলক, উরু, বস্ত্র-গ্রন্থি প্রভৃতির স্পর্শন, পরিহাস, নখাগ্রপাত, নানাবিধ ক্রীড়া অবলোকন ও হাস্য দ্বারা ব্রজরামাগণের রতিপতি উত্তম্ভিত করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। (উত্তম্ভিত—কথার অর্থ বর্দ্ধিত, উদ্দীপিত ও নিরস্ত।)

এই প্রকারে স্বাধীনভাবে এবং প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানের সহিত ক্রীড়া করিবার অধিকার পাওয়ায়, তাঁহারা মনে করিলেন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত রমণী আছে, তাহারা কেহই এ প্রকারের নায়ক লাভ করিতে পারে নাই। আর প্রত্যেকের মনে হইতে লাগিল এই স্থানে যত নারী আছে, তাহাদের মধ্যে কেহই আমার মত সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহারই নাম গর্ব্ব। সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয় ও ইষ্ট-লাভাদিহেতু অন্যের প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব জন্মিয়া থাকে, তাহারই নাম গর্ব্ব।

সৌভাগ্য-রূপ তারুণ্য-গুণ সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ব্রজরমণীগণেরই এই গর্ব্ব অবশ্য স্থায়ীভাব নহে, ইহাকে সঞ্চারীভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। সমুদ্রের বুকের উপর যেমন বড় ছোট ঢেউগুলি উঠিয়া নানারূপ খেলা করিয়া আবার সেই সাগরেই মিলাইয়া যায়, সেইরূপ স্থায়ীভাবের উপরে সঞ্চারীভাবের খেলা হইয়া থাকে, এবং তাহাতে স্থায়ীভাবের ব্যাঘাত হয় না, তাহাতে স্থায়ীভাবের পুষ্টিই হইয়া থাকে। কেবল পুষ্টি নহে—স্থায়ীভাবের সৌন্দর্য্য তাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং স্থায়ীভাবের সম্ভোগ বা আস্বাদন হইয়া থাকে।

যাহা হউক ব্রজদেবীগণের চিত্তে সৌভাগ্য-গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। আমরা প্রথমে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি এইবার সেই শ্লোকটির তাৎপর্য্য অবধারণ করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ কেশব অর্থাৎ ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির নিয়ন্তা, সুতরাং তাঁহার না জানাও কিছু নাই,

অসাধ্যও কিছু নাই। তিনি গোপীদিগের ভিতর তুইটি জিনিস দেখিলেন—সৌভাগ্যগর্ব্ব ও মান, বিশেষ করিয়া দেখিলেন। সৌভাগ্যগর্ব্ব ও মান, এই তুইটি তুই রকমের ব্যাপার। একই লোকের একই সময়ে এই তুইটি হইতে পারে না। স্তরাং কাহারও সৌভাগ্যগর্ব্ব কাহারও মান, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চাহেন কি? প্রশমন ও প্রসাদন। সৌভাগ্যগর্ব্বের প্রশমন, আর মানের প্রসাদন, ইহাও খুব স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই তুইটি উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সেইস্থানেই অন্তর্হিত করিলেন। মূলশ্লোকে ক্রিয়াপদটি কর্ত্তরি-কর্ম্মবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, স্তরাং নিজেই নিজেকে অন্তর্হিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া যাহাদের গর্ব্ব হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে তাহাদের গর্ব্ব চূর্ণ হইবে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু, যাঁহার বা যাহাদের মান হইয়াছে, ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাঁহার বা তাহাদের প্রসাদন কি প্রকারে হইবে? রসতত্ত্বের অতি সামান্যমাত্র বোধ থাকিলেই এইরূপ সংশয় মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে।

কাজেই এই শ্লোকের অর্থ প্রাচীন আচার্য্যগণ যাহা করিয়াছেন তাহাই স্বাভাবিক। এই শ্লোকের ব্যাখায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলিয়াছেন—

ততশ্চ সর্ব্বাসু ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ষাকষায়িতাক্ষী মানিনী বভুব ততো নূনা অন্যাঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববত্যো বভুবুরিত্যদ্ভুতে বৈমত্যে সতি ভগবতৈব যত্তত্র সমাহিতং তদাহ।

ভগবান্ সমুদয় গোপীদিগের সহিত সমানভাবে বা সাধারণভাবে বিহার করিতেছিলেন, এই কারণে যিনি সকলের প্রধানা, সেই বৃষভানুকুমারী শ্রীমতী রাধিকা সহসা মানিনী ও ঈর্ষাকষায়িতাক্ষী হইলেন। অন্যান্য গোপীরা সৌভাগ্যগর্ব্ববতী হইলেন। এই প্রকারের বৈমত্য যখন উপস্থিত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এখানে বুঝিতে হইবে তিনি বৃষভানুনন্দিনীকে সেখান হইতে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শ্লোকটির অর্থবিচারে অবশ্য শ্রীরাধাকে লইয়া যাওয়া বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু মান যখন প্রসাদিত করিতে হইবে, তখন যাহার বা যাহাদের মান, তাহাকে বা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। অবশ্য অন্যান্য কথা ইহার পর ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীরাধাপ্রসঙ্গ এই প্রকারে ঈঙ্গিতে বলা হইয়াছে।

২। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ

রাস-পঞ্চাধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায় বা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের নাম শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ। শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল ছাড়িয়া গেলে ব্রজদেবীগণ কাতর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছেন। বিরহের প্রথমাবস্থা উন্মাদের অবস্থা, তাহার পর এই উন্মাদ অবস্থা যখন কমিয়া আসিল, যখন তাহাদের অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা আসিল, তখন তাহাদের বাহিরে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সে সময়ে ব্রজাঙ্গনাদের অবস্থা এইরূপ। তাঁহারা দূর হইতে যখন যে বস্তুতে দৃষ্টিপাত করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে সেই বস্তুর বাহিরে দেখিতে পান, আবার যখন নিকটের কোন বস্তুতে দৃষ্টিপাত করেন, তখন অনুভব করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বস্তুর ভিতরে রহিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহারা বৃক্ষগণকে সেই পুরুষ যে কৃষ্ণ, তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইহাই অন্বেষণের প্রথমাবস্থা, আমরা নিম্নে দুইটি প্রাচীন শ্লোক দিলাম, ভক্তগণ আস্বাদন করিবেন।

নাথ হরে! বত নাথ হরে!
করুণাং কুরু পরিজন নিকরে।
গর্ব্বিতচিন্তাস্তব সুখচিন্তা
নান্যনিমিত্তাঃ প্রাণপতে!
রসিক শিরোমণি রসি হৃদয়ঙ্গম!
রমণ! মহাশয়! বিমলমতে॥ কিশোর প্রসাদ।
প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে
বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে।
জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে
দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরং॥

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রজদেবীগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—নন্দনন্দন কোথায়? কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক প্রভৃতি ফুলের গাছগুলিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—রামানুজ কোথায়? তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ওগো গোবিন্দচরণ-

প্রেয়সি! তোমার প্রিয় অচ্যুতকে কি দেখিয়াছ? মালতি, মল্লিকা, জাতি, যূথি প্রভৃতি স্ত্রীজাতীয় পুষ্পবৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—মাধবকে দেখিয়াছ? তাহার পর আম্রবৃক্ষ, পিয়ালবৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশবের কথা।

এ পর্য্যন্ত নানা নামে, নানা ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, ইহার ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি, কিন্তু বিরহকাতরা ব্রজদেবীগণ এ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু এইবার সে কথা উল্লিখিত হইতেছে। তরুলতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উন্মাদবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রজদেবীগণ একটি হরিণীকে দেখিতে পাইলেন, হরিণীর চল চল চক্ষু দুইটি বিশেষ করিয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। এই অবস্থায় তাঁহারা হরিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওগো হরিণপত্নি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার সহিত এই বনপথে গিয়াছেন, তুমি কি তাঁহাদের দেখিয়াছ; দেখ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীকে প্রেমে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, বাতাসে যে গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, সেই গন্ধ হইতেই আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি। শ্লোকটি এই—

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি! সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥

হে সখি এণপত্নি, (হরিণপত্নী) প্রিয়ার সহিত অচ্যুত কি এই বনে আসিয়াছেন? তাঁহাদের অঙ্গের দর্শনের দ্বারা তোমার চক্ষুযুগলের কি পরমানন্দ বিহিত হইয়াছে? কুলপতি (গোকুলপতি) শ্রীকৃষ্ণ কান্তার অঙ্গসঙ্গ করিয়াছেন বুঝিতেছি, কারণ কুচ-কুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দফুলের মালার গন্ধ বাতাসে বহিয়া যাইতেছে।

এই শ্লোকের পরের শ্লোকেও পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজগোপীগণের মধ্যে যিনি প্রধানা, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নিভৃতে তাঁহার সহিত বিবিধপ্রকারে বিহার করিতেছেন।

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালি কুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহবস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥

পূর্ব্বের শ্লোকে হরিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। টিকাকারগণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন, এই হরিণীর নাম রঙ্গিণী, এটি শ্রীকৃষ্ণের পোষা হরিণী। একজন টিকাকার, শ্রীবল্লভাচার্য্য বলিয়াছেন, এই কৃষ্ণান্বেষণে যখন হরিণীকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, স্থাবরগণকে পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়া গিয়াছে, এখন জঙ্গমগণকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। যাহা হউক হরিণী চুপ করিয়া থাকিল—গোপীদের প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিল না। (আমরা শ্রীমজ্জীবগোস্বামিকৃত বৈষ্ণব-তোষণী টিকার অনুসরণ করিতেছি) হরিণীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া গোপীগণ ভাবিলেন, হরিণী চুপ করিয়া যখন আমাদের প্রতি চাহিল, তখন বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ এ বনে আসেন নাই। যাহা হউক বিরহকাতরা গোপীগণ ভাবিলেন হরিণী বোধ হয় অহঙ্কার করিয়াই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিল না। তখন তাহারা দেখিল কতকগুলি বৃক্ষ ফল ও পুষ্পের ভারে নত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা ভাবিল ইহারা বেশ বিনয়নম্র, হরিণীর ন্যায় অহঙ্কারী নহে। তখন তাহারা সেই বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, হে বৃক্ষগণ, তোমরা চরণে প্রণাম করিলে পর, রামানুজ কি প্রণয়-দৃষ্টিতে তোমাদের আপ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন? বৃক্ষেরা যেন বলিতেছেন, কেন, তিনি তো সর্ব্বদাই এদিকে আসিয়া থাকেন? গোপী বলিতেছেন, তাহা বলি নাই, প্রেয়সীর স্কন্ধের উপর বাহু রাখিয়া কি এখন আসিয়াছিলেন? দেখ বৃক্ষগণ, তাঁহার এক হাত প্রেয়সীর স্কন্ধের উপর, আর এক হাতে পদ্ম। তুলসী-গন্ধে অথবা তুলসী-রসপানে বিহ্বল অলিকুল তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটিয়া আসিতেছে, পাছে এই অলিকুল প্রেয়সীকে দংশন করে এই ভয়ে তিনি পদ্ম ঘুরাইয়া অলিকুলকে নিবারণ করিতেছেন; এই জন্যই বলিতেছি, তিনি কি তোমাদিগকে প্রণামের উত্তরে অভিনন্দিত করিয়া গিয়াছেন?

এই যে দুইটি শ্লোক, ইহার প্রথমটির টিকায় শ্রীমজ্জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপে বিচার্য্য।

অথাত্রেতি বিচার্য্যতে কামপাধ্যায় শ্রীভগবানন্তর্হিতঃ ইতি ব্যক্তীভবিষ্যদপি পূর্ব্বং

র্যন্মুনীন্দ্রঃ স্বয়ং ন স্ফুটমুক্তবান্ তস্যায়মভিপ্রায়ঃ। সৎস্বপি নানাভগবদাবির্ভাবেষু মম স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণাখ্য এব তস্মিন্নাগ্রহবিশেষ ইতি। তথা সৎস্বপি নানা তৎপরিকরেষু শ্রীব্রজবাসিষ্বেব স ইতি তথা সৎস্বপি তেষু শ্রীব্রজদেবীষ্বেব ততোঽপ্যধিকতর স ইতি রহস্যং, সর্ব্বেষ্বপি জ্ঞাতবস্তু এব, কিন্তু তাস্বপি সতীষু শ্রীরাধিকায়া মেবাধিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞাত-বস্তুঃ তদেতম্মদাগ্রহতারতম্যঞ্চ তত্তদুৎকর্ষতারতম্যাদেব। অস্যাঃ পরমহস্যায়াস্তদেতত্তু সাক্ষাজ্ জ্ঞাপয়িতুং সঙ্কুচতি মচ্চিত্তম্।

এই শ্লোকটি ও এই শ্রেণীর কতকগুলি পরবর্ত্তী শ্লোকের ভিতরের কথা বুঝিতে হইলে, এইস্থানে এইরূপ বিচার করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ যখন রাসমণ্ডল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন কাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, একথা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে, গোপন থাকিবে না, কিন্তু মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব একথা নিজমুখে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না কেন? ইহার উত্তর এই। শ্রীশুকদেব, যেন বলিতেছেন—শ্রীভগ-বান্ নানা অবতারে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই আমার বিশেষ আগ্রহ। এই শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য পরিকর, তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রজবাসীগণেই আমার বিশেষ আগ্রহ। আবার ব্রজবাসীগণের মধ্যে ব্রজগোপীগণে আমার অধিকতর আগ্রহ। এই গুপ্তকথা সকলেই জানেন। কিন্তু এই ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকায় যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ, ইহা কেহই জানে না। উৎকর্ষ-তারতম্য-নিবন্ধনই আমার এই আগ্রহের তারতম্য। এই কথাটি পরম রহস্য, এই কারণে সাক্ষাৎভাবে একথা জানাইতে আমার চিত্ত সঙ্কুচিত হইতেছে।

তাহার পর শ্রীমজ্জীবগোস্বামী মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ। সাক্ষাৎভাবে বলিতে পারিব না সত্য. কিন্তু ভয় হয় পাছে জ্ঞানখল হইয়া পড়ি। এই ভয়ে আমি এক কৌশল অবলম্বন করিতেছি। গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীমতী রাধিকায় স্বপক্ষা বা সুহৃৎ-পক্ষা তাঁহাদের কথায় প্রকাশিত হইবে না, তাঁহারা ইহা গোপন করিয়াই কথা বলিবেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতিপক্ষীয়া তাঁহাদের কথায় ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা (By Suggestiveness) ঐ কথা অবসরমত প্রকাশিত করিব। তবে ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা এই রস ব্যক্ত করিতে গিয়া আবিষ্ট অবস্থায় যদি কিছু গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার নাম গ্রহণ করিব না। এরূপ করার

আর এক উদ্দেশ্য আছে শ্রীমজ্জীবগোস্বামী মহোদয়ের টিকার অপরাংশও আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

জ্ঞানখলতাভিয়া বিজ্ঞাপয়িতুমপীচ্ছতি তস্মাদস্যা সখীনাং বচনাত্তত্রাপ্রতীতৌ চ প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্ব্যঞ্জনয়ৈব বৃত্ত্যা যথাবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটয়িষ্যামঃ। যদি চ জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ প্রকটয়িষ্যামঃ তদা নাম তু তস্যাঃ সাক্ষান্ন বক্ষ্যামঃ।

তাহার পর শ্রীমজ্জীবগোস্বামী মহোদয় বলিতেছেন, এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি নানারস-প্রকাশিনী, মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তি তাদৃশ রস-প্রকাশিনী নহে। ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ কেহ বলানুজের অন্বেষণ করিতেছেন, সকলেই যুগল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন নাই। এই সমুদয় গভীর কথাও শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন।

শ্রীমজ্জীবগোস্বামী মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে দুইটি বিভিন্ন দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া বুঝিতে হইবে। From two different stand-points. ইহার ভিতর একটি দিক্ কঠিন নহে। উহাকে একালের ভাষায় আমরা সাহিত্য-শিল্পের ভূমি (The stand-point of Literary art) বলিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত গুণময় পরম পুরুষ, তিনি একমাত্র নায়ক,—নায়কের শিরোরত্ন, তিনি বহুকান্তা-সঙ্গে প্রেমলীলা ও রাসবিহার করিতেছেন। নায়িকা বা প্রেমিকাগণের এই যে বহুত্ব, ইহাও কতকটা ব্যবহারিক বলিলেও চলে। ঠিক্ ব্যবহারিক নহে, কারণ তাহা হইলে লীলা মায়িক হইয়া পড়ে। ঠিক্ ব্যবহারিক না হইলেও কতকটা ব্যবহারিকেরই মত। বহু কান্তার বহু ভাব আর শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ, রসিকশেখর—শ্রীকৃষ্ণ সকলের ও প্রত্যেকের। ব্রজগোপীগণ বহুরূপে বা বহুমূর্ত্তিতে ব্যক্ত, কিন্তু ইঁহারা তত্ত্বতঃ সকলেই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র—শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা; শ্রীমতী রাধিকা প্রেমকল্পলতা, আর ব্রজগোপীগণ তাঁহার পল্লব ও পাতা। ইহাই মূল সত্য—The Fundamental conception। এই সত্যটি সাহিত্যশিল্পের রসস্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত (worked out) করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত যেভাবে শ্রীরাধার নাম গোপন করিয়াছেন, তাহা অতিশয় সঙ্গত ও মধুর হইয়াছে, ইহা একটু চিন্তা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ধর্ম্মতত্ত্বের দিক্ হইতে (From the Theological standpoint) ইহার আলোচনাও শ্রীমজ্জীবগোস্বামী মহোদয় করিয়াছেন। শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রীশুকদেবের অন্তরতম গুহ্য সত্য, ইহাই তাঁহার পরমমন্ত্র, অতএব গোপনীয়, সকলের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে।

৩। পদচিহ্ন-দর্শন

স্থাবর ও জঙ্গমের নিকট প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করার পর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সমূহের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। লীলানুসরণ করিতে করিতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥

ব্রজদেবীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, পরমপুরুষোত্তম নন্দনন্দনের এই চরণ-চিহ্ন। পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব প্রভৃতি দেখা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনাও ঠিক্ একরূপ। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপীর্গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশি নয়নোৎপলা॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্করেখাবন্ত্যালি ! পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ॥

একজন গোপী মাটির দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া কি দেখিল ! দেখিয়া তাহার সকল শরীরে পুলক জাগিয়া উঠিল, তাহার নয়ন-পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিল। সেই গোপী অন্যান্য গোপাঙ্গনাগণকে বলিলেন, সখিগণ দেখ, ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মের রেখা দেখ, এযে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন, তিনি এই পথে ধরণীকে পদচিহ্নে অলঙ্কৃত করিয়া লীলায় চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ব্রজদেবীগণ ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নের সহিত বধুর চরণ-চিহ্ন সংমিশ্রিত দেখিলেন। এখানে বলিলেন—বধু—শ্রীরাধার নাম করিলেন না।

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্॥

বধুর চরণ-চিহ্ন দেখিয়া কতকগুলি গোপী আর্ত্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন। ব্রজগোপীরা আর্ত্তা বা দুঃখিতা হইলেন কেন? প্রত্যেক গোপীরই হৃদয়ভাব ঠিক্ একরূপ নহে, অতএব প্রত্যেকেই ঠিক্ একভাবে ভাবিতা হইয়া দুঃখিতা হন নাই। আমরা পরিত্যক্তা হইলাম, আর, আর একজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন, এইরূপ ভাবিয়া কাহারও মনে দুঃখ হইল; আর, আর একজনকে লইয়া যাউন, কিন্তু আমার যে বিরহ সহ্য হয় না, এজন্য কেহ বা দুঃখিতা হইলেন।

ব্রজদেবীগণ প্রথমে সকলেই বলিলেন, এই সব পদচিহ্ন কোন্ রমণীর? হস্তীর সহিত হস্তিনী যেমন যায়, ইনি যে ঠিক্ তেমনি করিয়া নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত গমন করিয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার হাত আদর করিয়া নিজের স্কন্ধ-দেশে গ্রহণ করিয়াছেন?

ইঁহার পরের অবস্থা কি, তাহা টিকাকারগণ আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা সখী, তাঁহারা ভিতরের কথা সবই জানেন, তাঁহারা গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া থাকিলেন। যাঁহারা প্রতিপক্ষা তাঁহাদের দুঃখের সীমা নাই, সুতরাং তাঁহারাও চুপ করিয়া থাকিলেন। যাঁহারা তটস্থ, তাঁহারা দুদিকের দুই অবস্থায় যেন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না, অতএব তাঁহারাও চুপ করিয়া রহিলেন। যাঁহারা শ্রীরাধার সুহৃৎ-পক্ষ, তাঁহারা বলিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের টিকা এইরূপ।

পদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুবিধগোপীজনসঙ্ঘট্টে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্যস্তস্যাঃ সুহৃদস্তন্নামনিরুক্তিদ্বারা তস্যাঃ সৌভাগ্যং সহর্ষমাহুঃ।

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীরাধার সুহৃৎ, তাঁহারা পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝিয়াছেন শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের অন্তঃ-করণ আশ্বস্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে বহুপ্রকারের ব্রজগোপীর হাট, সুতরাং তাঁহারা অভিনয় করিয়া যেন দেখাইতেছেন, তাঁহারা কিছুই জানেন না, তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই। কিন্তু যাহা বলিতেছেন, তাহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে, যিনি বুঝিবার, তিনি বুঝিবেন। শ্রীরাধার নাম যে-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের কথায় সেই 'রাধ্' ধাতুর প্রয়োগ

রহিয়াছে। সুতরাং সুহৃৎ-পক্ষীয়া গোপীগণ শ্রীরাধার সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া হর্ষ-সহকারেই নিম্নের শ্লোকটি বলিতেছেন।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

হরি ভক্তজনের দুঃখহারী, তিনি ভগবান্ নারায়ণ, তিনি ঈশ্বর, ভক্তজনের অভীষ্টদান-সমর্থ। তিনি এই সৌভাগ্যবতী রমণী-কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছেন। এই রমণী এমনভাবে হরির সেবা করিয়াছেন, যে হরি তাঁহার সেবার দ্বারা বশীভূত হইয়াছেন। সেই কারণেই গোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই রমণীকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছেন।

তটস্থা সখিগণ বলিলেন—

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥

গোবিন্দের এই পদরেণুসমূহ অতিশয় পবিত্র; ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীদেবী অপরাধ ও বিরহাদি দুঃখ বিনাশের জন্য তাহা মাথায় ধারণ করিয়া থাকেন।

এইবার প্রতিপক্ষগণ বলিলেন—

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সকলের, অথচ এই গোপী একাকী অচ্যুতের অধরামৃত অপহরণ করিয়া স্বয়ং ভোগ করিতেছে, ইহাতে আমাদের মনে অতিশয় ক্ষোভ জাগিতেছে।

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলমুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥

ইহার পর ঐ রমণীর অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার পদচিহ্ন আর দেখা গেল না। তখন, যাঁহারা শ্রীরাধিকার প্রিয়সখী তাঁহারা বলিলেন—ওগো তোমরা আর হিংসা করিও না—এই দেখ সেই রমণীর পদচিহ্ন আর দেখা যাইতেছে না। এই কথা শুনিয়া প্রতিপক্ষাগণ বেশ ভাল করিয়া পদচিহ্নগুলি দেখিলেন এবং বলিলেন—প্রিয়তমার কোমল ও সুন্দর চরণ পাছে তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হয়, তাই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীকে তুলিয়া কাঁধে করিয়া লইয়া গিয়াছেন; সেই জন্যই পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ! পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ॥

এই দেখ, এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ অধিক মগ্ন অর্থাৎ বালিতে বা ধূলাতে বেশী পুঁতিয়া গিয়াছে। তিনি বধূকে কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া গিয়াছেন, এইজন্য কামী বেশী ভারাক্রান্ত হইয়াছেন।

অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাহসকলে পদে ॥

অন্য সখীরা বলিলেন—মহাত্মা রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ গাছ হইতে ফুল পাড়িবার জন্য এই স্থানে প্রেয়সীকে নামাইয়া ছিলেন। প্রিয়াকে ফুল দিয়া সাজাইবার জন্যই এই আয়োজন। এই দেখ এখানে তাঁহার চরণের কেবল অগ্রভাগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, এইখানে দাঁড়াইয়া তিনি ফুল পাড়িয়াছেন।

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥

মাথার চুলের মালা সম্মুখে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রতিপক্ষাগণ বলিলেন—কামুক শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সেই কামিনীর চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, আর এইস্থানে ফুল দিয়া প্রেয়সীর মাথায় চূড়া বাঁধিয়া দিবার জন্য বসিয়াছিলেন।

স্বপক্ষা, সুহৃৎ-পক্ষা, তটস্থা ও প্রতিপক্ষা, এই চারিপ্রকারের ব্রজগোপী। শ্রীরাস-লীলার অন্তরতম বা গুহ্যতম তত্ত্ব শ্রীরাধাতত্ত্ব। শ্রীরাধাতত্ত্বের প্রাকট্য হইবে। এই প্রাকট্য দুই স্থানে হয়, এক ভক্তহৃদয়ে আর লীলায়। ভক্তহৃদয়ে যে হয়, তাহা কোন-রূপ সাধনা বা তপস্যার ফলে নহে। শ্রীরাধারাণীর কৃপায় বা সখীগণের কৃপায় বা ভক্ত বা গুরুকৃপায়। লীলায় যে প্রাকট্য হয়, তাহাও সখীগণের কৃপায়। অন্য উপায় নাই। এই মহাসত্য শ্রীমদ্ভাগবতকার কেমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করিলেন। শ্রীশুকদেব শ্রীরাধি-কার কথা মুখ্যভাবে (In the direct narration) বলিলেন না। সখীগণ পদচিহ্ন-দর্শন করিয়া পরস্পরের মধ্যে যে কথোপকথন করিলেন, সেই কথোপকথনের দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত করিলেন।

যাঁহারা পৌরাণিক সাধনার তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। তবে এই প্রণালীতে চিন্তা করিবার অভ্যাস যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় একটু ক্লেশস্বীকার করিয়া এই চিন্তাপ্রণালীতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কথাটা এই। পুরাণের কোন উচ্চ বা গভীর বা তত্ত্বপূর্ণ ঘটনার যখন আলোচনা করিবেন, তখন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন, কাহার জ্ঞান এই ঘটনার সাক্ষ্য? কাহার চৈতন্য বা অনুভূতি আশ্রয় করিয়া এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে? অর্থাৎ এই ঘটনার জ্ঞাতাই বা কে, আর বক্তাই বা কে? এই প্রশ্নটির উত্তর একান্ত-ভাবে দরকার—Indispensably necessary. পৌরাণিক ঘটনাবলী, অন্ততঃ পক্ষে পুরাণে বর্ণিত যাবতীয় ঘটনাকে সাধারণ ইতিহাসের ঘটনার সহিত সমশ্রেণীভুক্ত সত্য (Truths of the same order) বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রাচীন ঋষিদের দর্শনের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায় যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারা সকলেই মনে রাখিবেন—এই যে গূঢ় ও মধুর লীলা, যাহাকে সকল লীলার মুকুটমণি বলা হইয়া থাকে, এই লীলা শ্রীবৃন্দাবনের অপর কেহই জানিতেন না এবং এখনও জানেন না।

ব্রজগোপীদের কথোপকথনের দ্বারা পরিব্যক্ত হইল যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, কিছু দূর গিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কাঁধে করিলেন। তাহার পর কাঁধ হইতে নামাইয়া গাছের উঁচু ডাল হইতে ফুল পাড়িলেন। তাহার পর প্রেয়সীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন ও প্রেয়সীর মাথার খোপায় ফুলের চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। শ্রীশুকদেব ব্রজগোপীদের মুখে যে কেবল এই সব কথা শুনিতেছেন তাহা নহে, তিনি যেন দেখিতে পাইতেছেন। গোপীর হৃদয় দিয়া এই সব অনুভব-দর্শন করিতে করিতে, গোপীদের কৃপায় তাঁহার এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া গেল এবং এখন তিনি নিজেই প্রত্যক্ষভাবে বা মুখ্যভাবে এই অতিগুহ্য শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত বিলাস-লীলা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্॥
ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে॥

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুম্ নয়মাং যত্র তে মনঃ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥

এই শ্লোকগুলি শ্রীশুকদেবের নিজের উক্তি। এই শ্লোকগুলির ভিতরের রস, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে, আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিব না। অন্য সময়ে তাহা করা যাইবে। শ্লোকগুলির অর্থ নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীশুকদেব বলিলেন—মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত। (স্বতস্তুষ্ট, স্বক্রীড় ও স্ত্রীবিভ্রমের দ্বারা অনাকৃস্ট।) কিন্তু তথাপি তিনি সাধারণ লোকের দৌর্ভাগ্য ও স্ত্রীলোকদিগের দুরাত্মতা দেখাইবার জন্য সেই রমণীর সহিত বিহার করিলেন।

এইরূপ চলিতে লাগিল। একদিকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ অনুকরণ করিতে করিতে অথবা পদচিহ্ন দেখিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বিরহ-কাতরচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আর একদিকে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যে গোপীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেই গোপী নিজেকে সকলের অপেক্ষা ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। এই অবস্থায় বনমধ্যে একটু আগে যাইয়া গর্ব্ব করিয়া তিনি কেশবকে বলিলেন—আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তুমি যদি পার আমাকে কোন প্রকারে লইয়া চল। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বলিলেন, তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে বধূ অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

হে নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং॥

হে প্রভো, হে বিবিধক্রীড়াকারক, হে প্রিয়তম, হে মহাভুজ, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? আমি তোমার দাসী, আমি দীনা, একবার দাসীর নিকট আসিয়া দেখা দাও।

অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই পথে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে দুঃখিতা ও মূর্চ্ছিতা সেই সখী দর্শন করিলেন। সেই দুঃখিতা সখীর নিকট অন্যান্য সকলে সমুদয় কথা শুনিলেন, কেমন করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, এবং কি করিয়াই বা শেষে অপমানিত হইলেন—এই সমুদয় কথাই শুনিলেন।

এখন সকল গোপীর মিলন হইল এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর গোপী-গীত—গোপীগণ একত্র মিলিত হইয়া বিরহগীতি গাহিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে পর কতকগুলি গোপী কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন, তাহা কথিত হইয়াছে। সেই ভাবগুলি ধরিয়া টীকাকারগণ গোপীদের নাম অবধারণ করিয়াছেন। সেখানেও একজন সখীকে তাঁহার ভাবের দ্বারা শ্রীরাধা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

৫। শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন ও মিলন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি এই—

> কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
> কাচিদ্ দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্॥
> কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বুলচর্ব্বিতম্।
> একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তাস্তনয়োর্নাধাৎ॥
> অপরাহনিমিষদ্দৃগভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজং।
> আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥
> তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেন হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
> পুলকাঙ্গ্যপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দ সংপ্লুতা॥

ক। কোন গোপী আনন্দ সহকারে অঞ্জলিদ্বারা শৌরি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ করকমল ধারণ করিলেন।

খ। অন্য কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত বামবাহু নিজের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন।

গ। বিরহতাপ-শীর্ণা কোন গোপী অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন।

ঘ। কোন ব্রজাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণকমল স্তনের উপরিভাগে ধারণ করিলেন।

ঙ। সাধুগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের চরণ পুনঃপুনঃ সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, সেইরূপ কোন গোপী অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিয়াও অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

চ। প্রণয়কোপযুক্তা কোন গোপী ওষ্ঠ দংশন করিয়া ও ভ্রূযুগল কুটিল করিয়া কটাক্ষ-আক্ষেপ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যেন তাড়না করিতেছেন, এই ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ছ। কোন গোপী নয়নপথে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে আনয়ন করিয়া নিমীলিতনয়নে ও পুলকিত শরীরে যোগীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দে নিমগ্না হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে এই সাতজন গোপীর উল্লেখ আছে। তালিকা সম্পূর্ণ করিতে হইলে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে।

কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতি হর্ষিতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সা প্রাহ নান্যৎ কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥

জ। কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষভরে "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" এইমাত্র বলিলেন, কিন্তু আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

এই যে আটজন সখীর কথা বলা হইল, ইঁহাদের নাম যথাক্রমে চন্দ্রাবলী, শ্যামা, শৈব্যা, পদ্মা, রাধা, ললিতা, বিশাখা ও ভদ্রা। প্রথম চারিজন দক্ষিণা ও সরলা, দ্বিতীয় চারিজন বামা ও মানিনী। চন্দ্রাবলীর ভাবের নাম তদীয়তামষ, ঘৃতস্নেহ; ইনি কান্তপরাধীনা ও মৃদু। শ্রীরাধার ভাবের নাম মদীয়তাময়, ইনি মধুস্নেহোপমান-কৌটিল্যবতী।

শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুইজন যূথেশ্বরী। আটজন সখীকে মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া দেখিলে রামধনুর শোভার ন্যায় শোভা ভাবনেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রামধনুতে যেমন একটি বর্ণ ধীরে ধীরে আর একটি বর্ণে ঢলিয়া পড়িয়াছে ও মিশিয়া গিয়াছে, ঠিক্ সেই প্রকারে চন্দ্রাবলীর ভাব, ক্রমে ক্রমে তিনটি সখীর তিন প্রকারের ভাবের মধ্য দিয়া শ্রীরাধার ভাবে, আবার শ্রীরাধার ভাব ঠিক্ সেই প্রকারের তিনটি ভাবের মধ্য দিয়া চন্দ্রাবলীর ভাবে উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন, বিরহের সময় সকলের তুল্যতাপ্রাপ্তি হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের আগমন মাত্রেই প্রত্যেকের নিজ নিজ আলম্বন ও স্বভাব পরিস্ফুট হইল। রাসনৃত্যের নিবিড়তম মহামিলনে বৈচিত্র্যসত্ত্বেও আর এক প্রকারের তুল্যতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

১। চন্দ্রাবলীর ভাব তদীয়তাময়,—আমি শ্রীকৃষ্ণের, আমাকেই তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। তিনি কান্তের অধীন। শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিবার জন্য তাঁহার চিত্তে ঔৎসুক্য খুব প্রবল; আবার শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত। তাই, চন্দ্রাবলী অঞ্জলিবন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের করপদ্ম গ্রহণ করিলেন। হস্ত আকর্ষণ করিতে বা জোরে চাপিয়া ধরিতে তাঁহার সাহস নাই।

২। শ্যামা বা শ্যামলা। ইনি কিছু প্রখরা, কারণ ইনি শ্রীকৃষ্ণের বাহু আকর্ষণ করিয়া ধারণ করিলেন।

৩। শৈব্যা চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন, অতএব নিজের দিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা তাঁহার আরও অধিক।

৪। পদ্মা—শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পদকমল স্তনের উপর ধারণ করিলেন।

৫। এইবার শ্রীমতী রাধিকা। ইনি প্রখরা, স্বাধীনা ও মধুস্নেহবতী। শ্রীকৃষ্ণ আমার—এই অভিমানই তাঁহার জীবন। চন্দ্রাবলী আকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গেলেন, কিন্তু শ্রীরাধিকা তাঁহার নিকট গেলেন না। তিনি ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে ওষ্ঠ দংশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই ভাবের নাম বিব্বোক ও ললিতাখ্য অনুভাব। "ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ" —যিনি ইষ্ট অর্থাৎ একমাত্র অভিলষিত, তাঁহার ব্যবহারে অভিমান হইয়াছে। আবার নিজের অসীম ও অতুলনীয় প্রেমে পূর্ণ বিশ্বাস থাকার জন্য গর্ব্বও আছে। এই অবস্থায় ইষ্টের প্রতি যে অনাদর, তাহার নাম বিব্বোক অনুভাব। বিব্বোক অনুভাব মানস, তাহারই দৈহিক প্রকাশের নাম ললিতাখ্য অনুভাব।

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীরাধিকার এই সময়ের ভাব এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হে প্রতারক-চূড়ামণি, তোমার প্রেমরূপ হলাহল আমার উপর প্রয়োগ করিয়া বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছ। প্রাণ যে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। এখন কি এই বহির্গত প্রাণকে দগ্ধ করিতে আসিয়াছ—তোমাকে বেশ চিনিয়াছি। আর কেন?

৬। ললিতা। তিনিও প্রখরা বামা। 'শ্রীকৃষ্ণই আমার নিকট আসিবেন'—এই চিন্তায় তিনিও শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধার ন্যায় নয়নের দ্বারা তাড়না করেন নাই, বরং অনিমেষ নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছিলেন।

৭। বিশাখা—প্রখরা কিন্তু সরলা। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত, ভাবাবেশে অঙ্গ পুলকিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দে নিমগ্না হইলেন।

৮। ভদ্রা—তিনি "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

এই গোপীগণ আবার স্বপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা, প্রতিপক্ষা ও তটস্থা, এই চারিভাগে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শনেও এই ভাবভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাধার তত্ত্ব অতিশয় পরিস্ফুটরূপেই পাওয়া যায়। শ্রীরাধার স্থায়ীভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, দুইটি বৈষ্ণবপদের দ্বারা ভক্তগণ তাহা আস্বাদন করুন। প্রথম পদের রচয়িতা শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর—

ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরত
সো তুঁহু ভাব-বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু, লতিকা-অবলম্বনকারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

কেশ পসারি, যবহুঁ তুহুঁ আছলি
উর পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুঁহু, দশন দেখায়লি,
করে কর জোরহিঁ মোর।
অলখিতে দিঠি কব, হৃদয়ে পসারলি,
পুন হেরি সখি কৈলি কোর॥
এতহুঁ নিদেশ, কহল তোহে সুন্দরি
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুঁহু, সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

পদটির অর্থ—শ্রীরাধে, ধন্য ধন্য তোমার রমণী জন্ম ধন্য। সকলে কানু কানু করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কানুকে খুঁজিতেছে, আর সেই কানু তোমার ভাবে বিহ্বল। বড়ই আশ্চর্য্য, আজ যেন চাতকের জন্য মেঘের পিপাসা পাইয়াছে, চাঁদ যেন চকোরকে খুঁজিতেছে, আর তরু, লতিকাকে অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। শ্রীরাধে, তুমি যখন মাথার চুল প্রসারিত করিয়া, বুকের আধখানিমাত্র কাপড়ে ঢাকিয়া বসিয়াছিলে, কানু তখন সব দেখিয়াছে ও দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছে, এখন বল ইহার সমাধান কি? হাস্য করিয়া কবে তুই দন্ত দেখাইলি, কবে মাথার খোঁপায় হস্তযুগল দিয়াছিলি, আর কবে অলক্ষিতভাবে হৃদয়ে দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছিলি, আবার কবে শ্যামকে দেখিয়া সখিকে কোলে করিয়াছিলি! সখি, এই সব সন্ধান বলিলাম, সুন্দরি এই সব জানিয়া, যাহা উচিত করিস্। তুই, হৃদয়ের পুত্তলি, আর সে শূন্য দেহমাত্র। পদটি পূর্ব্বরাগের।

দ্বিতীয় পদের রচয়িতা কবি চন্দ্রশেখর। পদটি কলহান্তরিতার।

মান করলি তো করলি। বিরহে কাহে রোয়সি।
বৈঠি বিরম তুঁহু ভবনে।

সো কাঁহা যাওব, আপহি আওব, পুনহি লুটায়ব চরণে ॥
সুন্দরি বচনে করবি আশোয়াস
আকুল-নয়ন করি, পন্থ নেহারই
চিত্রা চাহল মঝু পাশ ॥
ধেনু বেণু ছাড়ি, সকল সখাগণ, পরিহরি নীপমূলে বসই,
রাই রাই করি, শিরে কর হানই
তুয়া নাম ধরই নিশসই ।

এই যে শ্রীরাধার ভাব, ইহা পরবর্ত্তী কালের সাধনার দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু ইহার বীজ শ্রীমদ্ভাগবতে রহিয়াছে ।

সনাতন ধর্ম্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫ । বেদ-সম্বন্ধে বিবিধ প্রাচীন মত ।

শব্দের নিত্যত্ব মীমাংসকের মত ।

মীমাংসকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ করেন । মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের বা পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনের প্রবর্ত্তক । তিনি নিম্নলিখিত সূত্রে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ।

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্য ।"

একটি শব্দ উৎপন্ন হইল, সেই শব্দ যিনি শুনিলেন তাঁহার মনে একটি অর্থের বোধ হইল । এই শব্দের এই অর্থ এই প্রকারের একটি সংকেতাত্মক সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের মধ্যে রহিয়াছে । অবশ্য এই সম্বন্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে । তাহা হইলে শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা কি কল্পিত ? যদি কল্পিত হয়, তাহা হইলে বেদবাক্যসকল অপ্রমাণ ও নিরর্থক হইয়া পড়ে । এই মত খণ্ডন করিয়া জৈমিনি বলিলেন, শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্যবোধকভাবে স্বাভাবিক ও নিত্য । সুতরাং বেদবাক্যসমূহ

ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে এবং অদৃষ্ট বিষয়ে অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করে। অতএব বেদ প্রমাণ ও নিত্য।

নৈয়ায়িকের মত

নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব অস্বীকার করেন। যে কারণে অস্বীকার করেন, তাহা নিম্নলিখিত সূত্রগুলির সাহায্যে বুঝিতে পারা যাইবে।

১। কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ। ২। অস্থানাৎ। ৩। করোতি শব্দাৎ। ৪। সত্ত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ। ৫। প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ। ৬। বৃদ্ধিশ্চকর্তৃভূম্নাস্য।

১। যত্ন করিলেই শব্দ উৎপাদিত হয়, শব্দ যত্ন-সাপেক্ষ, অতএব ইহা কর্ম্ম। যাহা নিত্যকাল বর্ত্তমান, তাহা যত্ন দ্বারা উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে? অতএব শব্দ নিত্য হইতে পারে না। ২। শব্দ ক্ষণস্থায়ী, যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি বিনষ্ট হয়, অতএব উহা নিত্য হইতে পারে না। ৩। লোকে বলে—"শব্দং করোতি' অর্থাৎ শব্দ করে, অতএব শব্দ 'কৃত', কাজেই উহা নিত্য হইতে পারে না। ৪। শব্দ একই সময়ে নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী ব্যক্তির কর্ণগোচর হইয়া থাকে, কাজেই ইহা কিরূপে এক ও নিত্য হইবে? ৫। যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহা কখনও নিত্য হইতে পারে না। শব্দের প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবই দৃষ্ট হইতেছে, অতএব উহা পরিবর্ত্তনশীল যেমন সন্ধিতে হ্রস্ব 'ই'-কার স্থানে 'য' হয়। অতএব শব্দ নিত্য নহে। ৬। শব্দ-বার্ত্তার সংখ্যা ভেদে শব্দের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব উহা নিত্য নহে।

মীমাংসকের উত্তর।

মীমাংসকেরা অবশ্যই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরও নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

১। সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ। ২। প্রয়োগস্য পরমং। ৩। আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং। ৪। বর্ণান্তরমবিকারঃ ৫। নাদবৃদ্ধিঃ পরা

১। শব্দ নিত্য; সকল সময়ে উপলব্ধ হয় না, তাহার কারণ উচ্চারণকারী ব্যক্তির সহিত সকল সময়ে শব্দের সন্নিকর্ষ হয় না। একটি শব্দ, যেমন 'গ', আমরা যখনই এই শব্দ শুনি, তখনই আমাদের এইরূপ জ্ঞান হয় যে আমরা সকল সময়ে যে 'গ'-কার শব্দ শুনি ইহাও তাহাই। ২। লোকে অবশ্য বলে "শব্দং করোতি"—শব্দ করে। কিন্তু এই 'করা'-র অর্থ নির্ম্মাণ নহে, উচ্চারণ মাত্র। ৩। যেমন একই সূর্য্য, নিকটস্থ ও দূরস্থ সকলেই দেখিতে পায়, তেমনি একই শব্দ নিকটস্থ ও দূরস্থ

সকলেই শুনিতে পায়। ৪। বর্ণান্তর বিকার নহে। 'ই'-কার 'য'-কার হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে 'ই'-কারের কোন বিকার হয় না। ৫। দশজনে একটি শব্দ উচ্চারণ করিলে, নাদের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শব্দের বৃদ্ধি হয় না।

অতএব শব্দের একত্ব ও নিত্যত্ব অব্যাহত রহিল। ইহা ছাড়া, মীমাংসকগণ আরও কতকগুলি যুক্তি দিয়াছেন।

মীমাংসকের বিশেষ যুক্তি

(১) নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ (২) সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ (৩) সংখ্যাভাবাৎ (৪) অনপেক্ষত্বাৎ (৫) লিঙ্গদর্শনাৎ চ। শব্দ যেমন উচ্চারিত হয়, অমনি অন্য ব্যক্তি তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। সুতরাং শব্দ নিত্য। শব্দ নিত্য না হইলে কেহই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না এবং শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্রই বিনষ্ট হইত। কাজেই, উচ্চারণ হইতে অর্থবোধ-পর্য্যন্ত কাল শব্দের স্থিতি। ইহা হইতেই শব্দের নিত্যত্ব আপনা হইতেই প্রমাণিত হইল। . । ভিন্ন ভিন্ন লোক একই সময়ে এক শব্দের সমানভাবে ও অভ্রান্তরূপে প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারেন, কাজেই শব্দ নিত্য ও একই স্বরূপ। ৩। শব্দের সংখ্যাবৃদ্ধি নাই। একটি শব্দ বারংবার উচ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু এজন্য অর্থাৎ সংখ্যাবচ্ছেদ-নিবন্ধন ঐ শব্দগুলি পরস্পর বিভিন্ন নহে। ৪। শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোন কারণ বা অবলম্বন নাই, সুতরাং শব্দ কেন অনিত্য হইবে? ৫। বেদ-সংহিতাতেও শব্দের নিত্যত্ব স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। যেমন—"বাচা বিরূপনিত্যয়া"।

এই প্রকারের বহুযুক্তি প্রয়োগ করিয়া মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেন। বেদ শব্দ-রাশি মাত্র। শব্দ নিত্য এবং প্রমাণ।

উত্তরমীমাংসা-দর্শনের বা জৈমিনী-দর্শনের সারসংগ্রহ-স্বরূপ একখানি গ্রন্থ আছে। তাহার নাম 'ন্যায়মালা বিস্তর'। মাধবাচার্য্য এই গ্রন্থের রচয়িতা। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থও মাধবাচার্য্যের রচনা। 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থেও বেদের অপৌরুষেয়তা প্রতিপাদনের জন্য জৈমিনী যে সব যুক্তি বা অনুমান-প্রণালী দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ আছে।

পতঞ্জলির মত

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলিয়াছেন—বেদের অর্থ নিত্য। বর্ণবিন্যাস বা বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্য নিত্য নহে। প্রত্যেক কল্পে মহর্ষিগণ অর্থানুসারে

বর্ণবিন্যাস করিয়া বেদশাখা রচনা করেন। এই কারণেই বেদশাখার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যথা কাঠক, কালাপক, মৌদক, পৈপ্পলাদক প্রভৃতি।

জৈমিনীর মত, অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের মত, বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই স্বীকার করিতে চাহেন না। জৈমিনীর মতে বেদ ঈশ্বর-নির্ম্মিত নহে, পুরুষ-নির্ম্মিতও নহে, বেদের কর্ত্তা কেহই নাই। মহর্ষি জৈমিনীর মতে দেবতা নামক কোন জৈব পদার্থও নাই। জৈমিনী-দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"—কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে কোন স্থানেই ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের নামগন্ধও নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই কারণেই মীমাংসা-দর্শনকে নাস্তিক্য-দর্শন বলিয়া কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

জৈমিনীর বেদ-সম্বন্ধীয় মত সকলেই স্বীকার না করিলেও, পতঞ্জলির মতে কাহারও বিশেষ আপত্তি নাই। উত্তরমীমাংসা-দর্শন বা বেদান্ত-দর্শন বেদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে সূত্রে বলিয়াছেন—শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ।

বেদান্তের মত

ইহাই বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় সূত্র। এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ"

পূর্ব্বে যে সূত্র উদ্ধৃত হইল, তাহার ভাষ্যে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি।"

মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের সর্ব্বার্থ-ভাসকতা শক্তি রহিয়াছে। ইহাদের দ্বারা মানবের সর্ব্ববিধ অজ্ঞান দূরিভূত হয়। এই শাস্ত্রসমূহ সর্ব্বজ্ঞ-কল্প, এই প্রকার শাস্ত্রের উৎপত্তি সর্ব্বজ্ঞ-গুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু হইতে, হইতে পারে না। অতএব—বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

বৃহদারণ্যক হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহার অর্থ বেদত্রয় ও অন্যান্য শাস্ত্র মহান্ পরব্রহ্ম হইতে নিশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে আবিভূত হইয়াছে। বেদান্তের তৃতীয় সূত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ। বেদ নিশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্নে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার উদ্ভবের জন্য অর্থবোধের প্রয়োজন হয় নাই। প্রতিকল্পে সমানভাবে উচ্চারিত হওয়ায় বেদ প্রবাহরূপে নিত্য এবং পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। বেদের কারণ হেতু পরব্রহ্ম ও সর্ব্বজ্ঞ। 'অধিকরণ মালা' গ্রন্থে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে।

অধিকরণ মালা গ্রন্থ

"ন কর্ত্তৃব্রহ্ম বেদস্য কিম্বা কর্ত্তৃ ন? কর্ত্তৃ তৎ। বিরূপনিত্যয়া বাচেত্যেবং নিত্যত্বকীর্ত্তনাৎ। কর্ত্তৃনিঃশ্বসিতাৎ যুক্তং নিত্যত্বং পূর্ব্ব সাম্যতঃ। সর্ব্বাবভাসি বেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিত্ত্বমেৎ।"

অতএব বেদান্ত-দর্শনমতে বেদ ব্রহ্মকার্য্য। এখন চিন্তা করিতে হইবে—ব্রহ্ম কি। বেদান্ত-দর্শনের মীমাংসা এইরূপ—

"অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়ত দেশ-কালানামত্ত ক্রিয়াকালাশ্রয়স্য মনসাপ্যাচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বাজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ।"

বেদান্তের ব্রহ্ম

নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তা ও অনেক ভোক্তা-সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশকালানামত্ত ও ক্রিয়া, কালের আশ্রয়, অচিন্ত্যরচনারূপ এই জগতের জন্মস্থিতি ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বজ্ঞ কারণ হইতে সম্পন্ন হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম আবার ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সকলই ব্রহ্ম। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্ব-খল্বিদং ব্রহ্ম"।

বেদের নামও ব্রহ্ম

বেদের আর এক নাম—ব্রহ্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

বেদ-সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যগণের এই সমুদয় আলোচনা আমাদিগের জানা আবশ্যক। আজকাল অনেক লোক বেদের দোহাই দিয়া তাড়াতাড়ি নানারূপ সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য সংস্কার চাই, পরিবর্ত্তনও স্বাভাবিক। কিন্তু এখনকার দিনে সাধারণতঃ যে ভাবে বেদের দোহাই দেওয়া হয় তাহা দূষণীয়। প্রত্যেক আর্য্যসন্তানেরই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

বেদ, গায়ত্রী ও প্রণব।

বেদের সার—গায়ত্রী, গায়ত্রীর সার—প্রণব। প্রণব ঈশ্বরের বাচক। "প্রণবস্তস্য বাচকঃ"—যোগসূত্র। গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হয়। আবার বেদকেও মাতা বলা হয়। অথর্ব্ববেদে আছে—

স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাং।

আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্ত্তিদ্রাবিণং ব্রহ্মবর্চসং মহ্যং দত্বা, ব্রজত ব্রহ্মলোকং॥

পাপনাশিনী কল্যাণদাত্রী বেদমাতার স্তুতি আমার করা হইয়াছে। আমাদের

অর্থাৎ দ্বিজদিগের আয়ু, প্রাণ, প্রজা, পশু, কীর্ত্তি, ধন এবং ব্রহ্মতেজ, যেন তাঁহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। তোমরা সকলে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শন কর।

৬। স্মৃতি ও পুরাণ

শ্রুতির পরেই স্মৃতির অধিকার ও সম্মান। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি যে ধর্ম্মব্যবস্থায় শাসিত হইবে, স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহে সেই সব ব্যবস্থা আছে। স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতিমূলক, অর্থাৎ বেদই উহাদের মূল। স্মৃতিশাস্ত্র প্রধানতঃ চারিখানি গ্রন্থে বিভক্ত।

স্মৃতি

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তকাত্যায়ন বৃহস্পতিঃ।
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিত দক্ষ গৌতমাঃ
শাতাতপো বাশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥

পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। পূর্ব্বে চারিখানি সংহিতার কথা বলা হইয়াছে। সত্যযুগে মনুসংহিতা, ত্রেতাযুগে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, দ্বাপরে শঙ্খলিখিত স্মৃতি, আর কলিতে পরাশর। এই চারিযুগের যুগধর্ম্ম চারিজন সংহিতাকার কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

কৃতেতু মানবা প্রোক্তাঃ ত্রেতায়াং যাজ্ঞবল্ক্যজাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা, ঋষিগণ কর্ত্তৃকই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ত্রিকালদর্শী মহানুভব সিদ্ধ মহর্ষিগণ অভিভাবকরূপে মানবজাতির হিতাহিত সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতেছেন এবং তাঁহারা মানবের কল্যাণের জন্য মানবের অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থাও করিতেছেন।

শ্রুতি ও স্মৃতি সম্বন্ধে মনুসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

শ্রুতিস্তু বেদ বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥

শ্রুতি বেদ আর ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি, যাহা কিছু মীমাংসা এই শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে করিতে হইবে। ধর্ম্ম এই শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিই বর্ত্তমানযুগে প্রধান। নারদস্মৃতিতে কথিত হইয়াছে মনু একলক্ষ শ্লোকে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন। উহা ১০৮০ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। নারদ উহাই ১২০০০ শ্লোকে, মার্কণ্ডেয় ৮০০০ শ্লোকে আর ভৃগুর পুত্র সুমতি ৪০০০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রচারিত করেন। এখন যে মনুসংহিতা পাওয়া যায়, উহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, উহাতে ২৬৮৫ শ্লোক আছে। মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে—

মনুসংহিতার আলোচ্য বিষয়

১। সৃষ্টি-প্রকরণ, দৈবাদিকাল নির্ণয়, বর্ণধর্ম্ম।

২। ধর্ম্মের চতুর্বিধ প্রমাণ, ব্রহ্মচর্য্যবিধি, শিষ্যের বা ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য।

৩। অষ্টবিধ বিবাহ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি।

৪। গার্হস্থ্যধর্ম্ম।

৫। ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, অশৌচ নির্ণয়, দ্রব্যশুদ্ধি, স্ত্রীধর্ম্ম।

৬। আশ্রমধর্ম্মানুশাসন।

৭। রাজধর্ম্ম।

৮। ব্যবহার—সাক্ষি, দণ্ড প্রভৃতির কথা অর্থাৎ আইনকানুন।

৯। দায়ভাগ, দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্য-নিরাকরণের উপায়।

১০। সঙ্করজাতির উৎপত্তি, আপৎকালে বর্ণচতুষ্টয়ের জীবিকার উপায়।

১১। প্রায়শ্চিত্ত-বিধি।

১২। জন্মান্তরের কারণ, জ্ঞান ও মোক্ষের সাধন।

মনুসংহিতার আলোচ্য বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব—সনাতন ধর্ম্ম কি, এবং সনাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থার দ্বারা প্রাচীন মহর্ষিগণ কি প্রণালীতে মানবজীবন গঠন করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকে মনে করেন, ধর্ম্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, কতকগুলি বিশ্বাস আর নির্দ্দিস্ট দিনে বা নির্দ্দিস্ট কালে কতকগুলি বিশেষ রকমের অনুষ্ঠান। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থা তাহা নহে। আমাদের সমগ্র জীবন ধর্ম্মের ব্যবস্থার দ্বারা নিয়মিত-

ভাবে শাসিত ও সংযত হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত জীবন, গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক জীবন —সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের শাসন ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মের প্রমাণ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ ২।১২

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মপ্রসাদ—এই চারিটিকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমরা যতই পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী হই না কেন, কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধি ও প্রতিভা আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে হঠাৎ কোনও মতামত প্রচার করা উচিত নহে। তাহাতে নিজেরও অনিষ্ট হয়, অন্যেরও অনিষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন—অর্থ ও কামে আসক্তি-শূন্য ব্যক্তিগণেরই ধর্ম্মজ্ঞান হয়। আমাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন কথা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বলিতে হইলে প্রথমেই চিন্তা করিতে হইবে, আমাদের অর্থ ও কাম্য বস্তুতে আসক্তি আছে কি না; যদি আসক্তি থাকে, তাহা হইলে আর অহঙ্কার করিয়া প্রয়োজন নাই।

অনাশক্তি ও শাস্ত্রবোধ

বেদ নিত্যজ্ঞান, ইহা মনুষ্যের রচিত নহে। গুরুরূপী পরব্রহ্মের কৃপায় এই বেদ সমাহিত সপ্ত ঋষির হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়া সপ্তছন্দে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়াছেন। এই বেদের বা মন্ত্রের চারি মূর্ত্তি—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরি। বেদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিতে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা নাই। এই বেদ আশ্রয় করিয়া, এই বৈদিক ধর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, মহর্ষিগণ স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র এবং সদাচারের ব্যবস্থা জগতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। জীবের পরম কল্যাণ সাধন করাই শাস্ত্র ও সদাচার প্রবর্ত্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই সদাচারের দ্বারা আমাদের সমগ্র জীবন সংযত ও পরিচালিত করিব। এই প্রকারে, যখন চিত্তশুদ্ধ হইবে তখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করিব।

মনু বলিয়াছেন,

নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।

তন্তুশাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্‌জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ২।১৬

জন্মিবার পূর্ব্বে গর্ভাধান হইতে মরণের পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত, যাহাদিগের সমস্ত জীবনকাল শাস্ত্রোক্ত বিধান-ক্রমে নিয়মিত হইয়া থাকে, সেই দ্বিজাতিগণই এই মানবশাস্ত্র (এবং বেদাদি অন্যান্য শাস্ত্র) অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিবার অধিকারী—অন্যে নহে।

দশসংস্কার ও মনু

ইহার কারণ আমরা বেদেই দেখিতে পাই। বেদে কথিত হইয়াছে এক এক 'বর্ণ' এক এক ছন্দে নির্ম্মিত। ব্রাহ্মণ গায়ত্রী ছন্দ, ক্ষত্রিয় ত্রিষ্টুভ ছন্দ, বৈশ্য জগতী ছন্দ। সংসারে ব্যবহার-দোষে সংসর্গ-দোষ ও অন্যান্য কারণে এই ছন্দের বা দহ ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতির বিকৃতি জন্মে। দশসংস্কারের উদ্দেশ্য এই বিকৃতি দূর করিয়া মানবকে তাহার মৌলিক সুপবিত্র অবস্থায় রক্ষা করা।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে ১০১০ শ্লোক আছে। আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত, তিন অধ্যায়ে এই তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

স্মৃতির পরেই পুরাণ ও ইতিহাস। ইহারা পঞ্চম বেদ নামে পরিচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণ ও ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও পুরাণ ও ইতিহাসকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে।

আঠারখানি পুরাণ প্রধান। ইহা ছাড়া আঠারখানি উপপুরাণ আছে। মুখ্য অষ্টাদশ পুরাণের নাম—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড। অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম—সনৎকুমার, নরসিংহ, বৃহন্নারদীয়, শিবরহস্য, দুর্ব্বাসা, কপিল, বামন, ভার্গব, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী, সূর্য্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, দেবী ভাগবত, গণেশ, হংস।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ

দুইখানি ভাগবত আছে, একখানি দেবী-ভাগবত আর একখানি বিষ্ণুভাগবত। এই দুইখানির মধ্যে কোনখানি পুরাণ, আর কোনখানি উপপুরাণ এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সেই মতভেদের কোনরূপ মীমাংসাও নাই। আমাদের উচিত এই উভয়-গ্রন্থকেই তুল্যরূপে সম্মান করা। এই উভয়-গ্রন্থই অমূল্য সুশিক্ষার আধার।

দুই ভাগবত

পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণ, অর্থাৎ পাঁচটি বিষয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ বলে।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থান পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহলক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—শ্রীমদ্ভাগবতে এই দশটি বিষয় আছে। যদিও এই দশটি বিষয় পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু সেজন্য শাস্ত্র ভিন্ন নহে। কারণ 'আশ্রয়' নামক যে দশম পদার্থ, তাহারই সুস্পষ্ট পরিচয় সর্ব্বসাধারণকে দিবার জন্যই মহাত্মাগণ, কোথাও শ্রুতির দ্বারা, কোথাও সাক্ষাৎ, কোথায় বা তাৎপর্য্যের দ্বারা অন্য নয়টি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

দশ লক্ষণ

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য যে দশটি বিষয়, তাহা কি জানা আবশ্যক।

সর্গ বলিতে তত্ত্বসৃষ্টি বুঝায়। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনগুণের পরিণাম-নিবন্ধন কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চভুত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ব ও অহঙ্কার-তত্ব এই সকলের বিরাট্-রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহার নাম সর্গ। আর ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর-সৃষ্টি তাহার নাম বিসর্গ। সৃষ্ট জীবগণ নিজ নিজ মর্য্যাদা পালন করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি-লাভ করিতেছে, এই উন্নতি-লাভের নাম স্থান। ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতেছেন, ইহার নাম পোষণ। কর্ম্মের বাসনার নাম উতি, এই কর্ম্মবাসনা জীবের বন্ধনের হেতু। ভগবানের অনুগৃহীত সাধুদিগের যে ধর্ম্ম তাহার নাম মন্বন্তর। শ্রীভগবানের অবতার-চরিত্র এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী মহাপুরুষগণের যে সৎকথা তাহার নাম ঈশ-কথা। ভগবান্ যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে পর, জীবের আত্ম-উপাধির সহিত যে লয় হয়, তাহার নাম নিরোধ। জীব অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত

কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে যে অবস্থিতি লাভ করে, তাহার নাম মুক্তি। যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি ও লয় হয়, এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম, তাঁহাকে আশ্রয় বলে।

শ্রীল জীবগোস্বামী মহোদয় "ষট্, সন্দর্ভ" নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের প্রথম সন্দর্ভে অর্থাৎ তত্ত্বসন্দর্ভে, শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ অংশটুকুর মর্ম্ম এইরূপ—

শ্রীজীব গোস্বামীর মত

পুরাণ পঞ্চমবেদ. এই প্রকারের কথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে প্রমাণ পাওয়া যায়—"বেদের ন্যায় পুরাণের অর্থকেও নিশ্চল মনে করি। বেদ সকল পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, পুরাণের সাহায্যে তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কথা বলিয়াছেন, এই কারণে পুরাণের অর্থ দুর্ব্বোধ্য। মৎস্যপুরাণ বলিয়াছেন, কল্পভেদে পুরাণের বিভিন্নতা হইয়াছে। সাত্বিক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজস কল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক। তামস কল্পে অগ্নির ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক। সত্বরজস্তমোময় সংকীর্ণ কল্পসকলে সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য অধিক পরিমাণে কথিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে পুরাণ-সমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। সাত্বিক পুরাণ-সমূহ শ্রেষ্ঠ হইলেও তৎসমুদয়ের মধ্যেও মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ব্রহ্ম সগুণ, কেহ বলেন নির্গুণ, কেহ বলেন জ্ঞানমূলক, কেহ বলেন জড়মূলক, সুতরাং এই সমুদয়ের সাহায্যে শেষ কথা কি তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ব্রহ্মসূত্রের সাহায্যে পরমার্থ-নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সূত্রগুলি অত্যন্ত অল্পাক্ষর ও গূঢ়। সুতরাং উপায় কি? এইরূপ প্রসঙ্গ বলিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী মহাশয় উপসংহারে বলিতেছেন,—যদি অপৌরুষেয় বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ সকলের সারার্থ-প্রকাশক, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য, এই জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত এবং পুরাণের যাবতীয় লক্ষণ-যুক্ত একখানি পুরাণ থাকে, তাহা হইলে সেই পুরাণের সাহায্যে এই সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের আশ্রয় বা অবলম্বন হইলেন।

ভগবান বেদব্যাস পুরাণ-সমূহ আবিষ্কার করিলেন—ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিলেন, কিন্তু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-পূর্ণ, বিচিত্র গূঢ় লীলা-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় তিনি

চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না সেই সময়ে দেবর্ষি নারদের উপদেশে তিনি সমাধিস্থ হইলেন এবং স্বরচিত সূত্র সমূহের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিলেন। "যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ববেদার্থসূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ।" এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় আছে, কারণ সকল বেদার্থের সূত্রস্বরূপ যে গায়ত্রী, সেই গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া এই শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধীয় এই সমুদয় কথা শ্রীজীব-গোস্বামী-কৃত তত্ত্ব-সন্দর্ভের কথা।

রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতিহাস বলে। এই ইতিহাস ও পুরাণ একত্রে পঞ্চম বেদ নামে পরিচিত ও সম্মানিত। শ্রীজীব গোস্বামী পুরাণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"পূরণাৎ পুরাণঃ" যিনি বেদের অর্থ পূরণ করেন, তাঁহার নাম পুরাণ।

৭। বেদাঙ্গ ও দর্শন।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধৰ্ম্ম, এই তিনটি যেন পৃথক্, অনেকে এইরূপ বিবেচনা করেন। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন এবং মানবকে বুঝাইয়াছিলেন, জ্ঞান এক, সত্য এক, তত্ত্ব এক। সুতরাং দর্শন, বিজ্ঞান ও ধৰ্ম্ম ইহাদের মধ্যে কোনই বৈষম্য বা বিরোধ নাই। সনাতন ধর্ম্মের অনুগত বিজ্ঞান-সমূহ বেদের ষড়ঙ্গ নামে পরিচিত। ইহা ছাড়া উপনিষদে বিদ্যাকে পরা ও অপরা এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের যাবতীয় অনাত্ম বস্তুর তত্ত্ব যে বিদ্যার দ্বারা জানা যায় এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় অনাত্মকে যে বিদ্যার দ্বারা আয়ত্ত করা যায়, তাহার নাম অপরা বিদ্যা। আর পরা বিদ্যা কি? উপনিষদ্ বলিতেছেন—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে", যে বিদ্যার দ্বারা যে অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করা যায়, তাহার নাম পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যার অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা। এই দুই বিদ্যা কিন্তু পরস্পর বিরোধী নহে।

পরা ও অপরা বিদ্যা।

মুণ্ডকোপনিষৎ অপরা বিদ্যার তালিকায় নিম্নলিখিত বিদ্যাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

"তত্রাঽপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।"

শেষের ছয়টিকে ষড়ঙ্গ বলে। ষড়ঙ্গ সূত্রে রচিত, তাহাদের সুবিস্তৃত ভাষ্য ও টীকা আছে। বেদ কেমন করিয়া পড়িতে হইবে, উচ্চারণ কিরূপ, কোন বর্ণের উপর কিরূপ জোর দিতে হইবে, এই সব বিষয় শিক্ষা-সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। বেদের সূত্র ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বিভক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং ভবিষ্যতে কেহ নিজের ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। শিক্ষার এক অংশ পদপাঠ, আর এক অংশ ক্রমপাঠ। ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অংশের নাম কল্প। এই অংশে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সমুদয় কথা আছে। এই অংশে শ্রৌতসূত্র আছে। ইহাতে ত্রিবিধ অগ্নি-সাধ্য ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। ইহার শেষ অংশ শুলভ সূত্র। ইহাতে যজ্ঞের বেদী নির্ম্মাণের প্রণালী ও ব্যবস্থা আছে। ইহার প্রথমেই ইউক্লিডের জামিতির প্রথমাধ্যায়ের সাতচল্লিশের প্রতিজ্ঞা আছে। ইহা ছাড়া গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, এই দ্বিতীয় ষড়ঙ্গের অন্তর্গত। তৃতীয়, ব্যাকরণ। এই অংশের পূর্ব্বাচার্য্যগণের গ্রন্থসমূহের সার পাণিনি সংকলন করিয়াছেন। চতুর্থ নিরুক্ত। ইহাতে ভাষাতত্ব ও ধাতুতত্ব আছে। ব্যাকরণে যেমন পাণিনি, নিরুক্তে সেইরূপ যাস্ক। পঞ্চম বেদাঙ্গ ছন্দ, আর ষষ্ঠ জ্যোতিষ।

নিরুক্ত-সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা আলোচনা করা আবশ্যক। ঋষিগণ নিরুক্ত বেদমন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে মানুষের, এমন কি পণ্ডিতদেরও এই দর্শনশক্তি লুপ্ত হইয়া গেল বা তেমন প্রখর অবস্থায় থাকিল না। ইহার ফলে, কোন কোন শব্দ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে মন্ত্র পাঠ করিলেই, তাহার অর্থ বোধ হইত, এখন আর তাহা হয় না। সেই সময়ে বেদের দুর্ব্বোধ্য শব্দ-সমূহের তালিকা প্রস্তুত হইল। কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ জল, কোন কোন্ শব্দের অর্থ আকাশ, কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ তেজঃ, কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ পৃথিবী, তাহার তালিকা সঙ্কলিত হইল। এই তালিকায় বলিয়া দেওয়া হইল এই একুশটির নাম পৃথিবী, এই একশত একটি শব্দের অর্থ জল। এই তালিকা-গ্রন্থের নাম "নিঘণ্টু"। নিঘণ্টু গ্রন্থ রচিত হওয়ার পরবর্ত্তী সময়ে মহামুনি যাস্ক, তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি যে যে শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই সেই শব্দ বেদের মধ্যে যে যে মন্ত্রে আছে, তিনি সেই মন্ত্রগুলিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রকারে আমরা মহামুনি যাস্কের নিকট অনেকগুলি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা

করিবার একটি প্রণালী পাইয়াছি। বেদের যে সকল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই নিরুক্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

বিলাতী পণ্ডিতের ভুল

বিলাতী পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তনে আমাদের দেশের স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেদের ব্যাখ্যায় এই নিরুক্তকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহার ব্যাখ্যা এক নূতনরকমের হইয়াছে এবং আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি না। দু' একটি উদাহারণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ঋগ্বেদে আছে—"মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ বিশাদসং ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা।" দত্তসাহেব ইহার অর্থ করিয়াছেন—মিত্র ও বরুণ আসিয়া আমাদের যজ্ঞে ঘৃতাহুতি প্রদান করুন।

যাস্কের অর্থ—পূত দক্ষ মিত্র (সূর্য্য যে সময়ে ...থার উপরে থাকেন, তখন তাঁহার নাম মিত্র) ও শত্রুনাশক বরুণকে (সূর্য্য যখন অধোদেশে গমন করেন তখন তাঁহার নাম বরুণ) আহ্বান করি, তাঁহারাই উদক প্রেরণা[illegible] কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'ঋ' ধাতুর অর্থ করিয়াছেন—"চাষকরা"। অতএব 'আর্য্য' কথার অর্থ—'চাষা'। যাস্ক, 'আর্য্য' কথার অর্থ করিয়াছেন—"ঈশ্বর পুত্র"। যাস্কের নিরুক্ত পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, ইহা বেদের ঋষিগণ প্রচারিত করিয়াছেন।

ষড়দর্শনের নাম ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের 'প্রস্থানভেদ' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে এই ছয়দর্শনের সার মর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে। সরস্বতী মহোদয় ষড়দর্শনের সার সঙ্কলন করিয়া দেখাইয়াছেন, ষড়দর্শনের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বিরোধ নাই। ইঁহার ভিন্ন ভিন্ন ভূমি হইতে, বিভিন্ন প্রকারের বিচারণা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বেদ-প্রতিপাদ্য একই মহাসত্যের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেখাইয়াছেন। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের এই মত বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শন জগতে অতুলনীয়। এই ভারতবর্ষের আর্য্যঋষিগণই পৃথিবীর আদিম উপদেষ্টা। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা ইহা পূর্ব্বে স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন গ্রীস্‌দেশই সভ্যতার জনক। কিন্তু এই মত এখন আর দাঁড়াইতে পাড়িতেছে না। মিশরদেশের পিরামিড্ খনন করা হইতেছে, তাহা হইতে অনেক নূতন নূতন

তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। খৃষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মানবজাতির ইতিহাসকে ছয়হাজার বৎসরের ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন, এবং সেই কথাই দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতেন। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকেও সেই সব কথা লিখিত আছে, আর আমরা না বুঝিয়া শৈশবে সেই সব কথা মুখস্ত করিতাম। আমাদের শিক্ষকগণ এই দেশেরই সন্তান, তাঁহারাও আর্য্য ঋষিগণের বংশধর, কিন্তু তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ভুল সিদ্ধান্ত যখন আমাদের মুখস্ত করাইতেন তখন আমাদিগকে কিছু বলিয়াও দিতেন না। বাল্যকালের এই ভ্রান্তি নিবন্ধন, আমরা শাস্ত্রে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি।

কিন্তু এই মত এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রাচীন মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন্ প্রভৃতি দেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া সভ্যতার বিবিধ নিদর্শন আবিষ্কার করা হইতেছে, আর সেই সব নিদর্শনের সাহায্যে ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে, এই দেবনির্ম্মিত কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষই জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতার আদিজনক। ভারতবর্ষ হইতেই সভ্যতার আলোক পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিকীরিত হইয়াছে।

আর্য্যসভ্যতার প্রভাব ও বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেব ভারতবর্ষেরই সন্তান। তিনি জ্ঞানবাদ আশ্রয় করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধতা করিলেও তাঁহার উপদেশ উপনিষদেরই একাংশ। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা যীশু-খৃষ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত অহিংসা ও প্রেমের ধর্ম্ম এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বনেই প্রবর্ত্তিত, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন। মহাত্মা যীশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ আছে। যীশুখৃষ্টের বহুপূর্ব্বে গ্রীস্‌দেশে যে সমুদয় দার্শনিক-মহাপুরুষ জন্মাইয়াছিলেন তাঁহারাও ভারতের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। আমেরিকা দেশে এমন অনেক প্রাচীন চিহ্ন আছে, যাহা দেখিলে মনে হয় যে ভারতের আর্য্যগণের ধর্ম্মই একদিন সে দেশের ধর্ম্ম ছিল। যাবাদ্বীপ প্রভৃতিতে এখনও হিন্দু রহিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষ কি ছিলেন, আজ তাহা আমাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথার প্রতিধ্বনি করিলে আমরা বঞ্চিত হইব।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র

গীতার ধর্ম্ম—স্থিত-প্রজ্ঞ

১। দ্বাপর যুগের সমস্যা

শ্রীকৃষ্ণ সকলই জানেন বা জানিতেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের বোধ কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইতে চাহেন না। তিনি কখনই ইচ্ছা করেন না যে অন্য কেহ অন্ধভাবে, না বুঝিয়া তাঁহার মত মানিয়া লউক। প্রত্যেকের সত্যবোধ তাহার নিজের ভিতর হইতে তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে ফুটিয়া উঠুক ; জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রত্যেকেই জ্ঞান ও শক্তি লাভ করুক, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়।

দ্বাপর যুগের শেষে আমাদের সমাজের ভিতরটা একেবারে পচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাহির হইতে দেখিয়া সকলে তাহা বুঝিতে পারিত না, এবং এখনও পারিবে না। সমাজে যাহারা বড়, সামাজিক শক্তির যাহারা নিয়ামক, তাহারা যাহা করে, লোকে মনে করে তাহাই ভাল। যদি বা কেহ বোঝে তাহা মোটেই ভাল নহে, তাহা হইলে সে তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারে না; যদিই বা বলে তাহা হইলে তাহার কথা শোনেই বা কে ? এ বড় ভয়ানক অবস্থা।

দেবব্রত ভীষ্ম, তাঁহার চরিত্রের তুলনা নাই। তিনি জানিতেন, খুব ভাল করিয়াই জানিতেন, দুর্য্যোধন মূর্ত্তিমান পাপ ! জানিয়াও তিনি শেষ পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের পক্ষে ছিলেন। ইহার অর্থ কি ? দ্রোণাচার্য্যকেও সাধুপুরুষ বলিতে হইবে, কৃপাচার্য্যও ভাল লোক, কিন্তু তাঁহারাও দুর্য্যোধনের পক্ষে। ইহার কারণ কি ? মহাভারতখানি ভাল করিয়া পড়িয়া ইহার কারণ বুঝিতে হইবে। এই কারণ-গুলি বুঝিলে গীতার উপদেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই এমনভাবে চলিয়াছিলেন; ঘটনাগুলিকে এমনভাবে পরিচালনা করিয়া-ছিলেন, যাহাতে সমাজের ভিতরের গলিত ও দূষিত অংশ বাহিরে ব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং যাহারা চিন্তা করে, তাহারা যেন ধরিতে পারে ও বুঝিতে পারে, সমাজের ভিতরের অবস্থা কিরূপ ?

মহারাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র, তিনি পণ রাখিয়া পাশা খেলিয়া নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত শত্রুর হাতে বিলাইয়া দিলেন। কুলস্ত্রীকে সভার মধ্যে বিবস্ত্রা করিবার জন্য চেষ্টা হইল, সভাস্থ সকলে তাহা নীরবে বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। এই প্রকারের সামাজিক জীবন ধ্বংস হওয়াই আবশ্যক ! কিন্তু কে ধ্বংস করিবে ? যদি ধ্বংসই করিতে হয়, তাহা হইলেও যাহা করিবে ভাবিয়া বুঝিয়া করিও। আর ভাল বা মন্দ, যাহা কিছু ভাঙ্গিতে যাওনা কেন, গড়িবার ব্যবস্থাটা পূর্ব্ব হইতে করিয়া ভাঙ্গিবার

কার্যে হাত দিও। শ্রীকৃষ্ণ ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ভাঙ্গিবার ঠিক্ পূর্ব্বেই পুনর্গঠনের উপকরণ দিয়াছেন। ভগবদ্গীতায় সেই উপকরণগুলি রহিয়াছে। আমাদিগকে সেগুলি বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

গীতা পুনর্গঠনের যে উপকরণ দিয়াছেন, তাহার প্রধান কথা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া প্রত্যেককে সর্ব্বাগ্রে আত্মজয়ী হইতে হইবে এবং ভিতর হইতে আত্মার আলোকে জগৎকে ও সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—বাহিরের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম বা বিধির দ্বারা নহে। প্রথম চাই আত্ম-জয় Self-mastery আর The world to be re-made from within.

২। আত্মজয় ও তাহার প্রণালী

আত্মজয়, এই কথাটি খুব সুবিধাজনক কথা নহে। তবে আত্মা বলিতে দেহকেও বুঝায় আবার এই ব্যবহারিক 'আমি'টাকেও বুঝায়। আত্মজয় বলিতে বুঝায় এই, যে আমার যাহা প্রকৃত আমি, তাহাকে আমি ভুলিয়া গিয়াছি এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া, যাহা অস্থায়ী তাহাকে স্থায়ী বলিয়া মনে করিতেছি। এই যে ভুল, এই ভুলের হাতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আমার প্রকৃত 'আমি'কে ধরিতে হইবে। এমন করিয়া ধরিব, যে আর ছাড়িব না। এমন করিয়া ধরিব যে সুখদুঃখ ভালমন্দ লাভ লোকসান যাহাই ঘটুক না কেন, সেই স্বরূপের ভূমি হইতে বা সেই সত্যবোধ হইতে কিছুতেই বিচলিত বা বিভ্রান্ত হইব না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই অবস্থার কতকগুলি নাম দেওয়া হইয়াছে। ১। স্থিতপ্রজ্ঞ ২। স্থিতধী ৩। সমাধিস্থ এই অবস্থারই আর একটি নাম—৪। ব্রাহ্মীস্থিতি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও কতকগুলি কথা আছে, যেগুলি এই অবস্থারই পরিচায়ক যথা নিস্ত্রৈগুণ্য, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান্, যোগস্থ। এই কথাগুলির দ্বারা যে অবস্থা বুঝায় সেই অবস্থাতেই সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এজন্য ধারণা ও ধ্যান অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নরূপে গভীর চিন্তা আবশ্যক। আমি কি হইতে চাই, কি অবস্থায় পৌঁছিতে চাই, যাত্রার প্রারম্ভেই তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক, এবং পথে অগ্রসর হইবার সময় তাহা মনে রাখা আবশ্যক, নতুবা পথ-ভ্রষ্ট ও বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা। অনেকে মনে করেন, এবং পূর্ব্বকালে অধিকাংশ লোকেই মনে করিতেন যে, ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে প্রথমেই বড় বড় কথা লইয়া আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। শাস্ত্র আছে, গুরু আছে, তাহাদের উপদেশ আছে। সেই উপদেশ শুনিয়া অনুসারে কাজ করিয়া যাও। কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ আপনা আপনি সকল কথা বুঝিতে পারিবে, এবং যাহা হইবার তাহা হইবে। প্রথম হইতেই জিজ্ঞাসা করিয়া কোন লাভ নাই এবং জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর পাইবে তাহা বুঝিতে পারিবে না। এই উপদেশ ভাল হইতে পারে,

কিন্তু এই উপদেশ অনুসারে কাজ করা সকলের পক্ষে সম্ভব কি না তাহাই বিবেচ্য। তাহার পর শাস্ত্র ও গুরু। শাস্ত্র অর্থাৎ প্রত্যেক শাস্ত্র সত্য শাস্ত্র কি না, প্রত্যেক গুরু সত্য গুরু কি না, এক শাস্ত্রের সহিত অপর শাস্ত্রের, এক গুরুর সহিত অপর গুরুর পার্থক্য হয় কেন, এই প্রশ্ন মানুষ মাত্রেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক। জোর করিয়া বা ভয় দেখাইয়া মানুষের মনের এই স্বাভাবিক প্রশ্ন বিনষ্ট করিলে মানুষের পারমার্থিক কল্যাণ হইবে না—দারুণ অকল্যাণ হইবে। শাস্ত্র সত্য এবং অবলম্বনীয়, গুরু সত্য এবং অনুসরণীয়, একথা গীতা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র ও গুরু যে সত্য তাহা বুঝিতে হইলে এবং তাহা বুঝিয়া তাহাদিগকে ধরিতে হইলে, আমার ভিতরে কিছু থাকা চাই। সেই যে "কিছু", তাহা লাভ করিবার জন্য প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ সাধনা আবশ্যক।

কথাটা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে, এই মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংস হইবে, সমাজের প্রাচীন বন্ধনগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইবে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর দ্বাপর যুগ আর অতি অল্প দিন মাত্র থাকিবে, তাহার পর কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইবে। কলিযুগ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। এই কলিযুগে প্রত্যেক নরনারী নিজেকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে, প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে এই অনুভূতি হঠাৎ এক দিনে জাগিয়া উঠিবে না। প্রাচীন জগতের সংস্কার, অভ্যাস ও ব্যবস্থার সহিত এই নব ভাবের পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হইবে, এই সংঘর্ষ কখন এক পক্ষ কখন অপর পক্ষ জয়লাভ করিবে। কিন্তু আবার সংঘর্ষ হইবে। এই ভাবে যে কতকাল চলিবে তাহার স্থিরতা নাই। উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছাচার, নৈতিক পতন প্রভৃতি এই সংঘর্ষের আনুসঙ্গিক ও অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে উপস্থিত হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, কলিযুগের যাহা ভাব অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভাব ক্রমে ক্রমে তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে এই সমুদয় কথা বলা হইয়াছে। আমাদের অনেককে হয়ত এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভাব ভাল লাগিবে না। আমরা ইহাকে স্বৈরাচার বলিয়া ঘৃণা করিব; কিন্তু যিনি নিত্য কুরুক্ষেত্রের সারথি এবং যাঁহারা সেই নিত্য সারথির সৈনিক, তাঁহারা ঘৃণা করা, উপেক্ষা করা ও পরিত্যাগ করা কাহাকে বলে জানেন না। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে তাঁহারা বীরের মত গ্রহণ করেন এবং কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা জানেন। আজ যাহা কুৎসিত তাহারই ভিতরে সুন্দর লুকাইয়া রহিয়াছে। ভয় পাইও না, ব্যস্ত হইও না, অপেক্ষা কর। আজ যাহা ভীষণ, তাহারই ভিতর মধুর লুকাইয়া আছে; ভয় পাইও না, ব্যস্ত হইও না, অপেক্ষা কর। সুতরাং এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভাব উপেক্ষণীয় নহে। ইহারও সদ্ব্যবহার আছে। গীতায় সেই সদ্ব্যবহারের প্রণালী ও পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; ইহাই গীতার বৈশিষ্ট্য। গীতার বাণী যে যুগে ঘোষিত হইয়াছে সে যুগে অনেক শাস্ত্র ছিল, অনেক গুরু ছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, বেদব্যাস ও অর্জ্জুন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

এই কারণেই গীতা মানুষকে অন্ধভাবে কোন কর্ম্ম করিতে না বলিয়া জীবনের যাহা চিরন্তন আদর্শ তাহারই কথা বলিলেন, নানা প্রকারে সেই আদর্শ ব্যাখ্যা করিলেন, এবং সকলকেই বলিলেন—তোমরা এই আদর্শে অবিশ্বাস করিও না। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তোমরা সর্ব্বদা এই আদর্শের ধারণা ও ধ্যান কর। আমরা এইবার একটি একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কথাগুলি লইয়া এই আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

৩। স্থিত-প্রজ্ঞ

অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিতে শুনিতে প্রশ্ন করিলেন—'স্থিত-প্রজ্ঞ' কাহাকে বলে? 'স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা আত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য' আত্মনাত্মবিবেকের দ্বারা অর্থাৎ ইহা সৎ এবং ইহা অসৎ, এই বিষয়ের সর্ব্বদা বিচার করিতে করিতে যে বুদ্ধি বিকশিত হয়, সেই বুদ্ধি যাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই স্থিত-প্রজ্ঞ। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, এই এষণাত্রয় যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন—যিনি নিজের সুখ বা সুবিধার জন্য বাহিরের কোন ব্যক্তি বা বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না, যিনি আত্মারাম ও আত্মক্রীড় তিনিই স্থিত প্রজ্ঞ। আচার্য্য শঙ্কর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চান্ন শ্লোকে এইভাবে কথাটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অবস্থাই আদর্শ অবস্থা, প্রত্যেক মানবকে এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে। প্রথম হইতেই নিয়মিতভাবে এই অবস্থার ধ্যান করিতে হইবে, আর এই আদর্শ অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া প্রতিদিন বিচারপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে, আমার প্রকৃত অবস্থা কি? একজন ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরের উপকার করিতেছে, নিজে হয় ত পরোপকার কার্য্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, কিন্তু কেহই তাহা বুঝিল না, কেহই তাহা স্বীকার করিল না। যাহারা উপকৃত হইল তাহারাও বুঝিল না। বরং উল্টা হইল। লোকে ভাবিল, ইহার কোন গূঢ় মতলব আছে। এরূপ অবস্থায় কি হয়? পরোপকারী সাধু লোকেরও মন খারাপ হইয়া যায়, তিনি হয় ত মনের দুঃখে লোকের নিন্দা করেন, নিজের প্রশংসা করিয়া বেড়ান। এ প্রকারের অবস্থা অধঃপতনের অবস্থা। যাহারা ভাল কাজ করিতেছে আর জোগাড় করিয়া নিজের অনুগত লোকের দ্বারা নিজের প্রশংসা প্রচার করিতেছে, তাহাদের কথা ত আলোচনার বিষয়ই নহে। তাহারা নিতান্তই সংসারের বদ্ধ ও সাধারণ জীব। ধর্ম্মরাজ্য বা আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত তাহাদের কোনরূপ সম্বন্ধই নাই। তাহারা ঈশ্বরও মানে না, আত্মাও মানে না।

আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা করিব, আমি যাহা আমার ধর্ম্ম বলিয়া অনুভব করিব, অনলসভাবে তাহা পালন করিব। সংসারের মানুষ তাহা জানিল কি জানিল না, বুঝিল কি বুঝিল না, মানিল কি মানিল না, সে চিন্তাই মনের মধ্যে জাগিবে না। আমার পুরস্কার, আমার

ভিতরে, বাহিরে নহে, এই মহাসত্যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা যিনি করিয়াছেন, এবং অটলভাবে এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে যিনি প্রস্তুত, তিনিই গীতার ধর্ম্মের অধিকারী। আমাদিগকে আত্মারাম হইতে হইবে। নিত্য পরমানন্দ আমার ভিতরে আছেন, নিজের ভিতরে সেই পরমানন্দ লাভ করিতে হইবে।

অর্জ্জুন ভগবান্‌কে যে প্রশ্ন করিলেন, সেই প্রশ্নটি একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। আচার্য্য সেই প্রশ্নটির বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করিয়াছেন।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কাভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের টীকানুসারে শ্লোকটি ব্যাখ্যাত হইতেছে। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? লোকে কি লক্ষণ দেখিয়া বুঝিবে ইনি সমাধিস্থ স্থিত প্রজ্ঞ? সমাধিভঙ্গের পরের অবস্থার নাম ব্যুত্থিতচিত্ত। ইহাকে স্থিতধী বলে। যিনি স্থিতধী স্থিত-প্রজ্ঞ, তিনি কিভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তিনি কিভাবে বাহিরের ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করেন? যখন ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত না করেন সে সময়ে কিভাবে বিচরণ করেন? অর্জ্জুন চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সমাহিত স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে একটি, আর ব্যুত্থিতচিত্ত স্থিত প্রজ্ঞ সম্বন্ধে তিনটি।

কিন্তু প্রশ্নগুলি সবই বাহির হইতে করা হইল। অর্জ্জুন যেন ভাবিতেছেন তিনি বাহিরের লক্ষণের দ্বারা এই সমুদয় ব্যাপার বুঝিয়া লইবেন। সংসারের স্থূলবুদ্ধি লোকেও তাহাই করে। যাঁহার সাজসজ্জা আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, বড় বড় মঠমন্দির আছে, বড় বড় শিষ্য আছে, তিনিই বড় সাধু। সংসারের স্থূলবুদ্ধি লোক, যাহারা অন্তর্জগতের ব্যাপার একেবারেই বোঝে না, তাহারা এইরূপ মনে করে, এবং এই সব বহির্ম্মুখ লোককে অধীনে রাখিবার জন্য সাধু নামে পরিচিত বহুলোক সংসারের বিষয়াসক্ত লোক অপেক্ষাও অধিক অসাধু। সাধু নামে পরিচিত অথচ বিষয়সম্পত্তি, মামলা মোকদ্দমা, জাল দলিল, জাল উইল, মিথ্যা সাক্ষ্য, দাঙ্গা, নরহত্যা প্রভৃতিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। অথচ সেই সব লোকে 'সাধু' নামে পরিচিত। ইহা অপেক্ষা মানবজাতির অধঃপতন আর কি হইতে পারে? এই গেল প্রচলিত ও অধঃপতিত সাধুগিরির একদিক্। আর একদিক্ ভেল্কি, বুজ্‌রুকি, ইন্দ্রজাল বা প্রবঞ্চনা। মোটকথা মানুষ বাহিরের ব্যাপারের সাহায্যে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বুঝিতে চায়।

শ্রীভগবান্ উত্তরে যেন বলিলেন, অর্জ্জুন, বাহিরের লক্ষণের দ্বারা বুঝিতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

প্রথম কথা, সমুদয় কামনা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মনের ভিতর, হৃদয়ের ভিতর যত প্রকারের কামনা প্রবেশ করিয়াছে, সমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করিলে তুষ্ট হইবার কারণ থাকিবে না। তাহা হইলে মানুষ যে উন্মত্ত বা প্রমত্ত হইয়া যাইবে? ইহার উত্তরে বলিলেন—তাহা হইবে না। পরমার্থদর্শনরূপ যে অমৃতরস, সেই অমৃতরসলাভের দ্বারা তিনি ধন্য ও পূর্ণ হইবেন। এই অবস্থার নাম স্থিতপ্রজ্ঞ। ইহাই আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রায়।

এই অবস্থাটি আমাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে হইবে। এই কারণে এই অবস্থাটি খুব বিস্তারিতরূপে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। জীবনে যদি নানারূপ দুঃখ ঘটে, তাহা নীরবে সহ্য করিব, উদ্বিগ্ন হইব না, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব না। সুখ যদি আসে তাহার প্রতি স্পৃহা থাকিবে না। সুখের ভিতরেও যেমন মনের অবস্থা থাকিবে, সুখ চলিয়া গেলেও মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ থাকিবে। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ একেবারে অপগত হইবে।

এই প্রকারের অবস্থালাভই গীতার ধর্ম্ম। আমরা গীতার মাহাত্ম্যও শতমুখে বর্ণন করি, আর ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য হয় কোন নামজাদা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুরুর অন্বেষণ করি, না হয় একটা কিছু আজগুবি কাণ্ড আশা করি। গীতার ধর্ম্ম অতিশয় সুবোধ্য। দুঃখও সকলের জীবনে ঘটে, সুখও যে আসে না তাহা নহে। আসক্তিও সকলেরই আছে, ভয় এবং ক্রোধেরও অসদ্ভাব নাই। এই সকলের মধ্যে পড়িয়া যদি সর্ব্বদা মনোযোগী হইয়া নিজের মনের উপর পাহারা দেওয়া যায়, তাহা হইলেই প্রকৃত ধর্ম্মসাধনা হইবে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হইবে। আমার ভয়, ক্রোধ ও আসক্তি কমিতেছে কি না, দুঃখের মধ্যে নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছি কি না, সুখে স্পৃহা আছে কি না? এই সমুদয় প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? কোন গুরু পুরোহিত বা অবতার নহে, আমাকেই আমার আত্মার অন্তর্যামী শ্রীভগবানের নিকট এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইবে। প্রতিদিন এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করা যাউক, তাহা হইলেই ধর্ম্মলাভ হইবে। আজগুবির অন্বেষণে জীবন নষ্ট করিতে হইবে না, মুরুব্বি ধরিবার চেষ্টায় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া পশুত্বের মধ্যে অধঃপাতিত হইয়া চেষ্টা করিয়া আত্মঘাতী হইতে হইবে না। ইহাই গীতার ধর্ম্ম—বর্ত্তমান যুগের একমাত্র নিরাপদ ধর্ম্ম বা নিরাপদ ধর্ম্মের ভিত্তি।

মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ কি না, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা কি না, ইহা বুঝিবার সদুপায় কি তাহাও শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ, যদিও আমার ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহারা আমার অমতে নিজ নিজ বিষয়ের অভিমুখে ছুটিতেছে। আমিও ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কখন অনিচ্ছায়,

আবার কখন স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ছুটিতেছি। বঞ্চিত হইতেছি, কষ্ট পাইতেছি, তথাপি ছুটিতেছি, বুঝিয়াও বুঝি না। এমনই দুরবস্থায় পড়িয়াছি। আমার ইচ্ছাশক্তির এমন সামর্থ্যই নাই যে ক্ষণকালের জন্যও ইন্দ্রিয়গণকে নিজের শাসনাধীনে আনি। এই প্রকারের শোচনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে। কচ্ছপ যেমন ইচ্ছামত নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটাইয়া লইয়া নিজের ভিতরে প্রবেশ করে, আমাকেও সেইরূপ ইচ্ছামাত্র ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের প্রীতিকর বিষয়সমূহ হইতে টানিয়া লইয়া নিজের ভিতরে রুদ্ধ করিতে হইবে। এই অবস্থার নামই আত্মজয়ের অবস্থা। কি প্রকারে ইহা হইতে পারে? উত্তর—ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন—Development of the Will—ছাড়া ইহার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কোন অলৌকিক উপায়ে ইহা হইবে না। মন্ত্র, ক্রিয়া বা গুরু সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু আমাকেই অভ্যাস যোগের দ্বারা নিয়মিতভাবে পরিশ্রম করিয়া এই ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করিতে হইবে।

রোগের দ্বারা, উপবাসের দ্বারা, অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রব্রতের দ্বারা এবং ঔষধিযোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে দুর্ব্বল করিয়া তাহাদের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট করিয়া সংযত করা যায়। কিন্তু তাহা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে, সাবধান! ইন্দ্রিয়গুলি অক্ষম হইয়া বিষয়ভোগে বিরত হইবে বটে, কিন্তু ভোগের বাসনা ভিতর হইতে যাইবে না। বরং ভোগশক্তি যত কমিবে, ভোগাসক্তি তত বাড়িয়া যাইবে। তাহা হইলে এই অভিলাষ কি প্রকারে যাইবে—গীতা বলিলেন—"পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিলেন—"পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে।" পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁহার অভিলাষ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়। গীতার মত—

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

ইন্দ্রিয়গণকে যিনি বশীভূত করিয়াছেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।

গীতা প্রচারিত হওয়ার পর যখন আমাদের দেশে অসংখ্য ধর্ম্মমণ্ডলী প্রবর্ত্তিত হইল, ধর্ম্ম যখন লোক ঠকাইবার সর্ব্বপ্রধান উপায় হইয়া পড়িল, তখন আর ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার উপদেশ থাকিল না। তখন বলা হইতে লাগিল—অমুক তীর্থে অমুক তিথিতে স্নান করিলেই বৈকুণ্ঠ-লাভ, অমুক জায়গায় অমুক মোহান্তের পায়ে এই পরিমাণ মোহর দিলেই গোলোকের চাবি খুলিয়া যাইবে, অমুকের কণ্ঠের মালা গলায় দিলেই মোক্ষ, আর অমুক রঙ্গের মাটি এতখানি মাখিলেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাগম। মালা, তিলক, তীর্থযাত্রা বিগ্রহদর্শন প্রভৃতির উপকারিতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা গৌণ, ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করা, চিত্তকে শুদ্ধ করা ইহাই মুখ্য। গীতা এই মুখ্য ধর্ম্মই জগতে প্রচার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলেই প্রসাদ লাভ হইবে। এই প্রসাদই স্বাস্থ্য। এই অবস্থারই নাম

৪। ব্রাহ্মী-স্থিতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবান্, এই অবস্থা কি, তাহা বুঝাইয়াছেন।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

দেশদেশান্তর হইতে কত শত নদনদী সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু সমুদ্র যেমন তেমনই আছে। সেজন্য সমুদ্র নিজের মর্য্যাদা অতিক্রম করে না, বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয় না। সেইরূপ বিষয়সমূহ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুনির ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু তিনি ভোগের দ্বারা অবিক্রিয়মান। এই অবস্থাই শান্তির অবস্থা। যে ব্যক্তি ভোগকামনাশীল, সে কখনও এই শান্তি পায় না।

এই শ্লোকটি শ্রীধর স্বামীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ব্যাখ্যাত হইল। শ্লোকটির স্বাভাবিক অর্থ এই। বিষয়ের সহিত জোর করিয়া সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কি হইবে? আর জোর করিয়া সম্বন্ধ ত্যাগ করার প্রয়োজনই বা কি? যে আছে সে থাকুক, যে আসে সে আসুক, যে যায় সে যাউক। দরজা বন্ধ করিব না। কিন্তু ভিতরে আত্মসংস্থ হইবে। বিষয়ের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমি যে মহাসমুদ্র, আর বিষয়গুলি যে নদনদীর ন্যায়।

যিনি এই প্রকারে সমুদয় বাসনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্ম্মমভাবে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া প্রারব্ধবশে বিষয় ভোগ করেন, তিনি শান্তিলাভ করেন।

ইহারই নাম ব্রাহ্মস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা। ইহা পাইলে আর সংসারমোহ ঘটে না—এই অবস্থায় অন্তকালে ক্ষণমাত্র থাকিলেও ব্রহ্মলাভ হয়।

পূর্ব্বের শ্লোকগুলি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আলোচনা করিতে হইবে। প্রথম কথা এই শ্লোকগুলিতে কামনা-ত্যাগের কথা রহিয়াছে। কামনাত্যাগ বলিতে কি বুঝায়, প্রথমে তাহাই ভাবিতে হইবে। পাথরে কোন জিনিসের যেমন প্রতিবিম্বপাত হয় না, সেই প্রকার, এমন লোক থাকিতে পারে, যাহার হৃদয় ও মন কিছুতেই সাড়া দেয় না, কিছুতেই জাগে না, কিছুতেই মাতে না। এমন লোক আছে সংসারের ছোট বড় বিবিধ প্রয়োজনে তাহার হৃদয় আক্রান্ত ও আকুল হয় না। এই শ্রেণীর লোক কি কামনাত্যাগী? উত্তর—না। এই শ্রেণীর লোক পশুরও অধম—ধাতুপ্রস্তর শ্রেণীর।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি শ্লোকের প্রথম শ্লোকে বলিলেন, নদনদীসমূহ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ কামনাসমূহ যাহার ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু কামনার জন্য, যাহার কোনরূপ ক্ষোভ না হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করিয়াছে। তাহা হইলে কামনার জাগরণ হয় না, ইহা সত্য নহে। দ্বিতীয় শ্লোকে কামনা-ত্যাগের কথা রহিয়াছে। সুতরাং কামনা জাগিবে অথচ তাহার দ্বারা অভিভূত হইব না, কামনাসমূহকে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা বা তৃপ্তিসাধনে প্রযুক্ত করিব না, এই সমুদয় কামনাকে অন্যভাবে ব্যবহার করিব, ইহাই গীতার অভিপ্রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

স্বভাবকবি গোবিন্দদাস—[শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী আকারের ২১৩ পৃষ্ঠা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র লিখিত ৭ পৃষ্ঠা ভূমিকা ও ছয়খানি চিত্র আছে। ভাল এণ্টিক কাগজে ছাপা—রেশমী কাপড় মোড়া ভাল মলাটে বাঁধাই। মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রকাশক—শ্রীপরেশমোহন হালদার বি, এল্. রঙ্গপুর।]

বর্ত্তমান বঙ্গের কবিতা-সাহিত্যে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের একটি বিশিষ্ট উচ্চ ও স্থায়ী স্থান আছে। এই স্থানের স্বরূপ এনখও নির্ণীত হয় নাই। কেবল গোবিন্দদাস কেন, তেমন সমালোচনা অনেকেরই হয় নাই। সন্দর্ভ-লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষেরও হয় নাই, কবি নিত্যকৃষ্ণ, দেবেন্দ্র সেন বা অক্ষয় বড়ালেরও হয় নাই। যাহা হউক, গোবিন্দদাসের একখানি বেশ ভাল জীবন-চরিত বাহির হইল। খুবই সুখের কথা। যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যকে ভালবাসেন, সাহিত্যের জন্য কিছু খরচ করা ধর্ম্মেরই একটি অঙ্গ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা একখানি করিয়া এই পুস্তক খরিদ করুন—ঠকিবেন না, পড়িয়া সুখী হইবেন। কবি গোবিন্দদাসের জীবনের শেষ ষোল বৎসর এই গ্রন্থের লেখক, কবির সহিত ভাল করিয়া মিশিয়াছিলেন, কবির সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর কবির সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। হেমবাবু এই গ্রন্থ-রচনায় খুব খাটিয়াছেন, অনেক উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছেন। এখন বিশেষ দরকার, কবি গোবিন্দদাসের সমগ্র রচনা সংগ্রহ করিয়া সুলভে গ্রন্থাবলী প্রচার। আশা করি কোন উৎসাহী প্রকাশক এই কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এই গ্রন্থের ভূমিকা আমরা পূর্ব্বে ছাপাইয়াছি। সুতরাং, বিশেষ কিছু নূতন কথা আপাততঃ বলিবার নাই। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে এই গ্রন্থখানি যেরূপভাবে সাময়িক পত্রে সমালোচিত হওয়া আবশ্যক, সেরূপভাবে সমালোচিত হইতেছে না। কিন্তু পরে দেখিলাম, অনেক কাগজেই ভালরূপ সমালোচনা হইয়াছে।

ভূমিকায় শিবরতন বাবু বলিয়াছেন—'একজন লোক কোন মানুষের জীবন-সম্বন্ধে সব কথা

বলিতে পারে না। আমরা প্রকৃতই বহুরূপী। কাজেই যাঁহাদের জীবনের ঘটনা আমাদের বলিবার বিষয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি লোক যদি নিজ নিজ মন্তব্য ও ধারণা প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যযুগের উপকার এবং মানবজাতির জ্ঞানোন্নতিরও সাহায্য হইয়া থাকে। হেমবাবু যাহা জানেন এবং যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন, এখন এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে পর তাঁহারা যদি নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের উপকার—আমাদেরও সকলেরই উপকার হয়।' বড়ই সুখের কথা, এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর জনৈক লেখক একখানি সাপ্তাহিক পত্রে গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং গোবিন্দচন্দ্রের অনেক পত্রও প্রকাশিত হইতেছে।

'মডার্ণ রিভিউ'—পত্রে এই গ্রন্থের ভাল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। প্রথম কথা,—বর্ত্তমান-যুগে ঢাকা জেলা হইতে এই গোবিন্দচন্দ্র ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য সুকবির উদ্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় কথা—স্কটল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত কবি বার্ণসের সহিত গোবিন্দদাস তুলনীয়। তৃতীয়তঃ—তিনি ইংরাজী জানিতেন না। তাঁহার কবি-প্রতিভার ব্যাপ্তি ও শব্দ-বৈভব যে খুব বেশী ছিল তাহা নহে। কিন্তু, স্বদেশ প্রীতি ও মানব-প্রীতির মধুরোজ্জ্বল দীপ্তিতে তিনি আমাদের গ্রাম্য ও সঙ্কীর্ণ জীবন যেভাবে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, আমাদের গার্হস্থ্য-জীবনের উপর যে মধু ছড়াইয়াছেন, তাহা সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবে।

স্বর্গীয় সন্দর্ভ-লেখক বিদ্যাসাগর উপাধিধারী বান্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সহিত জীবিতকালে দরিদ্র কবি গোবিন্দদাসের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধের কথা আলোচ্য গ্রন্থে কিছু কিছু আছে। এই সম্বন্ধ বেশ সুখদায়ক নহে। কিন্তু সুখদায়ক আর দুঃখদায়ক—এ সব আর ভাবিয়া কি হইবে?—যাহা সত্য তাহাই জয়যুক্ত হইবে। এখন গোবিন্দদাসও নাই—কালীপ্রসন্নও নাই। গোবিন্দদাসের এক বিনীত জীবন-চরিত আখ্যায়ক বাঙ্গলা সাহিত্যের দুয়ারে উপস্থিত। গোবিন্দদাস অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, অত্যাচারিত জনগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, দারিদ্র্য-ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। দেশের লোক যে সাহায্য করে নাই, তাহাও নহে। আর একজন কবি মধুসূদন দারিদ্র্য-ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের জীবনী প্রকাশিত হওয়ার পর যে আলোচনা জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক, তাহাতে একটি নিরপেক্ষ গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালী জাতির উপর নিন্দাবাণ বর্ষণ সঙ্গত নহে— এই কথাটি সকলে মনে রাখিলে, এই গ্রন্থের প্রচার এবং গোবিন্দদাসের জীবন ও কবিতার আলোচনা দ্বারা আমরা নানাপ্রকারে উপকৃত হইব।

এই গ্রন্থ, গোবিন্দচন্দ্রের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে, আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার থাকিল।

বীরভূমি ৬—৮

শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব।

১। পৌরাণিক ঘটনার শ্রেণী বিভাগ

শ্রীমদ্ভাগবতের টিকার প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিলেন, এই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত,—বেদান্তের ভাষ্য। এই কথা হইতে বুঝিতে হইবে, প্রথমে তত্ত্ব তাহার পর লীলা। পৌরাণিক ঋষি সমাধিস্থ হইয়া তাঁহার বর্ণনীয় ব্যাপার জগতে প্রচারিত করিয়াছেন, আমাদিগকে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া বর্ণিত ব্যাপার সমূহ বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম, দিব্য—অপ্রাকৃত ও অলৌকিক, সুতরাং ইহা তত্ত্বতঃ বুঝিতে হইবে।

পুরাণ-সমূহে যে সমুদয় ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই এক শ্রেণীর ঘটনা নহে, তাহা পুরাণ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক পুরাণেই চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্পমিত্র প্রভৃতি রাজার কথা আছে, আরও পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম আছে। এই সমুদয় নাম ও ঘটনা, সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনারূপেই বিবেচিত হইবে। এই গেল সাধারণ ঘটনা। এ সম্বন্ধে কোন গোলমাল নাই। কিন্তু অন্যান্য দ্বীপ বা অন্যান্য মন্বন্তরের অনেক ঘটনা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ঘটনাগুলি বুঝিবার সময় আমাদের কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করিতে হইবে। বিশ্বচরাচর আজ যে অবস্থায় রহিয়াছে, চিরকাল সে অবস্থায় ছিল না, প্রাণশক্তি বা মননশক্তির ক্রিয়া আজ যে প্রকারে সাধিত হইতেছে, দশলক্ষ বা দুইকোটি বৎসর পূর্ব্বে ঠিক সে প্রকারে হইত না। জম্বু-দ্বীপের জীবন আর প্লক্ষদ্বীপের জীবন, একরূপ নহে, একই দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন বর্ষের মধ্যেই কত বিভিন্নতা। এই সব প্রাথমিক বিষয় কিছু কিছু জানা থাকিলে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাপারগুলির ভিতরের রহস্য কিছু কিছু ধরিতে পারা যায়।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর ঘটনা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলিই প্রকৃত

প্রস্তাবে "লীলা"। এই ঘটনাগুলির নায়ক শ্রীভগবান্ স্বয়ং। এইগুলি "রহস্য" নামে পরিচিত। এই ঘটনাগুলি ঠিক্‌মত বুঝিলে শ্রীভগবান্‌কেই বুঝিতে ও ধরিতে পারা যাইবে। সুতরাং এগুলি উন্নততম সাধনশাস্ত্র ও তত্ত্ববাদের সাহায্যে বুঝিতে হইবে। যোগশাস্ত্রে, জ্ঞানশাস্ত্রে, ভক্তিশাস্ত্রে যে সমুদয় চরম ও পরমতত্ত্ব কথিত হইয়াছে সেই তত্ত্বসমূহ আমরা যে পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারিব, এই "লীলা" আমরা সেই পরিমাণে আস্বাদন করিতে পারিব। পুরাণে শ্রীভগবানের অনেক লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলা, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও মধুর এবং এই কারণেই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। আবার এই বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীরাধাতত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য। সুতরাং খুব ধীরতার সহিত এই তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। তত্ত্ব না জানিয়া, তত্ত্বের দ্বারা হৃদয় মার্জ্জিত না করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বা গীতগোবিন্দ প্রভৃতি নিগূঢ় গ্রন্থ তাড়াতাড়ি করিয়া আলোচনা করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে এবং প্রাচীন ভারতের সাধন-শাস্ত্রের প্রতি অবিচার করা হইবে।

২। বেদে পুরুষ-কথা।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত অনেকেরই পরিচিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণলীলা উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে এই পুরুষ-সূক্তের আলোচনা করা একান্তভাবে আবশ্যক। সেই পুরুষের পরিচয়ে বৈদিক সাহিত্য ও পৌরাণিক সাহিত্য পরিপূর্ণ. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও এই পুরুষের কথা আছে। ঋগ্বেদে আমরা তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাই।

তাঁহার মস্তকাদি অবয়ব অসংখ্য, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় অসংখ্য, পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় অসংখ্য। এই প্রকারের বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি আবার মানবের নাভিপ্রদেশ হইতে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥

ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সমস্তই এই পুরুষ। ইনি মোক্ষের অধিপতি। অন্নের দ্বারা যাহা কিছু পরিবর্দ্ধিত হয়, ইনি তৎসমুদয়ের অধিপতি।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২

এ সমুদয় তাঁহার মহিমা, কিন্তু তিনি এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বভূতগ্রাম তাঁহার এক-পাদ, আর ত্রিপাদ অমৃত স্বরূপ।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩

ইহার পর বেদ বলিলেন সেই পুরুষ হইতে বিরাট জন্মিয়াছিলেন, বিরাট হইতে অধিপুরুষ। সেই অধিপুরুষ দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিলেন, তাহার পর পঞ্চভূত ও জীবশরীরাদি সৃষ্ট হইল।

৩। উপনিষদে পুরুষ-কথা

ঋগ্বেদে যে পুরুষের কথা পাওয়া যায়, তাঁহারই কথা উপনিষদ্-সমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাঽঽপঃ শরীরং সোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা-ঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

যিনি পৃথিবীতে আছেন, অথচ পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী তাঁহাকে জানে না, পৃথিবী তাঁহার শরীর, তিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে যমন বা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তিনি আত্মার অন্তর্য্যামী অমৃত।

এই প্রকারে তিনি অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, আকাশে, সূর্য্যে, সকল দিকে, চন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে আছেন কিন্তু ইহারা কেহই তাঁহাকে জানে না, ইহারা তাঁহার শরীর, তিনি ভিতরে থাকিয়া ইহাদের যমন করিতেছেন। ইনি আত্মার অন্তর্যামী পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ইঁহাকে অধিদৈবত পুরুষ বলিয়াছেন, কারণ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতা। সেই আত্মার অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন, তিনি অধিভূত পুরুষ। আর প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে,

মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে ও রেতে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তিনি অধ্যাত্ম পুরুষ। তিনি—

অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা। নাঽন্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা। ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তিনি সকলই শুনিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না। তিনি সকলকে মনন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ মনন করিতে পারে না, তাঁহাকে কেহ বিশিষ্টরূপে জানে না, কিন্তু তিনি সকলকে বিশিষ্টরূপে জানেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই। তিনিই আত্মার অন্তর্যামী অমৃত।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ এই প্রকারে সেই অন্তর্যামী পুরুষের কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত সুপরিচিত সঙ্গীতটি সেই পুরুষেরই ধ্যানসম্ভূত।

নয়ন তোমারে, পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥
বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে॥
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ সেও আছে তব ভবনে॥
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর,
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে॥
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানিনে॥
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,

লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আছে—

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি
ভূতানি মধুযশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

এই পৃথিবী সর্ব্বভূতের পক্ষে মধু, এই পৃথিবীর পক্ষেও সর্ব্বভূত মধু। এই পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন, এবং এই শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী তেজোময় অমৃতময়, অধ্যাত্মপুরুষ আছেন, তিনি সকল ভূতের মধু, এবং সকল ভূতই তাঁহার পক্ষে মধু, তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল।

পুরুষ, অন্তর্যামী পুরুষ; তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, তিনি মধু। তাঁহার পর আনন্দ ব্রহ্ম, রস ব্রহ্ম; এই সমুদয় উপনিষদের বা বেদান্তের তত্ত্ব যাঁহারা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার তত্ত্ব ও লীলার মধ্যে প্রবেশ করা খুব কঠিন কথা নহে। কিন্তু বেদান্তের এই সমুদয় তত্ত্ব ধ্যানযুক্ত হইয়া যাঁহারা হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে একেবারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্বে প্রবেশ কেবল কঠিন নহে, অসম্ভব বলিলেই হয়।

ভগবদ্গীতাতে এই পুরুষ সম্বন্ধে বহুল আলোচনা আছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। যাঁহার দ্বারা সকলই পূর্ণ অথবা যিনি পুরে শয়ন করেন, তিনি পুরুষ,—আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি, পুরেশয়নাদ্বা পুরুষঃ।"

আদিত্যমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ অধিদৈবত পুরুষ, তিনি সকল প্রাণির সকল ইন্দ্রিয়কে অনুগ্রহ করিয়া শক্তিযুক্ত করেন। অধিযজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু সকল যজ্ঞের অভিমানিনী দেবতা। এই সমুদয় শ্রুতিবাক্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টিকায় ও ভাষ্যে আচার্য্যগণ বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পুরুষের যাবতীয় লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং 'পুরুষ' সম্বন্ধে ভালরূপ আলোচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের

তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিলে শ্রীরাধার তত্ত্ব আর বিশেষ কঠিন হইবে না।

৪। পুরুষোত্তম

বেদে আছে—

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"

তিনিই মহান্ পুরুষ, পুরুষোত্তম। প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে আমি পুরুষ। আমাদের সাংখ্যদর্শনে বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে কেহ কেহ সাংখ্যদর্শনের ভূমি হইতেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভুল। মানুষ বোঝে আমি পুরুষ—ইহার অর্থ—আমি এই দেহপুরের অধিবাসী, কর্ত্তা, ভোক্তা ও শাসক। এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি আমার জন্য। আমার ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি আছে, আমার দায়িত্ব আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্য আছে। জন্মজন্মান্তরে এই বোধ বিকশিত হইতেছে। এই বোধ বিকশিত হইলে, আরও গভীর চিন্তার উদয় হয়, তখন চিন্তা হয় আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, অন্যান্য সকলের জ্ঞান, আমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা, অন্যান্য সকলের ইচ্ছা ; আমার প্রেম, তোমার প্রেম, অন্যান্য সকলের প্রেম ; ইহা আসেই বা কোথা হইতে, আর ইহাদের পূর্ণতাই বা কোথায় ? তখন আমরা আমাদের অন্তরেই অন্তর্যামীরূপে সেই পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ পাই। ক্রমশঃ বুঝি, তিনিই চিরকাল অবিশ্রাম আমাদের প্রত্যেকের সহিত লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহার পরের অবস্থা লীলা ; সেই পুরুষোত্তম, যিনি অন্তরে পরিপূর্ণরূপে চিরদিন রহিয়াছেন, তিনি ভিতর ও বাহিরের বিরোধ মিটাইয়া, ভিতর ও বাহির এক করিয়া প্রকট হইয়াছেন। ইহারই নাম লীলা বা নিত্যের প্রাকট্য। শ্রীমদ্ভা-গবতের বহু বহু শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে।

৫। শ্রীকৃষ্ণ—রসরাজ

এইবার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র নায়ক। পুরুষোত্তম-বাদ হইতে এই তত্ত্বটি অনুভব করা কঠিন নহে।

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি নায়কগণের শিরোরত্ন। তাঁহারই প্রেমলীলা একমাত্র কার্য্য। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কার্য্য নাই। আমাদের যখন মনে হয়, ইহা ছাড়া অন্য কিছু আছে, তখন আমরা মিথ্যায় জড়াইয়া পড়ি। এই প্রেমলীলাই তাঁহার স্বভাব—তাঁহার স্বরূপ।

"নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত।"

তিনি আনন্দ, তিনি রস, তিনি মধু।

শ্রীরূপগোস্বামী কৃত শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, নায়কের ছেয়ানব্বই প্রকার গুণ ও অবস্থা পরিপূর্ণরূপে এক শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান। প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার। ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত। ইহার প্রত্যেকটি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমভেদে তিন প্রকার। এই দ্বাদশ প্রকারের আবার প্রত্যেকটি পতি ও উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। এই চব্বিশ প্রকারের প্রত্যেকটি অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চারি প্রকার। এই প্রকারে নায়ক ছেয়ানব্বই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণে এই সমুদয়গুলিই লীলায় প্রকট হইয়াছে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা ভক্তগণের আস্বাদিত বিবিধ গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন। আদিরসই যখন মূলরস, তখন পূর্ণতম ও একমাত্র নায়করূপে সেই রসরাজ ও রসিকশেখরের চিন্তা, নিতান্তই স্বাভাবিক। অতএব আমরাও ভক্তের ভাষায় সেই নায়ক-শিরোরত্নের বন্দনা করি।

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষণং।
অঙ্গীকৃত নরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং॥

যাঁহার শৃঙ্গাররসই সর্ব্বসম্পত্তি, ময়ুরপুচ্ছই যাঁহার বিভূষণ, যিনি নরাকার আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ত্রিভুবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি।

৬। শ্রীরাধা—মহাভাব

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, যাহা সংক্ষেপে বলা হইল তাহা হইতে শ্রীরাধাতত্ত্বের আলোচনা করা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক রসময় কলেবর॥
প্রেমময় বপুঃ কৃষ্ণ ভক্ত-প্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেম রসগুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করায় পরম সন্তোষ॥
বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা একগণ।
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্নখনি॥

সংসারে মানুষ মাত্রেই সুখের জন্য পরিশ্রম করিতেছে। এই সুখ আস্বাদন,—রসের আস্বাদন। ভাবের দ্বারা রসের আস্বাদন হয়. ইহা সামান্যমাত্র চিন্তা করিলেই লোকে বুঝিতে পারে। খাদ্য দ্রব্য অতি উপাদেয় ও মধুর, তাহাতে রস আছে এবং সেই রস আস্বাদনের জন্য মানুষ লোলুপ। খাদ্য জুটিল, খাইবার অধিকারও পাইলাম, কিন্তু মোটেই ভাল লাগিল না, রসের আস্বাদন হইল না। ইহার কারণ কি? ভাব ছিল না। যেরূপ অবস্থায় থাকিলে রসের আস্বাদন হয়, আমি সেরূপ অবস্থায় ছিলাম না। আমার ক্ষুধা ছিল না, দেহ সুস্থ ছিল না, মনও ভাল ছিল না। ইহাকে ইংরাজীতে বলা যায় Mood। প্রত্যেক সুখাস্বাদনেই একটা অনুকূল ভাব বা Mood দরকার। সংসারে প্রকটিত প্রত্যেক খণ্ড ও ক্ষয়শীল সুখ বা রস, এক পরম রসের খণ্ড খণ্ড প্রতিবিম্বমাত্র। একদিন মানুষ বলে—

"ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"

এই খণ্ড খণ্ড সুখ, ইহারা প্রবঞ্চক, ইহাদের চাহি না, চাই সেই নিত্য সুখ। সেই নিত্য সুখের নামই অমৃত। বেদে এই অমৃত-পিপাসার কথা আছে। বেদে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ তিনিই রসরাজ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। অতএব সেই রসরাজকে চাই। কিন্তু সেই রসরাজকে পায় কে? রসকে পাইতে ভাবের দরকার সুতরাং রসরাজকে পাইতে মহাভাবের দরকার। এই মহাভাবই শ্রীমতী রাধিকা।

আমি চাই রসরাজকে। কিজন্য চাই? আমার ভোগের জন্য? তাহা হইলে পাইব না। আমার ভোগের জন্য যখন লোলুপ হইয়া জীবনের পথে চলিয়াছি, তখন বঞ্চিত হইয়া মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিতেছি। যাহা খুঁজিতেছি তাহা পাইব না। বেদ বলিয়াছেন—

"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"

ত্যাগের দ্বারাই ভোগ সিদ্ধ হয়, ভোগের দ্বারা নহে। অতএব রসরাজকে চাই, রসরাজেরই তৃপ্তির জন্য। তাঁহার কাম নাই একমাত্র সত্য ব্যাপার, আর সব কল্পনা। অতএব—

"কুরুমম বচনং সত্বর রচনং পূরয় মধুরিপু কামং ॥"

একমাত্র মধুরিপু, তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই সত্য, তাঁহার কামনাই একমাত্র সত্য। অতএব তাঁহার কামনা পূর্ণ কর।

কিন্তু তুমি যে নিজের কামনার আগুনে দিনরাত্রি জ্বলিতেছ, এ অবস্থায় তুমি মধুরিপুর কামনা কেমন করিয়া পূর্ণ করিবে? তুমি যে কেবল নিজের কথাই ভাবিতেছ, এ অবস্থায় তুমি অন্যের কথা ভাবিবে কি করিয়া? তুমি যে খণ্ড লইয়া মাতিয়া রহিয়াছ, অখণ্ডের চিন্তা করিবে কি প্রকারে? অতএব সাধনা চাই, সৎসঙ্গ চাই, তত্ত্ববিচার চাই; শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ চাই। কি শুনিবে? শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রবণ কর।

৭। হ্লাদিনী শক্তি।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোহন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। ইহাই প্রথম কথা। হ্লাদিনী শক্তি কি? আমরা ভগবান্‌কে তিন প্রকারে অনুভব করিতে পারি। তাঁহার অবশ্য অনন্ত শক্তি, আমাদের নিকট এই তিনটি প্রধান। ভগবান্ আমাদের নিকট সচ্চিদানন্দ। প্রথম তিনি সৎ, তিনি আছেন, তিনিই আছেন। আমি মনে করিতেছি আমি আছি, আপনি মনে করিতেছেন আপনি আছেন, আমি ও আপনি মনে করিতেছি পাহাড় আছে, নদী আছে, সমুদ্র আছে, দেবতা আছে, যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি আছে। কিন্তু এই সমুদয়

সত্ত্বা (Existence) ব্যবহারিক (Phenomenal) সাপেক্ষ (Relative)। একমাত্র আছেন তিনি সেই এক, অদ্বিতীয় ভূমা, পরম পুরুষ। তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া আমরা আছি। তাঁহার জন্য আমরা আছি, তিনি মূলে আশ্রয়তত্ত্বরূপে (as substantial reality) আছেন বলিয়াই আমার সত্ত্বা সম্ভব হইয়াছে। ইহাই প্রথম চিন্তা প্রণালী—তিনি সৎ—তিনি অসীম সত্ত্বা—Infinite and Absolute Existence। সেই পুরুষোত্তমকে অসীম সত্ত্বারূপে অনুভব করিতে গেলে তাঁহাতে বা তাঁহার স্বরূপে যে শক্তির (Attribute) বিলাস বা ক্রিয়া অনুভব করি, তাহার নাম সন্ধিনী শক্তি। অনন্ত সত্ত্বাসম্পন্ন শ্রীভগবান্ যে শক্তির দ্বারা নিজে সত্তাবান্ হন, ও অপরকে সত্তাবান্ করেন, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী শক্তি।

সেই পুরুষোত্তমকে অনুভব করার দ্বিতীয় প্রণালী, তিনি চিৎ—তিনি জ্ঞানরূপ ;—একমাত্র তিনিই জ্ঞানরূপ, অন্যসকলের জ্ঞান, এমন কি হিরণ্যগর্ভেরও জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও সাপেক্ষ, একমাত্র তিনিই অসীম ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ—Infinite and Absolute Consciousness। অন্য সকলে তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপের যে শক্তির বিলাসের দ্বারা নিজেকে জ্ঞানবান্ করেন ও অপর সকলকে জ্ঞানযুক্ত করেন, সেই শক্তির নাম সম্বিৎশক্তি। একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে—সত্ত্বা ছাড়া চৈতন্য নাই, চৈতন্য ছাড়া সত্ত্বা নাই।

এই দুই শক্তির মূলরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপে আর এক শক্তি রহিয়াছেন। শ্রীভগবান্ আনন্দ—সমগ্র আনন্দই তাঁহার, তাঁহার আনন্দের আশ্রয়েই জগৎ আনন্দযুক্ত। শ্রীভগবানের স্বরূপের যে শক্তির বিলাসের দ্বারা শ্রীভগবান্ নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অপরকে আনন্দিত করেন—সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি।

হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

৮ স্বরূপ-চিন্তা

শ্রীভগবান্ সুখ আস্বাদন করিতেছেন। ইহা অনুভব করা কিছু কঠিন। ভগবানের স্বরূপ-চিন্তাই কঠিন কাজ। ভাব-চিন্তায় (In abstract thinking) বিশেষরূপে অভ্যস্ত না হইলে ইহা করা যায় না। কিন্তু কিছু চেষ্টা করিয়া ধীরভাবে কিছুদিন অভ্যাস করিয়া যদি আমরা এই চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে পারি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণলীলার যে সব কথা আমাদের নিকট এখন অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, সেগুলি অন্যরূপ মনে হইবে। ব্যাপারখানা এই—সাধারণ মানুষ শ্রীভগবানের স্বরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত নহে, ভগবান্‌কে জগতে আনিয়া জগতের মধ্য দিয়া অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণে উপলক্ষিত করিয়া শ্রীভগবান্‌কে দেখে। Not God as He is in Himself, but God as He is reflected in our universe. কাজেই জগতের নৈতিক শাসনকর্ত্তারূপে শ্রীভগবান্‌কে বুঝাইতে পারা যায় এবং সাধারণ লোকে এই পর্য্যন্তই বোঝে। কিন্তু তাহার উপরের কথা সাধারণ লোককে বুঝাইয়া দেওয়া খুবই কঠিন, তবে সে ব্যক্তি যদি বুঝিতে চাহে, অর্থাৎ সে যদি শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং সাধুসঙ্গ করিয়া ভজনা করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে বুঝাইতে পারা যায়। নতুবা বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। এই কারণেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বুঝিতে এত লোকের এত সংশয় ও অসুবিধা।

সুখস্বরূপ কৃষ্ণ সুখ আস্বাদন করিতেছেন,—ইহাই চরম কথা। এই বিশ্বপ্রক্রিয়ার মূলে এক পরম পুরুষের আস্বাদন ও উপভোগ রহিয়াছে। আমার জীবনে তাহারই উপভোগ—আমাদের সকলেরই জীবনে তাঁহারই উপভোগ। আমরা যে রহিয়াছি, জানিতেছি, সকলেরই মূলে তাঁহারই আস্বাদন ও উপভোগ। তাঁহারই আস্বাদন ও উপভোগের জন্যই আমরা রহিয়াছি এবং থাকিব। জীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই। এই বোধই মানবের চরম বোধ। আমার জীবনে তাঁহার উপভোগ ও আস্বাদন বাধা প্রাপ্ত হইতেছে—আমি অভক্ত। আপনার জীবনে তাঁহার উপভোগ ও আস্বাদন অব্যাহত—আপনি ভক্ত, আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। যাঁহার জীবনে রস-আস্বাদক শ্রীগোবিন্দের আস্বাদন ও উপভোগ যে পরিমাণে অব্যাহত, তিনি সেই পরিমাণে ভক্ত বা সত্যপথে অগ্রসর

ভক্ত সত্য, ভক্তিই সত্য, আর সব ব্যবহারিক। ব্রহ্মাণ্ডে অনেক ভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রহিয়াছেন। জল যেমন নানাস্থানে নানা আকারে রহিয়াছে—ঠিক সেইরূপ। আকাশে মেঘরূপে জল বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে; বায়ুমণ্ডলে বাষ্পরূপে জল অদৃশ্য-ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় পাথরের মত শক্ত হইয়া জল রহিয়াছে। তাহা ছাড়া নদীতে জল, সরোবরে জল, প্রস্রবণে জল, আবার নারিকেল গাছের মাথায় জল। একই জল নানা মূর্ত্তিতে নানাস্থানে বিরাজিত। কিন্তু জল যেখানেই যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে সমুদয় জল সেই এক মহাসমুদ্র হইতে আসিয়াছে এবং সমুদয় জল চলিবার পথ পাইলে পুনর্ব্বার সমুদ্রে গিয়া পরিণতি ও সার্থকতা লাভ করিবে। ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্ত জন্মিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে জন্মিবেন, তাঁহাদের যাঁহারই যে ভাব হউক, সকলই সেই মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধারূপ মহাসমুদ্র হইতে আসিয়াছেন এবং সকলেই পরিণামে সেই মহাভাব সমুদ্রে সঙ্গতি লাভ করিয়া, তাহার পর সার্থকতা লাভ করিবেন। "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ" ইহার এই অর্থ।

৯। শক্তি ও শক্তিমান্

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা—শক্তি ও শক্তিমান্ পৃথক্ নহে। শক্তিকে বাদ দিলে শক্তিমান্‌কে জানা যায় না, আবার শক্তিমান্‌কে বাদ দিলে শক্তিকে জানা যায় না।

"মৃগমদ যৈছে তার গন্ধ অবচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥"

যেমন কস্তুরি ও তাহার গন্ধ, আর অগ্নি ও তাহার উত্তাপ। চন্দ্র ও তাহার জ্যোৎস্না, এরূপ উদাহরণও দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণও সেইরূপ। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের যেন ঘনীভূতা মূর্ত্তি,—প্রণয়-বিকৃতি।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহার সাহায্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নের অংশগুলি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করেন ভক্তের পোষণ॥

সৎ চিৎ আনন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরয়ে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নোগুণ বর্জ্জিতে॥ বিষ্ণুপুরাণ।

[হে ভগবন্, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিত, এই তিনটি বৃত্তিসম্পন্না মুখ্যা শক্তি, সর্ব্বাশ্রয় যে আপনি, আপনাতে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু হ্লাদকারী যে সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং উভয়মিশ্রা যে রাজসী শক্তি তাহারা, গুণাতীত যে তুমি, তোমাতে অবস্থিত নহে। অর্থাৎ এই তিনটি শক্তি তোমার স্বরূপশক্তি, প্রাকৃত গুণময়ীশক্তি তোমাতে নাই।]

(ক) সন্ধিনী শক্তি

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা যত তাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে একবিংশ শ্লোকে শিব বলিতেছেন—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং,
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

[বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বে পুরুষ শ্রীভগবান আবরণশূন্য অবস্থায় প্রকাশিত, এই জন্য তাঁহার নাম বাসুদেব। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন অন্তঃকরণে আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই শ্রীবাসুদেবকে বিশেষরূপে ভাবনা করিয়া থাকি।]

বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ লোক ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত, তাহাতে

পূর্ব্বোক্ত অংশের কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—পুরুষোত্তমের চিন্তা (God as the Supreme Person) কি প্রকারে উদিত হইয়াছে। আমার দেহ একটি পুর, আমি সেই দেহে পুরুষ। আমি পুরুষরূপে বিবিধ ও বিচিত্র সম্বন্ধে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছি, আমার পিতা, মাতা, সখা, আমার শয্যা, আসন প্রভৃতি। যিনি যত বড় তাঁহার এই সম্বন্ধময় জগৎও তত বড়। এই সম্বন্ধগুলিকে বাদ দিলে আমার কি থাকে? আমার যাহা পুরুষত্ব বা চৈতন্যময় আত্মত্ব, তাহার প্রকাশ বা বিলাস (Manifestation) কেবল দেহের দ্বারাই হয় না, আমার পুত্রত্ব, বন্ধুত্ব, পতিত্ব প্রভৃতির প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধে এই ধারণাটি আমাদের জগতে স্থানদ্দিষ্ট করিয়া উহা শ্রীভগবানে আরোপ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগের আলোচনা আবশ্যক। সেখানে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমি সকল ক্ষেত্রের একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এই চিন্তাপ্রণালীর মধ্য দিয়া গেলে আমরা বুঝিব পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে এই সমুদয় সম্বন্ধও বিদ্যমান। কিন্তু আমি যে অপূর্ণ ও পরিমিত, আর তিনি যে পূর্ণ ও অপরিমিত, সুতরাং এই যে পিতা মাতা শয্যা আসন দেহ গেহ প্রভৃতি, এ সকল লইয়া তাঁহাতে ও আমাতে বিশেষরূপ প্রভেদ থাকিবে। সে প্রভেদ কি? আমার এই সব সম্বন্ধের বস্তু বা ব্যবহারের বস্তু, আমার হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আমার নহে, যদিও আমি ইহাদিগকে 'আমার আমার' বলি, কিন্তু ইহারা আমার, প্রকৃত 'আমার' নহে। ইহারা আমার 'অনাত্ম'। (Not-self) কারণ আমার পক্ষে এই 'আমি' বলাটাই যে একটা আয়ত্তাধীন ব্যাপার নহে। 'আমি, আমি' বলিতেছি, কিন্তু কাহাকে 'আমি' বলি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেই আমার চক্ষু স্থির। কিন্তু এই সব দোষ বা ত্রুটি (Imperfections) পুরুষোত্তমে বা শ্রীভগবানে নাই, সুতরাং তাঁহার পিতা মাতা শয্যা আসন প্রভৃতি তাঁহারই চিচ্ছক্তির বা সন্ধিনী শক্তির মূর্ত্তি বা বিকার। শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় বা স্বরূপে এইরূপ অনুভব করা তো কঠিন নহে; আবার চিন্তা করুন, দেখিবেন, এইরূপ অনুভবই স্বাভাবিক। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তাই স্বভাবতঃ মানুষের মনে আসিয়া থাকে। যাহাদের না আসে তাহারা স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়াছে। নিত্যলীলার প্রাকট্য অর্থাৎ সেই

নিত্য পিতা নিত্য মাতা (The Eternal and Ideal Father and Mother বা The Eternal and Ideal Child) যখন প্রপঞ্চে আসিবেন, তখন তাঁহাদের প্রপঞ্চে আগমন বা আবির্ভাবের পদ্ধতি একটু কঠিন। অন্যপ্রকারের চিন্তাপদ্ধতি, যাহাকে অবরোহন পদ্ধতি বলিব, তাহাতে আবার অভ্যস্ত হইতে হইবে। এই গেল সন্ধিনী শক্তি।

(খ) সম্বিৎ শক্তি

কৃষ্ণে ভগবত্ত্বাজ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞান, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। সামান্য জ্ঞান বিশেষজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; অতএব সামান্য জ্ঞানকে বিশেষজ্ঞানের পরিবারভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্, এই জ্ঞানই চরম ও পরম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্মাজ্ঞান ঐ চরমজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর মাত্র। (different stages)

এই যে জ্ঞান—কৃষ্ণে ভগবত্ত্বাজ্ঞান, এই জ্ঞান কাহার? এই জ্ঞানের জ্ঞাতা কে? যদি বলেন—ভগবান্ বা কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেহ, তাহা হইলে দোষ হইল। কারণ কৃষ্ণ বা ভগবান্ তাহা হইলে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কে কৃষ্ণকে জানেন? উত্তর—কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন; Who knows the Divine? It is the Divine who knows the Divine. আপনি যদি কৃষ্ণকে জানেন তাহা হইলে বুঝিবেন—কৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি, আপনাকে আশ্রয় করিয়া বা অপনার মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে জানিতেছে। ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পরমেশ্বর।

হে পরমেশ্বর, তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জান। এখানে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, ও ক্রিয়া একই।

(গ) হ্লাদিনী শক্তি

কে কৃষ্ণকে ভালবাসে, কে কৃষ্ণকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করে ? Who loves the Divine ? It is the Divine that loves the Divine, এই ভালবাসার ও তৃপ্তি-বিধানের যিনি পূর্ণতা, তিনিই শ্রীরাধা।

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি সর্ব্বকান্তা শিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সাররূপা। শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা কান্তা, শ্রীমতী রাধিকা হইতেই তাঁহাদের বিস্তার হইয়া থাকে। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধিকার অংশবিভূতি, মহিষীগণ শ্রীরাধিকার বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপা। লক্ষ্মীগণকে বৈভব বিলাসাংশরূপ আর মহিষীগণকে প্রাভব প্রকাশস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি ॥

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত বা আস্বাদিত হইয়াছে।

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ-ক্রীড়া-পূজার বসতি নগরী ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥

কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্বজগতের মাতা॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বসয়ে তাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥

শক্তিতত্ত্বের আলোচনায় একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শক্তিমাত্রেই অমূর্ত্ত, শক্তিমান্‌কে আশ্রয় করিয়াই শক্তির বিলাস হয়। ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন—

"তত্র তাসাং কেবল শক্তিমাত্রত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্ বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ।"

শক্তি যখন কেবল শক্তিমাত্র, তখন ভগবানের বিগ্রহের সহিত এক হইয়া অবস্থিত। লীলা-বিলাসে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। তখন তাহার বিরূপত্ব সাধিত হয়।

হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ-প্রধানকে গুহ্যবিদ্যা, সংবিৎ শক্তির সারাংশ-প্রধানকে আত্মবিদ্যা, আর সন্ধিনী শক্তির সারাংশ-প্রধানকে অব্যয়শক্তি বলে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্যস্থানে কথিত হইয়াছে—

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥

১০। শ্রীরাধার স্বরূপ

শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথোপকথন, যাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে ॥
সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্ট শাটি পরিধান ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্যকুঙ্কুম সখী প্রণয়চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য ধম্মিল্য বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্বগুণ অঙ্গে পট্টবাস।
রাগতাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল।
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী ॥
এই সব ভাবভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥

মধ্যবয়স্থিতা সখীস্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর॥
যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার সদ্‌গুণের কৃষ্ণ না পান পার।
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয়-কৃত "প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য স্তবরাজঃ" নামে একটি স্তব আছে, পূর্ব্বের অংশটি সেই স্তব হইতে গৃহীত। সেই স্তবটি এই প্রসঙ্গে অস্বাদনীয়।

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতাবিগ্রহাং।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধঃবরোদ্বর্ত্তনসুপ্রভাং॥
কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নাপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং।
হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য ঘুসৃণাঙ্কিতাং।
শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরী বিচিত্রিত কলেবরাং॥
কম্পাশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ গদ্গদরক্ততা।
উন্মাদোজাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ॥

ক্লপ্তালঙ্কৃতি সংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীং।
ধারাধীরাত্বসদ্বাস পটবাসৈঃ পরিস্কৃতাং॥
প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্য তিলকোজ্জলাং।
কৃষ্ণনামযশঃ শ্রাববতংসোল্লাসিকর্ণিকাং॥
রাগতাম্বুলরক্তৌষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাং।
নর্ম্মভাষিত নিঃস্যন্দ স্মিতকর্পূরবাসিতাং॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরিলীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য বিচলত্তরলাঞ্চিতাং॥
প্রণয়ক্রোধসচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং।
সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপীবরাং॥
মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ লীলান্যস্তকরাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ মধূলী পরিবেশিকাং॥

১১। প্রেম

উপরে যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে "প্রেম" জিনিসটি কি, তাহার আলোচনা করা দরকার। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই প্রেমতত্ত্ব নানা প্রকারে অতিশয় বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ব্যাখ্যায় ও বর্ণনার সহিত পরিচিত হওয়া দরকার।

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ রূপ-গোস্বামীকৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' নামক গ্রন্থাবলম্বনে নিম্নের কথা গুলি লিখিত হইল।

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমাপরিকীর্ত্তিতঃ॥

ধ্বংসের কারণ রহিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ধ্বংসরহিত, কিছুতেই ধ্বংস হইতেছে না, যুবক যুবতীর ভিতর এই প্রকারের যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নামক উপন্যাসে শৈবলিনীর প্রেমের কথা আছে। শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবাসিতেন, বালিকা বয়স হইতেই প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

সেই ভালবাসার প্রেরণায় শৈবলিনী পতির গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অশেষ প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, অতি ভয়ঙ্কর বিপদ-সমূহের সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রথমে মনে হইবে ইহা প্রেম। কিন্তু যখন মহাপুরুষের সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে তাহার সেই ভাববন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, যে হৃদয় প্রতাপের জন্য এত করিয়াছে, সেই হৃদয়েরই গতি আবার ফিরিল, তখন বোঝা গেল, ইহা ধ্বংসরহিত নহে, অতএব প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর যে ভাববন্ধন বা ভালবাসা, তাহা প্রেম নহে।

নরলোকে মানুষকে বিষয় করিয়া মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের উদয় হয় না। প্রেম নিত্যাশ্রয়ী, অর্থাৎ নিত্য যে শ্রীভগবান্ তাঁহার জন্যই জাগরিত হয়। যদি কখনও সত্যপ্রেমের উদয় হয়, তাহা হইলে দেহরক্ষা অসম্ভব। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বলা হইয়াছে।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
এ প্রেম নৃলোকে নাহি হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥

'প্রেমসম্পুট' নামক গ্রন্থে প্রেম-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

লোকদ্বয়াৎ স্বজনতঃ পরতঃ স্বতোবা
প্রাণপ্রিয়াদপি সুমেরুসমা যদিস্যুঃ।
ক্লেশাস্তদপ্যতিবলী সহসা বিজিতা
প্রেমৈব তান্ হরিরিভানিব পুষ্টিমেতি॥

ইহলোক বা পরলোক হইতে, স্বজন হইতে পরজন হইতে বা নিজের নিকট হইতে, যিনি প্রাণপ্রিয় তাঁহার নিকট হইতে যদি সুমেরু পর্ব্বতের সমান ক্লেশসমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, সিংহ যেমন হস্তিসমূহকে পরাজিত করেন, সেইরূপ প্রেম সেই সমুদয় ক্লেশকে পরাজিত করিয়া পুষ্টিলাভ করেন।

বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আলোচনায় এই সংজ্ঞাটি যদি সকল সময়ে মনে রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা বৈষ্ণব কবিতার ভিতরের কথা ও আধ্যাত্মিকতা আস্বাদন করিতে পারিব।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে, প্রেম—'আনন্দ-চিন্ময় রস'; আর আছে—প্রেম হ্লাদিনী শক্তির সার। প্রেম যে শক্তি বা শক্তিসার তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শক্তি জড়ীয় নহে, মানবীয় নহে, ইহা চিন্ময়, ইহা ঐশ। Love is Divine। মৃত্যুময় জগৎ—প্রেমই এখানে অ-মৃত। জগতে সকলই নশ্বর—একমাত্র প্রেমই অবিনশ্বর ও নিত্য। আমার যতক্ষণ আত্মতৃপ্তির বা আত্মসুখের বোধ থাকে, ততক্ষণ প্রেম কি তাহা আমি বুঝিতেই পারি না। আত্মসুখদুঃখ বোধ পরিত্যাগ করিলে প্রেমের আবির্ভাব হয়, অথবা প্রেমের আবির্ভাব হইলে আর আত্ম-সুখ-দুঃখের বোধ থাকে না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেই আছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

আচার্য্যগণ প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ ভেদে প্রেমের তিন প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থা তিনটি দুইদিক্ হইতে আলোচনা করা যায়। এক নায়কের দিক্ হইতে আর নায়িকার দিক্ হইতে। এই প্রেম, একটি বিশেষ প্রকারের পুষ্ট বা পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হইলে তাহার নাম হয়—স্নেহ।

১২। স্নেহ

আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমাচিদ্দীপদীপনং
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে।

প্রেম যখন পরম উৎকর্ষের অবস্থায় আরোহণ করে তখন উহা চিদ্দীপদীপন। 'চিৎ'-শব্দে প্রেম-বিষয়ের উপলব্ধি বুঝায়। "প্রেক্ষোপলব্ধিশ্চিৎ সম্বিৎ"—অমরকোষে এই অর্থ আছে। প্রেমবিষয়ের যে উপলব্ধি বা সম্যক্ জ্ঞান তাহা দীপের মত অর্থাৎ তাহার দ্বারা আমার ভিতরের ও বাহিরের সকল প্রকার অন্ধকার বা সংশয় দূরীভূত হয়। প্রেম

যখন পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া স্নেহের অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন উহা দ্বারা সেই চিদ্দীপের দীপন হইয়া থাকে, সেই চিদ্দীপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তৈলাদি স্নেহ পদার্থের দ্বারা দীপ যেমন উজ্জ্বল হয় ঠিক্ সেইরূপ। স্নেহের দ্বারা হৃদয়ও দ্রব হয়। দীপ উজ্জ্বল হইলে তাহার উষ্ণতাযোগে যেমন অনেক পদার্থ গলিয়া যায়, সেইরূপ প্রেম স্নেহ-অবস্থায় উপস্থিত হইলে, হৃদয় সর্ব্বদাই দ্রব-অবস্থায় থাকে।

এখানে, ভাবিয়া দেখিবার কথা এই। মানুষে মানুষে ভালবাসা হয়। কিন্তু এই ভালবাসা রক্ষা করিতে হইলে দেখাশুনা প্রয়োজন। অনেকদিন দেখাশুনা না হইলে ভাববন্ধন শিথিল হইয়া যায়, শেষে হৃদয় শুকাইয়া যায়, আর প্রেম থাকে না। ইংরাজীতে বলে—Out of sight, out of mind। দৃষ্টির বাহির হইলেই মনের বাহির হইয়া যায়—ইহাই প্রাকৃত জগতের নিয়ম। এখন স্নেহের অবস্থা দেখুন ; স্নেহ আমার ভিতরে জাগিয়াছে, আমার যিনি প্রেমাস্পদ বা প্রেমের বিষয় তিনি আলোকের ন্যায় আমার ভিতরে রহিয়াছেন। তিনি আসুন আর না আসুন, দেখা হউক আর না হউক, তিনি আদরই করুন আর অনাদরই করুন, স্নেহ আমার ভিতরে। সেই স্নেহের সাহায্যে আমার হৃদয়ের দীপের সর্ব্বদাই উদ্দীপন হইতেছে, যতই সময় যাইতেছে সেই মূর্ত্তি আমার হৃদয় মধ্যে ক্রমেই অধিক উজ্জ্বল হইতেছে, অদর্শন তাহার উজ্জ্বলতা কমাইতে অক্ষম, স্নেহ ভিতর হইতে তাহার উজ্জ্বলতা বাড়াইয়া দিতেছে। সেই প্রেক্ষ বা প্রেম-বিষয়, তাঁহার উজ্জ্বলতা যত বাড়িতেছে, আমার হৃদয়ও তত বিগলিত বা দ্রবীভূত হইতেছে। ইহার জন্য আর বাহিরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই। এই অবস্থার নাম স্নেহ।

অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তি দর্শনাদিষু।

স্নেহ উদিত হইলে দর্শনাদির দ্বারা কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

এই স্নেহকে আচার্য্যগণ ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা এই প্রকারে বুঝিতে হইবে। রতির উদ্ভব দুই প্রকারে হইয়া থাকে—'তাহার আমি' এই এক প্রণালী, আর 'আমার তিনি' এই এক প্রণালী। ঘৃতস্নেহে প্রথম প্রকারের চিন্তা প্রবল (dominant), আর মধুস্নেহে দ্বিতীয় প্রকারের চিন্তা প্রবল। শ্রীজীব গোস্বামীকৃত লোচনরোচনী টীকায় নিম্নরূপ কথিত হইয়াছে—

রত্যুন্তবো হি দ্বিধা ভবতি। তদীয়াহমিতি মদীয়ঃ স ইতি ভাবনাভেদাৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বং যো ঘৃতস্নেহ উক্ত স তদীয়াহমিতি ভাবনাময়ঃ। মধুস্নেহস্ত্বয়ং মদীয়ঃ স ইতি ভাবনাতিশয় ময়ঃ।
'শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি' বলিয়াছেন—

আত্যন্তিকাদরময়ঃ স্নেহোঘৃতমিতীর্য্যতে।

যে স্নেহ অতিশয় আদরময় তাহাকে ঘৃতস্নেহ বলে।

মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু।

'আমার তুমি' এই ভাবের আতিশয্যময় যে স্নেহ, তাহার নাম মধুস্নেহ।

১৩। মান

স্নেহের পরিণত অবস্থার নাম মান।

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥

স্নেহ অর্থাৎ চিত্তদ্রব, উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়া যখন নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেকে গোপন করিবার জন্য যখন অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য অবলম্বন করে, তখন তাহার নাম মান।

আমরা পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে আছে—

প্রচ্ছন্ন-মান, বাম্য, ধম্মিল্ল-বিন্যাস।

আর আছে—

প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল।

উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুই প্রকার। ঘৃতস্নেহই উদাত্ত মান হয়।

মধুস্নেহস্তু কৌটিল্যং স্বাতন্ত্র্যা হৃদয়ঙ্গমং।
বিভ্রন্নর্ম্মবিশেষঞ্চ ললিতোহয়মুদীর্য্যতে॥

মধুস্নেহবতী যখন স্বাধীন ভর্তৃকারূপে,—কান্ত, হৃদয়ের দ্বারা বুঝিতে পারেন এ প্রকারের কৌটিল্য ও নর্ম্ম বা কৌতুক অবলম্বন করেন, তখন তাহাকে ললিত মান বলা হইয়া থাকে।

মানের পরের অবস্থার নাম প্রণয়।

মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।

মান যখন এমন অবস্থায় আসে যে আর কোনরূপ সম্ভ্রমবুদ্ধি বা পার্থক্য বুদ্ধি থাকে না, কান্তের সহিত একেবারে অভেদ মনন হয়, সেই অবস্থার নাম প্রণয়।

১৪। প্রণয় রাগ, অনুরাগ, ভাব মহাভাব

এই অবস্থায় নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি দেহের ঐক্যভাবন হইয়া থাকে।

বিস্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসই প্রণয়ের স্বরূপ। বিস্রম্ভ দুই প্রকার, মৈত্র ও সৌখ্য। বিনয়ান্বিত বিস্রম্ভকে মৈত্র বলে আর ভয় হইতে নির্ম্মুক্ত যে বিশ্রম্ভ তাহার নাম সখ্য। আচার্য্যগণ বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থের বর্ণনা হইতে এই সমুদয় অবস্থা দেখাইয়াছেন।

প্রণয়ের পরের অবস্থার নাম রাগ।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

প্রণয়ের উৎকর্ষ নিবন্ধন চিত্তের এমন অবস্থা হয় যে যাহা নিতান্ত দুঃখ, তাহাকেও সুখ বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থার নাম রাগ। নীলিমা ও রক্তিমাভেদে রাগ দ্বিবিধ।

রাগের পরের অবস্থা অনুরাগ।

সদানুভূতমপি যং কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবেন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।

যে রাগ সর্ব্বদাই নূতন হইতেছে, আর অনুভূত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নূতনের মত বোধ করাইতেছে, তাহাকে অনুরাগ বলে।

অনুরাগের পর ভাব।

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

এই অনুরাগ যখন যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে অর্থাৎ ইহার চরম অবস্থায় উপস্থিত হয়, রাগের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, সেই লক্ষণ যখন তাহার উৎকর্ষ লাভ করে, এবং

স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজের ভিতরেই নিজের সাফল্য লাভ করে, তাহার নাম ভাব। ভাব আর মহাভাব, ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। যেমন ভগবান্ আর স্বয়ং ভগবান্। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার টিকায় এইরূপ বলিয়াছেন। এই অবস্থা একমাত্র ব্রজদেবীগণের মধ্যেই সম্ভব, মহিষীগণের মধ্যেও এ অবস্থা হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব-স্বরূপিনী।

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্যতার।

সেই মহাভাব কি তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এই আলোচনা যথেষ্ট নহে। মহাভাব কি, তাহা বুঝিতে হইলে সুদৃঢ় চিন্তা অর্থাৎ অন্তর্মুখী হইয়া ধারণা ও ধ্যান আবশ্যক। মোট কথা, আচার্য্যেরা কিভাবে এই রাধাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন আমরা তাহা মোটামুটি দেখিলাম। শ্রীরাধাতত্ত্ব লইয়া তাড়াতাড়ি যাহা হউক একটা সমালোচনা আমরা যেন না করি।

মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ।
ব্রজদেব্যেক সংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ॥
বরামৃত স্বরূপশ্রীঃ স্বংস্বরূপং মনোনয়েৎ ॥

এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীসকলে অতি দুর্ল্লভ। কেবলমাত্র ব্রজ-সুন্দরীগণেরই ইহা সংবেদ্য, ইহাই মহাভাব। এই মহাভাব, শ্রেষ্ঠ অমৃতের স্বরূপ সম্পত্তি বিশিষ্ট হওয়ায় চিত্তকে নিজের স্বরূপে লইয়া যায়।

এই মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। অধিরূঢ় মহাভাবের মোদন ও মাদন, এই দুই প্রকার ভেদ। এই মোদন ভাব, বিরহ দশায় মোহন নামে কথিত হয়। এই মোহন ভাব হইতে দিব্যোন্মাদ হইয়া থাকে। দিব্যোন্মাদের উদঘূর্ণা চিত্রজল্পা প্রভৃতি বহু বহু অবস্থাভেদ আছে। চিত্রজল্প দশাঙ্গ। অঙ্গগুলির নাম—প্রজল্প,-পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প প্রতিজল্প, সুজল্প। শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতায় এই অবস্থাগুলি পরিদৃষ্ট হয়।

ইহা ছাড়া আর একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম মাদন।

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

হ্লাদিনীসার প্রেম। ঐ প্রেম যদি রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্তের উদ্গমনে উল্লাসশীল হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাদন বলা যায়। এই মাদন পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সতত ইহা শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অন্যত্র ইহার উদয় হয় না। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টিকায় বলিয়াছেন,—মাদনে বিরহাভাবাৎ—মাদনে বিরহ নাই।

এই সমুদয় চিন্তাপ্রণালীর মধ্যদিয়া শ্রীরাধাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ও প্রেম জয়যুক্ত হউক।

আস্পষ্টৈরক্ষয়িষ্ণুং হৃদয়বিধুমণিদ্রাবণং বক্রিমাণং
পূর্ণত্বেঽপ্যুদ্বহন্তং নিজরুচিঘটয়া সাধ্বসং ধ্বংসয়ন্তং।
তন্বানং শং প্রদোষে ধৃত নব নবতা সম্পদং মাদনত্বা-
দদ্বৈতং নৌমি রাধাদনুজবিজয়িনোরদ্ভুতং ভাবচন্দ্রঃ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদ্ভুত ভাবচন্দ্রকে প্রণাম করি। এই ভাবচন্দ্র প্রাকৃতী ও অপ্রাকৃতী সৃষ্টিকে অভিব্যাপ্ত করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্বকালব্যাপিনী। ইহার কখনও ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। (ধ্বংস-সম্ভাবনা নাই—ইহা প্রেমের লক্ষণ) এই প্রেমচন্দ্র হৃদয়রূপ চন্দ্রকান্তমণিকে দ্রবীভূত করেন। (দ্রবীভূত করা স্নেহের লক্ষণ) এই ভাবচন্দ্র পূর্ণ হইয়াও বক্রভাব ধারণ করিয়াছেন। (ইহা মানের লক্ষণ) এই ভাবচন্দ্র স্বীয় কান্তিসমূহের দ্বারা ভয়রূপ অন্ধকার ধ্বংস করিতেছেন। (প্রণয়) এই ভাবচন্দ্র প্রদোষে—সন্ধ্যায় অথবা প্রকৃষ্টরূপ দোষে বা অপরাধে অর্থাৎ কালদেশকৃত দুঃখরূপ-দোষে সুখ বিস্তার করেন। (রাগের লক্ষণ) এই ভাবচন্দ্র মাদন অর্থাৎ নিখিল-বিশ্বের আনন্দবিষয়ক। এই ভাবচন্দ্র দ্বিতীয়রহিত, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত আর কিছুই নাই। (মহাভাব)

শ্রীরাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহাই প্রাথমিক কথা। আমরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণবন্দনা করি।

সাধ যায় ইহ চন্দ্রম কিরণে, কুসুমিত কুঞ্জবিতানে।
বসন্তবায়ে প্রাণ মিশাওব বাঁশিক সুমধুর গানে॥

প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়, রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা, চরণে প্রণমে ভানু॥

১৫। রাধাপ্রেম—সাধ্যশিরোমণি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে সাধনতত্ত্ব প্রবর্ত্তিত করেন তাহার শেষ কথা শ্রীরাধাতত্ত্ব। শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, তাহার শেষ কথা এই—

রায় কহে রাধা-প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

মানবজীবনে ধর্ম্মসাধনার দ্বারা যে চরম ফল লাভ করা যাইবে তাহা শ্রীরাধার প্রেম বা শ্রীরাধাতত্ত্বের সহিত প্রকৃত পরিচয় বা শ্রীরাধারাণীর করুণালাভ। রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কথোপকথন তাহাতে সাধনার নিম্নলিখিত স্তরগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১। স্বধর্ম্মাচরণ ২। কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ৩। স্বধর্ম্মত্যাগ ৪। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ৫। জ্ঞানশূন্যাভক্তি ৬। প্রেমভক্তি ৭। দাস্যপ্রেম ৮। সখ্যপ্রেম ৯। বাৎসল্যপ্রেম ১০। কান্তাপ্রেম ১১। রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি।

স্বধর্ম্মাচরণে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ আর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পরিচয়লাভই ধর্ম্মজীবনের চরম পরিণতি। এই মাধুর্য্যের পরিচয় কি প্রকারে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন—

কর্ম্মতপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি জপধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

এই রাগ ও রাগমার্গ কি, তাহা না বুঝিলে শ্রীরাধাতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে না।

উপসংহার

আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে পৌরাণিক ঘটনাবলীর শ্রেণী-বিভাগের কথা

বলিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে ইহা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আজ কাল পুরাণকে ইংরাজী ভাষায় Mythology বা Myth বলে। সকলেই জানেন ইংরাজী ভাষায় Myth কথার অর্থ মিথ্যা। সুতরাং পুরাণের কথা বলিলেই অনেকের মনে হয় ইহা মিথ্যা বা কাল্পনিক কথা। তবে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে ইহার ভিতর হইতে কিছু কিছু সত্য বাহির করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ের এই ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। এই চিন্তা ও ধারণার দ্বারা ভারতবর্ষের ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। সুপরিচিত চিন্তাশীল লেখক রাস্কিন্ (Ruskin) তাঁহার Queen of the Air নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—

Never confuse a myth with a lie. The thoughts of all the greatest and wisest men hitherto have been expressed through mythology.

পৌরাণিক আখ্যানকে মিথ্যা ভাবিও না। পৃথিবীতে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বড়লোক ও জ্ঞানীলোক তাঁহাদের চিন্তাসমূহ এতকাল ধরিয়া পুরাণের মধ্য দিয়া আসিয়াছে।

তিনি আবার বলিয়াছেন—

To the mean person the myth always meant little ; to the noble person, much.

অজ্ঞ লোকের নিকট পুরাণের কোন অর্থ নাই, কিন্তু যাঁহারা মহৎলোক তাঁহাদের নিকট পুরাণ গভীরার্থ-পূর্ণ।

Novalis বলেন—mythology contains the history of the archetypal world. It comprehends past, present and future. পুরাণ ভাবজগতের নিত্য ইতিহাস।

বর্ত্তমান সময়ের একটি শুভলক্ষণ এই যে পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিত আজকাল আর প্রাচীন জগতের পৌরাণিক ঘটনাসমূহ অশ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন না। তাঁহারা গভীর শ্রদ্ধা ও চিন্তার সহিত পৌরাণিক ঘটনাসমূহের তত্ত্বনির্দ্ধারণের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন। সেই পরিশ্রমের ফলে অনেক কথা জানিতে পারা যাইতেছে। গ্রীস্ রোমের পৌরাণিক ঘটনাসমূহ ইংরাজী সাহিত্যে নানাপ্রকারে

প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এখন অনেক চিন্তাশীল সমালোচক সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

এই সমুদয় আলোচনার ফলে অনেক কথা জানিতে পারা যাইতেছে। প্রাচীন জগতের যাবতীয় সভ্যদেশে রহস্য বিদ্যার আলোচনার জন্য অনেক গুপ্তসমিতি ছিল। এই সমুদয় সমিতিতে যাঁহারা উচ্চাধিকারী তাঁহারা বিশ্বরহস্যের চরম সত্য সম্বন্ধে গোপনে আলোচনা করিতেন। এই সমুদয় সত্য সাধারণ লোকের অবোধ্য, কাজেই গোপনে ইহার অনুশীলন হইত। গোপনে যাহার অনুশীলন হইত, তাহাই আবার নানারূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা,—কাব্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির দ্বারা বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। সাধারণ লোকেরা নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী এই সমুদয় কথা বুঝিয়া লইত। ক্রমে ক্রমে অবশ্য গূঢ় অর্থ তাহারা বুঝিতে পারিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন সংশয় প্রকাশ করিয়া শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শ্রীশুকদেব সাতটি উত্তর দিলেন। এই যে সাতটি উত্তর ইহা সাত প্রকারের লোকের জন্য।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক জ্ঞানীলোক বলিতেছেন, পূর্ব্বদেশের প্রাচীন রহস্যশাস্ত্রের অন্ততঃপক্ষে সাত প্রকার তাৎপর্য্য বা গূঢ় অর্থ আছে। ইহার সকলগুলি বুঝিয়া উঠা খুবই কঠিন, তবে যাঁহারা অন্তর্মুখী হইয়া সাধনা করেন তাঁহারা চেষ্টা করিলে কয়েকটি অর্থ, অন্ততঃপক্ষে তিনটি করিয়া অর্থ বুঝিতে পারিবেন। আমরা ইহাকে পুরাণের সপ্তদ্বার বলিতে পারি। আমরা প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষায় ঐ সাতটি দ্বারা বা সপ্তদ্বারের সাতটি চাবি নিম্নে বিবৃত করিলাম—

I. The Spiritual key—আধ্যাত্মিক

II. The Astronomical key—জ্যোতিষিক

III. The Metaphysical key—তাত্ত্বিক

IV. The Anthropological key—নৃতত্ত্ববিদ্যাগত

V. The Geometrical key—জ্যামিতিক

VI. The Psychic key—মনস্তত্ত্বগত

VII. The Physiological key—দেহতত্ত্বগত

এইগুলি প্রধান। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার সাতটি করিয়া ছোট চাবি বা সন্ধান আছে। প্রথম ও সপ্তমের ছোট চাবিগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

a. The astroncmical
b. The geometrical
c. The numerical
d. The real-mystical
e. The allegorical
f. The moral
g. The Literal

যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা চিন্তা করিবেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের কাল নির্ণয়

[শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়কে বৈষ্ণব সাহিত্য-সম্বন্ধে ১৪টী প্রশ্ন করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন—]

প্রিয় অচ্যুত,

তুমি বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছ। আজও বৈষ্ণব-কবি ও চৈতন্য-পার্ষদগণের কাল যথার্থভাবে নিরূপিত হইল না দেখিয়া ব্যথিত হইতেছি। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বৈষ্ণব-সাহিত্যের কাল সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহার তারিখ dogmatically assert করিয়াছেন। ঠিক original source of information কি, বা কোন যুক্তিবলে কি তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। ফলে, প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। তুমি এই পত্রের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি দাও, তবে ঐতিহাসিকভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনার সাহায্য হয়। তবে, প্রত্যেকটী উত্তরই প্রমাণসহ ও যুক্তিগর্ভ হয়, তাহাই ইচ্ছা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দ্বারা ইংরাজীতে বক্তৃতা করাইয়া দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানির নাম—Chaitanya and his Companions ও Vaishnava Literature. দীনেশবাবু ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনায় পথ প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু উক্ত দুই গ্রন্থে, দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ও "বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ের" ভূমিকার মতের সহিত বিরোধ আছে। দীনেশবাবু যথার্থ ঐতিহাসিকের ন্যায় নিজমত পরিত্যাগ করিতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইলেও, ১৯২১ সালের "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যে"র চতুর্থ সংস্করণে সেই নব মত গৃহীত হয় নাই দেখিয়া মনে হয়, দীনেশবাবুর নিজের মত সম্বন্ধে এখনও হয়তো কিছু সন্দেহ আছে, তাহা না হইলে দুই গ্রন্থে দুইরূপ মত কেন ?

যাহা হউক, এখন দীনেশবাবুর নবমত এই যে—"বিশ্বকোষে" লেখা আছে যে, বীর হাম্বীর ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিরোহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিষ্ণুপুরে আগমন তাহার পরে। অতএব ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের আগে খেতুরীর মহোৎসব হইতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, এই খেতুরীর

মহোৎসবের তারিখের উপর, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ এমন কি, ছয়গোস্বামী ও অধিকাংশ বৈষ্ণব সাহিত্যিকের তারিখ নির্ভর করে।' সুতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা প্রয়োজন। দীনেশবাবু আর একটি যুক্তিদ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন—তাহা এই যে, রূপ ও সনাতনের নির্দ্দেশমত ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হয় ও শ্রীনিবাস সেই মন্দির দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই মতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি, "প্রেম-বিলাস" যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ও "কর্ণানন্দ" ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইল বলিয়া গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, সে কথা অবিশ্বাস করিয়াছেন। শ্রীনিবাস যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কথা নীলাচলে যাইতে যাইতে শুনিয়াছিলেন, তাহাও অবিশ্বাস করিয়াছেন। আর রূপ ও সনাতন ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের পর তিরোধান করেন—এইরূপ অভিনব কথা শুনাইয়াছেন। এখন উপযুক্ত External ও Internal প্রমাণদ্বারা এই মত ঠিক কিনা, তাহা আলোচনা করিতে হইবে।

তোমাকে বলা বাহুল্য যে, দীনেশবাবু "বিশ্বকোষের" উপর নির্ভর করিয়া বীরহাম্বীরের রাজ্যাধিরোহণের তারিখ সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছেন। কেননা Archeological Survey of Indiaর ১৯০৩—৪ খৃষ্টাব্দের T. Bloch সাহেবের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে মল্লাব্দ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু "বিশ্বকোষে" ৭১৫ খৃষ্টাব্দে মল্লাব্দের আরম্ভ ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে। আর দীনেশ-বাবু স্বীকার না করিলেও দেখা গেল যে, গোবিন্দের মন্দির সম্বন্ধে সংবাদ তিনি "বিশ্বকোষ" হইতেই লইয়াছেন। গ্রাউস সাহেবের মথুরার ইতিহাস হইতে সেই গোবিন্দের মন্দিরের insription পাঠ করিয়া দেখা গেল যে তাহাতে রূপ সনাতনের নাম গন্ধও নাই। এ ক্ষেত্রেও "বিশ্বকোষ" দীনেশ বাবুকে ভ্রান্ত করিয়াছে। আর 'ভক্তি রত্নাকরে'র ২য় তরঙ্গে ৯১ পৃষ্ঠায়

গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্রীরূপ গোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঞি॥

এই কথায় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের বর্ণনায় মনে হয় যে মান-সিংহের মন্দিরের পূর্ব্বেও গোবিন্দের মন্দির ছিল। এ সম্বন্ধে তোমার মত, প্রমাণ সহ লিখিয়া সুখী করিবে।

(২য় প্রশ্ন) ছয় গোস্বামীর তারিখ নির্দ্ধারণের উপায় কি? বৃন্দাবনে রক্ষিত "সেবা প্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয়" পুঁথি, "ভক্ত দিক্ দর্শিনী" ও "সজ্জনতোষিণী"তে প্রকাশিত জনৈক ভক্তের বিবরণ হইতে জানা যায় (ঐ তিনটী মত প্রায়ই একরূপ) ইহাদের তিরোভাবের তারিখ একরূপ :—

রূপ	১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ, জগবন্ধু ভদ্র মতে	১৫৫৮
সনাতন	১৫৫৮ " " "	১৫৬৪

গোপাল ভট্ট	১৫৮৫	"	"	"	১৫৭৮
রঘুনাথ দাস গোস্বামী	১৫৮১				
রঘুনাথ ভট্ট	১৫৭৯				
শ্রীজীব	১৬০৮ ভদ্র ও 'ভক্ত দিক্‌দর্শিনী'				১৬১৮

সতাতনের তিরোভাব রূপের আগে হইয়াছিল, এ কথা রঘুসাথ দাস গোস্বামীর সূচক হইতে জানা যায়। সুতরাং ভদ্র মহাশয়ের মত, ওস্থলে ভুল বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সনাতন রূপের কতদিন পূর্ব্বে তিরোধান করেন? উক্ত তালিকাগুলির মতে ৫ বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু প্রেম-বিলাসের পঞ্চম বিলাসে চারি মাসের মধ্যে উভয়ের অপ্রকট লিখিত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে শ্রীনিবাসকে এক ব্রজবাসী বলিতেছেন:—

কতেক কহিব ভাই শুনিলে সব কথা।
সনাতনের অপ্রকটে পাইলু বড় ব্যাথা॥
চারিমাস হইলেন হিঁহো অপ্রকট।
শুনিতেই মাত্র প্রাণ করে ছটফট॥

বৃন্দাবনে যাইতেই শুনিলেন—

প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট।
তাহা বহি কতদিন রঘুনাথ ভট্ট॥
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে হইলা অপ্রকট।
শরীরে না রহে প্রাণ করে ছটফট॥

'অনুরাগবল্লী'তে আছে—

শ্রীনিবাস যাইয়া শুনিলেন—
সনাতন অপ্রকট অনেক দিবস।
তার পরে রঘুনাথভট্ট স্বেচ্ছ'বাস॥
সম্প্রতি কয়েক দিন রূপ অদর্শন।
কহিল তোমারে এ তিনের বিবরণ॥

'ভক্তি রত্নাকরে'র বর্ণনাতেও বোধ হয় রূপ সনাতন অল্পদিন ব্যবধানে তিরোহিত হয়েন।

রঘুনাথভট্ট ভাগবত বক্তা যেঁহো।
প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হৈলা তিহোঁ॥

এই কথোদিন শ্রীগোসাঞি সনাতন।
মো সবার নেত্র হৈতে হৈলা অদর্শন॥
এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
দেখিয়া আইনু সে দুঃখের সীমা নাই॥

(৩য় প্রশ্ন তারপর 'প্রেমবিবাস','অনুরাগবল্লী' ও 'ভক্তি রত্নাকর' হইতে জানা যায় যে, শ্রীনিবাস নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সংবাদ পান। এরূপ অবস্থায় তিনি বাঙ্গলার কয়েকটী স্থান ভ্রমণ করিয়াই বৃন্দাবনে যান। সেখানে যাইয়া শুনেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে অস্থির হইয়া রঘুনাথ-ভট্ট, রূপ ও সনাতন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তবে কি তাঁহারা ১৫৩০ হইতে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েন? এস্থানে উক্ত গ্রন্থগুলি স্পষ্টতঃ কোন তারিখ উল্লেখ না করিলেও, ঐরূপ ভাব মনে আনিয়া দেয়।

'অনুরাগবল্লী'তে শ্রীনিবাস—

পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিতে পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যান॥

'ভক্তি রত্নাকর'—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।
কতদূরে শুনিল চৈতন্য সংগোপন॥

কিন্তু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধানের অল্পকাল পরে রূপসনাতনাদির তিরোভাব হইতে পারে না। কেননা, শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী নামক সনাতনকৃত টিপ্পনীর সংক্ষেপ করিয়া যে বৈষ্ণবতোষিনী লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন যে, ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সনাতন টিপ্পনী শেষ করেন। অতএব সনাতন ১৫৫৪ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন জানা গেল। এ স্থলে উল্লিখিত গ্রন্থ-গুলিকে অবিশ্বাস করিতে হয়।

যদি বল, শ্রীনিবাসের গৌড় ভ্রমণ করিতে ১৫৩৩ হইতে ১৫৫৫ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২২ বৎসর লাগিয়াছিল, তাহাও হয় না। কেমনা, ঐ সব গ্রন্থেই প্রকাশ, শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখনও তিনি তরুণ। অতএব (১৩+২২=৩৫) ৩৫ বৎসর তখন তাঁহার বয়স হয় না। তাহা ছাড়া, তিনি ২৫ বৎসরে বিবাহ করেন লিখিত আছে। এ সম্বন্ধে তোমার সমাধান কি লিখিবে।

(৪র্থ প্রশ্ন) ছয় গোস্বামীর উদ্ধৃত তালিকায়, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তারিখের সহিত প্রেম-বিলাসাদি গ্রন্থেরও মিল নাই, ইহা দেখিতে পাইতেছি। অতএব বিশেষ প্রমাণ সহ গোস্বামীদের তারিখ সম্বন্ধে জানাইবে।

(৫ম প্রশ্ন) শ্রীনিবাসের কখন জন্ম হয়? জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদ তরঙ্গিণীতে' একস্থানে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে, অন্যস্থলে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন। দীনেশবাবু বলেন, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বহু পরে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়, একথা তিনি 'প্রেমবিলাসে' পাইয়াছেন। তিনি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 'প্রেমবিলাসে'র প্রথম বিলাসে দেখিতেছি যে, শ্রীচৈতন্য পৃথিবীকে চৈতন্য দাসের খোঁজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পৃথিবী তিনদিন পরে আসিয়া নীলাচলবাসী শ্রীচৈতন্যকে বলিতেছেন—

চাকন্দিতে বাস তাঁর অতি শুদ্ধাচার
তাঁর দেহে নাহি কিছু পাপের সঞ্চার
পুত্র নিমিত্তে পুরশ্চরণ আরম্ভিলা
জগন্নাথে রাখি তেঁহো অল্পকাল গেলা॥

* * * *

এথায় চৈতন্যদাস বিপ্র পুরশ্চরণ করে।
সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে॥
স্বচ্ছলে আজ্ঞা হইল গৌরবর্ণরূপে।

স্বপ্নদর্শন করার পর লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিতেছেন—"আমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষ্ঠান"। নানারূপ মঙ্গল হইতে লাগিল—তাহাতে কবি বলিতেছেন—"গর্ভেতে প্রবেশমাত্র এত ফল হইল"। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, 'প্রেম বিলাস' মতে শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত "বৃন্দাবন কথায়" লিখিয়াছেন যে, তিনি আচার্য্য বংশীয়দের গৃহে রক্ষিত পুথি হইতে জানিয়াছেন যে, শ্রীনিবাস ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

(৬ষ্ঠ প্রশ্ন) তুমি 'সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায়' ১৩০৪ সালের ১ম সংখ্যায় লিখিয়াছ যে, শ্রীনিবাসাদি গ্রন্থ লইয়া "১৫০৪ শকে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলেন"—এ কথার প্রমাণ কি?

এদিকে 'গোপালচম্পূ'র শেষে শ্রীজীব বলিতেছেন যে, ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। তোমার ও ভদ্রমহাশয়ের মতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাদি গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল—তখন কি 'গোপাল-চম্পূ' সঙ্গে যায় নাই?

(৭) শ্রীনিবাস বাল্যকালে নরহরি সরকারকে দেখিয়াছিলেন—সরকার ঠাকুর ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন, ইহা সকলেই বলেন। একথার প্রমাণ কি? অবশ্য এই তারিখ ধরিলে বেশ সঙ্গতি হয়; তবে দীনেশবাবুর মত মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

(৮) খেতুরীর মহোৎসব কোন তারিখে হইয়াছিল? প্রবাদ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে, দুই চারি বৎসরের মতভেদও দেখা যায়। যাহা হউক ইহার ভিত্তি কি?

(৯) বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' কবে রচিত হয়? তুমি একবার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৩ মাঘ) লিখিয়াছ, "বৃন্দাবন দাসের ভাগবত ১৪৯২ শকে অর্থাৎ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।" আবার নগেন্দ্রবাবু (সাঃ পঃ পঃ ১৩০৪. তৃতীয় সংখ্যায়) বলিতেছেন—শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—১৪৫৭শকে অর্থাৎ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।" তোমার যথার্থ মত কোনটি এবং কেন এরূপ মত পোষণ কর?

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে'র ন্যায় গ্রন্থের কাল সম্বন্ধে এত মতভেদ আজও দেখা যায়—আজও তাহার তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইল না। জগদ্বন্ধুভদ্রের মতে ১৫১৫ খৃঃ অঃ, রামগতি ন্যায়রত্ন মতে ১৫৪৮ খৃঃ অঃ, অম্বিকা ব্রহ্মচারীর মতে ১৫৫৭ খৃঃ অঃ, 'প্রেমবিলাসে'র ২৪শ বিলাস মতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ ও দীনেশবাবুর মতে একবার ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দ, আর একবার ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ। মোটের উপর আমার মনে হয় যে, কবিকর্ণপুর যখন ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচনা করেন, তখন বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ এত প্রচলিত যে, তাঁহাকে ব্যাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১০) চৈতন্য চরিতামৃতের ১৫৮১ খৃঃ অঃ বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ তারিখ তোমার অভিমত। প্রেম-বিলাসের ২৪ বিলাসেও ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ আছে। দীনেশবাবু দুইবার দুইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১১) লোচনের "চৈতন্য-মঙ্গলের" তারিখ কি? জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ বলেন। দীনেশ-বাবু একবার ১৫৩৭ ও আর একবার ১৫৭৩ খৃঃ এর পর বলেন! নগেন বাবু ১৫৫৮এর অনেক পরে ইহা রচিত বলেন। (সাঃ পঃ পঃ ১৩০৪)। তোমার মত জানাইবে।

(১২) ঈশান নাগরের উল্লিখিত অদ্বৈতের তিরোভাব তারিখ ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ, বিশ্বাস কর কি? যদি শ্রীনিবাস ১৫১৯এ জন্মেন বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে অদ্বৈতের ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তিরোভাব বিশ্বাস করা যায় না। কেননা শ্রীনিবাস অদ্বৈতকে দেখিতে পান নাই, ইহা 'প্রেমবিলাস', 'অনুরাগবল্লী', 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে। আর 'প্রেমবিলাসে' আছে— শ্রীনিবাস নীলাচল হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিবার পথে বলিতেছেন—"তৃতীয় বৎসর গোসাঞির অপ্রকট"। 'ভক্তি রত্নাকর' বলেন, শ্রীনিবাস নীলাচল হইতে ফিরিতেই দেখিলেন—

কেহো অধোমুখে কহে করিয়া ক্রন্দন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে হৈলা অদর্শন॥

এই বর্ণনা হইতেও অদ্বৈতের অপ্রকটের তারিখ ১৫৩৩ হইতে ১৫৩৫ মনে হয়। মহাপ্রভুর

তিরোধানের পরই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিরোহিত হয়েন—এই বিশ্বাস বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত। এ অবস্থায় ঈশানের তারিখ কিরূপ বোধ হয়?

(১২ক) নিত্যানন্দের অপ্রকটের তারিখ লিখিও।

(১২খ) প্রেমবিলাসে অদ্বৈত ও তৎপুত্র কৃষ্ণমিশ্রের উপর জ্ঞানবাদ প্রচারের দোষার্পণ করা হইয়াছে—তুমি কি মনে কর গ্রন্থের বহু প্রক্ষিপ্তাংশ নিত্যানন্দ শিষ্যগণের দ্বারা পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে?

(১৩) জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'—"শ্রীচৈতন্য অষ্টাদশবর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করেন" প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ কথা আছে। তাহার সম্বন্ধে তোমার মত প্রার্থনীয়।

(১৪) গোবিন্দের কড়চাকে প্রামাণ্য মনে কর কি?

(১৫) মুরারী গুপ্তের "চৈতন্য চরিতে" শেষের শ্লোকে, একবার আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে যে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ শেষ হইল, আর একবার শ্লোকার্থে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যাহাই হউক, উভয় মতেই শ্রীচৈতন্যের বয়স তখন ১৮ বা ২৮ বৎসর। কিন্তু ঐ গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া বৃন্দাবনাদি দর্শন করতঃ প্রতাপরুদ্র ত্রাণ করিয়া নীলাচলে বিরহোন্মাদ অবস্থায় আছেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৬এর বেশী নিশ্চয়ই হইবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুধু বাল্যলীলা মুরারি বর্ণনা করিয়াছেন এই কথা বলিয়াছেন,—এ অবস্থায় মুরারিগুপ্তের কড়চায় ২৮ বৎসরের পরের বর্ণিত লীলা তুমি প্রক্ষিপ্ত মনে কর কি?

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

যুগধর্ম্ম—বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ,—প্রত্যক্ষ দর্শনের যুগ। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু-সমূহের পর্য্যবেক্ষণ ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া জড়বিজ্ঞানসমূহ গড়িয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞান সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর সাধনা ও তপস্যা চলিতেছে। এই সাধনায় মানবজাতি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাও বিস্ময়াবহ। বিজ্ঞানের এই উন্নতি উপেক্ষনীয় নহে। অনেকে মনে করেন আমরা ধার্ম্মিক লোক, আমরা অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুশীলন করি, পরমার্থ-লাভের জন্য সাধনা করি, আমরা পারলৌকিক মঙ্গলের কামনা করি, আমরা এই সব জড়বিজ্ঞান লইয়া কি করিব? আবার এমন উৎকট কথাও শুনিতে পাওয়া যায়—এই সমুদয় মায়া বা মিথ্যা। এই মত সর্ব্বনাশকর; ভগবান্ এই সর্ব্বনাশকর সিদ্ধান্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের কোনই বিরোধ নাই। প্রাচীন ঋষিগণ বিজ্ঞান-সমূহকে অপরাবিদ্যা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার চর্চা করিতে নিষেধ করেন নাই—বরং উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালের অনেক বৈদিক ঋষি এমন কথা বলিয়াছেন যে, অপরাবিদ্যার অনুশীলন না করিলে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না। ঈশোপনিষদে এই কথা আছে। ধর্ম্ম বলিতে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয়কেই বুঝায়—অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা উভয় বিদ্যাকেই বুঝায়।

প্রাচীন ভারতের বৈদিক ঋষিগণই যে মানবজাতির আদিগুরু ও পথপ্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রাথমিক কথাগুলি সর্ব্বপ্রথম জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদেরই উপদেশসমূহ আরব, মিশর, গ্রীস, রোম্ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশ-সমূহের মধ্যদিয়া বর্ত্তমান পাশ্চত্য দেশ-সমূহে প্রচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সাধন খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু বিজ্ঞানরাজ্যের অনেক প্রাথমিক কথা তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালের প্রভাবে ভারতবর্ষ জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পিছাইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলি এ বিষয়ে অনেক উন্নতি করিয়াছে। বহুকাল পরে আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হইয়াছে। ইহা ভগবানেরই লীলা। জড়বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ পিছাইয়া পড়িলেও তত্ত্ববিদ্যায় ভারতবর্ষ সত্য করিয়া অধঃপতিত হয় নাই। অন্তর্জগতের জ্ঞান—আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, প্রভৃতি, যাহা ভগবান্ স্বয়ং বেদরূপে অবির্ভূত হইয়া তপোবনবাসী শুদ্ধসত্ত্ব আর্য্যঋষিগণকে শিখাইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান এখনও ভারতবর্ষে রহিয়াছে। এই জ্ঞানকে আমরা তত্ত্ববিদ্যা বা যোগবিদ্যা বলিতে পারি। এই বিদ্যায় পারদর্শী অসংখ্য সাধু মহাপুরুষ এখন ও রহিয়াছেন। কেহ কেহ হিমালয় পর্ব্বতের সুদুর্গম গুহায় ধ্যানমগ্ন, আবার কেহ কেহ কৃপা করিয়া আমাদিকে ঐ সমুদয় বিদ্যাদান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা, গ্রহণ করে কে? ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে সংযম চাই, ব্রহ্মচর্য্য চাই, সদাচার চাই, তপস্যা চাই। কিন্তু অমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, জড়জগতের বিষয়ভোগের মোহ আমাদিগকে নিরতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে—কাজেই, ভারতবর্ষের ঐ প্রাচীন বিদ্যা লাভ করিবার জন্য আমাদের তেমন চেষ্টা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক লোক তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের পথ অবলম্বন করিয়া আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের ঐ সমুদয় বিদ্যা, ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিতেছেন। কিন্তু আমরা এখনও নিশ্চেষ্ট! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এখনও ভারতবর্ষে সেই বৈদিক ঋষিগণের বংশধরেরা বাস করিতেছেন, শাস্ত্রও রহিয়াছে, সাধনার পথও রুদ্ধ হয় নাই,—কিন্তু ঐ সাধাপথে অগ্রসর হয় কে?

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একজন বড় সাহেব, তাঁহার নাম সিনেট; তিনি প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ

ইংরাজী সংবাদপত্র 'পায়োনিয়ারের' সম্পাদক ছিলেন। তিনি হঠাৎ একখানি ইংরাজী গ্রন্থ লিখিলেন, তাহার নাম The Occult World বা অন্তর্জগৎ। এই গ্রন্থের প্রথমেই তিনি লিখিলেন—ভারতবর্ষে হিমালয় পর্ব্বতে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের জ্ঞান ও শক্তির তুলনায় পাশ্চাত্য জগতের সমগ্র জ্ঞান ও শক্তি, সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জলের মত। তিনি বলিলেন যে—তিনি নিজে এই প্রকারের অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানের ও শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছেন। এই গ্রন্থ যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখনও বিলাতের টেলিগ্রাম আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই সময়ে তিনি লিখিলেন যে—ভারতবর্ষে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের একজন বসিয়া আছেন হিমালয় পর্ব্বতে, আর একজন বসিয়া আছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে, অথচ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই কথোপকথন চলিতেছে। এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা স্থূলদেহ কোনস্থানে ফেলিয়া রাখিয়া, সূক্ষ্ম দেহে ইচ্ছামত দূরদূরান্তে বিচরণ করিতে পারেন। সিনেট্ সাহেব, এই সব কথা লোকের মুখে শুনিয়া লেখেন নাই, স্বয়ং দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া তিনি এই সমুদয় কথা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি প্রচারিত হওয়ার পর, ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেশের অনেক মনীষি ও সাধুব্যক্তি ভারতবর্ষের এই যোগবিদ্যা বা গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য, বহুল পরিমাণে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কেহ কেহ কিছু কিছু সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিদ্যালাভ করিবার পক্ষে ভারতবাসীর দেহ যেমন উপযুক্ত, রজোগুণপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের লোকদিগের দেহ তেমন উপযুক্ত নহে। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা আছে, আমাদের চেষ্টা নাই।

ভারতবর্ষে যে এই প্রকারের এক বিদ্যা ছিল, এবং এখনও সেই বিদ্যায় পারদর্শী মহাপুরুষগণ আছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই বিদ্যারই সাধারণ নাম ব্রহ্মবিদ্যা। স্বয়ং ভগবান্ গুরুরূপে এই বিদ্যা ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা অথর্ব্বণ ঋষিকে দিয়াছিলেন। এই বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, এই প্রকারের কথা উপনিষদে আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—এই বিদ্যা তিনি অর্থাৎ গুরুরূপী শ্রীভগবান্, সূর্য্যদেবকে দিয়াছিলেন, সূর্য্যদেব মনুকে দিয়াছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে দিয়াছিলেন। পুরাণে দেখিতে পাই, এই বিদ্যা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুক প্রভৃতির মধ্য দিয়া গুরুশিষ্য পরম্পরায় জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আজকাল অনেকে গুরুশিষ্য পরম্পরায় বা গুরুপ্রণালীতে বিশ্বাস করেন না এবং দীক্ষা ব্যাপারটিকে একটি অনাবশ্যক ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করেন। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে দীক্ষাদান একটি প্রাণহীন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে, এবং একথাও বহুল পরিমাণে সত্য যে, গুরুগিরি একটি লৌকিক ব্যবসায়মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই ব্যাপারটিকে আমরা যেন অনাবশ্যক ব্যাপার বলিয়া মনে না করি এবং হয় ইহার নিন্দা করিয়া, না

হয় এ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, এই ব্যবস্থাটি নষ্ট করিয়া না ফেলি। এখন প্রয়োজন,—এই ব্যবস্থা যাহাতে সংস্কৃত হয়, এবং আবার সদ্‌গুরু, উপযুক্ত শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে সাধন-পথে পরিচালনা করেন। এই প্রাচীন ব্যবস্থা পুনর্ব্বার সত্যোপেত ও প্রাণময় না হইলে, ভারতের এই প্রাচীন বিদ্যার পুনরুত্থান হইবে না। এই বিদ্যার পুনরুত্থান না হইলে, কেবল ভারতের নহে,– সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি কতদূত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানসমূহ কোথায় আসিয়া উপস্থিত, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সম্মুখে এখন কি কি সমস্যা রহিয়াছে, আমরা যদি তাহার আলোচনা করি, তাহা হইলে বিশ্বব্যবস্থার অনেক রহস্য জানিতে পারিব। সংক্ষেপে দুএকটি কথায় আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ মনোবিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এখন আমরা যে মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা করি, উহা জড়বাদের ভিত্তি হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। শারীর বিদ্যা বা Physiology উহার মূল ভিত্তি। জড়বাদী পণ্ডিতগণের ধারণা—স্নায়ুমণ্ডলী না থাকিলে চিন্তা করা যায় না। কিন্তু এক্ষণে সম্মোহন বিদ্যার (Hypnotism) আলোচনার ফলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সম্মোহনের অবস্থায় একজন লোকের স্নায়ুমণ্ডলী যে সময়ে একেবারে নিষ্ক্রিয়, মানুষটি সে সময়ে খুব বড় বড় জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতেছে। শুধু তাহাই নহে, সেই সময়ে লোকটি দুইশত চারিশত ক্রোশ দূরের জিনিস দেখিতে পাইতেছে, দুইশত চারিশত ক্রোশ দূরের কথা শুনিতে পাইতেছে। তাহার Clairvoyance (সূক্ষ্মদৃষ্টি) ও Clairaudience (সূক্ষ্মশ্রুতি) খুলিয়া গিয়াছে। অথচ সে সময়ে তাহার স্নায়ুমণ্ডলী ও স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ একেবারে নিষ্ক্রিয়। এই প্রকারের সম্মোহিত অবস্থায় পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে,— একজন মূর্খ লোক খুব বড় পণ্ডিতের ন্যায় সাধু ভাষায় তত্ত্বকথা বলিতেছে। একজন মানুষের ভিতর তিনজন মানুষ রহিয়াছে, এমন ব্যাপারও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। স্বপ্ন সঞ্চরণের কথা অনেকেই জানেন। স্বপ্নের অবস্থায় মানুষ খরস্রোতা ও গভীরজলপূর্ণা নদী পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শরীর বা কাপড় ভিজিয়া যায় নাই, এপ্রকারের ঘটনাও পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহার পর চিন্তাবিনিময় বা Thought Transference, চিন্তাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্য বিধান—এই সমুদয় ব্যাপারও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে।

এই সব ব্যাপার দেখিলে কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে—স্থূল ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়ীয় উপকরণ বা ইন্দ্রিয় ব্যতীত সম্বিৎ, জ্ঞান বা চৈতন্য (Consciousness) ক্রিয়া করিতে পারে। স্থূলভূত ও স্থূল ইন্দ্রিয় ব্যতীত সূক্ষ্মভূত বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে এবং যথারীতি চেষ্টা করিলে, মানুষ সেই

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণকে ক্রিয়াম্বিত করিয়া এমন অনেক কার্য্য করিতে পারে, যাহা সাধারণ মানুষের নিকট অলৌকিক ও ইন্দ্রজালের ন্যায় বিস্ময়াবহ।

প্রেততত্ত্ব বা পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বিলাতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের একটি বিশিষ্ট মণ্ডলী আছে। উহার নাম Psychical Research Society। আমরা যদি শুনি—কোন স্থানে প্রেতের উপদ্রব হইতেছে, তাহা হইলে হয় তাহা মানিয়া লই, না হয় উহা কিছুই নহে, বলিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু এই পণ্ডিত-মণ্ডলী তাহা করেন না। তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিয়া উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করেন। অবশ্য কোন কোন ব্যাপার হয়ত মিথ্যা, অশিক্ষিত লোকের ভ্রান্তধারণা হইতেই তাহা জন্মিয়াছে। কিন্তু সমুদয় ঘটনাই মিথ্যা নহে। এই সমুদয় ঘটনা লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা চলিতেছে; কেবল তাহাই নহে, পরলোকগত মানবের সহিত কথোপকথন করারও চেষ্টা চলিতেছে। আর একদিকে কেহ কেহ সূক্ষ্ম জগতের অধিবাসী গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির ও প্রাকৃতিক দেবযোনিসমূহের ছায়াচিত্র বা ফটোগ্রাফ্ লইতেছেন। এই সমুদয় বিষয়ের যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা মায়ার্স সাহেবের Human Personality নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এই গ্রন্থখানি ডাব্‌লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে। আমরা আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই ইহা আমাদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইবে। এই গ্রন্থ পড়িলে আমাদের আস্তিক্য-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিবে, এবং প্রাচীন কালের যে সমুদয় সংস্কার ও অনুষ্ঠানকে আমরা অর্থহীন ও অযৌক্তিক আড়ম্বর বলিয়া মনে করি, তাহার অনেক ব্যাপারই যে ঋষিদের গভীরতর তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে পারিব।

জড়বাদীগণের মত এই যে—চৈতন্য, জ্ঞান বা প্রাণ জড়পরমাণুর সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য হইতেই জন্মিয়াছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে চার্ব্বাক এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই মতের নাম, চার্ব্বাক মত, লোকায়াত মত, বার্হস্পত্য মত বা নাস্তিক মত। এই মতই বর্ত্তমান কালের জড়বাদ, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, ইহসর্ব্বস্ববাদ, প্রভৃতি। ইহারা সকলেই নাস্তিক্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি-মাত্র। জড়বিজ্ঞান প্রথম হইতেই এই জড়বাদের পুষ্টিবিধান করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানসমূহ উন্নতিরপথে অগ্রসর হইতে হইতে এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে যে জড়বাদ আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এখন আর অচেতন জড়পরমাণুকে বিশ্বজগতের মূলতত্ত্ব বলিয়া ধরিয়া থাকা চলে না। পরমাণু কি? (What is an atom)—এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হইতে হইতে বৈজ্ঞানিকগণ কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পরমাণুও ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন আয়ণ্, ইলেক্ট্রন্ প্রভৃতির কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আবার দেখা যাইতেছে—স্থূল পরমাণু বলিয়া একটা জিনিসই নাই। শক্তিপ্রবাহের বিভিন্নমুখী গতির সংঘাতের নামই পরমাণু।

বিজ্ঞানের এই সমুদয় শেষ কথার আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের দ্বার, একটির পর অপরটি উদ্ঘাটিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম পদার্থবিজ্ঞান শ্রেণীর বিজ্ঞান-সমূহ Sciences of the Physical group, তাহার পর রসায়ণ শ্রেণী Chemical group, তাহার পর প্রাণ-বিজ্ঞান Biological group—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পশুবিদ্যা প্রভৃতি, তাহার পর মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, Psychological, Moral and Sociological group। এই সমুদয়ের আলোচনা করিতে করিতে বিজ্ঞান জড়ের বা স্থূলের সীমা ছাড়াইয়া সূক্ষ্ম চৈতন্যের দুয়ারে আসিয়া পরলোকের প্রাচীরে আঘাত করিতেছে। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের আর বর্ত্তমান পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন—ধাতু প্রস্তরেরও প্রাণ আছে, জীবন মরণ আছে—Response in the living and non-living—উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্রী আছে, সুখ দুঃখের অনুভব আছে। সুতরাং জড়বাদের পথে আর বিজ্ঞান অগ্রসর হইতে পারিবে না, প্রত্যেক বিজ্ঞানের সম্মুখেই দুরতিক্রমণীয় বাধা (Deadlock)। সুতরাং অধ্যাত্মবাদ, বা ভারতের ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের ও প্রতিষ্ঠার সুসময় উপস্থিত।

ভারতবর্ষের উন্নতি বা জাগরণ শব্দের অর্থ—এই ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগবিদ্যার অনুশীলন। ভারতবাসীগণ এই বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই প্রাচীন ও বিস্মৃত বিদ্যা আবার জগতে প্রচার করুন, তাহা হইলে ভারতের দুর্দ্দশাও দূর হইবে, সমগ্র জগতেরও দুর্দ্দশা দূর হইবে। ইহাই ভারতরবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কার্য্য। এই কার্য্য করাইবার জন্যই বিধাতাপুরুষ এত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও ভারতবর্ষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারতের কল্যাণের আর পথ নাই।

বৈজ্ঞানিকগণ যাহা করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসাও করিতে হইবে। কিন্তু আর বিজ্ঞানের দ্বারা চলে না, এখন প্রজ্ঞানের আসিবার সময় হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের পদ্ধতি আমরা জানি। যন্ত্রের উন্নতি এবং যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ—বৈজ্ঞানিকের পদ্ধতি। কিন্তু প্রজ্ঞান যাঁহাদের সাধনা আশ্রয় করিয়া জগতে আসিবেন, তাঁহাদের পদ্ধতি ও উপকরণ কি, তাহাই এখন আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

উভয় প্রকারের আলোচনার প্রণালী এইরূপ। একটি বৃক্ষে তাহার অসংখ্য পত্র, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইহার এক একটি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে বহু হইতে শ্রেণীবিভাগের দ্বারা (By Induction) ঐক্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রজ্ঞানের প্রণালী অন্যরূপ। বৃক্ষেরও প্রাণ আছে, আমারও প্রাণ আছে। আমি আমার প্রাণের দ্বারা বৃক্ষের প্রাণকে ধরিতে পারি এবং সেই প্রাণশক্তির প্রেরণা বুঝিয়া তাহার ক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

কিন্তু আমার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় যেরূপ বিকশিত হইয়াছে, যেরূপ ব্যবহার করিবার উপযুক্ত অবস্থায় আসিয়াছে, আমার প্রাণ সেরূপ অবস্থায় আসে নাই। আমার ভিতরে প্রাণ আছে, এই প্রাণ আছে বলিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি, কিন্তু এই প্রাণ আমার আয়ত্তাধীন নহে। আমি যদি আমার প্রাণকে আয়ত্ত করিয়া আমার ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার প্রাণের দ্বারা কেবল বৃক্ষের প্রাণ কেন, নিখিল বিশ্বের সকলের প্রাণই ধরিতে ও বুঝিতে পারিতাম। আমি যদি আমার প্রাণের দ্বারা বৃক্ষের প্রাণ ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে বৃক্ষের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে আমাকে আর বাহির হইতে পত্রপল্লব প্রভৃতি একটি একটি বুঝিতে হইত না, আমি ভিতর হইতে, ঐক্যের ভূমি হইতে, বাহিরের এই বহু বা বিচিত্রের জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ম বুঝিয়া ফেলিতে পারিতাম। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের পদ্ধতির ভিতর ইহাই প্রভেদ। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় ঐক্যের অভিমুখী, বিজ্ঞানের পথ বাহির হইতে ভিতরের দিকে —from outside inwards. প্রজ্ঞানের পথ ঠিক ইহার বিপরীত। প্রজ্ঞান একেকে ধরিয়া বহুর দিকে আসিতেছে—from inside outwards.

প্রাণের কথা বলা হইল। প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে, বৃক্ষের বা অপর কোন প্রাণীর তত্ত্ব ধরিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাণকে আয়ত্ত করার উপায় কি? উত্তর —প্রাণায়াম।

বর্ত্তমান কালের মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ মনের বাহিরের ক্রিয়া বা স্থূল স্নায়ুমণ্ডলীতে মনের প্রভাব দেখিয়া মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। ইহা বাহির হইতে আলোচনা। কিন্তু কেহ যদি মনকে আয়ত্ত করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজের মনের দ্বারা অপরের মনের ক্রিয়াবৈচিত্র্য অনায়াসেই ধরিতে ও বুঝিতে পারেন। এই প্রকারে মনকে আয়ত্ত করার উপায় কি? উত্তর—ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি।

কিন্তু প্রাণায়াম, ধারণা প্রভৃতি প্রাণের ও মনের ক্রিয়া করিতে গেলে, যে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া এই প্রাণ ও মন ক্রিয়া করিতেছে সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়কে উপযুক্ত করিতে হইবে। দেহ ও ইন্দ্রিয়কে উপযুক্ত করিতে হইলে যম, নিয়ম প্রভৃতি প্রয়োজন। দেহ নানা কারণেই অনুপযুক্ত হয়। পুত্রকন্যার দেহেন্দ্রিয়ের অনুপযুক্ততার জন্য পিতামাতা দায়ী। পিতামাতাকে প্রথমেই সাবধান ও সাধনশীল হইতে হইবে। দেবতারা ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, পিতৃগণ প্রাণশক্তির অধিষ্ঠাতা। এই প্রকারে তত্ত্বচিন্তা করিলে আমরা গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সংস্কার সমূহের এবং পিতৃলোক ও দেবলোকের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার, এবং আহারশুদ্ধি, সদাচার, ব্রত উপবাস, যম নিয়ম প্রভৃতির প্রয়োজন বুঝিতে পারিব। ইহাই সমগ্র সনাতন ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্ম কেবল তত্ত্ববিচার বা Philosophy নহে।

ইহা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ। ইহা সমগ্র জীবনের দ্বারা, জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের দ্বারা অনুষ্ঠেয়।

প্রজ্ঞানের যুগ আসিতেছে। এই প্রজ্ঞান ভারতের সুপ্রাচীন নিজস্ব সম্পত্তি। আমাদিগকে আজ সাধনার দ্বারা এই প্রজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং লাভ করিয়া মানবজগতে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভারতের বেদান্ত যে আজ জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে, তাহার হেতু এই। কিন্তু এই প্রজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রথম হইতেই ইহার অনুষ্ঠান না করিলে, পারিবারিক জীবনে ইহা প্রতিষ্ঠিত না করিলে, কেবলমাত্র গ্রন্থ পাঠের দ্বারা প্রজ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন সমস্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আমরা আমাদের কর্ম্মদোষে পিতৃলোক, দেবলোক ও ঋষিলোকের আনুকূল্যে বঞ্চিত হইয়াছি। আমরা আজ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে অক্ষম। গুরুপুরোহিতের অভাব হইয়াছে, তীর্থস্থান কলুষিত হইয়াছে। আজ আর আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার দিন নাই। আহ্বান আসিতেছে, ইহা বিধাতার আহ্বান, সমগ্র পৃথিবীর আহ্বান। সমগ্র মানবজাতি আজ দারুণ দুর্দ্দশায় নিপীড়িত হইয়া ভারতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদেশ হইতে আবার নবালোক সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। ভারতবর্ষ ব্রহ্মণ্যশক্তির দেশ। ভারতের ব্রহ্মণ্যশক্তি আবার জাগরিত হউক, ভারতের তপস্যা আবার জয়যুক্ত হউক, ভারতের প্রজ্ঞান আবার বিজ্ঞানের সহিত মিলিত হউক। তাহা হইলেই জগতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুমাত্রেরই দৈনন্দিন জীবন, যে নিয়মে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, প্রাত্যহিক অভ্যাসের দ্বারা মানব কি প্রকারে তাহার নিম্ন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া, দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিত। এই প্রকারে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপার পরিচালনা না করিলে, মানবের উন্নততর প্রকৃতি বিকশিত হয় না এবং মানুষ প্রজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

সমগ্র দিনমানকে ষোলটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগ দেড় ঘণ্টা পরিমিত কাল। ইহাকে যামার্দ্ধ বলে। কোন্ যামার্দ্ধে কি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা এইরূপ।

ঊষা ৪½টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিনের শেষ যামার্দ্ধ। এই সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা ও ধ্যান। প্রথম যামার্দ্ধ ৬টা হইতে ৭½টা—দেবপূজা, গুরুপূজা। দ্বিতীয় যামার্দ্ধ ৭½টা হইতে ৯টা—বেদাদি শাস্ত্রপাঠ। তৃতীয় যামার্দ্ধ ৯টা হইতে ১০½,—পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিষয় কর্ম্ম। এই গেল পূর্ব্বাহ্নকৃত্য। তাহার পর মধ্যাহ্নকৃত্য। মধ্যাহ্নকৃত্যের ব্যবস্থা এইরূপ। ১০½টা হইতে ১২টা—স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, সূর্য্যোপস্থান, ব্রহ্মযজ্ঞ, গণেশ শিব বিষ্ণু প্রভৃতি

দেবপূজা। ১২টা হইতে ১২টা,—পঞ্চযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ। আহার। অপরাহ্নকৃত্য, ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধ ১২টা হইতে ৪২টা,—কাব্য ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠ। সন্ধ্যাকৃত্য, ৪২টা হইতে ৬টা বন্ধুগণের সহিত দেখাশুনা ও সন্ধ্যাবন্দনা। রাত্রিকৃত্য, নবম ও দশম যামার্দ্ধ, ৬টা হইতে ৯টা—কাজ কর্ম্ম যাহা শেষ হয় নাই তাহা দেখাশুনা, শয্যানির্ম্মাণের ব্যবস্থা, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত কথোপকথন। ৯টা হইতে ৪২টা পর্য্যন্ত—নিদ্রা।

দৈনিক জীবন পরিচালনার ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। বর্ত্তমান সময়ে জীবন-সংগ্রাম যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িয়াছে, উদরান্ন-সংগ্রহের জন্য মানুষকে গ্রাম দেশ ছাড়িয়া বিদেশে সহস্র অসুবিধার মধ্যে যে ভাবে থাকিয়া দিনরাত্রি অপ্রীতিকর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে এই ব্যবস্থা অনুসারে চলা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অসম্ভব। পূর্ব্বকালে মানুষ পরিবার প্রতিপালনের জন্য মাত্র দেড়ঘণ্টা পরিশ্রম করিত। তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত। জীবন এতই সরল ছিল। এখন অনেকে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে বাধ্য, নতুবা পেটের ভাত সংগৃহীত হয় না। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, মানুষ মানুষ। যথেষ্ট অবসর না পাইলে, মানুষের উন্নততর বৃত্তিসমূহ বিকশিত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণও ইহা বুঝিয়াছেন, এবং শ্রমজীবিগণের দৈহিক পরিশ্রম করার সময় কমাইবার জন্য সর্ব্বদাই আন্দোলন হইতেছে এবং এই আন্দোলনের ফলে নূতন নূতন আইনও হইতেছে। জীবনসংগ্রাম বর্ত্তমান সময়ে অতিশয় কঠিন হইয়াছে সত্য, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের উন্নতি নিবন্ধন মানুষের পরিশ্রমের প্রয়োজনও কমিতেছে। এখন এই বৈজ্ঞানিক শক্তির সদ্ব্যবহার আবশ্যক। এখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় নাই, বরং বহুলপরিমাণে অসদ্ব্যবহার হইয়াছে। মানুষের লালসা ও দম্ভ, এই অসদ্ব্যবহারের হেতু। চিরদিন মানবের এইরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে না। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আবার একদিন সেই ব্যবস্থা সকলের পক্ষে প্রতিপালন করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। দ্বিতীয় কথা—এই ব্যবস্থা যদি সঙ্গত ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে যতদূর পারি, আমাদিগকে এই ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করিয়া চলা উচিত। মধ্যাহ্নকৃত্যগুলি অনেকেরই পক্ষে আজকাল করা অসম্ভব, কারণ সে সময় চাকুরীর সময়। কিন্তু রবিবারের দিন অথবা ছুটির দিন করিলেও তো হয়! মোট কথা, আমরা এই দিন চর্য্যা যেন ভুলিয়া না যাই। এই প্রকারে যদি প্রতিদিন চলিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। চিত্তশুদ্ধ হইলেই প্রজ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে এবং তাহা হইলেই মানব ধন্য হইবে।

মানুষ জড়দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ, মন, বুদ্ধি নহে, মানুষ চিদানন্দরূপ, অজর, অমর, নিত্য ও শুদ্ধ। মানুষ—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির প্রভু। কিন্তু এখন মানুষ অবিদ্যাচ্ছন্ন, আপনাকে ভুলিয়া

মেচ্ছেন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মানুষকে তাহার স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বে দৈনন্দিন জীবন যাপনের যে ব্যবস্থা বলা হইল তাহা অবলম্বনীয়, ইহাতে আর সন্দেহ কি! ঐ প্রকারের সুপরিচালিত জীবন না হইলে প্রজ্ঞান লাভ হইবে না, এবং প্রজ্ঞানলাভ না হইলে ভারতের ও জগতের এই বিভীষিকাময় দুর্দ্দশাও দূর্গত হইবে না। অতএব—উত্তিষ্ঠত. জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উত্থিত হও, জাগ্রত হও, সাধুমহাপুরুষগণের শরণ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হও।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র

গ্রন্থ-সমালোচনা

শুশ্রূষা-শিক্ষা—[ডাক্তার শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজি আকারের ২৯১ পৃষ্ঠা। শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, মূল্য দেড় টাকা মাত্র।]

গ্রন্থকার বোলপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বহুদর্শী চিকিৎসক। সচিত্র সফল স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা, প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ট্রিটিজ্ অন্ ফিবার,—এই দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ গ্রন্থকারের পূর্ব্বের রচনা। কেবল সুচিকিৎসক নহেন, গ্রন্থকার একজন কর্ম্মী। তিনি মফঃস্বলের চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণকে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার সেই চেষ্টা অনেকটা ফলবতীও হইয়াছে। 'চিকিৎসক' নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্রের তিনি সম্পাদক।

আলোচ্য-গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে:—

১। শুশ্রূষাকারিণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। ২। শুশ্রূষার ভার স্ত্রী কিম্বা পুরুষ, কোন্ শ্রেণীর উপর দেওয়া উচিত। ৩। চিকিৎসকের প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর কর্ত্তব্য। ৪। রোগীর প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর কর্ত্তব্য। ৫। শুশ্রূষাকারিণীর নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। ৬। রোগীর গৃহ পরিষ্কার করণ প্রণালী, গৃহের আসবাব ও আলোকদান প্রণালী। ৭। তাপমানযন্ত্র ব্যবহার-প্রণালী। ৮। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা প্রণালী। ৯। নাড়ী পরীক্ষা ও গণনাপ্রণালী। ১০। ঔষধ প্রয়োগবিধি ও ঔষধ এবং ব্যবস্থাপত্র রক্ষা প্রণালী। ১১। পুল্‌টিস্, গরমজলের সেক, শুষ্ক উত্তাপ ও জলপট্টি-সম্বন্ধে উপদেশ। ১২। বিবিধ প্রকার স্নান বিধি। ১৩। এনিমা-প্রয়োগ বিধি ১৪। লক্ষণ-পর্য্যবেক্ষণ। ১৫। উপসর্গ দমন প্রক্রিয়া।

বিষয়গুলি সরল-ভাষায়—কথোপকথন আকারে—কথিত হইয়াছে। আমাদের দেশের লোক রোগীর শুশ্রূষা-বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। চিকিৎসা-অভাবে যত লোক মরে, শুশ্রূষা-অভাবে তদপেক্ষা অধিক লোক মরে। ভাড়া-করা শুশ্রূষা-কারিণী সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও তাহার ব্যয় বহন করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এই শ্রেণীর গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। গৃহস্থগণ বাড়ীর সকলকে বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে এই গ্রন্থখানি পড়াইবেন। বালিকা-বিদ্যালয়ে এই শ্রেণীর গ্রন্থ পারিতোষিক দিয়া এই গ্রন্থগুলির প্রচারে সাহায্য করা আবশ্যক।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীরাধা

১। শ্রীকৃষ্ণ-পারম্যবাদ

দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, স্বয়ং ভগবান্, "সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান"। তিনিই আদিতত্ত্ব। আর শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার স্বরূপশক্তি, অন্যান্য সকল শক্তির মূলীভূতা, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি। এই যুগলতত্ত্ব শ্রীরাধাগোবিন্দই উপাসনার চরম বস্তু। এই মত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে এই মত ছিল না, তিনি এই মত প্রথম উদ্ভাবিত করিলেন, ভক্তগণ তাহা বলেন না। ভক্তেরা বলেন,—এই মত চিরকালই আছে, ইহা নিত্য ও অনাদিকাল সিদ্ধ। সাধারণ লোকে এই মত জানিত না। জীবের পরম সৌভাগ্য, তাই শ্রীভগবান্ করুণা করিয়া আবির্ভূত হইয়া, ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া, নিজে আচরণ করিয়া, উপযুক্ত ভক্তগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া, এই চরমতত্ত্ব ও পরমকথা প্রচারিত করিলেন এবং কৃপা করিয়া আপামর সাধারণ সকলকে এই উন্নততম ও অতিগূঢ় শ্রীরাধাগোবিন্দ-আরাধনার অধিকার ও সামর্থ্য দান করিলেন।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূর্ব্বে কেহ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের, কেহ শ্রীরামচন্দ্রের, কেহ শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা করিতেন। তাহা ছাড়া, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, শিব, দুর্গা প্রভৃতিকে চরম ও পরমতত্ত্ব বোধে উপাসনা প্রচলিত ছিল। কেহ গণেশকে, কেহ সূর্য্য প্রভৃতিকেও পরব্রহ্ম-বুদ্ধিতে আরাধনা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে তত্ত্ব ও সাধন প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য। শ্রীমদ্ভাগবত উত্তমরূপে আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবত, এই তত্ত্বকেই চরমতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন। কিন্তু অসতর্কভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিলে, এই মতই যে শ্রীমদ্ভাগবতের মত, তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাভাজন গোস্বামীপাদগণকে অনেক পরিশ্রম করিয়া, অনেক বিচার করিয়া দেখাইতে হইয়াছে যে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অন্য প্রকারের গ্রন্থ। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 'শ্রীকৃষ্ণ-পারম্যবাদ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই চরম ও পরমতত্ত্ব,—এই মত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অতিশয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের উত্তমরূপে এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের আলোচনা করা আবশ্যক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রথমেই পরদেবতার যে বন্দনা আছে, সৃষ্টিকার্য্য বর্ণনার প্রারম্ভে আদিতত্ত্বের যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলেই আমরা এই পুরাণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব। ইহা ছাড়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আর একটি কারণে বিশেষরূপে আলোচ্য। বর্ত্তমান সনাতন ধর্ম্মে যে সব দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে, এই পুরাণে সে সমুদয় দেবতার প্রত্যেকেরই তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও মিলনের ভূমি কোথায়, তাহাও এই গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য, এই সমন্বয় একটি সুনির্দ্দিষ্ট অধিষ্ঠানভূমি (from a definite and particular stand point) হইতে করা হইয়াছে। অন্য ভূমি হইতে দেখিলে অন্যরূপ সমন্বয় ও করা যায়, ইহা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থের প্রারম্ভে যে সমুদয় শ্লোকের দ্বারা পরদেবতার বন্দনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নের শ্লোকটিই প্রধান—

বন্দে কৃষ্ণং গুণাতীতং পরং ব্রহ্মাচ্যুতং যতঃ।
আবির্ব্বভূবুঃ প্রকৃতি ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥

সেই গুণাতীত, পরব্রহ্ম, অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। প্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

এইবার এই পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টির প্রথম কথা আলোচনা করা যাউক। মহাপ্রলয়ে কেবল জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতির ভিতরে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক। এই তিন লোকের দুই প্রকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা, আর সৃষ্টি

সময়ের অবস্থা। সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়ের সময় গোলোকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ, আর সৃষ্টির সময়ে কৃষ্ণ-ব্যতীত গোপগোপী প্রভৃতি থাকেন। সেইরূপ, প্রলয়ের সময় বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক শূন্য, আর সৃষ্টির সময়ে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ আর শিবলোকে সপার্ষদ ... থাকেন। এই তিন নিত্যলোকের মধ্যে গোলোক সকলের উপরে। গোলোকের দক্ষিণে বৈকুণ্ঠ, আর বামে শিবলোক। সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই গোলোক কেমন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—

গোলকাভ্যন্তরে জ্যোতিরতীব সুমনোহরম্।
নবীন নীরদশ্যামং রক্তপঙ্কজলোচনম্॥
শারদীয় পার্ব্বণেন্দুশোভামুষ্টশুভাননম্।
কোটি কন্দর্পলাবণ্যং লীলাধাম মনোহরম্॥
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং পীতবাসসম্।
সদ্রত্নভূষণৌঘেন ভূষিতং ভক্তবৎসলম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষঃ সম্ভ্রাজৎ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥
সদ্রত্নসাররচিতং কিরীট মুকুটোজ্জ্বলম্।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্॥
তদেব পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্ববীজং সর্ব্বাধারং পরাৎপরম্॥
কিশোরবয়সং শান্তং গোপবেশবিধায়িনম্।
কোটি পূর্ণেন্দুশোভাঢ্যং ভক্তানুগ্রহ কারকম্।
নিরীহং নির্ব্বিকারঞ্চ পরিপূর্ণতমং বিভুম্।
রাসমণ্ডল মধ্যস্থং শান্তং রাসেশ্বরং পরম্॥
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্।
পরমানন্দবীজঞ্চ সত্যমক্ষরমব্যয়ম্।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরং সর্ব্বসিদ্ধিরূপঞ্চ সিদ্ধিদম্।
প্রকৃতেঃ পরমীশানং নির্গুণং নিত্যবিগ্রহম্॥
আদ্যং পুরুষমব্যক্তং পুরুহূতং পুরুষ্টুতং।
সত্যং স্বতন্ত্রমেকঞ্চ পরমাত্মস্বরূপকম্।

ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শান্তাঃ শান্তং তৎ পরমায়ণম্।
এবং রূপং পরং বিভ্রদ্ ভগবানেক এব সঃ।
দিগ্‌ভিশ্চ নভসা সার্দ্ধং শূন্যং বিশ্বং দদর্শ হ॥

গোলকের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে অতি মনোহর নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল, রক্তপদ্মের ন্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ। শরতের পূর্ণচন্দ্রের শোভা তাঁহার মুখশোভার নিকট পরাজিত। তাঁহার লাবণ্যের নিকট কোটি মদনের লাবণ্য পরাজিত। তিনি লীলাধাম ও মনোহর। তিনি দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী, অধরে হাসি, পরিধান পীতবসন। মূল্যবান্ রত্নসমূহে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত, তিনি ভক্তবৎসল। চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত, বক্ষঃদেশ শ্রীবৎস-চিহ্নযুক্ত এবং কৌস্তুভমণি শোভিত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন-রচিত উজ্জ্বল কিরীট ও মুকুট, তিনি রত্ন সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি বনমালা-বিভূষিত। তিনি পরব্রহ্ম, সনাতন ভগবান্। তিনি স্বেচ্ছাময়, সকলের বীজ, সকলের আধার ও পরাৎপর। তিনি কিশোরবয়স, শান্ত, ও গোপবেশধারী। তাঁহার শোভা কোটি পূর্ণেন্দুর শোভার সমতুল্য, তিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহকারী। তিনি নিরীহ, নির্ব্বিকার পরিপূর্ণতম ও বিভু। তিনি রাসমণ্ডলের মধ্যে বিরাজিত, শান্ত, রাসেশ্বর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মঙ্গলদাতা, মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলের দ্বারা পূজ্য। তিনি পরমানন্দের বীজ, সত্য, অক্ষর ও অব্যয়। তিনি সকল সিদ্ধির ঈশ্বর, সকল সিদ্ধিরূপ ও সকল সিদ্ধিদাতা। তিনি প্রকৃতির পরম, ঈশান,—একমাত্র নিয়ন্তা, নির্গুণ এবং তাঁহার বিগ্রহ নিত্য। তিনি আদ্য ও অব্যক্ত পুরুষ, নিখিল যজ্ঞের দ্বারা তিনিই সম্পূজিত। তিনি সত্য, স্বতন্ত্র, এক ও পরমাত্মাস্বরূপ। শান্ত বৈষ্ণবগণ সেই পরমাশ্রয়কে সর্ব্বদা ধ্যান করেন। এই প্রকারের রূপধারী শ্রীভগবান্ একাকী ছিলেন, তিনি দিক্ আকাশ সমস্তই শূন্য দর্শন করিলেন।

২। সমন্বয়—যোগী ও বৈষ্ণব

ইহার পর ভগবানের মনে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা হইবে এবং বিশ্ব ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-সম্বন্ধে আমরা প্রথমে যে কথা বলিয়াছি, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দ্বিভুজ মুরলীধর গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ বৃন্দাবনচন্দ্রকে, পরতত্ত্ব বলিয়া স্থাপনা করা হইয়াছে, কিন্তু

অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা বা অন্য ক্রিয়াকর্ম্ম, কিছুই বর্জ্জন করা হয় নাই, ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বৈশিষ্ট্য। ভক্তিপথের পথিক বৈষ্ণবগণের সহিত যোগীদের মতভেদ ছিল এবং দ্বন্দ্বও ছিল, এখনও যে নাই তাহা নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রারম্ভেই বলিলেন—

বৈষ্ণবা যোগিনঃ সন্তো ন চ ভিন্নাশ্চ শৌনক।

হে শৌনক, বৈষ্ণব ও যোগী ভিন্ন নহে। এই কথা বলার পর পুরাণকার বলিয়াছেন, যাঁহারা যোগী তাঁহারা অজ্ঞান নিবৃত্তির ফলে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইয়া বৈষ্ণব পদবাচ্য হইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথ যে রুচিভেদে ও অধিকারভেদে স্বাভাবিক, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তাহা অতিশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সেই উদার বোধশক্তি নাই—এই কারণে আমরা বন্ধুভাবে মিলিত হইতে পারি না, ভিন্ন ভিন্ন পথ ও ভিন্ন মত লইয়া বিরোধ করিয়া থাকি।

৩। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে বৈষ্ণবপুরাণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল বৈষ্ণব পুরাণ বলিলেই হইবে না, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে, যে মতকে সর্ববিশেষ বৈষ্ণব মত বলিয়া মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সেই মতের প্রচারক। সেই মত—শ্রীবৃন্দাবনের ও শ্রীরাধাগোবিন্দের আরাধনা। বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে অনেক দিন হইতে একটি বাদানুবাদ চলিতেছে। বৈষ্ণব-সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান কোথায়? শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নিজের জীবনের দ্বারা সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণের সম্মান ও পূজা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবদিগের স্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসে ব্রাহ্মণগুরুর শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম, বিশেষতঃ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম, নরনারী সকলকেই ধর্ম্মরাজ্যে উন্নততম অধিকার দান করিয়াছে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হরিভক্তি-সমন্বিত চণ্ডাল, হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ, একথা স্পষ্টভাবেই ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করা ও উপেক্ষা করা বৈষ্ণবধর্ম্মের অভিপ্রায়?

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে অনেকে এই মত প্রচার করিতেছেন। একজন বৈষ্ণব বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণেরা শাক্ত, কারণ তাঁহাদের গায়ত্রী-দীক্ষা হয়। তাঁহারা যখন

শাক্ত, তখন তাঁহাদের বৈষ্ণবী দীক্ষা দান করিবার অধিকার নাই। এই প্রকারের কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে চলিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষা—শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, আর এই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীধরস্বামীর মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং।

আর—

শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান ॥

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে বলিলেন,—এই শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, আর বলিলেন—

গায়ত্র্যাখ্য—ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ।

গায়ত্রী যে ব্রহ্মবিদ্যার নাম, শ্রীমদ্ভাগবত সেই ব্রহ্মবিদ্যা। অতএব মহাপ্রভুর সুস্পষ্ট উপদেশ যদি মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে শক্তি বলিয়া গায়ত্রীকে বা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া ব্রাহ্মণকে, উপেক্ষা করার অধিকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নাই। তবে অন্য কারণে ব্রাহ্মণ বর্জ্জনীয় বা উপেক্ষনীয় হইবেন কিনা, তাহার অবশ্য বিচার চলিতে পারে।

ব্রাহ্মণকে অস্বীকার করিয়া কি জগতে ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে? ইহা একটি খুব বড় প্রশ্ন। বৈষ্ণবমাত্রেরই এবং হিন্দুমাত্রেরই, এ বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে দেশে একদল ব্যবসায়ী সমাজ-সংস্কারকের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা জাতিভেদ প্রথা বাহির হইতে জোর করিয়া তুলিয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য ব্রাহ্মণ-বিরোধী। অনেক বৈষ্ণবও আজকাল মনে করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মও ব্রাহ্মণ-বিরোধী। এই প্রকারের ভ্রান্তমত বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। কি প্রকারে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। দেশের ও সমাজের ইতিহাস একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমান যুগের অনেক শক্তিশালী প্রতিপত্তিকামী লোক, দশজনের মধ্যে একজন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা প্রথমাবস্থায় সমাজসংস্কার-ব্যবসায়িগণের দলে মিশিয়াছেন, সেখানে সুবিধা করিতে পারেন

নাই। শেষে বৈষ্ণব হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিপত্তিকামনাও ছাড়িতে পারেন নাই। আবার এমন ঘটনাও আছে যে চিরদিন গোলামী করিয়া, উপরওয়ালার পদলেহন করিয়া চাকুরী করিয়া সারাজীবন কাটাইয়া, শেষকালে কৌশলের দ্বারা গুরুগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে?

প্রকৃত কথা বুঝিয়া উঠা বেশী কঠিন নহে। বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিবাদ সংস্কারের পক্ষপাতী। প্রত্যেক নরনারী বিকশিত হইবে, তাহার বিকাশের সম্মুখে কোনরূপ কৃত্রিম প্রতিবন্ধক থাকিবে না, সমাজে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় অ-ন্যায্য সুবিধা উপভোগ করিবে না, এই সব কথা যে ভক্তি-ধর্ম্মের অনুমোদিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্য সাধিত হইবে কিরূপে? উত্তর—বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতে। কথাটা বুঝিতে হইলে, একটু ধীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

আমি সংস্কারক ; সমাজের দোষগুলি যাহাতে সংশোধিত হয়, সেজন্য আমি চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু একটা কথা যে আমি প্রায়ই ভুলিয়া যাইতেছি। আমি আমার নিজের দোষ দেখিতে পাই না, আমি আমার নিজের দোষ সংশোধিত করিতে চেষ্টা করি না। এইখানেই প্রকৃত সমস্যা।

সংসারে দুই প্রকার মানুষ আছে। এক বহির্মুখী, আর এক অন্তর্মুখী। যাহারা বহির্মুখী, তাহারা মনে করে—বাহির হইতে সমাজকে সংশোধিত করিব। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। বাহির হইতে চেষ্টা করিয়া যদি একটা দোষ সংশোধিত করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সেই দোষ আর একদিক্ দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। বহির্মুখী মানুষ অহঙ্কারবশতঃ মনে করিবে, দোষ সারিয়া গেল, কিন্তু সেই দোষ যে অন্য জায়গায় অন্য মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, ইহা সে দেখিতে পাইবে না এবং বুঝাইলেও বুঝিতে পারিবে না। যাঁহারা অন্তর্মুখী তাঁহাদের প্রণালী অন্যরূপ। তাঁহারা আত্মার ভূমি হইতে সমুদয় ব্যাপারের চরম অর্থ ও পরম তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। তিনি বলিলেন—প্রত্যেক নরনারী শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসুক। শ্রীভগবানই একমাত্র প্রেমাস্পদ। তিনি সুন্দর, তিনি মধুর। তিনি প্রত্যেক মানুষের আত্মার অন্তর্যামীরূপে রহিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসা কেমন, তাহা কতদূর ঐকান্তিক ও বিপুল হইতে পারে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু

জগতের জীবকে দেখাইয়া গেলেন এবং কি প্রকারে সাধনার দ্বারা এই প্রেমের অনুশীলন করিতে হইবে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রত্যেক নরনারী এই ভজনার অধিকারী। প্রত্যেকে এই পথে অগ্রসর হউক। মানুষ সরল হৃদয়ে এই সাধনপথ আশ্রয় করিলে সামাজিক ব্যবস্থা আপনা আপনি ভিতর হইতে সংশোধিত হইবে। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিমত।

মানুষের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হইলে, বিশ্বব্যবস্থার নিয়মগুলি মানুষ সহজেই বুঝিতে পারিবে। তখন আর কেহ কাহারও নিন্দা করিবে না, কেহ কাহারও দোষ দেখিবে না। আমরা যে কেবল অপরের দোষই দেখি, তাহার গুণ দেখিতেই পাই না। এই কারণে সমাজে হিংসা, নিন্দা, ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি চারিদিকে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সমাজে যত পাপ ও দুর্নীতি আছে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য দায়ী। আমি আমাকে সংশোধিত না করিয়া, আমার ভিতরে যে দোষের ও পাপের বীজ রহিয়াছে, তাহা উন্মূলিত করার জন্য চেষ্টা না করিয়া, বাহিরে অপরের সংস্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। তাহার ফলে জগতের পাপ না কমিয়া দিনের পর দিন কেবলই তাহা বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে একটি উপদেশ আছে—

পরনিন্দা পরিহরি লহ কৃষ্ণনাম।

সমগ্র বৈষ্ণবসাধন এই এক কথার ভিতরে রহিয়াছে। কিন্তু 'পরনিন্দা-পরিহার' কি, কত প্রকারে আমরা পরনিন্দা করিতেছি, তাহা সুগভীর চিন্তার বিষয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে নিম্নরূপ কথা বলিয়াছেন—

দেবং বিপ্রং গুরুং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্ যঃ সুসম্ভ্রমাৎ।
কালসূত্রং ব্রজতি স যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
হরির্ব্রাহ্মণরূপেণ শশ্বদ্ ভ্রমতি ভারতে।
সুকৃতী প্রণমেৎ পুণ্যং ব্রাহ্মণং হরিরূপিণং॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে দেখিয়া যে ব্যক্তি অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত প্রণাম না করে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন তাহাকে কালের প্রভাবে তাড়িত হইয়া ভবচক্রে ঘুরিতে হইবে। হরি, ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতেছেন। যিনি সুকৃতী, তিনি অবশ্য অবশ্য এই হরিরূপী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি প্রধান উপদেশ—"মর্য্যাদালঙ্ঘন" করিবে না। এই উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিলেই, সামাজিক জীবন কিরূপভাবে পরিচালনা করা আবশ্যক তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব।

৪। শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার প্রাচীনতা

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা অনাদিকাল-সিদ্ধ, ইহা চিরদিনই আছে। পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ লোক ইহা পাইতেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এই উপাসনায় সকলকে অধিকার দিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই উপাসনাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছিল, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই পুরাণ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে—

ইদং পুরাণসূত্রঞ্চ পুরা দত্তঞ্চ ব্রহ্মণে।
নিরাময়ে চ গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥
মহাতীর্থে পুষ্করে চ দত্তং ধর্ম্মায় ব্রহ্মণা।
ধর্ম্মেণেদং স্বপুত্রায় প্রীত্যা নারায়ণায় চ ॥
নারায়ণোঽয়ং ভগবান্ প্রদদৌ নারদায় চ।
নারদো ব্যাসদেবায় প্রদদৌ জাহ্নবী তটে ॥
ব্যাসঃ পুরাণসূত্রং তৎ সংব্যস্য বিপুলং মহৎ।
মহ্যং দদৌ সিদ্ধক্ষেত্রে পুণ্যদে সুমনোহরম্ ॥

সিদ্ধক্ষেত্র হইতে সমাগত সৌতি নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণকে বলিলেন—এই পুরাণের সূত্র নিরাময় গোলোকধামে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন। মহাতীর্থ পুষ্করে ব্রহ্মা ইহা ধর্ম্মকে দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম প্রীত হইয়া নিজপুত্র নারায়ণকে ইহা দিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ঋষি নারদকে দিয়াছিলেন। নারদ গঙ্গাতীরে ইহা ব্যাসদেবকে দিয়াছিলেন। ব্যাসদেব সেই পুরাণসূত্র সম্যক্‌রূপে বিস্তারিত করিয়া বিপুলায়ত করেন, এবং এই মহৎ ও সুমনোহর পুরাণ পুণ্যস্থান সিদ্ধক্ষেত্রে আমাকে দান করেন।

৫। শিব ও কৃষ্ণ

ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মতামত আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম হইতে শৈবসম্প্রদায়ের সহিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রীতি ছিল না। এখনও তত্ত্বজ্ঞানহীন অনেক লোক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ করিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক।

শ্রীভগবান্ শিবকে বলিলেন—

অদ্য প্রভৃতি জ্ঞানেন তেজসা বয়সা শিব।
পরাক্রমেণ যশসা মহসা মৎসমো ভব।
প্রাণানামধিকস্ত্বঞ্চ ন ভক্তস্ত্বৎপরো মম॥

হে শিব, তুমি জ্ঞান, তেজ, বয়ঃক্রম ও পরাক্রমে সর্ব্বতোভাবে আমার সমান। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিক, তোমা অপেক্ষা আর বড় ভক্ত আর কেহ নাই।

অনেকে না জানিয়া শিবকে তমোগুণের দেবতা বলিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

পরমাজ্ঞানিনো মূর্খা বদন্তি তামসং শিবম্।

যাহারা পরম অজ্ঞান ও মূর্খ, তাহারাই বলে শিব তামস।

প্রকৃত কথা কি?

রাজসশ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা শিবো বিষ্ণুশ্চ সাত্ত্বিকৌ।
গোলোকনাথঃ কৃষ্ণশ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥

ব্রহ্মা রাজস, শিব ও বিষ্ণু সাত্ত্বিক, আর গোলোকনাথ কৃষ্ণ নির্গুণ ও প্রকৃতির পর।

এই পুরাণে আরও বলা হইয়াছে, যিনি কালাগ্নি রুদ্র, তিনিই তামস এবং তিনি নিখিলের বিনাশকর্ত্তা। এই পুরাণে শিবলিঙ্গ পূজার অশেষ ও অসীম ফল এবং 'শিব,' 'মহাদেব' প্রভৃতি নামগ্রহণের ফল কথিত হইয়াছে। তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, শৈব ও বৈষ্ণবমতের কিরূপ মৈত্রী এই পুরাণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। বিশ্বসৃষ্টি

এইবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করা যাইতেছে।

স্বেচ্ছাময় প্রভু সমুদয় শূন্য দেখিয়া স্বেচ্ছায় সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। পর পর নিম্নলিখিত ক্রমে সৃষ্টি হইল। ১। মূর্ত্তিমন্তস্ত্রয়োগুণাঃ—মূর্ত্তিমান তিন গুণ,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ২। মহত্তত্ত্ব ৩। অহঙ্কার ৪। পঞ্চতন্মাত্রা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ৫। স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ—স্বয়ং প্রভু নারায়ণ। তিনি কেমন?

শ্যামো যুবা পীতবাসা বনমালী চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরঃ স্মেরমুখাম্বুজঃ॥

৬। মহাদেব—বামপার্শ্ব হইতে ইনি আবির্ভূত হইলেন। ইনি কেমন?

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ পঞ্চবক্ত্রো দিগম্বরঃ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভজটাভারধরো বরঃ॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ত্রিশূলপট্টিশধারী জপমালাকরঃ পরঃ॥

৭। ব্রহ্মা—ইনি শ্রীকৃষ্ণের নাভিপঙ্কজ হইতে আবির্ভূত হইলেন। ইনি কেমন?

মহাতপস্বী বৃদ্ধশ্চ কমণ্ডলুধরো বরঃ।
শুক্লবাসা শুক্লদন্তঃ শুক্লকেশশ্চতুর্ভুজঃ॥

৮। ধর্ম্ম—পরমাত্মার বক্ষঃ হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি কেমন?

সস্মিতঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ শুক্লবর্ণো জটাধরঃ।
সর্ব্বসাক্ষী চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
সমঃ সর্ব্বত্র সদয়ো হিংসাকোপবিবর্জ্জিতঃ॥

৯। সরস্বতী—পরমাত্মার মুখ হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি কেমন?

একা দেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী।

১০। মহালক্ষ্মী—শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি কেমন?

একা দেবী গৌরবর্ণা রত্নালঙ্কারভূষিতা।
পীতবস্ত্রপরিধানা সস্মিতা নবযৌবনা॥

১১। মূল প্রকৃতি—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি কেমন?

নিদ্রাতৃষ্ণাক্ষুৎপিপাসাদয়াশ্রদ্ধাক্ষমাদিকাঃ।
তাসাঞ্চ সর্ব্বশক্তিনামীশাধিষ্ঠাত্রীদেবতা॥
ভয়ঙ্করী শতভূজা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
আত্মনঃ শক্তিরূপা সা জগতাং জননীপরা॥
ত্রিশূলশক্তিশার্ঙ্গঞ্চ ধনুঃখড়্গশরাণি চ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মমক্ষমালা কমণ্ডলু॥
বজ্রমঙ্কুশপাশঞ্চ ভুষণ্ডীদণ্ডতোমরম্।
নারায়ণাস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রং রৌদ্রং পাশুপতং তথা।
পার্জ্জন্যং বহ্নিগান্ধর্ব্বং বারুণং বিভ্রতী সতী॥

এই দেবী নিদ্রা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, পিপাসা, দয়া, শ্রদ্ধা, ক্ষমা প্রভৃতি সকল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী। ইনি ভয়ঙ্করী, ইঁহার একশত হস্ত, ইনি দুর্গা এবং দানব কর্ত্তৃক উৎপাদিত বাধা (দুর্গ) ও যাবতীয় ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাকেন। ইনি আত্মার শক্তিরূপা, জগতের পরাজননী। ইনি ত্রিশূল, শক্তি, শার্ঙ্গ, ধনু, খড়্গ, শর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বজ্র, অঙ্কুশ, পাশ, ভুষণ্ডী, দণ্ড, তোমর, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র প্রভৃতি সমন্বিত। [মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর বর্ণনার সহিত এই অংশ তুলনীয়]

১২। সাবিত্রী। শ্রীকৃষ্ণের রসনাগ্র হইতে ইঁহার উৎপত্তি।

১৩। মন্মথ। শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। ইনি মারণ, স্তম্ভন, জৃম্ভণ, শোষণ ও উন্মাদন—এই পঞ্চবাণের দ্বারা সমুদয় কামিজনের মন মন্থন করেন বলিয়া ইঁহার নাম মন্মথ।

মনোমথ্নাতি সর্ব্বেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্।
তন্নাম মন্মথস্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

১৪। রতি। মন্মথের বামপার্শ্ব হইতে ইঁহার উৎপত্তি।

১৫। অগ্নি—মন্মথ ও রতির প্রভাবে ব্রহ্মা হইতে ইঁহার উৎপত্তি।

১৬। বরুণ—অগ্নিকে প্রশমিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখবিন্দু হইতে ইঁহার উৎপত্তি।

১৭। স্বাহা—ইনি অগ্নির পত্নী। অগ্নির বামপার্শ্ব হইতে উদ্ভূতা।

১৮। বারুণী—বরুণের বামপার্শ্ব হইতে উদ্ভূতা।

১৯। বায়ু—বিষ্ণুর নিশ্বাসবায়ু হইতে উদ্ভূত।

২০। বায়বী—বায়ুর বামপার্শ্ব হইতে উদ্ভূত।

২১। বিরাট্-মূর্ত্তি মহাবিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। সহস্র বৎসর পরে তাহা ডিম্বমূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই ডিম্ব হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইঁহার একটি লোমবিবরে বিশ্বের অবস্থান। যত কিছু স্থূল বস্তু আছে, ইনি তাহার মধ্যে স্থূলতম। ইনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ। তিনি সর্ব্বাধার ও সনাতন। তিনি যখন মহার্ণবে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যের জন্ম হয়। ইহারা ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইলে ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের বিনাশ করেন। সেই দৈত্যযুগলের মেদ হইতে মেদিনীর উৎপত্তি।

এই পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ হইতে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইল। এই সৃষ্টি-পর্য্যায়ের শেষ কথা মহাবিষ্ণুর সৃষ্টি। মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব, এবং তাহার পরের সৃষ্টি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সাধিত। পুরাণে সমগ্র সৃষ্টি-পর্য্যায়কে দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্গ ও বিসর্গ। বিসর্গের অপর নাম প্রতিসর্গ। প্রত্যেক পুরাণে সৃষ্টির এই দ্বিবিধ স্তর বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টিকার্য্যের যে অংশ সাধিত হয়, তাহার নাম সর্গ বা তত্ত্বসৃষ্টি। আর ব্রহ্মা হইতে সেই তত্ত্বের অনুবর্ত্তনে যে সৃষ্টি হয়, তাহার নাম বিসর্গ। যিনিই যাহা সৃষ্টি করুন, তত্ত্ব বিশেষের বা ভাবের অনুবর্ত্তনে (According to an Idea or Arche-ype) তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে। সৃষ্টির এই মূল তত্ত্বগুলি শ্রীভগবান্ হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মার মধ্য দিয়া আসিতেছে।

৭। রাসমণ্ডল ও শ্রীরাধা

যাহা হউক, গোলোকবিহারী শ্রীভগবান্ এই সমুদয় সৃষ্টি করিয়া রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। এই রাসমণ্ডল সুরম্য ও অতীব কমনীয়। পূর্ব্বে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন,

তৎসমুদয়কে লইয়া তিনি এই রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। রমণীয় কল্পবৃক্ষসমূহের মধ্যে এই রাসমণ্ডল পরম শোভাময়। সেই রাসমণ্ডল দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ঠিক্ সেই সময়ে

আবির্ব্বভূব কন্যৈকা কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বতঃ।
ধাবিত্বা পুষ্পমানীয় দদাবর্ঘ্যং প্রভোঃ পদে॥
রাসে সম্ভূয় গোলোকে সা দধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভির্দ্বিজোত্তম॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আবির্ব্বভুব প্রাণেভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥

শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে একটি কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। তিনি আবির্ভূত হইয়াই ধাবিত হইলেন, এবং পুষ্প আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্ঘ্যদান করিলেন। রাসে সমদ্ভুত হইয়া হরির সম্মুখে ধাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে 'রাধা' বলিয়া থাকেন। এই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা গরীয়সী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসমূহ হইতে তিনি আবির্ভূত হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার সাহায্যে আমরা রাধাতত্ত্বের ধ্যান করিতে পারি। রূপের ধ্যান ও তত্ত্বের ধ্যান, এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। এই উভয়েরই ধ্যান আবশ্যক। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহার সাহায্যে তত্ত্বের ধ্যান করা যাইতে পারে।

বেদে আছে আনন্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব, আনন্দের আশ্রয়েই বিশ্ব রহিয়াছে, আর আনন্দেই বিশ্বের পরিণতি। বিশ্বের আদি, অন্ত, মধ্য, সবই আনন্দ। আবার বেদে আছে, যিনি সর্ব্বকারণকারণ ও পরমার্থ সত্য, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তাঁহার আনন্দাংশই আমরা জানিতে পারি। আমাদিগকে এই আনন্দ জানিতে হইবে। তাঁহার এই আনন্দ জানিলেই আমরা পূর্ণ ও ধন্য হইব। "ন বিভেতি কুতশ্চন"—আর কোথায়ও কোনরূপ ভয় থাকিবে না। সেই আনন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপের আনন্দ, বিষয়ানন্দ নহে। আমরা যে সেই আনন্দ জানিতে পারিব, আমাদের পক্ষে সেই আনন্দের পরিচয় লাভ যে সম্ভবপর, ইহা কি প্রকারে হইল? যাঁহার আনন্দ বা যিনি স্বয়ং এই আনন্দ, তিনি আপনার গুণে আমাদিগকে এই আনন্দ জানাইয়াছেন বা জানাইতেছেন বলিয়াই

আমাদিগের পক্ষে সেই আনন্দের পরিচয় লাভ সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপের সেই আনন্দ জানাইতেছেন। তিনি তাঁহারই স্বরূপ হইতে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপের সেই আনন্দ জানাইতেছেন। সমগ্র সৃষ্টিপদ্ধতির ইহাই গূঢ়-তত্ত্ব। এই গূঢ়-তত্ত্ব, জীবনের এই চরম ও পরম অভিপ্রায় আমাদিগকে ধ্যানযুক্ত হইয়া অনুভব ও উপলব্ধি করিতে হইবে। এই অনুভূতি ও উপলব্ধিই আমাদের জীবনের সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন।

পূর্ব্বের বর্ণনায় আমরা দেখিলাম—শ্রীভগবান্ ত্রিগুণ হইতে বিরাট্ বা মহাবিষ্ণু পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিলেন। ইহার দ্বারা ভাবরূপে ও বীজরূপে সৃষ্টি-কার্য্য শেষ হইয়া গেল। প্রকৃত কথা, সৃষ্টি শেষ হইবার নহে—সৃষ্টি-প্রবাহ অনন্ত। তবে আমরা ইহার শেষ সীমা কল্পনা করিয়া থাকি, কারণ এই প্রকারের একটা সমাপ্তি বা চরম অবস্থা আমরা অনুমান না করিয়া পারি না। প্রকৃত কথা সমাপ্তি একমাত্র শ্রীভগবানে বা বিভুচৈতন্যেই আছে, অনুচৈতন্যে বা জীবচৈতন্যে তাহা নাই। সৃষ্টি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে শ্রীভগবান্ সকলকে রাসমণ্ডলে লইয়া গেলেন। রাসমণ্ডল অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই ছিল। শ্রীভগবান্ রসরূপ, ইহা বেদের কথা। যে অবস্থায় শ্রীভগবানের স্বরূপের এই রসবস্তু অবাধে প্রকটিত বা পরিব্যক্ত, তাহাই রাসমণ্ডল। এই রাসমণ্ডলেই শ্রীভগবানের স্বরূপের বা প্রাণের যাহা গূঢ়-তত্ত্ব তাহা প্রকাশিত হয় না। অন্যত্র শ্রীভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন—তাহাই সত্য।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া আমি সকলের নিকট প্রকাশিত নহি। এই সমুদয়ের পরম বা শ্রেষ্ঠ যে আমি, মূঢ় সেই আমাকে জানিতে পারে না।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্ব মিদং জগৎ।

ত্রিগুণের দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে।

ইহাই জীবের বা জগতের সাধারণ অবস্থা। এই কারণেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সৃষ্টি বর্ণনার প্রারম্ভেই সর্ব্বপ্রথম ত্রিগুণের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। আপাততঃ জীব ও জগৎ, এই অবস্থায় আছে, ইহা সত্য। কিন্তু চিরকাল এই অবস্থায় রাখা শ্রীভগবানের ইচ্ছা নহে।

তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ। আমরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না। সে জন্ম আমাদের অশেষ ক্লেশ হইতেছে। আমরা যদি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা আর সংসারের বদ্ধজীব হইয়া ত্রিগুণের প্রভাবে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া কর্ম্মডোরে বদ্ধ হইয়া ভবচক্রে বিঘূর্ণিত হইতাম না। তাহা হইলে আমরা শ্রীগোবিন্দের নিত্যদাস হইয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতাম।

পূর্ব্বের বর্ণনায় দেখিলাম, সমুদয় সৃষ্টপদার্থকে তিনি রাসমণ্ডলে লইয়া গেলেন, সকলেই রাসমণ্ডল দেখিলেন ও অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। এই বিস্ময়, জীবচৈতন্যের আত্মলাভের বা পরমার্থপ্রাপ্তির প্রথম সোপান। আমরা লৌকিক জগতে বলিয়া থাকি যাহার বিস্ময় নাই, কৌতূহল নাই, সে মৃত। বিস্ময়ী ও কৌতূহলীর নিকট সত্য প্রকাশিত হয়। যাহার বিস্ময় নাই, কৌতূহল নাই, আগ্রহ নাই, অনুসন্ধান নাই, তাহার প্রাণ নাই, সে মৃত, সে আত্মহত্যার পথে চলিয়াছে। শ্রীভগবানের স্বরূপ চিরবিস্ময়ের বিষয়। তিনি—

সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার লীলাকল্লোলবারিধিঃ।

সর্ব্বপ্রকার অদ্ভুত ও চমৎকার লীলার কল্লোল সেই সমুদ্রের বুকে জাগিতেছে।

শ্রীভগবানের স্বরূপের রসের বা আনন্দস্ফূর্ত্তির দর্শনে নিখিল বিশ্ব বিস্মিত ও মুগ্ধ, নিখিলের সেই বিস্ময়ের মধ্যে, সেই বিস্ময়ের চির উদ্দীপনার হেতুস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা আবির্ভূতা হইলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক নহেন। শ্রীভগবানের ইনি প্রাণরূপা। শ্রীরাধিকা যখন প্রকটিত হইলেন, তখনই ভগবান সত্য করিয়া আমাদের আপনার হইলেন। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির যে ব্যবধান সেই ব্যবধান দূরগত হইল। স্রষ্টার উপর একটি আবরণ ছিল—কোন কোন আচার্য্যের মতে এই আবরণই যোগমায়া—এই আবরণ আজ দূরগত হইল। বিশ্বসৃষ্টির চরম ও পরম অভিপ্রায় আজ ধরা পড়িয়া গেল—শ্রীমতী রাধিকা আবির্ভূতা হইলেন।

এই ব্যাপারটি অবশ্য অত্যন্ত কঠিন ও গূঢ়। কে কাহাকে বুঝায়? অন্তর্য্যামী গুরুরূপে শ্রীভগবান্ প্রত্যেক জীবের ভিতর রহিয়াছেন। বিশ্বস্রষ্টা প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থে পরিপূর্ণরূপে রহিয়াছেন। মানুষকে অন্তর্মুখী হইতে হইবে। অন্তর্মুখী হইয়া ধ্যানযোগে নিজের ভিতরে সেই বিশ্বস্রষ্টা অন্তর্যামীকে অন্বেষণ করিতে হইবে। তাঁহার অভিপ্রায়

কি, তিনিই বলিয়া দিবেন। তাঁহার কথাই সংসারচ্ছেদী। তিনি বলিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

সাধারণভাবে এই ব্যাপার আর এক প্রকার চিন্তাপ্রণালীর মধ্য দিয়া মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। আমি বাঁচিয়া আছি, আমি প্রাণময়। ইহাই আমার নিকট প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান সত্য। মন বলুন, বুদ্ধি বলুন, ইন্দ্রিয় বলুন, দেহ বলুন, প্রাণ আছে তাই ইহারা আছে। আমি বাঁচিয়া আছি, ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই। ইহা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কেহ কেহ মনের দুঃখে বলে—মরিলে বাঁচি। এই কথা মানুষ যখন বলে, তখন সে সত্য করিয়া মরিতে চায় না, ইহা তাহার কথা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সে বলিতেছে—মরিলেই বাঁচি। সে মরিতে চাহিতেছে, কিন্তু মরিবার জন্য নহে—ভাল করিয়া বাঁচিবার জন্য। এই বাঁচা, তাহার পসন্দ হইতেছে না। সে আরও ভাল করিয়া বাঁচিতে চায়। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে, আমরা বাঁচিতে চাই, ভাল করিয়া বাঁচিতে চাই—অর্থাৎ সুখে বাঁচিতে চাই। এই বাঁচিয়া থাকার মূলে একটা সুখ বা আনন্দ আছে। ক্রমে ক্রমে সেই আনন্দ প্রকাশিত হইতেছে। নিত্যজীবন, নিত্যআনন্দ। জীবন সেই নিত্যানন্দের অভিমুখে চলিতেছে। ভগবান্ নিজের প্রাণ দিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। তিল তিল করিয়া তাঁহার অসীম প্রাণ বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই খণ্ড প্রাণগুলিকে তিনি অখণ্ডতায় লইয়া যাইতেছেন—তাঁহার স্বরূপের নিত্যানন্দের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপের এই নিত্যানন্দের বিলাসই শ্রীরাসমণ্ডল, আর শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের ও শ্রীরাসমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী। শ্রীরাধার প্রাকট্য ও রাসমণ্ডল, বিশ্বসৃষ্টির চরম ও পরম অভিপ্রায়। এইভাবে পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীরাধাতত্ত্বের ধ্যান করা যাইতে পারে।

৮। শ্রীরাধার রূপ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার পর শ্রীরাধার রূপ বর্ণিত হইয়াছে।

দেবী ষোড়শবর্ষীয়া নবযৌবনসংযুতা।
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানা সস্মিতা সুমনোহরা॥
সুকোমলাঙ্গী ললিতা সুন্দরীষু চ সুন্দরী।
বৃহন্নিতম্বভারার্ত্তা পীনশ্রোণীপয়োধরা॥

বন্ধুজীবজিতারক্ত সুন্দরোষ্ঠাধরা বরা।
মুক্তাপংক্তিজিতা চারুদন্ত পঙ্ক্ত্যা মনোহরা॥
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুশোভামুষ্ট শুভাননা।
চারুসীমন্তিনী চারুশরৎপঙ্কজলোচনা।
খগেন্দ্রচঞ্চুবিজিতচারুনাসা মনোহরা।
খগগেণ্ডুকবিজিতে গণ্ডযুগ্মে চ বিভ্রতী॥
দধতী চারুকর্ণে চ রত্নাভরণ ভূষিতে।
চন্দনাগুরুকস্তুরীযুক্ত কুঙ্কুমবিন্দুভিঃ॥
সিন্দুরবিন্দুসংযুক্তসুকপোলামনোহরা।
সুসংস্কৃতং কেশপাশং মালতী মাল্যভূষিতম্॥
সুগন্ধ কবরীভারং সুন্দরং দধতী সতী।
স্থলপদ্ম-প্রভামুষ্টং পাদযুগঞ্চ বিভ্রতী॥
গমনং কুর্ব্বতী সা চ হংসখঞ্জনগঞ্জনম্।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণাং বনমালাং মনোহরাম্॥
হারং হীরকনির্ম্মাণং রত্নকেয়ূরকঙ্কণম্।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণং পাশকং সুমনোরমম্॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং কণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্।
নানাপ্রকারচিত্রাঢ্যং সুন্দরং পরিবিভ্রতী॥

৯। শ্রীরাধাও ব্রজগোপী

এই শ্রীরাধা। তিনি গোবিন্দকে সম্ভাষণ করিয়া শ্রীগোবিন্দের মুখপঙ্কজের প্রতি হাস্যমুখে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখপঙ্কজের প্রতি বিহ্বলভাবে চাহিয়া থাকিবার সময় শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে গোপাঙ্গনাগণ আবির্ভূতা হইলেন। ইঁহারা রূপে ও বেশে প্রায়ই শ্রীরাধার ন্যায়। ইঁহারা সকলেই স্থিরযৌবনা। গোলোকে গোপিকাগণের সংখ্যা লক্ষকোটি, অসংখ্য বলিলেই হয়। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদের বয়স ও বেশ, শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সমতুল্য। ইঁহাদের সকলেরই মূর্ত্তি মনোহর ও অতীব কমনীয়। ইঁহাদের সংখ্যা ত্রিশকোটি। তাহার পর

শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে নানাবর্ণ গো আবির্ভূত হইল। বলীবর্দ্দ, সুরভি, বৎস, কামধেনু, দেখিতে পরম সুন্দর। ইহাদের মধ্যে একটি বলিবর্দ্দের বল কোটিসিংহের সমতুল্য। শ্রীকৃষ্ণ এই বলীবর্দ্দটি বাহন করিবার জন্য শিবকে দিলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের নখশ্রেণী হইতে হংস ও হংসীগণ আবির্ভূত হইল। এই হংসগণের মধ্য হইতে একটি রাজহংস শ্রীকৃষ্ণ বাহন করিবার জন্য ব্রহ্মাকে দান করিলেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামকর্ণের বিবর হইতে শ্বেতবর্ণ অশ্বসমূহ আবির্ভূত হইল। শ্রীকৃষ্ণ একটি শ্বেত অশ্ব বাহন করিবার জন্য ধর্ম্মকে দান করিলেন। দক্ষিণ কর্ণের বিবর হইতে সিংহগণের আবির্ভাব হইল। একটি সিংহ, ভগবান্ বাহন করিবার জন্য প্রকৃতিকে দান করিলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ পাঁচখানি রথ সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর কুবের, তাঁহার পত্নী ও অনুচরগণের উৎপত্তি হইল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল আদি দেবযোনি, ভগবানের গুহ্যদেশ হইতে আবির্ভূত হইল। তাঁহার মুখকমল হইতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালশোভিত, পীতবস্ত্রপরিধান, শ্যামবর্ণ ও চতুর্ভুজ, কিরীট, কুণ্ডল ও রত্নভূষণভূষিত পার্ষদগণ আবির্ভূত হইলেন। এই পার্ষদগণ নারায়ণকে দেওয়া হইল। কুবের গুহ্যকগণকে পাইলেন, শঙ্কর ভূতগণকে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ ও দক্ষিণ চক্ষু হইতে ভৈরবগণের উৎপত্তি হইল। বামনেত্র হইতে দিক্‌পালগণের অধীশ্বর দিগম্বর ঈশানের আবির্ভাব। অতঃপর ডাকিনী যোগিনী, ক্ষেত্রপাল, দেবস্ত্রী প্রভৃতির জন্ম। ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সৃষ্টিতত্ত্ব।

৯। পঞ্চপ্রকৃতি

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রথম খণ্ডের নাম ব্রহ্মখণ্ড। ঐ খণ্ডে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা বলা হইল। এইবার দ্বিতীয় খণ্ড আলোচনা করা যাইতেছে। দ্বিতীয়খণ্ডের নাম প্রকৃতিখণ্ড। এই খণ্ডের প্রথমেই বলা হইল—প্রকৃতি পঞ্চধা। পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করিতেছেন।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃপঞ্চধা স্মৃতা॥

গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী সৃষ্টিবিধানে প্রকৃতির এই পঞ্চরূপ।

প্রকৃতির পঞ্চরূপ বুঝিবার পূর্ব্বে, প্রকৃতি কি তাহাই দেখা যাউক। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেই আমরা তাহার উত্তর পাইব।

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃসাপ্রকীর্ত্তিতা॥
গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসিকৃশ্চ তিশব্দস্তমসি স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানং সৃষ্টিকারণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥

'প্র' কথার অর্থ প্রকৃষ্ট, আর 'কৃতি' শব্দে সৃষ্টি বুঝায়; অতএব সৃষ্টিকার্য্যে যে দেবী প্রকৃষ্টা বা সর্ব্বপ্রধানা তিনি প্রকৃতি। বেদে আছে, প্র-শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট সত্বগুণ, 'কৃ' বলিতে বুঝায় রজোগুণ, আর 'তি' তমোগুণ। যিনি ত্রিগুণাত্মস্বরূপা ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা, এবং সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানা, তিনি প্রকৃতি। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রথম, 'কৃতি' শব্দের অর্থ সৃষ্টি। যে দেবী সৃষ্টির আদ্যা, তিনি প্রকৃতি।

বিশ্বে যাহা কিছু আমরা অনুভব করিতেছি, সমস্তই শক্তির খেলা। এই শক্তির যিনি সমষ্টি তিনি প্রকৃতি। The sum-total of the cosmic forces. শক্তি মূলে এক, তিনি বহুমূর্ত্তি ধরিয়া ক্রিয়া করিতেছেন। বৈষ্ণব-দর্শনে এই শক্তিকে অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি, ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, এই তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শক্তির ক্রিয়ার রহস্য আমাদিগকে জানিতে হইবে, এই শক্তির আনুগত্য করিয়া এই শক্তিকে প্রসন্ন করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদের কল্যাণ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে—

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

এই মহাশক্তি প্রসন্না ও বরদা হইয়া জীবসকলের মুক্তির বা পরমমঙ্গলের হেতুভূতা হইয়া থাকেন। যিনি শক্তিমান্ তিনি পুরুষ, সর্ব্বশক্তি যাঁহার তিনি আদ্য পুরুষ। প্রকৃতি বা শক্তির সাহায্যেই আমরা পুরুষের পরিচয় পাই। সেই পুরুষকে ধরিতে বা বুঝিতে অন্য কোন উপায় নাই।

এইবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শক্তি-কথা বা প্রকৃতি-কথা আলোচনা করা যাউক। এই কথারও শেষে আমরা শ্রীরাধাতত্ত্বের পরিচয় পাইব।

যিনি আদ্যপুরুষ তিনিই পরমাত্মা শ্রীভগবান্। তিনি তাঁহার অচিন্ত্য যোগশক্তির দ্বারা আপনাকে দুই অংশে ভাগ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ অংশ পুরুষ আর বাম অংশ প্রকৃতি। অগ্নি এবং তাহার জ্বালা বা দাহিকাশক্তি যেমন, এই পুরুষ, ও প্রকৃতি, ঠিক্ তেমনই। ইঁহারা সত্য করিয়া কখনই পৃথক্ নহেন। যেখানে পুরুষ সেইখানে প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ। পুরুষ ও প্রকৃতির যে পার্থক্য দেখা যায়, ইহা কেবল আমাদের চিন্তার সুবিধার জন্য। এই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা মায়া, নিত্যা ও সনাতনী।

স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টির ইচ্ছাবশতঃ ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি আবির্ভূতা হইলেন। সৃষ্টিকার্য্যের ভেদনিবন্ধন—সৃষ্টিকর্ম্মণি ভেদতঃ, অথবা ভক্তের অনুরোধে—ভক্তানুরোধাদ্বা—ভক্তানুগ্রহকারিণী সেই দেবী পঞ্চ ভাগে বিভক্তা হইলেন।

১। গণেশমাতা দুর্গা। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী।

২। লক্ষ্মী। তিনি শুদ্ধ সত্বস্বরূপা, 'সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা।' তিথি সর্ব্বশস্যস্বরূপা, ও সর্ব্ববিধ জীবনোপায়ারূপিণী। মহালক্ষ্মী, স্বর্গলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী ও গৃহলক্ষ্মীরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন। সকল প্রাণীতে এবং সকলদ্রব্যে তিনি শোভারূপা পুণ্যবান্ ব্যক্তিতে তিনি প্রীতি, নৃপতিতে তিনি প্রভা, বণিকে বাণিজ্যরূপা।

৩। সরস্বতী। তিনি বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিদেবতা ও সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপা। সুবুদ্ধি, কবিতা, মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতি সজ্জনগণ এই দেবীর কৃপায় পাইয়া থাকেন। তিনি আবার

সর্ব্বসঙ্গীতসন্ধানতালকারণরূপিণী।

তিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী, হরির প্রিয়তমা পত্নী॥

হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।

জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্নমালয়া॥

তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী।

সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাসদা॥

তিনি হিম, চন্দন, কুন্দফুল, চন্দ্র, কুমুদ ও শ্বেতপদ্মের ন্যায় অঙ্গকান্তিসম্পন্না। তিনি রত্নমালার দ্বারা সর্ব্বদাই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। তিনি তপঃস্বরূপা, তপস্যার ফলদাত্রী, সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা এবং সর্ব্বদা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন।

৪। সাবিত্রী। তিনি চারিবেদ, বেদাঙ্গ ও ছন্দসমূহের মাতৃস্বরূপা। সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি ক্রিয়ামন্ত্রের ও তন্ত্রাদির তিনি মাতা। তিনি ব্রাহ্মতেজোময়ী।

৫। শ্রীরাধিকা।

প্রেমপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণ স্বরূপিণী।
প্রাণাধিক প্রিয়তমা সর্ব্বাদ্যা সুন্দরী বরা॥
সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তা চ মানিনী গৌরবান্বিতা।
বামার্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা চ গুণেন তেজসাসমা॥
পরাবরা সর্ব্বব্রতা পরমাত্মা সনাতনী।
পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা॥
রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা॥
রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসবাসনিবাসিনী।
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা॥
পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী।
নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী॥

ইনি প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পঞ্চবিধ প্রাণস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা ও প্রিয়তমা, সকলের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সমুদয় সৌভাগ্যসম্পন্না, মানিনী, গৌরবান্বিতা, শ্রীকৃষ্ণের বাম অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা, গুণে ও তেজে শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য। তিনি পরাবরা —সগুণা ও নির্গুণা, সর্ব্বব্রত বা সর্ব্ববিধ সেবানিরতা, পরমাত্মা ও সনাতনী। তিনি পরমানন্দরূপা, ধন্যা, মান্যা ও পূজিতা। তিনি রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাসমণ্ডলসম্ভূতা ও রাসমণ্ডলমণ্ডিতা অর্থাৎ রাসমণ্ডলের কেন্দ্র বা শৃঙ্খল-স্বরূপা। রাসেশ্বরী, সুরসিকা, রাসাবাসনিবাসিনী। তিনি গোলোকবাসিনী ও গোপীবেশবিধায়িকা। তিনি পরমাহ্লাদরূপা, সন্তোষ ও হর্ষরূপিণী, নির্গুণা, নিরাকারা, আত্মস্বরূপা ও নির্লিপ্তা।

তাহার পর, ভক্তগণকে কৃষ্ণদাস্য দান করিবার সামর্থ্য একমাত্র তাঁহারই আছে। তিনি বারাহকল্পে বৃকভানু-সুতারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইনিই পঞ্চমী প্রকৃতি।

এই স্থলে বারাহকল্প কি, জানা আবশ্যক। ব্রাহ্ম, বারাহ ও পাদ্মভেদে কল্প ত্রিবিধ। ব্রহ্মার পরমায়ুকালকেই কল্প বলা যায়, আবার ব্রহ্মার একদিনের নাম ও কল্প। মার্কণ্ডেয় মুনি সপ্তকল্পান্তজীবী। এই কল্প ব্রহ্মার পরমায়ু নহে, ব্রহ্মার দিন। ব্রাহ্মকল্পে বিধাতা মধু ও কৈটভ, এই দৈত্যযুগলের মেদদ্বারা মেদিনীকে সৃষ্টি করিয়া পরে অন্য সব সৃষ্টি করিয়াছেন। বারাহকল্পে বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা পৃথিবীকে রসাতল হইতে উত্তোলন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পাদ্মকল্পে বিষ্ণুর নাভিকমলে বসিয়া সমুদয় লোক সৃজন করিয়াছেন। এখন শ্বেতবারাহকল্প চলিতেছে। এই কল্প অবশ্য ব্রহ্মার দিন। পুরাণের এই কল্পতত্ত্ব অত্যন্ত কঠিন।

পূর্ব্বে যে পঞ্চপ্রকৃতির কথা বলা হইল, তাহার প্রথমটি অর্থাৎ গণেশজননী শক্তি বিস্তারিণী শক্তি। দ্বিতীয় লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্য ও ভোগশক্তি, তৃতীয় সরস্বতী বিদ্যাশক্তি, চতুর্থ সাবিত্রী ব্রহ্মতেজঃশক্তি, আর পঞ্চম শ্রীরাধা প্রেমশক্তি। এইভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই যে পঞ্চশক্তি বা প্রকৃতির পঞ্চমূর্ত্তি ইহারা স্বরূপতঃ পৃথক্ নহে, একই মহাশক্তি বা মূলপ্রকৃতি লীলায় বা বিশ্বব্যবস্থায় প্রকাশের অনুরোধে এই পঞ্চমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাঁচে এক, একে পাঁচ, শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে এই সত্য যিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহারই সত্যবোধ হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের এই ঐক্য ও বহুত্ব একই সঙ্গে বুঝাইবার জন্য বৈষ্ণবসাধনায় ও শক্তিসাধনায় নানারূপ ব্যবস্থা আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইস্থানে শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আছে, তাহাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দেবী ব্রহ্মাদির দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহেন, অথচ সমুদয় জগৎ তাঁহাকে জানিতেছেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে রহিয়াছেন। ব্রহ্মা তাঁহার শ্রীচরণের দর্শন লাভ করিবার জন্য ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া স্বপ্নেও দেখিতে পান নাই। কিন্তু বৃন্দাবনে সমুদয় লোক তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। মূল শ্লোকগুলি এই—

যৎপাদপদ্মসংস্পর্শপবিত্রা চ বসুন্ধরা।
ব্রহ্মাদিভিরদৃষ্টা যা সর্ব্বদৃষ্টা চ ভারতে।
স্ত্রীরত্নসারসম্ভূতা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
তথা ঘনে নবঘনে লোলা সৌদামিনী মুখে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রানি প্রতপ্তং ব্রহ্মণা পুরা।
তৎপাদপদ্মনখরদৃষ্টয়ে চাত্মশুদ্ধয়ে।
ন চ দৃষ্টঞ্চ স্বপ্নেঽপি প্রত্যক্ষস্যাপি চা কথা॥
তেনৈব তপসা দৃষ্টা ভুবি বৃন্দাবন বনে॥

এই পঞ্চপ্রকৃতির কথা বলার পর বলা হইয়াছে, যাবতীয় দেবীগণ ও নারীগণ, কেহ সেই প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্না, কেহ তাঁহার কলা হইতে উৎপন্না, কেহবা কলাংশের কলা হইতে উৎপন্না।

তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গা, তুলসী, মনসা, দেবসেনা বা ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, কালী, স্বাহা, দক্ষিণা, স্বধা, স্বস্তি, পুষ্টি, সম্পত্তি, ক্ষমা, রতি, দয়া, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, মিথ্যা, শান্তি, লজ্জা, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, মূর্ত্তি, নিদ্রা প্রভৃতি শক্তির কথা বলিয়া কে কোন্ শক্তিকে পূজা করিয়াছে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

১০। শ্রীরাধার পূজা

শ্রীরাধার পূজাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

প্রথমে পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে।
পৌর্ণমাস্যাং কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেন পরমাত্মন॥
গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ।
গবাং গণৈঃ সুরগণৈস্তৎপশ্চান্মায়য়া হরেঃ॥
তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্মুনিভির্মনুভিস্তথা।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা॥
পৃথিব্যাং প্রথমে দেবী সুযজ্ঞেন চ পূজিতা।
শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে॥
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সুরৈঃ॥

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সর্ব্বপ্রথম গোলোকে রাসমণ্ডলে রমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধা পূজিতা হন। তাহার পর গোপিকাগণ, গোপগণ, বালিকাগণ, বালকগণ, গোগণ, দেবগণ তাঁহার পূজা করেন। তাহার পর হরির মায়া। তাহার পর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, মনুগণ কর্ত্তৃক পুষ্প ও ধূপাদির দ্বারা তিনি পূজিতা ও বন্দিতা হন। পৃথিবীতে শঙ্কর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সুযজ্ঞ তাঁহার প্রথম পূজা করেন। তাহার পর পরমাত্মার আজ্ঞায় তিন লোকে পুষ্প ধূপ প্রভৃতির দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক মুনিগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা হইলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ। শ্রীমতী রাধিকা এই রাসলীলার সঙ্গিনী। এই রাসলীলারই ফলে বরুণাদি দেবতা, ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট পুরুষের উৎপত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতী দেবীকে বৈকুণ্ঠপতি চতুর্ভুজধারী নারায়ণের নিকট প্রেরণ করিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন—আমি সকলের ঈশ্বর, সকলকেই শাসন করিতে সক্ষম; কিন্তু আমার শ্রীরাধাকে শাসন করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীরাধা, তেজে রূপে ও গুণে আমার সমান। তিনি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোন্ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতে পারে? প্রাণ হইতে কেহই প্রিয় নহে।

সর্ব্বেশঃ সর্ব্বশাস্তাহং রাধাং বাধিতুমক্ষমঃ।
তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ।
প্রাণতোঽপি প্রিয়ঃ কুত্র কেষাং বাস্তি কশ্চন॥

১১। শ্রীরাধার তপস্যা

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিদেবতা ও শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গসম্ভূতা শ্রীরাধিকার তপস্যা-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নিম্নরূপ কথিত হইয়াছে—

তপশ্চকার সা পূর্ব্বং শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে।
দিব্যং যুগসহস্রঞ্চ নিরাহারা কৃশা সতী॥
কৃশাং নিশ্বাসরহিতাং দৃষ্ট্বা চন্দ্রকলোপমাম্।
কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে কৃত্বা রুরোদ কৃপয়া বিভুঃ॥

বরং তস্মৈ দদৌ সারং সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্।
মম বক্ষঃস্থলে তিষ্ঠ ময়ি তে ভক্তিরস্থিতি॥
সৌভাগ্যেন চ মানেন প্রেম্ণা চ গৌরবেণ চ।
ত্বং মে শ্রেষ্ঠা চ প্রেষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ সর্ব্বযোষিতাম্॥
বরিষ্ঠা চ গরিষ্ঠা চ সংস্তুতা পূজিতা ময়া।
সন্ততং তব সাধ্যোঽহং বাধ্যশ্চ প্রাণবল্লভে॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথশ্চকার চেতনাং ততঃ।
সপত্নীরহিতাং তাঞ্চ চকার প্রাণবল্লভাম্॥

তিনি পূর্ব্বে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে দৈব সহস্রযুগ পর্য্যন্ত সময় কৃশাঙ্গী হইয়া অনাহারে তপস্যা করিয়াছিলেন। ক্ষীণচন্দ্রের কলার ন্যায় শ্রীরাধার এই নিশ্বাসরহিত ও কৃশ অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আপনার বক্ষঃদেশে গ্রহণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ সকলের দুর্ল্লভ এই সার বর তাঁহাকে প্রদান করিলেন—"তুমি আমার বক্ষঃস্থলেই সর্ব্বদা বাস কর, তোমার ভক্তি আমাতেই স্থির হউক। সৌভাগ্য, মান, প্রেম ও গৌরবে তুমই আমার সর্ব্বনারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, প্রিয়তমা ও জ্যেষ্ঠা। তুমি বরিষ্ঠা, গরিষ্ঠা, সংস্তুতা ও পূজিতা। আমি সর্ব্বদাই তোমার বশীভূত ও আরাধ্য হইব"। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চৈতন্য উৎপাদন করিলেন ও তাঁহাকে সপত্নীশূন্যা প্রাণবল্লভা করিলেন।

১২। গঙ্গা ও রাধা

গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি-প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধাকৃষ্ণকথা কথিত হইয়াছে। ঘটনাটি এই—কার্ত্তিকমাস, পূর্ণিমা; আজ রাধামহোৎসব। গোলোকে শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধিকার পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি ঋষিগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে শ্রীরাধার পূজা করিলেন। তাহার পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল। দেবী সরস্বতী বীণায় ঝঙ্কার দিয়া সুললিত তানে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত-মাধুরীতে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তাহার পর স্বয়ং মহাদেব সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। শিবের সঙ্গীতে দেবগণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সকলেই চাহিয়া দেখিলেন, রাসমণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাই, সমগ্র রাসমণ্ডল একেবারে

জলাকীর্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদর্শনে সকলেই নিরতিশয় ব্যাকুল। ব্রহ্মা ধ্যানযুক্ত হইয়া বুঝিলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গলিয়া গিয়াছেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ কাতর-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দৈববাণী হইল। অলক্ষ্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে দেবগণ, তোমরা যদি পুনরায় আমাকে দেখিতে চাও, তাহা হইলে মহাদেব শাস্ত্র ও বেদাঙ্গ প্রণয়ন করুন। সেই শাস্ত্রে মন্ত্র, পূজাবিধি, স্তব, ধ্যান ও কবচাদি থাকিবে। ভক্তগণ সেই শাস্ত্রের উপদেশমত আমার উপাসনা করিবে, তাহা হইলে তোমরা আবার দর্শন পাইবে।' শিব গঙ্গাজল হস্তে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন। কালক্রমে শম্ভু শাস্ত্রসমূহ প্রকাশিত করিলেন। গোলোকে এই প্রকারে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হইল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কথা এই—একদিন গঙ্গাদেবী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে গোপীগণসহ শ্রীরাধিকা তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা মধুরবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"প্রাণনাথ, তোমার পার্শ্বে ঐ সুন্দরী কে? কপট! তুমি গোলোক হইতে চলিয়া যাও, নতুবা তোমার মঙ্গল নাই।"

তাহার পর শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিলেন—

১। আমি দেখিয়াছি, চন্দনকাননে তুমি বিরজার সহিত মিলিত হইয়াছিলে। সখীগণের কথায় তোমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, বিরজার সহিত যখন মিলিত হইয়াছিলে, তখন তুমি আমাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলে। বিরজা ভয়ে নিজের দেহ ছাড়িয়া নদী হইয়া গেল। বিরজা কোটি যোজন বিস্তীর্ণা, দৈর্ঘ্য তাহার চতুর্গুণ। বিরজা আজিও নদীরূপে রহিয়াছে। আমি চলিয়া গেলে তুমি গোপনে বিরজার তীরে গিয়া কাতরস্বরে বিরজাকে ডাকিতে লাগিলে। বিরজা সিদ্ধযোগিনী। তোমার আহ্বানে সুন্দর ও সুবেশপরিহিত মূর্ত্তি লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই বিরজা হইতে সপ্ত সমুদ্রের উৎপত্তি। সে কথা কি তোমার মনে নাই?

২। চম্পকবনে তুমি শোভানাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলে। আমি আসিবামাত্রই শোভা ভয়ে দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে পলাইয়া গেল। তাহার শরীর সুস্নিগ্ধ তেজে পরিণত হইল। তুমি সেই তেজঃ বিভাগ করিয়া কিছু কিছু করিয়া রত্নে, স্বর্ণে, মণিতে, স্ত্রীলোকের মুখে, উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, রৌপ্যে, চন্দনে, জলে, পুষ্পে,

পল্লবে, ফলে, শস্তে, দেবগৃহে, রাজপ্রাসাদে রাখিয়া দিলে। সে কথা কি তোমার মনে নাই ?

৩। তুমি বৃন্দাবনের বনমধ্যে প্রভানাম্নী গোপীর সহিত মিলিত হইয়াছিলে। আমি আসিবামাত্রই তুমি অন্তর্হিত হইলে। প্রভা দেহত্যাগ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে পলাইয়া গেল। তাহার দেহ তীব্র তেজে পরিণত হইল। তুমি প্রেমে রোদন করিয়া সেই তেজঃ নিজের বক্ষে গ্রহণ করিলে, তাহার পর আমার ভয়ে ও লজ্জায় বিভাগ করিয়া কিছু কিছু করিয়া অগ্নিতে, রাজাতে, পুরুষে, দেবতায়, দস্যুতে, নাগে, ব্রাহ্মণে, মুনিতে, তপস্বীতে, সৌভাগ্যবতী নারীতে, ও যশস্বীব্যক্তিতে রাখিয়া দিলে, তাহা কি তোমার মনে নাই ?

৪। তুমি রাসমণ্ডলে বসন্তকালে রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্নমন্দিরে শান্তি নাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলে। আমার আগমনমাত্রেই তুমি অন্তর্হিতা হইয়াছিলে; আর শান্তি দেহত্যাগ করিয়া তোমাতেই লীনা হইয়াছিল। তুমি রোদন করিতে করিতে তাহাকে বিভক্ত করিয়া অনাসক্ত ব্যক্তিতে, সত্বরূপ বিষ্ণুতে, শুদ্ধসত্বরূপিণী লক্ষ্মীতে, তোমার মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণে, তপস্বীতে, ধর্ম্মে ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে তাহাকে রাখিয়া দিলে। তাহা কি তোমার মনে নাই ?

৫। তুমি ক্ষমানাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে। আমি তোমাদিগকে জাগরিত করাইয়াছিলাম। তাহা কি তোমার মনে নাই ? আমি তোমার পীতবসন, মনোহর মুরলী, বনমালা, কৌস্তুভমণি, রত্নকুণ্ডল প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু সখীদের একান্ত অনুরোধে আবার ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। তোমাদের সেই অবস্থায় দেখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি লজ্জায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলে। আজও তোমার বর্ণ সেই কারণে কৃষ্ণ। ক্ষমা, লজ্জায় শরীর ছাড়িয়া পৃথিবীতে গিয়াছিল এবং শ্রেষ্ঠগুণে পরিণত হইয়াছিল। তুমি তাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া রোদন করিতে করিতে বিষ্ণুতে, বৈষ্ণবে, ধর্ম্মে ধার্ম্মিক ব্যক্তিতে, কিছু দুর্ব্বল ব্যক্তিতে, তপস্বীতে, দেবতায়, ও পণ্ডিতে তাহাকে ভাগ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলে। আর কি বলিব, তোমার এই প্রকারের বহুগুণ আমার জানা আছে।

এই সময়ে সিদ্ধযোগিনী গঙ্গাদেবী যোগবলে বুঝিলেন যে, শ্রীরাধিকা তাঁহাকে

গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছেন। তখন আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গা গোপনে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধা গোলোক, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থান অন্বেষণ করিয়া গঙ্গাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। গঙ্গার এই আত্মগোপনের ফলে ব্রহ্মাণ্ডে জলাভাব উপস্থিত। ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মনু, মানব, সিদ্ধতাপস প্রভৃতি সকলেই শুষ্ককণ্ঠে গোলোকে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করার পর তাঁহারা দেখিলেন—

জ্যোতির্ম্ময়ং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণচিত্রসিংহাসনস্থিতম্॥
সেব্যমানঞ্চ গোপালৈঃ শ্বেতচামরবায়ুনা।
গোপালিকানৃত্যগীতং পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা॥
পরিতো ব্যাবৃতং শশ্বদ্গোপৈশ্চ শতকোটিভিঃ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্॥
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং পীতবাসসম্।
যথাদ্বাদশবর্ষীয়বালং গোপালরূপিণম্॥
কোটিচন্দ্রপ্রভামুষ্ট-পুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহম্।
স্বতেজসা পরিবৃতং সুখদৃশ্যং মনোহরম্॥
কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যলীলালাবণ্যধামকম্।
দৃশ্যমানঞ্চ গোপীভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সন্ততম্॥
ভূষণৈর্ভূষিতাভিশ্চ রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতৈঃ।
পিবন্তীভির্লোচনাভ্যাং মুখচন্দ্রং প্রভোর্মুদা॥
প্রাণাধিকপ্রিয়তমরাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্।
তয়া প্রদত্তং তাম্বূলং ভক্তবন্তং সুবাসিতম্॥

জ্যোতির্ম্ময় পরম ব্রহ্ম, সকল কারণের কারণস্বরূপ। অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত বিচিত্র সিংহাসনে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। গোপালগণ শ্বেতচামরবীজনের দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছেন। তিনি আনন্দিত হৃদয়ে হাস্যবদনে গোপালিকা নৃত্য দর্শন করিতেছেন ও গীত শ্রবণ করিতেছেন। শতকোটি গোপগণ কর্তৃক তিনি সকল সময়েই

পরিব্যাপ্ত। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও রত্নভূষণভূষিত। তাঁহার অঙ্গ নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল, তাঁহার বয়স কিশোর, পরিধান পীতবস্ত্র, তিনি গোপবালকমূর্ত্তি, দেখিয়া মনে হয় দ্বাদশ বর্ষীয় বালক। কোটিচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গের প্রভা ও শ্রী। তিনি আপনার তেজের ছটায় আবৃত, সুখদৃশ্যও মনোহর। তিনি কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্যলীলা ও লাবণ্যের ধামস্বরূপ। হাস্যবদনা গোপবালাগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। এই গোপবালাগণ রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র চক্ষুদ্বারা পান করিতেছে। প্রাণের অধিক প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকার বক্ষঃস্থলে তিনি রহিয়াছেন এবং শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাম্বুল তিনি ভোজন করিতেছেন।

রাসমণ্ডলের সকল স্থানেই দেবগণ এইরূপ দর্শন করিলেন। দেবগণের অনুরোধে সকলের অভিলষিত বিষয় প্রভুকে বলিবার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন—তাঁহার দক্ষিণ ভাগে বিষ্ণু আর বামভাগে বামদেব। তাহার পর যেন রাসমণ্ডল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সকলেই দেখিলেন উহা কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে। এক কৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সকল মূর্ত্তিই দ্বিভুজমুরলীধর, বনমালাভূষিত, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, বক্ষে কৌস্তুভমণি। সকলেই একরূপ। কৃষ্ণ কখন জ্যোতির্ম্ময়, কখন মূর্ত্তিমান, কখন নিরাকার, কখন সাকার। একবার দেখা যাইতেছে, এককৃষ্ণ এক রাধাসহ রহিয়াছেন, কখন প্রত্যেক কৃষ্ণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রাধা। কখন কৃষ্ণ, রাধারূপ ধারণ করিতেছেন, কখন রাধা কৃষ্ণরূপ ধারণ করিতেছেন, কে স্ত্রী, কে পুরুষ, ভগবান্ পুরুষ কি নারী, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এইপ্রকারে রাসমণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, শেষে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—গঙ্গাদেবী ভয়ে আমার চরণে লুকাইয়া আছেন। শ্রীরাধা তাঁহাকে গণ্ডুষে পান করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, সেইজন্য তিনি লুকায়িত। ব্রহ্মা তখন শ্রীরাধার স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃতা হইলেন। গঙ্গাদেবী নির্ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বাহির হইলেন, ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ জল কমণ্ডলুতে গ্রহণ করিলেন, চন্দ্রশেখর মস্তকস্থিত চন্দ্রার্দ্ধে কিঞ্চিৎ জল ধারণ করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা গঙ্গাকে রাধিকা-মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ,

পূজাবিধি, ধ্যান এবং সামবেদোক্ত পুরশ্চরণক্রম উপদেশ করিলেন। গঙ্গাদেবীও শ্রীরাধিকাকে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরাধা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এখানে মহাদেব বলিতেছেন, আর দেবী পার্ব্বতী শুনিতেছেন। পার্ব্বতী দেবী বলিতেছেন—বেদবাক্যে আপনার মুখে বিস্তারিতরূপে শ্রীরাধার প্রশংসা শুনিয়াছি। বেদের কাণ্বশাখায় এই প্রশংসা আছে।

শ্রুতৌ শ্রুতং প্রশংসা চ রাধায়াশ্চ সমাগতঃ।
তন্মুখাৎ কাণ্বশাখায়াং ব্যাসেন তাবতাধুনা॥

কিন্তু আগম বা তন্ত্র বলিবার সময় শ্রীরাধার কথা কিছুই বলেন নাই, তবে সেই সময়ে আপনি বলিয়াছিলেন, ইহার পর বলিব। এখন আপনি আমাকে সেই কথা বলুন।

পার্ব্বতীর এই অনুরোধে শিব শ্রীরাধাতত্ত্ব তাঁহাকে সমুদয় বলিলেন। প্রারম্ভে বলিলেন,—আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদেশ পাইয়াছি, তাই এই সব কথা তোমাকে বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ব্যতীত একথা বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের রিরংসা বা রমণেচ্ছাই শ্রীরাধার উদ্ভবের হেতু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আরাধনা করেন, উভয়েই সমান।

রাধা ভজতি শ্রীকৃষ্ণং স চ তাঞ্চ পরস্পরম্।
উভয়োঃ সর্ব্বসাম্যঞ্চ সদা সন্তো বদন্তি চ॥
রা-শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্লভাম্।
ধা-শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পরম্॥

'রা' এই শব্দ উচ্চারণমাত্রেই ভক্তগণ সুদুর্ল্লভ মুক্তিপদ লাভ করেন, ধা-শব্দ উচ্চারণমাত্রেই হরির পদে ধাবিত হন।

যাবতীয় দেবী শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে উৎপন্না। চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রিয়তমা মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠবাসিনী, শ্রীরাধার বামভাগে তাঁহার উৎপত্তি। মহালক্ষ্মীর অংশ রাজলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মীর অংশ মর্ত্ত্যলক্ষ্মী।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব পার্ব্বতি।
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্॥

হে পার্ব্বতী, ব্রহ্ম হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত চরাচর জগৎ সকলই মিথ্যা, ত্রিগুণাতীত রাধাকান্ত পরব্রহ্মই সত্য, তাঁহার ভজনা কর।

১৩। শ্রীরাধার অভিশাপ।

গোলোক বৃন্দাবনে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের এক প্রদেশে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিরজানাম্নী গোপীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। চারিজন দূতীর নিকট শ্রীরাধিকা এই সংবাদ পাইলেন। শ্রীরাধিকা কুপিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিতেছেন, এই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণের সহচর সুদাম জানিতে পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সাবধান করিয়া অন্যান্য গোপগণসহ সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। বিরজা নদীরূপ ধারণ করিলেন, বিরজার সখীগণও ছোট ছোট নদী হইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা দেখিলেন—রাসমণ্ডলে কেহই নাই। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অষ্ট সখার সহিত শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদাম সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধাকে ভৎ‍‍সনা করিলেন। ইহাতে শ্রীমতী রাধিকা সুদামের উপর অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"সুদাম তুই অসুরযোনিতে অধঃপাতিত হ।"

শ্রীরাধার অভিশাপ শুনিয়া সুদাম অভিশাপ দিলেন—"তুমিও গোলোক হইতে পৃথিবীতে যাইয়া গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ কর, শতবৎসর শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ অনুভব করিবে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সুদামকে শ্রীকৃষ্ণের সখা ও শ্রীরাধার পুত্র বলা হইয়াছে। অভিশপ্ত সুদাম শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গোলোক হইতে চলিয়া যাইতেছেন, শ্রীরাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন ও কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বৎস, তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ?"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"কাঁদিও না, শীঘ্রই পুত্রের সহিত মিলিত হইবে।"

সুদাম মাতৃশাপে শঙ্খচূড় নামক অসুর হইলেন এবং কাল পূর্ণ হইলে শিবের শূলে নিহত হইয়া গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরাধা বারাহকল্পে গোকুলনগরে বৈশ্য-শ্রেষ্ঠ বৃষভানুর কন্যা হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মাতার নাম কলাবতী। শ্রীরাধার

প্রাকৃত জন্ম হয় নাই। কলাবতী বায়ুগর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সহিত রায়াণের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্য নহে। শ্রীরাধা বৃষভানুসুতায় নিজের ছায়া রাখিয়া অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। ছায়ার সহিত রায়াণের বিবাহ হইয়াছিল। তখন শ্রীরাধার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ যশোদাপুত্ররূপে ব্রজে আগমন করেন। রায়াণ যশোদার সহোদর, গোলোকে নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অংশ। জগৎস্রষ্টা পুণ্যতম বৃন্দাবনের বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিহার করিতেন—রায়াণের গৃহে ছায়ারূপে থাকিতেন।

১৪। সুযজ্ঞের আরাধনা

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাসমণ্ডলে শ্রীরাধার পূজা করিয়া তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পর ব্রহ্মা, ধর্ম্ম, অনন্ত, বাসুকি, চন্দ্র, সূর্য্য, সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণ, পর পর শ্রীরাধার পূজা করেন। তাহার পর রাজা সুযজ্ঞ পাত্রমিত্রগণ সহ শ্রীরাধার পূজা করেন। সুযজ্ঞ ভারতবর্ষে সপ্তদ্বীপপতি ছিলেন। তিনি দৈবদোষে ব্রাহ্মণ-শাপে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কশ্যপকুলচূড়ামণি সুতপা ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শ্রীরাধার স্তব সামবেদোক্ত ধ্যান, কবচ প্রভৃতি দান করেন। এই কবচ ধারণ করিয়া মহারাজা সুযজ্ঞ শতবৎসরকাল পুষ্করতীর্থে নিয়ম পূর্ব্বক শ্রীরাধার ধ্যান ও পূজা আচরণ করেন। তিনি ইহলোকে পরহস্তগত রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করেন এবং অন্তে অনন্ত গোলোকধাম লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া সুযজ্ঞ মহারাজকে শ্রীরাধার আরাধনা করিবার উপদেশ কেন দেওয়া হইয়াছিল, পার্ব্বতী দেবী মহাদেবকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মহাদেব বলিয়াছিলেন—

> তৎসেবয়া চ তল্লোকং প্রাপ্স্যসে বহুজন্মতঃ।
> তৎপ্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবীং ভজরাধাং পরাৎপরাম্॥
> কৃপাময়ীপ্রসাদেন শীঘ্রং প্রাপ্নোষি তৎপদম্॥

শ্রীকৃষ্ণসেবায় শ্রীকৃষ্ণলোক পাওয়া যায়; কিন্তু বহুজন্মপরে; শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধিকা, তিনি পরাৎপরা—তাঁহার ভজনা কর। কৃপাময়ীর কৃপায় শীঘ্র তাঁহার চরণ লাভ করিবে।

শ্রীরাধিকার ধ্যান—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্॥
সুশ্রোণীং সুনিতম্বাঞ্চ পক্কবিম্বাধরাং বরাম্।
মুক্তাপঙ্ক্তি বিনিন্দৈকদন্তপঙ্ক্তিমনোহরাম্॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং রত্নমালাবিভূষিতাম্॥
রত্নকেয়ূরবলয়াং রত্নমঞ্জীররঞ্জিতাম্।
রত্নকেয়ূরযুগ্মেণ বিচিত্রেণ বিরাজিতাম্॥
সূর্য্যপ্রভাচ্ছাদিতেনগণ্ডস্থলবিরাজিতাম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণবহুলীযুগ্মভূষিতাম্॥
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণকিরীটমুকুটোজ্জ্বলাম্।
রত্নাঙ্গুরীয়সংযুক্তাং রত্নপাশকশোভিতাম্॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমালাভূষিতাম্।
রূপাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ গজেন্দ্রমন্দগামিনীম্॥
গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ॥
কস্তূরীবিন্দুভি সার্দ্ধমধশ্চন্দন বিন্দুনা।
সিন্দুর-বিন্দুনা চারু সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাম্॥
নিত্যং সুপূজিতাং ভক্ত্যা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
কৃষ্ণসৌভাগ্যসংযুক্তাং কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং বরাম্॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ নির্গুণাঞ্চ পরাৎপরাম্।
মহাবিষ্ণোর্বিধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বসম্পদম্॥
কৃষ্ণভক্তিপ্রদাং শান্তাং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্।
বৈষ্ণবীং বিষ্ণুমায়াঞ্চ কৃষ্ণপ্রেমময়ীং শুভাং॥
রাসমণ্ডলমধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
রাসে রাসেশ্বরযুতাং রাধাং রাসেশ্বরীং ভজে॥

শ্বেতচম্পকের বর্ণের ন্যায় অঙ্গের আভা, কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভা, শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়

বদন, শরতের পদ্মের ন্যায় চক্ষু, সুন্দর শ্রোণী ও নিতম্ব শোভিত। সুন্দর ও সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় অধর, মুক্তাপঙক্তি বিনিন্দিত মনোহর দন্তপঙক্তি। ঈষৎহাস্যযুক্ত প্রসন্ন-বদন, ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদাই করুণার্দ্র। অঙ্গ বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র ও রত্না-মালা দ্বারা শোভিত। গণ্ডস্থল সূর্য্য অপেক্ষা অধিকতর তেজঃসম্পন্ন। মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বারা কর্ণযুগল, উৎকৃষ্ট রত্নরাজি বিনির্ম্মিত মুকুট ও কিরীট দ্বারা কান্তি অতিশয় উজ্জ্বল। রত্নাঙ্গুরীয় ও রত্ন নির্ম্মিত পাশকদ্বারা সুশোভিত। মস্তকে কবরীভার মালতী মালাশোভিত। রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর ও মঞ্জীর দ্বারা সুশোভিত। রত্ননির্ম্মিত কেয়ূরযুগল মনোহর হস্ত-যুগলে শোভা পাইতেছে। গজেন্দ্রের ন্যায় মন্দগামিনী, তিনি রূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রিয়তমা গোপীগণ কর্ত্তৃক শ্বেতচামরদ্বারা সর্ব্বদা সেবিত। কেশকলাপ কস্তুরীবিন্দু যুক্ত চন্দন এবং সিন্দুর-বিন্দু দ্বারা সুশোভিত। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে ভক্তিসহকারে পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী এবং পরমা প্রাণাধিকা প্রাণা-ধিষ্ঠাত্রী দেবী নির্গুণস্বরূপিণী। তিনি পরাৎপর মহাবিষ্ণুর জননী ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী। তিনি মূলপ্রকৃতি, পরমেশ্বরী, শান্তা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুমায়া, কৃষ্ণপ্রেমময়ী সুন্দরী হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। রাসমণ্ডলের মধ্যে রত্নসিংহাসনে সমাসীন হরির সহিত বিলাসরতা, সেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে উপাসনা করি।

শ্রীরাধার মন্ত্র—"ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পূজার বিধি, পাদ্য, অর্ঘ্যদান প্রভৃতি আনুপূর্ব্বিক কথিত হইয়াছে। পূজাপদ্ধতি অন্যান্য পূজার ন্যায়। অতএব বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক। শ্রীরাধার পূজার পর দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে শ্রীরাধিকার প্রিয়পরিচারিকাগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হয়। পূর্ব্ব-কোণে মালাবতী, অগ্নিকোণে মাধবী, দক্ষিণদিকে রত্নমালা, নৈঋর্তকোণে সুশীলা, পশ্চিম-দিকে শশিকলা, বায়ুকোণে পারিজাতা, উত্তরদিকে পদ্মাবতী, এবং ঈশানে সুন্দরীর পূজা করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কথিত শ্রীরাধার স্তব এবং শ্রীরাধার কবচও আছে। শ্রীরাধাকেই সকল শক্তির মূলাধাররূপে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণব দিগের অনেক সম্প্রদায় আছে, এমন কি যাঁহারা কৃষ্ণ-উপাসক, তাঁহারাও সকলে শ্রীরাধার উপাসক নহেন। আসামে শঙ্করদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ে শ্রীরাধার

উপাসনা একেবারেই নাই। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে বলে গোপালের উপাসক আছেন, সখ্যভাবের উপাসকও অল্পসংখ্যক আছে, কিন্তু অধিকাংশই শ্রীরাধা-গোবিন্দের ও গোপীভাবের উপাসক। যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের এই শ্রীরাধাকথা তাঁহাদিগের অতি উত্তমরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতি হয়ত সকল স্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতানুযায়ী নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতি জানিলে, সাধক ও জিজ্ঞাসুর উপকার হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড ও প্রকৃতিখণ্ড হইতে যে সব কথা বলা হইল, তাহা সমস্তই তত্ত্বকথা, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতের কথা নহে। কিন্তু যে ভাষায় উহা বলা হইয়াছে, তাহা এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতেরই ভাষা। এইরূপ ভাষা কেন প্রযুক্ত হইল? এইরূপ ভাষা ছাড়া, অন্য কোন ভাষা নাই যাহার সাহায্যে ঐ তত্ত্ব মানবজগতে মানবের জ্ঞানের নিকট ব্যক্ত করা যাইতে পারে। সুতরাং কেবল ভাষা বা বর্ণনার স্থূল চিত্রের দ্বারা বাহিত না হইয়া, ভাষা ও চিত্রের পশ্চাতে যে তত্ত্ব বা নিত্যসত্য রহিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ইহারই নাম "তত্ত্বতঃ" বুঝিয়া লওয়া। পুরাণ বা পৌরাণিকী ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে, এই চাবিটি সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করিতে হইবে। এই চাবি যাঁহারা ব্যবহার করিতে না পারেন, অর্থাৎ অন্তর্মুখী হইয়া এই সমুদয় বর্ণনার ভিতরের নিত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যাহাদের অভ্যাস বা সামর্থ্য নাই, তাহাদের পক্ষে পুরাণ পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। কিন্তু একটি কথা আছে। যাহারা স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাবান্, এবং কল্পনাশক্তি যাহাদের মধ্যে বেশ সবল, তাহারা তত্ত্ব না বুঝিয়াও যদি এই সমুদয় বর্ণনা শ্রদ্ধান্বিত ভাবে শ্রবণ করিয়া যায়, প্রথমেই কোনরূপ সংশয় বা বিরুদ্ধভাব হৃদয়ে যদি না জাগে, তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়বৃত্তি এবং মনোবৃত্তিসমূহ ক্রমে ক্রমে মার্জ্জিত ও অনুশীলিত হইবে এবং অনেক প্রকারের সূক্ষ্ম ও তীব্র অনুভব-শক্তি যাহা আমাদের ভিতরে সুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে, তাহা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহারা এমন সূক্ষ্ম বিষয় ও ব্যাপার জানিতে ও ধরিতে পারিবে, যাহা অন্যে জানিতে পারে না। এই পথই সাধনার সুগমপথ। পূর্ব্বকালে অনেকেই এই পথে বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছে। এখন আর সেদিন নাই। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে, মানুষ অতিরিক্ত পরিমাণে অধীর ও সংশয়ী হইয়াছে। সকল বিষয়েই তাড়াতাড়ি যাহা হউক

একটা মতামত দিতেই হইবে। গভীরভাবে চিন্তা করার ও ধীরভাবে অপেক্ষা করার অভ্যাস মানব প্রকৃতিতে নাই, এই কারণে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক বিবরণ-সম্বন্ধে অনেকের মনে নানারূপ সংশয় জাগিয়া উঠিয়াছে।

১৫। প্রকৃতি ও পুরুষ

প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। নানা-দর্শনে, নানাপুরাণে, নানাতন্ত্রে এই কথা নানাভাবে কথিত হইয়াছে। এই সব কথা যে কল্পনামাত্র আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। মূল সত্যগুলি সকলের মধ্যেই একরূপ, কিন্তু মূলসত্যের আনুষঙ্গিক কথাগুলি দ্রষ্টার বা ঋষির অধিষ্ঠানভূমিভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছে। এই গেল দার্শনিক তত্ত্বালোচনার কথা। কিন্তু এই কথার সহিত উপাসনা ও আরাধনার কথা রহিয়াছে, সম্প্রদায় রহিয়াছে, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কেহ পুরুষকে প্রধান বলিয়া কেহ বা প্রকৃতিকে প্রধান বলিয়া উপাসনা করিয়াছেন। দ্বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে নানারূপ বৈষম্য ও বিরোধ হইয়াছে। তাহার পর আবার দুই মতে সামঞ্জস্যও হইয়াছে। অধ্যাত্মসাধনার এই ইতিহাসও ক্রমবিকাশ যাঁহারা জানেন তাঁহাদের উচিত, একই কথা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কিভাবে কথিত হইয়াছে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাহার আলোচনা করা। এই প্রকারের আলোচনা করিতে করিতে সত্য একদিন আসিয়া উপস্থিত হইবেন। যাঁহারা আলোচনা করিবেন না, সকল দিক্ দেখিবেন না, যাহা হউক একটা কিছু ধরিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তাঁহারা চিরদিন বঞ্চিত হইবেন।

সৃষ্টির প্রথম কথা বড়ই কঠিন কথা। ইহা কথার দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। কিন্তু সকলকেই এই তত্ত্বের একটা মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। বেদে আছে—

স ঐক্ষত অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়।

তিনি মনে করিলেন, আমি বহু হইব।

এই যে ঈক্ষণ বা মনে হওয়া, ইহাতেই আমরা শক্তির বা প্রকৃতির প্রকাশ দেখিতেছি। তন্ত্রে স্থানে স্থানে এই শক্তিকে 'পরমাপূর্ব্বনির্ব্বাণশক্তি' বলা হইয়াছে, আবার বলা হইয়াছে—এই শক্তিই ব্রহ্ম। এই পরশক্তিময় ব্রহ্ম হইতে নাদ, নাদ হইতে

বিন্দু। সারদাতিলকতন্ত্রে আছে—"সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো, নাদাদ্‌ বিন্দুসমুদ্ভবঃ।" এই বচনে আমরা দেখিতেছি—পরমেশ্বরে সচ্চিদানন্দ *বিভব ও প্রকৃতি (কলা) রহিয়াছে। তাহা হইতে শক্তি, তাহা হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দু। মূল বিভব ও প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে* ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। শৃঙ্গার রসকে আদিরস ধরিয়া যদি এই তত্ত্বের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে শ্রীরাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

যিনি আদিতত্ত্ব, তিনি আনন্দময়। এই আনন্দ, মায়িক আনন্দ নহে। এই আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। এই আনন্দই শ্রীরাধা বা এই আনন্দের বিলসিত বা প্রকটিত অবস্থার নামই শ্রীরাধা। আনন্দময় পরমপুরুষ, আপনিই আপনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, আপনিই আপনার মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। এইজন্য যেন তিনি নিজকেই নিজ-হইতেই পৃথক্‌ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ। সমগ্র সৃষ্টি সেই আত্মারামের রমণের আয়োজন মাত্র, অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য। চিন্তা করিলে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যে খুব কঠিন তাহা নহে—তবে চিন্তা করা আবশ্যক।

তবে সেই যুগলতত্ত্ব, আমাদের অন্তরে ও বাহিরে জয়যুক্ত হউক, বিশ্বব্যবস্থার সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাগোবিন্দের বিজয়গীতি ধ্বনিত হউক।

হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, হে গোপীপ্রাণবল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি।
হেম গৌরীশ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধেকৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পুরাও মনোসাধে॥

পূর্ব্বে যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলা হইল, তাহার সহিত বেদের আনন্দব্রহ্ম, রসব্রহ্ম ও মধুব্রহ্ম মিলাইয়া দেখিলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। আমাদের জীবনে নবীনতা

নাই, আমরা দুশ্চিন্তা ও অসচ্চিন্তার দ্বারা অবসন্ন, কাজেই নবীনা কিশোরী বা 'নওল কিশোর'-এর লীলা বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবনে সকলই নবীন, চিরদিনই নবীন।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দি-পুলিন, কুঞ্জ নবশোভন, নব নব প্রেমবিভোর॥
নবীন রসাল-মুকুল-মধুমাতিয়া নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী, মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতিমতি মাতি॥

হৃদয় যখন নবীন ও রসপূর্ণ, মানুষ যখন আপনাকে ছড়াইয়া ও বিলাইয়া দিবার জন্য আকুল, যে অবস্থায় বিশ্বের সকলই সুন্দর ও মধুময়, সেই অবস্থারই নাম "প্রসন্নোজ্জল-চিত্ততা।" এই অবস্থায় সেই মধুব্রহ্মের উপলব্ধি ও আস্বাদন হয়। সেই মধুব্রহ্মই মথুরার বা মধুরার অধিপতি, তাঁহার সকলই মধুময়।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং। নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং। মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং। বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং। মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
বেণুর্মধুরঃ রেণুর্মধুরঃ। পাণির্মধুরো পাদৌমধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং। মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং। ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং। মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
করণং মধুরং তরণং মধুরং। হরণং মধুরং রমণং মধুরং।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং। মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা। যমুনা মধুরা বীচি মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং॥ মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥

গোপী মধুরা লীলা মধুরা। যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং। মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
গোপা মধুরা গাবো মধুরা। যষ্টির্মধুরাঃ সৃষ্টির্মধুরাঃ।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং। মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই মধুব্রহ্মের আস্বাদন করিয়াছেন,—

মধুরং মধুরং বপুরস্তবিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আস্বাদন এইরূপ—

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিগে বহে যার পুর॥

সাধনার তিনটি পথ বা মার্গত্রয়।

ধর্ম্মসাধনার তিনটি পথ নিতান্তই স্বাভাবিক। শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ, তিনি সত্য, শিব ও সুন্দর। তিনি অনন্ত, সুতরাং তাঁহার শক্তি বা বিভূতিও অনন্ত। এই অনন্ত বিভূতির মধ্যে এই তিনটিই প্রধান। আমাদের পক্ষে এই তিনটি ছাড়া আর কিছু জানিবার উপায় নাই। ভগবান্ যখন আমাদের আরাধ্য হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করেন, তখন তিনি যেন একটি ত্রিভুজ। সত্তা (Existence) চৈতন্য (Consciousness), আনন্দ (Bliss), এই তিনটি যেন ঐ ত্রিভুজের তিনটি বাহু। অন্যভাষায় বলিলে এই তিনটি বাহু যথাক্রমে সত্য (Truth), শিব (Good), সুন্দর (Beauty)। মানুষ তিন দিক্ হইতে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কেহ সত্য বা সত্তারূপে, কেহ শিব বা চিৎ-রূপে, কেহ সুন্দর বা আনন্দরূপে তাঁহার অভিমুখী। কেন এরূপ হয়? মানুষে মানুষে প্রকৃতি-গত প্রভেদ আছে। সকলের রুচি ও অধিকার একরূপ নহে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মের দ্বারা মানুষে মানুষে এই প্রভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাও বাহিরের কথা। ভগবানের ইচ্ছাই মানুষে মানুষে পৃথক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই সাধনার তিনটি পথ।

মানুষও অস্ফুট সচ্চিদানন্দ। মানুষের প্রকৃতিও তিনভাগে বিভক্ত। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, প্রত্যেক মানুষেরই আছে। কাহারও ইচ্ছাশক্তি প্রবল, কাহারও জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি প্রবল। ইংরাজী ভাষায় বলে Knowing, Willing, Feeling মানুষের এই তিনটি বৃত্তি, মানুষের চৈতন্য এই তিনটি পথে ক্রিয়া করিতেছে। যে মানুষের জ্ঞানশক্তি প্রধান, তিনি ভগবানের সৎভাবের বা সত্যভাবের অভিমুখে স্বভাবতঃ অগ্রসর হইয়া থাকেন। যাঁহার ক্রিয়াশক্তি প্রবল, তিনি স্বভাবতঃ শিবভাব বা চিদ্ভাবের উপাসক। আর যাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রবল, সুন্দর বা আনন্দ তাঁহাকে লুব্ধ করিয়া থাকেন। সাধনার তিনটি পথের মূল কথা এই।

এই যে তিনটি পথ, ইহারা পৃথক্ হইয়াও পৃথক্ নহে। অনেকে মনে করেন ভক্তির পথ, জ্ঞান বা কর্ম্মের পথ হইতে একেবারে পৃথক। তাহা নহে। যাহাকে ভক্তি বলি তাহাতে জ্ঞান ও আছে কর্ম্ম ও আছে, কিন্তু ভক্তি (Emotion, feeling) সেখানে প্রবল ও প্রধান। সেইরূপ যাহাকে কর্ম্ম বলি, তাহাতে ভক্তি বা জ্ঞান যে নাই তাহা নহে তবে কর্ম্ম বা ক্রিয়াশক্তি সেখানে প্রবল। সেইরূপ যাহাকে জ্ঞান বলি তাহাতে কর্ম্ম বা ভক্তি যে নাই তাহা নহে, তবে জ্ঞান সেখানে প্রবল ও প্রধান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক পরম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ত্রিবেণী-সঙ্গম পরিদৃষ্ট হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে এই তিন প্রকারের সাধনপথের মধ্যে কোন্ পথের কে অধিকারী তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন।

যোগাস্ত্রয়োময়া প্রোক্তা নৃনাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্মচ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥
স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥
অস্মিল্লোঁকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোহনঘঃশুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন, মনুষ্যগণের পরম মঙ্গল যাহাতে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত মৎকর্ত্তৃক ত্রিবিধ যোগ কথিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। ইহা ছাড়া কল্যাণসাধনের আর অন্ত উপায় নাই। যোগ শব্দের অর্থ উপায়, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি টিকাকার সকলেই বলিয়াছেন। এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—

"বিষয়াভেদেহপ্যধিকারিভেদেনাবিরোধং বক্তুং"

জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, এই তিনপ্রকার উপায় সত্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, বিষয় অভিন্ন, অধিকারীভেদে উপায় ভেদ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথম শ্লোকের পরের শ্লোকগুলির অর্থ এইরূপ। যাঁহারা কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ দুঃখময় ভাবিয়া কর্ম্মের ফলে বিরক্ত এবং কর্ম্মত্যাগী, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ; আর যাহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলবিষয়ে দুঃখবুদ্ধিশূন্য, অতএব কামী ও অবিরক্ত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

কোনরূপ ভাগ্যবশে ভগবৎ-প্রসঙ্গে যাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, আর যিনি কর্ম্ম ও তাহার ফলসম্বন্ধে অতিশয় বিরক্তও নহেন, আবার অতিশয় আসক্তও নহেন, ভক্তিযোগ তাঁহার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। যে পর্য্যন্ত কর্ম্মাদি বিষয়ে বিরক্তি না জন্মে, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রসঙ্গে বিশেষ শ্রদ্ধা উৎপাদিত না হয়, ততদিন নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মযোগী জ্ঞানও ভক্তির ভূমিতে কি প্রকারে

আরোহণ করেন, তাহাই কথিত হইতেছে। যিনি স্বধর্ম্মে থাকিয়া কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি যাজন করেন, তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বর্গ বা নরকে যাইতে হয় না। নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রকারের শুদ্ধচিত্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ লাভ করেন, ভাগ্যবশতঃ ভগবদ্ভক্তিও লাভ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে স্বধর্ম্মস্থ হইয়া কর্ম্মযোগের পথ অবলম্বন করাই সাধারণ মানুষের অধিকার। এই পথে থাকিলে জ্ঞান ও ভক্তি-লাভের কোন বাধা নাই। জ্ঞানযোগের যে অধিকার বলা হইল, সে অধিকার কয়জন লোকের আছে, ইহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করা আবশ্যক। অনধিকারী ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি অভিমান-পূর্ব্বক বিবেচনা করে আমরা জ্ঞান বা ভক্তির অধিকারী, তাহা হইলে সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হয়, যথেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। সমাজের এইরূপ অবস্থা বড়ই সর্ব্বনাশের অবস্থা।

ভক্তিসাধনায় কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেই ব্যবস্থা কোন্ সময়ের ব্যবস্থা ও কাহার জন্য সেই ব্যবস্থা, তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ ১১।৫।৩৭

যিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে শরণাগতপালক মুকুন্দের চরণে শরণ লইয়াছেন, তিনি দেবতা ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য বা পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী নহেন।

এই শ্লোকে বিধিনিষেধ ও কৃত্যাকৃত্যের পরিহার উপদিষ্ট হইল। বলা হইল নিত্য-নৈমিত্তিক-শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্ম করিতে হইবে না। পঞ্চযজ্ঞ, দেবপূজা করিতে হইবে না, যাহারা পোষ্য, যেমন পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি, ইহাদিগকে পালন করিতে হইবে না। কিন্তু এই উপদেশ কাহার জন্য? যিনি সর্ব্বভাবে মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারের অবস্থা মনুষ্যলোকে কয়জন লোকের হয়? লক্ষজনের মধ্যে একজনের হইলেও ধরণী পবিত্রা হয়। যাঁহার এই অবস্থা হয় নাই, তিনি যদি এই শ্লোকের দোহাই দিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের আমি কিঙ্কর নহি, তাহাদের আমি ঋণী নহি, এই কথা বলিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে সে ব্যক্তিরও ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়, সমাজেরও অনিষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

কাম ত্যাগি কৃষ্ণভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিত্রাদিগের কভু নহে ঋণী॥

ইহার পরের শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

ভগবানের *পাদমূল-ভজনাকারী* অন্যভাবরহিত প্রিয়ভক্ত, যদি কখন প্রমাদবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়প্রবিষ্ট হরি তদীয় সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখিয়াছেন—

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥

এই যে অবস্থা অর্থাৎ কাম ত্যাগ করিয়া রাগমার্গে ভজনার অধিকার লাভ, ইহা অনেক উপরের কথা। দেহে যতক্ষণ আত্মবুদ্ধি আছে, মান অপমান, লাভ ক্ষতি, প্রভৃতির বোধ আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিসাব নিকাশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া সংসারে চলিতে হয়, বুঝিতে হইবে ততক্ষণ এ অবস্থা হয় নাই। এই কারণে আমাদের উচিত পিতৃকৃত্য. দেবকৃত্য প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ম্মল চিত্তে অনুষ্ঠান করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা। রামানুজাচার্য্য বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। সদাচারপালন ব্যতিরেকে ভক্তিলাভ হয় না, ইহাই রামানুজাচার্য্যের অভিমত। এখনকার দিনে অনেকে মনে করেন, খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু রামানুজাচার্য্য আহারশুদ্ধির উপরে খুব বেশী রকম জোর দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ।" আহারশুদ্ধি হইলে দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণমন প্রভৃতি শুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে ভগবানে ভক্তি হইবে। এই ভক্তিই ধ্রুবানুস্মৃতি। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সেই ভগবানের স্মরণ হয়, এবং সকল কার্য্য সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে, ও ভগবানের আদেশে সাধিত হয়, সেই যে অবস্থা, তাহার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের জন্য রাগমার্গ ভক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনিও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কেহ যেন সামাজিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করে। শাস্ত্রানুগত বৈধ অনুষ্ঠান-সমূহ যাহাতে রক্ষা পায় এবং সেই অনুষ্ঠান-সমূহ প্রাণহীন আড়ম্বর-মাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া যাহাতে সত্যোপেত ও প্রাণময় হয়, সে বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রায় রামানন্দের সহিত গোদাবরী তীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বপ্রথম বর্ণাশ্রমাচারের

কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমব্যবস্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তিপথের আচার্য্যগণ এ বিষয়ে একমত, সুতরাং রাগমার্গের দোহাই দিয়া কর্ম্মযোগ পরিত্যাগ করা কল্যাণের পথ নহে, অকল্যাণের পথ।

ভক্তি-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল জ্ঞান-সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই। জ্ঞানের পথের প্রারম্ভেই সাধন-চতুষ্টয়। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। ষট্‌সম্পত্তি বলিতে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ছয়টি গুণকে বুঝায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে বলিয়াছেন, প্রথমে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে, কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্ত সাধক পূর্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া সদ্গুরুর শরণাগত হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহাই জ্ঞানপথের সাধন। সুতরাং এখানেও কর্ম্মযোগ আবশ্যক। অনধিকারী ভক্তির দোহাই দিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া যেমন নিজের ও সমাজের অনিষ্ট করে, ঠিক্ সেইরূপ অনধিকারী ব্যক্তি জ্ঞানের দোহাই দিয়া অপরিপক্ক অবস্থায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাতে তাহারও অনিষ্ট, সমাজেরও অনিষ্ট।

আচার্য্যগণের শিক্ষা ও শাস্ত্রের উপদেশ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, সনাতন ধর্ম্মে যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ভিন্ন মত উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সত্য সত্য কোন বিরোধ বা বিবাদ নাই। যাহারা শাস্ত্র বোঝে না, বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চাহে না, তাহারা কথা লইয়া মারামারি করে। রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত বা অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহাই প্রকৃত ভক্তি। জ্ঞানহীন কর্ম্ম অন্ধ আর কর্ম্মানুষ্ঠানহীন জ্ঞান পঙ্গু, এই পঙ্গু ও অন্ধের মিলন আবশ্যক। অন্ধের স্কন্ধের উপর চক্ষুষ্মান্ পঙ্গুকে বসাইতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা সত্য লাভ করিব। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন, ভক্তি এক প্রকার জ্ঞান। জ্ঞান দুই প্রকার, কটাক্ষ বীক্ষণ ও নির্নিমেষ বীক্ষণ। নির্নিমেষবীক্ষণই ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে ঐক্য কোথায়, তাহা ভগবদ্গীতার আলোচনা করিলেই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ভক্তের লক্ষণ, গুণ ও চরিত্র বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণঃ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥

সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র ও কৃপালু, মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, শ্রীভগবানে স্থিরলক্ষ্য, ও মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী, আমার ভক্ত ও আমার প্রীতিভাজন।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভগবান্ এই সমুদয় সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন—

এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।

এইগুলিকে জ্ঞান বলা হয়, যাহা ইহার বিপরীত তাহাই অজ্ঞান।

অতএব জ্ঞান বলিতে শ্রীভগবান্ যে লক্ষণ ও গুণ বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলির সহিত ভক্তের গুণ ও লক্ষণ তুলনা করিয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। সেই গুণগুলি এই—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসাদি॥

যিনি নিজের গুণের শ্লাঘা করেন না, যাঁহার দম্ভ নাই, যিনি পরপীড়া বর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি সহিষ্ণু, যিনি সরল, যিনি গুরুসেবাপরায়ণ, যাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শৌচ আছে, যিনি স্থিরচিত্ত, যাঁহার মন সংযত, বিষয়-সমূহে যিনি বৈরাগ্যযুক্ত, যাঁহার অহঙ্কার নাই, পুত্র স্ত্রী ও গৃহাদিতে যাঁহার আসক্তি নাই, পুত্র প্রভৃতির সুখদুঃখে যিনি নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলিয়া বিবেচনা করেন না, ইষ্ট ও অনিষ্টে যিনি সমচিত্ত, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া যিনি ভগবানে একান্ত ভক্তি করিয়া থাকেন, যিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন, বহুজনের সভায় যাঁহার বিরক্তি, তিনিই জ্ঞানী।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত এই গুণ ও লক্ষণগুলির তত্ত্ব বুঝিয়া আমরা যদি সেই গুণগুলির অনুশীলন করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব জ্ঞান ও ভক্তির মিলনভূমি কোথায়।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই তিনটি পথ। কেহ কেহ বলেন যোগ একটি স্বতন্ত্র পথ, কিন্তু তাহা

মনে করিবার কোনই কারণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী-প্রমুখ সর্ব্বজনসম্মানিত আচার্য্যগণ যোগের অর্থ বলিয়াছেন "উপায়"। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রত্যেক অধ্যায়কে 'যোগ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের নাম যোগদর্শন। ইহার অপর নাম সেশ্বর সাংখ্য। পাতঞ্জল দর্শন ছাড়া আরও অনেক প্রকার যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও 'কুণ্ডলীযোগ' প্রভৃতি অনেক যোগের পন্থা উপদিষ্ট হইয়াছে। যোগকে ক্রিয়া বা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে যে পূর্ণাঙ্গযোগ আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতায় পূর্ণাঙ্গযোগের আদর্শও সেইরূপ, তাহাতেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় পরিদৃষ্ট হয়।

যোগের দ্বারা নানারূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়, এই জন্যই যোগের এত আদর। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের অনেক লোক,—স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তিকামনায় নানারূপ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং তাহার ফলে কিছু কিছু শক্তিও লাভ করিয়াছেন। যোগসাধনার প্রধান কথা, যাহা পাতঞ্জলদর্শনে কথিত হইয়াছে, তাহা সার্ব্বজনীন, অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত, সকলেরই প্রয়োজন। তবে এই প্রয়োজন, ভিন্ন ভিন্ন উপায় সাধিত হইতে পারে। জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই নিষ্কল পরব্রহ্মকে ধ্যানের দ্বারা পাওয়া যায়। সুতরাং সত্যলাভ করিতে হইলে প্রথম কার্য্য বহির্মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করা, চঞ্চল মনকে স্থির ও শান্ত করা। চিত্তের শক্তি অসীম বলিলেও হয়, সেই শক্তি আমাদের প্রত্যেকেরই অধিকারে রহিয়াছে। আমরা তাহার তত্ত্ব জানিনা, আমরা তাহার ব্যবহার জানিনা, এই জন্যই আমরা দুর্ব্বল ও বিপন্ন। চিত্তের শক্তি বাহিরের বিষয়ে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই শক্তি যদি সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে এখন যাহা অসাধ্য বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাও করিতে পারা যায় এবং অতি অনায়াসেই করিতে পারা যায়।

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি দুয়ারের ন্যায়। তাহাদের ভিতর দিয়া বাহিরের বিষয়-জগতের ছবি মনের উপর পড়িতেছে, আর মন চঞ্চলভাবে সেই বিষয়সমূহের অভিমুখে ছুটিতেছে। আহার, বেশভূষা, অর্থ, পদোন্নতি, মানসম্ভ্রম, পুত্রকন্যা আরও কত কি। চিন্তা ও উদ্বেগের শেষ নাই। চিত্তের এই চঞ্চলতা-নিবন্ধন, আমি আমার প্রকৃতশক্তির পরিচয় পাই না, আর সেই পরমার্থ সত্য যিনি, তাঁহারও পরিচয় পাই না। এই জন্যই এই দুর্দ্দশা। মনকে স্থির করিতে হইবে। পাতঞ্জলদর্শন বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধের নাম যোগ। (Inhibition of the functions of the mind) চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে মানুষ আপনাকে চিনিতে পারিবে, তাহার শক্তি কত তাহা বুঝিতে পারিবে। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যিনি দ্রষ্টা তিনি স্বরূপে অবস্থিত হইবেন,—তিনি সত্য করিয়া যাহা, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমরা যে

এখন স্বরূপ-ভ্রষ্ট, আমি আমাকে—আমার আসল ও খাঁটি আমিটাকে ভুলিয়া গিয়াছি, তাই আমার এত ক্লেশ, এত বিপদ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে আত্মলাভ হইবে, আত্মদর্শন হইবে।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ, চিত্তের এই পাঁচটি অবস্থা। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, ইহার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহাই রাজযোগ অর্থাৎ যত প্রকার যোগ বা ধর্ম্মসাধনার উপায় আছে, এই উপায় তাহাদিগের মধ্যে রাজা বা শ্রেষ্ঠ।

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রত্যেক অঙ্গ যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ইহার ভিতর কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি রহিয়াছে। রাজযোগকে অনেকে কর্ম্মযোগও বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনের শক্তি অসীম। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মানুষ করিতে পারে না, এমন কাজ নাই। যোগশাস্ত্রের গ্রন্থে নানাপ্রকার সিদ্ধির কথা লিখিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যোগসিদ্ধির কথায় বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু আজকাল ক্রমে ক্রমে অনেকেই ইহাতে বিশ্বাস করিতেছেন, আবার অনেকে অল্প স্বল্প পরীক্ষা করিয়াও দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাতঞ্জলদর্শনে এবং আরও অনেক গ্রন্থে যোগৈশ্বর্য্য ও যোগসিদ্ধি-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই সমুদয় সিদ্ধির কথা কথিত হইয়াছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র

বৃন্দাবনে শ্রীরাধা

১। কল্পান্তর

একই উপাখ্যান একাধিক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের বর্ণনায় কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের নানারূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে এবং নানারূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের সুধীগণ যে সব উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। সে আলোচনায় এখন প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতে চাই পৌরাণিকগণ কি বলেন? পৌরাণিকগণ বলেন, কল্পভেদ ইহার কারণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এমন কথা আছে, যাহা অন্য পুরাণে নাই এবং যাহার সহিত অন্যান্য পুরাণের সামঞ্জস্য করা খুবই কঠিন; অনেক স্থলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কল্পান্তরের, একথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই আছে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নারায়ণ ঋষি নারদকে বলিলেন—

যত্রকল্পে তথা চেয়ং তত্র ত্বমুপবর্হণঃ।
পঞ্চাশৎ কামিনীনাঞ্চ পতির্গন্ধর্বপুঙ্গবঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের জন্মকথা ও বাল্যলীলা বলিতে বলিতে নারায়ণ ঋষি নারদকে বলিলেন, হে নারদ, তুমি যে কল্পে উপবর্হণ নামে পরিচিত গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলে, এবং তোমার পঞ্চাশটি পত্নী ছিল, এই সব কথা সেই কল্পের। তুমি তখন সেই রমণীগণকে লইয়া আমোদপ্রমোদ করিয়া বেড়াইতে। তাহার পর তুমি ব্রহ্মার অভিশাপে দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। এই দ্বিতীয় জন্মে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজন ও সাধুসঙ্গের

প্রভাবে শ্রীভগবানে তোমার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মে। এখন, এই বর্ত্তমান কল্পে, তুমি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছ ও দেবর্ষিত্ব লাভ করিয়াছ। এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ব কল্পেরও পূর্ব্ব কল্পে যে শ্রীকৃষ্ণলীলা হইয়াছিল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বের কথাগুলি খুব দরকারী কথা। এত দরকারী যে এই কথাগুলিকে চাবির মত ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা করিতে না পারিলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বৈশিষ্ট্য, আর শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবৃন্দাবনলীলার বর্ণনার সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনার যে প্রভেদ তাহার হেতু বুঝিতে পারা যাইবে না।

আজ যিনি দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মার মানসপুত্র ও ভক্তচূড়ামণি; আজ যিনি শুদ্ধাভক্তির প্রবর্ত্তক, একদিন তিনি গন্ধর্ব্ব ছিলেন ও পঞ্চাশটি রমণী লইয়া কামক্রীড়া করিতেন। এই কথাটি মনে রাখিয়া সেই উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের মানসিক অবস্থা বেশ দৃঢ়রূপে চিন্তা করুন।

এইবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পাঠ করুন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কামভোগের চিত্র ও কামজ স্খলনের বর্ণনা খুবই বেশী। প্রচলিত ভাষায় আমরা যাহাকে "কাঁচারস" বলি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার বাড়াবাড়ি অনেক সময়েই আমাদের নিকট অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কি করা যাইবে? বিশ্বপ্রবাহ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে বিকশিত বা উন্নত হইতেছে। নিজ নিজ মর্য্যাদাপালনের দ্বারা ভূতসমূহের যে ক্রমিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, পুরাণে তাহাকে "স্থান" বলে। এই স্থানতত্ত্ব সত্য। বৎসরে বৎসরে যেমন পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষ হয়, যুগে যুগেও তেমনি হয়। আবার মন্বন্তরে মন্বন্তরে এবং কল্পে কল্পেও তাহা হইয়া থাকে। একদিনের মধ্যেই চারিযুগ, আবার একজন মানুষের জীবনেও চারি যুগ। ব্রহ্মার জীবন ও ব্রহ্মাণ্ডের জীবনেও সেই একই ব্যাপার চলিতেছে। এই যে সাদৃশ্য, (Analogy) পুরাণ বুঝিতে হইলে ইহার তত্ত্ব জানা চাই। উপরেও যাহা নীচেও তাহাই। As above so below, স্থূলেও যাহা সূক্ষ্মেও তাহাই, ভাণ্ডেও যাহা ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই। ইহার নাম সাদৃশ্যবিধি—The Law of Analogy and Correspondence পৌরাণিকের চিন্তাপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্তর্ম্মুখী হইয়া এই বিধি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কামের ধ্বংস নাই, বিশ্বসৃষ্টির মূলই কাম। কামই

পরিচালক। এই কাম ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উৎকর্ষ লাভ করে। এই কাম মার্জ্জিত (Transmuted) হইয়া নব নব মূর্ত্তি ধারণ করে। এই কাম আমার ভিতর এখন যে স্তরে বা অবস্থায় রহিয়াছে, আমার অনুভূতি ও কল্পনা ঠিক্ সেইরূপ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা নিত্য, প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের অবস্থাভেদে এই প্রাকট্যের বা প্রাকট্যের অনুভূতি ও আস্বাদনের ভেদ হইয়া থাকে। অন্তর্মুখী হইয়া উপবর্হণ গন্ধর্ব্বকে চিন্তা করুন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনা বুঝিবেন। অন্তর্মুখী হইয়া তাঁহারই আর এক অবস্থা অর্থাৎ দেবর্ষির অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করুন, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা বুঝিবেন। দুই প্রকারের বর্ণনায় প্রভেদ কেন তাহা বুঝিবেন এবং ক্রমশঃ বুঝিবেন, এই প্রভেদ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন না করিলে ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না।

কল্প কি? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতেই আমরা তাহার উত্তর পাইব। প্রকৃতি খণ্ডের ৫৪ অধ্যায়ে এই সমুদয় কথা আছে। ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ চৌদ্দ মন্বন্তর বা এক হাজার চতুর্যুগের নাম ক্ষুদ্র কল্প, আর ব্রহ্মার রাত্রির নাম ক্ষুদ্র-প্রলয়। Daily Exhibition and Inhibition in the Life of Brahma. ইহা যদি বুঝিতে হয় তাহা হইলে আমাকে একটু তপস্যা করিতে হইবে। আমার দিন যায়, রাত্রি আসে। আবার দিন আসে, রাত্রি আসে। দিন যখন যায়, দিনমণি অস্তমিত হন, তখন কি আপনি সেই দিনকে ও দিনমণিকে কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হে দিবাভিমানী দেবতা, আমায় কোথায় রাখিয়া গেলে? প্রভাতে উঠিয়া রাত্রির অভিমানী দেবতাকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাদের উত্তর পাওয়া যায়। ভারতের দ্বিজগণ উত্তর পাইতেন। সেই উত্তর পাইলে আমি আমার দৈনন্দিন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। নিজের দিবারাত্রি বুঝিলে তখন আর ব্রহ্মার দিবারাত্রি বুঝিতে বাকি থাকিবে না। ইহাই পৌরাণিকের সাধনা।

ব্রহ্মণো বাসরে রাজন্ ক্ষুদ্রঃ কল্পঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য ব্রহ্মনিশায়াঞ্চ ক্ষুদ্রঃ প্রলয়ঃ উচ্যতে॥

ব্রহ্মার এই রাত্রির নাম কালরাত্রি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই নাম পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় ঋষি সপ্ত কল্পজীবি। এই কল্প, ক্ষুদ্র কল্প বা ব্রহ্মার একদিন। মার্কণ্ডেয় ঋষির এক এক বৎসর আমাদের এক এক মন্বন্তর। অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য ধারণা করার পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-

চৈতন্যের ধারণা করুন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনার প্রারম্ভেই মার্কণ্ডেয়-চৈতন্যের চিন্তা করার ব্যবস্থা শ্রীরূপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে দিয়াছেন। আর আমাদের প্রত্যেক শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের পূজার বিধান।

বেদে যাহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে তাহা ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসরে হইয়া থাকে।

এবং পঞ্চাশদাব্দে তু গতে চ ব্রহ্মণো নৃপ।
দৈনন্দিনস্ত প্রলয়ো বেদেষু পরিকীর্ত্তিতঃ॥

এই দৈনন্দিন প্রলয়কে মোহরাত্রি বলে।

একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রাহ্মী শত বর্ষের অবসানে ব্রহ্মার নিপাত হয়। ইহার নাম মহাকল্প। ব্রহ্মার নিপাতের পর যে প্রলয়ের অবস্থা তাহার নাম মহারাত্রি। এই মহাকল্প ও মহারাত্রি একত্র করিলে যে পরিমাণ সময় হয়, তাহা প্রকৃতির এক নিমেষ। এই নিমেষ ধরিয়া শতবর্ষ গণনা করিলে যে সময় হয়, তাহার অবসানে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে।

অনন্তের চিন্তা করিতে হইলে প্রথমেই অনন্ত কাল ও অনন্ত দেশের চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং এই প্রকারে সময়ের হিসাব করা নিতান্তই স্বাভাবিক। ভারতের পৌরাণিকগণ এই প্রকারেই অনন্তকে অনন্তকালের সাহায্যে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অনন্তকালের বুকে কোন ঘটনাই নূতন হইতে পারে না। এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা যে আর কখন ঘটে নাই, এই প্রথম ঘটিল, ইহা হইতেই পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। অনন্তকালের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত দেশ বা অসংখ্য ও অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাও স্বাভাবিক। প্রত্যেক ঘটনাই অসংখ্যবার ঘটিয়াছে।

এই তিন প্রকারের অসংখ্য ও অগণ্য। কাল, দেশ ও ঘটনা। ঘটনার নামই নিমিত্ত বা পাত্র। তিনই অসংখ্য। মানবের পক্ষে কোন অবস্থায় এই প্রকারের ভাবনা আসিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন পুরাণ পড়িবার সময় স্বভাবতঃই মনে হয়। এই প্রকারের ভাবনা সঙ্গত ও প্রয়োজন কিনা, এই প্রশ্ন তুলিয়া অনন্ত-প্রসারী মানব-মনের অবাধ গতি সঙ্কুচিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই প্রকারের ভাবনা পৃথিবীতে অনেকেরই মনে জাগিয়াছিল। যাঁহাদের মনে খুব ভাল করিয়া জাগিয়াছিল এবং যাঁহারা নির্ভয়ে এই ভাবনার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতের পৌরাণিক ঋষি। বেদে আছে

"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, নূতন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। অনন্তের বুকে নূতন কিছুই নাই। প্রত্যেকেরই অসংখ্য ও অগণ্য স্থান যাঁহাতে আছে, তিনিই অনন্ত। কাজেই পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই অনুস্মৃতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন। Eternal Recurrence.

এই অনন্তের চিন্তায় ও আলোচনায় কল্পনা ব্যতীত মানুষের অন্য কোন বৃত্তি আপাততঃ কার্য্যকরী নহে। একালের কোন পণ্ডিতলোক যিনি প্রত্যক্ষের এই প্রয়োজন বা ব্যবহারকেই একান্তভাবে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তিনি বলিবেন,—"এ যে নিছক কল্পনা"। বেশ কথা। ইহা কল্পনা। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি বলিবেন,—"ইহা যখন কল্পনা, তখন মিথ্যা। মিথ্যার জাল বুনিয়া কি হইবে?" এইখানেই মতভেদ, দুর্জ্জয় মতভেদ। আমরা যেন সত্য পাইয়াছি, সত্যকে সম্পূর্ণরূপে চিনিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিয়াছি! এই ধারণাই আমাদের সর্ববিধ সর্ব্বনাশের মূল। সত্যকে আমরা এখনও পাই নাই। যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া আমরা অহঙ্কার করিতেছি, তাহা ব্যবহারিক সত্য, পারমার্থিক সত্য নহে। সুতরাং "কল্পনা" মিথ্যা নহে। একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে এক প্রকারের কল্পনা মিথ্যা হইতে পারে। সীমা বাড়াইলেই আগেকার সত্য মিথ্যা হয়, আর আগেকার মিথ্যা সত্য হয়। ইহা বুঝা কঠিন নহে। অনন্তের বুকে সর্ব্ববিধ কল্পনারই স্থান আছে, ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা কল্পনা, তাহাকে হঠাৎ মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সত্য করিয়া অনন্তের উপাসনা করিতে পারিবেন না। সীমার মধ্যে বাঁধা পড়িয়া যাইবেন।

মানবাত্মার অসীমদর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই প্রতিবিম্ব অগণ্য বৈচিত্র্যময়। মানুষ স্বরূপে নিত্য ও অনন্ত, কিন্তু সে এখন নিজেকেই ভুলিয়া রহিয়াছে। চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, দেহ, প্রভৃতি লইয়া মানুষ একটা গোলযোগের ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু এই গোলযোগ বা অবিদ্যার দুঃস্বপ্নের মধ্যেও সেই অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। কিন্তু দর্পণ বন্ধুর হইলে প্রতিবিম্ব যেমন বিকৃত হয়, সাধারণ মানবের চিত্ত-দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্বও সেইরূপ বিকৃত ও বিসদৃশ। অনন্তের প্রতিবিম্বপাতের দ্বারাই মানবের কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয়। সাধারণ মানুষের কল্পনা সিদ্ধ কল্পনা নহে, কারণ তাঁহার চিত্তদর্পণে অনন্তের যে প্রতিবিম্বপাত হয় তাহা নিখুঁত প্রতিবিম্ব নহে। এই

কল্পনাশক্তি আমি যদি হারাইয়া বসি বা চেষ্টা করিয়া সঙ্কুচিত করি, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইব ও আত্মঘাতী হইব। এই কল্পনার অনুশীলনের জন্য সাধনা আবশ্যক। এই সাধনাই সর্ব্বোত্তম।

মানুষের বৈজ্ঞানিকী শক্তি বা বৃত্তি আছে। এই শক্তির অনুশীলন চলিতেছে। গণিত হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় ব্যবহারিক বিদ্যা (Exact science) এই শক্তির অনুশীলনে সাহায্য করিতেছে। খুব ভাল কথা। এই শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হউক। কিন্তু এই শক্তি বা বৃত্তি ছাড়া মানুষের কি আর কোন শক্তি বা বৃত্তি নাই? কে বলিল? আরও অনেক শক্তি বা বৃত্তি আছে।

মানুষ কবি হয়, মানুষ দার্শনিক হয়, মানুষ সাধু বা মহাপুরুষ হয়। একজন কবি, একজন দার্শনিক বা একজন মহাপুরুষ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে যুগ যুগ ধরিয়া কল্যাণের পথে পরিচালনা করেন। তাঁহারা যে মানবজাতিকে উন্নীত করেন, মানবের কোন্ শক্তির অনুশীলনের দ্বারা? এখানে মূলতঃ কল্পনাশক্তিরই জাগরণ ও হৃদয়বৃত্তির প্রসারণই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কল্পনাশক্তিকে অবজ্ঞা করিবেন না। কল্পনা-শক্তির কার্য্যকে মিথ্যা বলিবার দুঃসাহস বা কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে ভারতের ও প্রাচীন জগতের পৌরাণিক ঋষিগণের চিন্তা-প্রণালী ও সাধনপ্রণালীর মর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমে অনন্তের চিন্তা করুন। দেশ ও কালের মধ্যে এই অনন্তের লীলা দর্শন করুন। যাবতীয় ঘটনাই অগণ্য ও অসংখ্যবার ঘটিয়াছে, ইহা আপনা হইতেই হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিবে। প্রত্যেক ঘটনারই চারিদিকে যেন লেখা রহিয়াছে—'আমি নূতন নহি, অসংখ্যবার আমি ঘটিয়াছি, এবং অগণ্যবার আমি ঘটিব।'

কিন্তু, আমার যে একটি প্রয়োজনীয় কাজ রহিয়াছে। ঘটনাটিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যতক্ষণ তাহা না পারিব, ততক্ষণ আমার নিস্তার নাই। যদিও অসংখ্যবার ঘটি-য়াছে, কিন্তু ঘটনাটি একই ঘটনা। কাজেই ঘটনাটির যাহা প্রাণ, আত্মা বা তত্ত্ব, তাহা এক, কিন্তু প্রকাশগত পার্থক্য থাকিতে পারে। এই বহু বা বিচিত্রের মধ্যে একই রহিয়াছেন। তত্ত্ব কত প্রকারে কল্পিত হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিলে আমরা কল্পভেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব। যদি কেহ বলেন—'ইহা কল্পনা, কেবল কল্পনা mere imagination

তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু, তাই বলিয়া যদি কেহ বলেন, 'ইহা মিথ্যা' তাহা হইলে যথেষ্ট আপত্তি আছে। সত্য কি, মিথ্যা কি, এই লইয়া আলোচনা চলিবে এবং পূর্ব্বে যে কথাগুলি বলা হইল, তাহাই আবার নূতন করিয়া বলা হইবে,—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির কল্পান্তর হইবে। কল্পনাভেদ কি, তাহা আর বুঝাইতে পারা যাইবে না, পূর্ব্বে যে চিন্তা ও অনুভব প্রণালী বলা হইল, তাহার অনুশীলন করিলে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা যাইবে।

২। শ্রীরাধার আবির্ভাবের পূর্ব্বকথা

শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার আবির্ভাবের মূলে এক কলহ ও অভিশাপ। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ। এক পুরুষ বহু প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করেন। আজ বিরজার সহিত ক্রীড়া হইতেছে—এমন সময়ে তথায় শ্রীরাধিকা উপস্থিত! বিরজা ভয়ে নদী হইলেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। সুদাম গোপ শ্রীরাধার পুত্র আবার শ্রীকৃষ্ণের সখা। তিনি শ্রীরাধার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন। শ্রীরাধা সুদামকে শাপ দিলেন—"তুমি অসুর হও"। সুদামও শ্রীরাধাকে শাপ দিলেন—"তুমি পৃথিবীতে গোপকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ কর। ভগবান্ ভূভার হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন ও তোমার সহিত মিলিত হইবেন।" শ্রীরাধার অভিশাপে সুদাম শঙ্খচূড় হইয়াছিল। শ্রীরাধার আবির্ভাবের ইহাই আদি কথা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া অনেক ভক্তই প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রশ্নের কারণ, এই ক্রোধ ও অভিশাপ। ক্রোধ ও অভিশাপ পুরাণের সর্ব্বত্রই। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সহিত যেখানেই সম্বন্ধ স্থাপনা করিতে হইবে, সেইখানেই ক্রোধ ও অভিশাপ। ইহাই পুরাণের সনাতন ব্যবস্থা। বৈকুণ্ঠের সহিত বা গোলোকের সহিত মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে, বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের বস্তুকে মর্ত্ত্যে আনিতে হইবে, সেতু প্রয়োজন। ক্রোধ ও অভিশাপ সেই সেতু। সনকাদি ঋষির ক্রোধ ও অভিশাপের ফলে জয় বিজয়ের অসুরযোনিতে জন্ম, আর ভগবানের যোদ্ধৃবেশে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাব অতএব এই ক্রোধ ও অভিশাপের কথা একটু ভাবা দরকার। নাটকেও তাই। শকুন্তলায় দুর্ব্বাসার ক্রোধ ও অভিশাপ।

৩। ক্রোধ ও অভিশাপ

পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব জানা আবশ্যক। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথাগুলি পৌরাণিক মানিয়া লইয়া সেই তত্ত্বের সাহায্যে লীলাদর্শন করিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্বেও কল্পভেদ আছে, তবে মূলকথায় মতভেদ নাই। যিনি মূল তিনি পরব্রহ্ম, তিনি অজ্ঞেয়, ভাষার সাহায্যে তাঁহার স্বরূপের প্রতিবিম্বেরও প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হইবার নহে। তিনি এক। এই ঐক্যের ভিতরে সর্ব্ববিধ অনৈক্য বা বৈচিত্র্যের স্থান আছে। This unity co-ordinates all diversity তিনি এই বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকিয়াও ইহার অতীত, এই সমষ্টির বহির্ভূত। এই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম নিজেকে সীমার ভিতর আনিয়াছেন। এই সীমার ভিতর প্রবেশ বা আগমনই বিরজার সহিত বিহার। আমাদের চৈতন্যের সমুদয় অবস্থাগুলি মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিলে এই দুরূহ তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। স্বরূপে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছি, সকলই দেখিতেছি অথচ বিশেষ করিয়া কিছুই দেখিতেছি না, সকলই আছে অথচ যেন কিছুই নাই, আমি যেন থাকিয়াও নাই, এই এক অবস্থা তাহার পর একটা কিছুতে দৃষ্টি (ঈক্ষণ) বা মনোযোগ অবরুদ্ধ করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ সেই বিষয়ে সঙ্গ বা প্রীতি, তাহার পর কামের উদয় হইল, কাম প্রতিহত হইল ক্রোধ হইল। আমাদের এই প্রকারে ক্রোধের উদয় হয়, ভগবদ্গীতায় ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

একজন কবি তাঁহার নিজের ভাবে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ। তাহার পর ক্রমশঃ হঠাৎ এক অমরকাব্যের আভাস বা চিত্র তাঁহার মনে জাগিল। ভিতরে ভাব ও ভাবোন্মাদ থাকিল, কিন্তু তিনি সীমার ভিতর আসিলেন, একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ অবরুদ্ধ হইল। বিশ্বস্রষ্টাও যে কবি। বেদে তাঁহাকেও কবি বলা হইয়াছে, আবার সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকেও শ্রীমদ্ভাগবতে আদিকবি বলা হইয়াছে। সত্যই তিনি কবি, প্রকট বিশ্বপ্রপঞ্চ, এই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেণী তাঁহার মহাকাব্য, এক এক সৌরমণ্ডল এক একটি সর্গ, এক একটি গ্রহ যেন সেই মহাকাব্যের এক একটি চরণ, আমরা যেন সেই মহাকাব্যের একটি একটি শব্দ।

অসীম স্বরূপে সীমার রেখাপাতই বিরজার সহিত বিহার। শ্রীরাধার সহিত কলহ

ও স্বরূপে সীমার রেখাপাত বা একটি স্বাতন্ত্র্য-বোধের কল্পনা। এই কলহ অবশ্য প্রেম-কলহ। মিলনকে মধুরতর করার জন্যই এই কলহ। আদর্শ ও বাস্তব, ভাব ও ভব Norm and form, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের যে প্রয়াস ও পদ্ধতি, তাহাই অভিশাপ। আপাততঃ সংক্ষেপেই এই বড় কথাটি বলা হইল। ইহাও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নিজের চৈতন্যের ক্রিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে হইবে।

৪। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাহার হেতু

বরাহকল্পে বসুন্ধরা দৈত্যভারে পীড়িতা হইয়া দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা সকল কথা শুনিয়া কৈলাস-শিখরে মহাদেবের নিকট গেলেন। মহাদেব ও পার্ব্বতী সকল কথা শুনিলেন। তাহার পর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ও মহেশ্বর ধর্ম্মের সহিত গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্তব-স্তুতি শুনিয়া বলিলেন—"আমি ভূভারহরণের জন্য আবির্ভূত হইব। তোমরা সকলে অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর।" তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীগণকে ডাকিয়া বলিলেন—"যাও, তোমরা সকলে অবতীর্ণ হও।" শ্রীরাধিকাকেও অবতীর্ণ হইতে বলিলেন।

শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু রাজা, মাতার নাম কলাবতী। কলাবতী লক্ষ্মীরূপা ও পিতৃগণের মানস-কন্যা, দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে মনুষ্য জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এই স্থানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে বিষ্ণু, নারায়ণ, নরনারায়ণ ঋষি প্রভৃতি, রাধিকেশ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে এই সময়ে লীন হইলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গোস্বামীপাদগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে তত্ত্ব প্রচারিত করাইলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা তাহার প্রায় সকল কথাই দেখিতে পাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

> পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে।
> আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
> নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
> যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥

সত্ত্বে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুরসংহারে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথাই এখানে আরও বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হইবার যে অন্তরঙ্গ হেতু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাই। সেই অন্তরঙ্গ হেতু এই। অসুরবিনাশ করিয়া ভূভার হরণ করা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে। উহা স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুর কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ যে অসুর বিনাশ করিয়াছেন, উহা ঠিক্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের দেহে ছিলেন, তিনিই অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে স্বয়ং ভগবানের কার্য্য কি? শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন—

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেম নহে মোর প্রীত॥

এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ রাগমার্গ ভক্তি প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উদ্দেশ্য —

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে লীলায় অবতীর্ণ হওয়ার এই উদ্দেশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিধিমার্গেরই উপদেশে পরিপূর্ণ এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতের এই প্রভেদও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে সমুদয় কথা বলা হইয়াছে তাহা রহস্যাবৃত। শ্লোকগুলির স্পষ্টার্থ গ্রহণ করিলে যাহা পাইব, গোস্বামীপাদগণের টিকা পড়িলে অন্যরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনার সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনার প্রভেদও অনেক।

প্রথম প্রভেদ এই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে ব্রহ্মা শিব ও ধর্ম্ম, এই তিনজনে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৃথিবীর দুঃখের কথা জানাইতে গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ব্রহ্মা দেবগণকে এবং মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরপয়োনিধির তীরে গমন করিয়া পুরুষসূক্তের দ্বারা সর্ব্বকাম-বর্ষুক বা সর্ব্বক্লেশ-নিবারক পুরুষের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে ব্রহ্মা প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কথোপকথন হইল, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে আছে দৈববাণী হইল, ব্রহ্মা তাহা শুনিতে পাইলেন ও অন্যান্য দেবতাগণকে তাহা বলিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের টিকাকার গোস্বামীপাদগণ বলেন ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে গিয়াছিলেন। ক্ষীরোদসাগরের মধ্যে শ্বেতদ্বীপে যে ভগবৎ-পুরী আছে, ব্রহ্মা প্রভৃতি সেখানেও যাইতে পারেন নাই। কারণ ঐ ভগবৎপুরী সাতিশয় দুর্ল্লভ। ব্রহ্মা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈববাণীতে জানিলেন স্বয়ং ভগবান্ই আসিবেন।

দ্বিতীয় প্রভেদ এই, ব্রহ্মা যখন দৈববাণীতে জানিতে পারিলেন পরমপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, তখন তিনি দেবগণকে বলিলেন সেই পরমপুরুষের প্রিয়কার্য্য-সাধনের জন্য দেবরমণীগণ জন্মগ্রহণ করুন। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপগোপীগণের কথা আছে, কিন্তু তাঁহাদের আবির্ভাবের কথা নাই। মধুর-রসবতী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী স্থানীয়া গোপিকাদিগের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাঁহাদের নাম নাই। এই পার্থক্যগুলি আলোচনা করা আবশ্যক। ইহা হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তসমূহ উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভক্তগণ কত প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। যাহা হউক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উপাখ্যান অনুসরণ করা যাউক।

৫। শ্রীকৃষ্ণের মিলন

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরাধার আবির্ভাব হয়। যশোদার সহোদর ভ্রাতা রায়াণ। দ্বাদশ বৎসর যখন বয়স, তখন শ্রীরাধার সহিত রায়াণের বিবাহ হয়। এই বিবাহ সত্য করিয়া শ্রীরাধার সহিত হয় নাই, ছায়ার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। রায়াণ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে, গর্গাচার্য্য যে সময়ে নন্দগোকুলে শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের নামকরণ করিতে আসেন, সে সময়ে তিনি নন্দ মহারাজকে শ্রীরাধার তত্ত্বও আনুপূর্ব্বিক বলিয়াছিলেন। গর্গাচার্য্য বলেন—একই তত্ত্ব লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। গোলোকের অভিশাপের কথাও গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজকে বলেন। সেই হইতেই নন্দমহারাজের দৃষ্টি ও মনোযোগ শ্রীরাধার প্রতি ছিল। তাহার পর একদিন নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিতান্ত শিশু। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও ভীষণ বজ্রগর্জ্জন আরম্ভ হইল। শিশু কৃষ্ণ ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা অবশ্য তাঁহার মায়া। নন্দমহারাজ নিতান্তই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শ্রীরাধিকা তথায় উপস্থিত। শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া নন্দ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এসময়ে এস্থানে শ্রীরাধার আগমন একেবারেই অসম্ভব।

নন্দমহারাজ শ্রীরাধার তত্ত্ব জানিতেন। গর্গাচার্য্যের নিকট সকল কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকে এই সঙ্কটের সময় হঠাৎ দেখিতে পাইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ও নতমস্তকে শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—"দেবি, গর্গমুনির নিকট আপনার মহিমা যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। আপনি লক্ষ্মী অপেক্ষাও হরির প্রিয়পাত্রী। গোকুলবিহারী এই কৃষ্ণই হরি। আপনি আপনার প্রাণনাথ হরিকে গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া গোপরাজ নন্দ রোদনপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া দূরে চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মণিময় রাসমণ্ডল নির্ম্মিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ আর বালক নহেন। তিনি কিশোর মূর্ত্তি

ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথোপকথন হইতেছে; এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া স্তব পাঠ করিলেন। তাহার পর হোমানল প্রজ্বলিত হইল। ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণকে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া বেদ-বিধিমতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক রাধাকে কৃষ্ণের বামে বসাইলেন এবং পিতা যেমন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করে, ঠিক সেই প্রকারে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মার পৌরহিত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যথাবিধি বিবাহ হইয়া গেল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আবার শিশু হইলেন, শ্রীরাধিকা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদাকে দিলেন। ইহার পর হইতে শ্রীরাধা নিজের ছায়ামাত্র গৃহে রাখিয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসমণ্ডলে বিহার করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে যে উপাখ্যান লিখিত হইল তাহা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে। তাহার কয়েকটি শ্লোক নিম্নে দেওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে--

মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্॥
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপহ॥

শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতেছেন, নন্দ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে তথায় শ্রীরাধিকা আসিয়া উপস্থিত।

এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।
গমনং কুর্ব্বতী রাজহংসখঞ্জনগঞ্জনম্॥
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভ—চারুবক্ত্রামনোহরা।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা॥

নন্দ মহারাজ শ্রীরাধার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন।

ইত্যুক্ত্বা স দদৌ তস্যৈ রুদন্তং বালকং ভিয়া।
জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বর্ণনার সহিত শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক তুলনীয়। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক এই।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং তদেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়ো প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

এই শ্লোকের সাধারণ অর্থ বা স্পষ্টার্থ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অনুরূপ। মেঘসমূহের দ্বারা গাঢ়স্নিগ্ধ আকাশতল, বনভূমি শ্যামবর্ণ হইয়াছে তমালবৃক্ষসমূহের দ্বারা; রাত্রিকালে ভীরু হয় অর্থাৎ ভয় পায় এই ছেলেটি। অতএব হে রাধে, ইহাকে বাড়ী লইয়া যাও। নন্দ মহারাজের এই আদেশে পথসমীপবর্ত্তী কুঞ্জের অভিমুখে প্রচলিত রাধামাধবের যমুনা-তটের নির্জ্জন বিহারসমূহ জয়যুক্ত হউক।

শ্রীগীতগোবিন্দের একজন প্রাচীন টিকাকার পূজারি গোস্বামী। ইনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা তাঁহার টিকা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় ইনি শ্রীগোপালভট্টের শিষ্য এবং শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া এই টিকা রচনা করিয়াছিলেন।

পূজারি গোস্বামী এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার অর্থ এইরূপ। লীলা ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে প্রথমে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্ব না জানিলে লীলা বুঝিবার উপায় নাই। সেই তত্ত্ব এই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, আর শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী। "নন্দনিদেশ" কথার অর্থ নন্দমহারাজের নিদেশ নহে। "নন্দশ্চাসৌ নিদেশশ্চেতি নন্দনিদেশঃ"—ইহার অর্থ আনন্দকর সখী বচন। "নক্তং ভীরুঃ" ইহার অর্থ—পূর্ব্বরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত ছিলেন না, অতএব কৃষ্ণ অপরাধ করিয়াছেন, এই অপরাধ স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে ব্যথা হইয়াছে। শ্লোকটির অর্থ—হে রাধে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বরাত্রিতে অপরাধ করিয়া ভয় পাইয়াছে, অতএব তুমিই তাঁহার নিকট যাও। যদি বল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, পথে অনেক লোক কেমন করিয়া যাইব? তাহা বলিতে পার না। স্নিগ্ধ মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, বনভূমি শ্যামবর্ণ হইয়াছে। এই গেল পূজারি গোস্বামীর টিকা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীরাধাগোবিন্দ যাঁহাদের উপাস্য তাঁহারা প্রকট লীলায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা

বলেন লীলা সত্য সত্য প্রপঞ্চে বা আমাদের পৃথিবীতে প্রকট হইয়াছিল। কিন্তু এই ঐতিহাসিকতা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার ভিত্তি নহে। উপাসনার ভিত্তি নিত্যলীলা। আজও সে লীলা চলিতেছে। নিত্য কৃষ্ণ ও নিত্য রাধা আর নিত্য বৃন্দাবন, কিন্তু ইহাকে রূপক বলিবেন না।

কিন্তু এই রাধাকৃষ্ণের লীলা নানাভাবে নানাগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমুদয় বর্ণনাও উপেক্ষণীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাসম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই আপাততঃ আমাদের নিকট চরমতত্ত্ব ও পরম কথা। সেই কথায় আমরা দেখিব শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা পবিত্রতম চিন্ময় রসের অফুরন্ত উৎস, ভক্তহৃদয়ের সকল সাধ পূর্ণ করার জন্য এই রস আস্বাদন ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। যাঁহারা মুক্ত ও আত্মারাম, তাঁহারা ও এই রস পরম সমাদরে আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই লীলায় কামগন্ধ নাই, প্রাকৃত মালিন্যের কণামাত্রও নাই। সুতরাং অন্যান্য পুরাণে এই লীলার যে বর্ণনা আছে, তাহা যদি আস্বাদন করিতে হয়, তাহা হইলে স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়জগৎ ও কামজগৎ হইতে চিত্তকে একেবারে সরাইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় রসিক ও ভাবুক হইয়া—From the standpoint of the highest abstraction ইহা আস্বাদন করিতে হইবে। ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব নাটক, গোপালচম্পূ ও পদাবলী সাহিত্য, এই সকলের মধ্যে যে শ্রীরাধাকথা আছে, তাহাও আমাদের সযত্নে আস্বাদনীয়। লীলা বুঝিতে হইলে তত্ত্ব জানা দরকার।

৫। শ্রীরাধার ষোড়শ নাম

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে সামবেদে শ্রীরাধার সহস্র নাম কথিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ষোলটি নাম প্রসিদ্ধ।

রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী॥
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা পরমানন্দরূপিণী।
কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী॥
চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্তা শতচন্দ্রনিভাননা।
নামান্যেতানি সারাণি তেষামভ্যন্তরাণি চ॥

রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ।
ধা নির্ব্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকীর্ত্তিতা ॥১

রা শব্দ দানবাচক, আর ধা বলিতে নির্ব্বাণ বুঝায় অতএব যিনি নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন তিনি রাধা। মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা নির্ব্বাণমুক্তি চাহেন না, বরং শুনিলে ভয় পাইয়া থাকেন।

রাসেশ্বরস্য পত্নীয়ং তেন রাসেশ্বরী স্মৃতা।২
রাসে চ বাসো যস্যাশ্চ তেন সা রাসবাসিনী ॥৩

তিনি রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পত্নী বলিয়া তাঁহার নাম রাসেশ্বরী। আর রাসমণ্ডলে বাস করেন বলিয়া রাসবাসিনী ॥২।৩

সর্ব্বাসাং রসিকানাঞ্চ দেবীনামীশ্বরী পরা।
প্রবদন্তি সদা সন্তস্তেন তাং রসিকেশ্বরীম্ ॥৪

সমুদয় রসিকা দেবীগণের ঈশ্বরী বলিয়া তাঁহার নাম রসিকেশ্বরী।৪

প্রাণাধিকা প্রেয়সী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা সা চ কৃষ্ণেন পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৫

তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণঅপেক্ষাও অধিক প্রিয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে কৃষ্ণ-প্রণাধিকা বলিয়া থাকেন।৫

কৃষ্ণস্যাতি প্রিয়া কান্তা কৃষ্ণো বাস্যাঃ প্রিয়ঃ সদা।
সর্ব্বৈর্দেবগণৈরুক্তা তেন কৃষ্ণপ্রিয়া স্মৃতা ॥৬

তিনি কৃষ্ণের অতি প্রিয়কান্তা, অথবা কৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্বদাই প্রিয়, এই কথা সমুদয় দেবগণ বলিয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহার নাম কৃষ্ণপ্রিয়া।৬

কৃষ্ণরূপং সংবিধাতুং যা শক্তি চাবলীলয়া।
সর্ব্বাংশৈঃ কৃষ্ণসদৃশী তেন কৃষ্ণস্বরূপিনী ॥৭

তিনি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণরূপ বিধান করিতে সমর্থা এবং সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশী বলিয়া কৃষ্ণস্বরূপিনী নামে প্রসিদ্ধ।৭

বামার্দ্ধাঙ্গেন কৃষ্ণস্য যা সম্ভূতা পুরা সতী।
কৃষ্ণবামাংশ সম্ভূতা তেন কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতা ॥৮

তিনি শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইজন্য নাম কৃষ্ণবামাংশ-সম্ভূতা। এই নামও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।৮

পরমানন্দরাশিশ্চ স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সতী।
শ্রুতিভিঃ কীর্ত্তিতা তেন পরমানন্দরূপিণী ॥৯

তিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমতী পরমানন্দরাশি, এজন্য বেদ তাঁহাকে পরমানন্দরূপিণী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।৯

কৃষির্মোক্ষার্থবচনো ণ এবোৎকৃষ্ট বাচকঃ।
আকারো দাতৃবচনস্তেন কৃষ্ণাত্র কীর্ত্তিতা ॥১০

কৃষ শব্দে মোক্ষ, ণ-কার অর্থে উৎকৃষ্ট, আকার অর্থে দান, তিনি উৎকৃষ্ট মোক্ষদায়িনী বলিয়া কৃষ্ণানামে বিখ্যাত।১০

অস্তি বৃন্দাবনং যস্যাস্তেন বৃন্দাবনী স্মৃতা।
বৃন্দাবনস্যাধিদেবী তেন বাথ প্রকীর্ত্তিতা ॥১১

তাঁহার বৃন্দাবন আছে, অথবা তিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এই কারণে তাঁহার নাম বৃন্দাবনী ॥১১

বৃন্দঃ সংঘবচঃ সখ্যুরকারোঽপ্যস্তিবাচকঃ।
সখীবৃন্দোঽস্তি যস্যাশ্চ সা বৃন্দা পরিকীর্ত্তিতা ॥১২

বৃন্দ শব্দে সখীসমূহ আর অকার বলিতে আছে বুঝায়। অতএব যাঁহার সখীবৃন্দ আছে, তিনি বৃন্দা নামে অবিহিত।১২

মুদ্বাচকো বিনোদশ্চ সা অস্যা অস্তি তত্র চ।
বেদা বদন্তি তাং তেন বৃন্দাবনবিনোদিনীম্ ॥১৩

বিনোদ শব্দ আনন্দ-বাচক, বৃন্দাবনে তাঁহার বিনোদ আছে বলিয়া বেদসমূহ তাঁহাকে বৃন্দাবনবিনোদিনী বলিয়া থাকেন।১৩

নখচন্দ্রাবলী যস্যা বক্ত্রচন্দ্রোঽস্তি সন্ততম্।
তেন চন্দ্রাবলী সা চ কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতা পুরা ॥১৪

শ্রীরাধার নখসমূহ চন্দ্রের ন্যায়, মুখও সর্ব্বদাই চন্দ্রের ন্যায় এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চন্দ্রাবলী বলেন ১৪

কান্তিরস্তি চন্দ্রতুল্যা সদা যস্যা দিবানিশম্ ।
সা চন্দ্রকান্তা হর্ষেণ হরিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥১৫

শ্রীরাধিকার কান্তি দিবারাত্রি সকল সময়েই চন্দ্রতুল্য। এই কারণে হরি হর্ষভরে তাঁহাকে চন্দ্রকান্তা বলিয়া থাকেন ।১৫

শতচন্দ্রপ্রভা যস্যাশ্চাননেঽস্তি দিবানিশম্ ।
মুনিনা কীর্ত্তিতা তেন শতচন্দ্রপ্রভাননা ॥১৬

শ্রীরাধার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই শতচন্দ্রের প্রভা বিরাজমান, এই কারণে মুনিগণ তাঁহাকে শতচন্দ্রনিভাননা বলিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে শ্রীরাধার বয়ঃক্রম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা চতুর্দ্দশ বৎসর অধিক। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাচিন্তায় অন্যরূপ বয়ঃক্রম আরোপ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর, বয়স পনর বৎসর, নয় মাস সাত দিন, পীতাম্বর, নবীনমেঘবর্ণ। শ্রীরাধিকা নিত্যকিশোরী, বয়স চৌদ্দ বৎসর, দুই মাস চৌদ্দ দিন, নীল-বসনা, ললিত হেমবর্ণা। শ্রীরাধিকার অষ্টসখীর বর্ণ, বস্ত্র, সেবা, ভাব, কুঞ্জের বর্ণ ও বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত আছে। ললিতা ও বিশাখা, শ্রীরাধিকা অপেক্ষা বয়সে একদিনের বড়, চিত্রা দুই দিনের, ইন্দুরেখা পাঁচ দিনের বড়, চম্পকলতা দুই দিনের ছোট, রঙ্গদেবী ছয় দিনের বড়, তুঙ্গবিদ্যা ও সুদেবী যথাক্রমে এক দিনের ও ছয় দিনের ছোট। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রধানসখীর বর্ণ যথাক্রমে গোরোচনা, বিদ্যুৎ, কাশ্মীর, হরিতাল, চম্পক, পদ্মকিঞ্জল্ক, চন্দ্রকুঙ্কুম, ও সুবর্ণের ন্যায়। তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণ যথাক্রমে ময়ূরপুচ্ছ, তারাবলী, কাচপ্রভা, দাড়িম্বকুসুম, চাসপক্ষী, জবাকুসুম, পাণ্ডুর ও প্রবালবর্ণ। ইঁহারা যথাক্রমে নিম্নরূপ সেবা করিয়া থাকেন তাম্বুল, চন্দন, বস্ত্রালঙ্কার, নৃত্য, চামর, অলক্ত, গীতবাদ্য ও জল। অষ্টসখীর অষ্টভাব যথাক্রমে খণ্ডিতা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, দিবাভিসারিকা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠা, বিপ্রলব্ধা ও কলহান্তরিতা। ইঁহাদের কুঞ্জের বর্ণ যথাক্রমে বিদ্যুৎ, মেঘ, কিঞ্জল্ক, স্বর্ণ, তপ্তস্বর্ণ, শ্যাম, অরুণ ও হরিদ্বর্ণ। এই সমুদয় বর্ণনা অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নাই। ভক্তগণ এই প্রকারে চিন্তা করেন। এই সমুদয় বর্ণ ও ভাব চিন্তা করিলে হৃদয়বৃত্তির যে অনুশীলন হয় তাহা অদ্ভুত। পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

———०———

কলিকাতায় আত্মবিদ্যা (Spiritualism.)

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) মহাশয়ের On the Soul নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক আছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—প্রথম বয়স হইতেই আমার দর্শন ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের উপর খুব ঝোঁক ছিল। এসম্বন্ধে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলাম। শেষে আমি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইলাম। কিন্তু আমি সর্ব্বদাই অনুভব করিতাম যে আমরা মনের দ্বারা যে ঈশ্বর তত্ত্বের আলোচনা করি, তাহা আত্মার দ্বারা অনুভূত ঈশ্বর তত্ত্ব হইতে পৃথক্। The God of the mind was not the God of the Soul. ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়। আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি। সেই সময়ে আমি Spiritualism বা বিলাতী আত্মবিদ্যার আলোচনা আরম্ভ করি। স্ত্রী-বিয়োগে শোকার্ত্ত না হইলে, এই আলোচনা বোধ হয় করিতাম না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আমি জজ এড্‌মণ্ডস্‌কে একখানি পত্র লিখি এবং এই আত্মবিদ্যার কি প্রকারে অনুশীলন করিতে হয়, তাহার উপদেশ প্রার্থনা করি। পত্রের উত্তরে তিনি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি আমার Stray Thoughts on Spiritualism নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে ডাক্তার বেরিণী কলিকাতায় অসিলেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া প্রেতানয়ন-মণ্ডলীর (Seance) অধিবেশন হইত। হঠাৎ একদিন এই অধিবেশনে আমি মিডিয়ম হইয়া পড়িলম ; অর্থাৎ আমার দেহে প্রেতের আবেশ হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি খুব গভীর ভাবে এই আত্ম-বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছি। বহুবর্ষ এই পদ্ধতিতে কার্য্য করিয়া আমি বুঝিয়াছি—আমাদের যোগ-বিদ্যা ও বিলাতী আধুনিক আত্ম-বিদ্যা, ইহাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। এই সাধনার দ্বারা আমাদের নিম্ন-জীবন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-শাসিত পশুভাব ক্রমে ক্রমে দূরীভূত বা সংযত হইয়া থাকে। স্যর্ হাম্‌ফ্রে ডেভি, নাইট্রাস্ অক্সাইডের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া এই প্রকারের অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এই অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নাই ; ভাবের দ্বারাই বিশ্ব গঠিত।

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়,—জজ এড্‌মণ্ডস্ ব্যতীত জেমস্ বার্ণস্, জে, জে, মর্স, শ্রীমতী এমা, এইচ্ ব্রিটেন্ এবং মার্কিন দেশের অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ আত্মবিদ্যাবিদের সহিত নিয়মিতভাবে

পত্র-ব্যবহার করিতেন। আমাদের দেশে প্রথম সময়ে যাঁহারা এই বিলাতী আত্ম-বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, প্রবন্ধ-বিশেষে বলিয়াছেন—বিলাতী আত্ম-বিদ্যাই রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের ধর্ম্ম ছিল। তিনি এই বিদ্যায় এতদূর বিশ্বাস করিতেন যে, প্রায়ই বলিতেন যে মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার মৃত বন্ধুগণের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবেন।' এখানেও যেমন, সেখানেও ঠিক্ তেমনি। তবে সেখানকার খাদ্য, স্থূল নহে, সূক্ষ্ম। তাঁহার এক পুত্র একবার ছাদের উপর হইতে পড়িতে পড়িতে দৈব-যোগে বাঁচিয়া যায়। এই ঘটনা সম্বন্ধে রাজা বলিতেন যে, তাঁহার মৃত পিতা গিরিশচন্দ্রই, ঐ শিশুকে বাঁচাইয়াছেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ আত্ম-বিদ্যাবিৎ ডাক্তার জে, এম্ পীবল্‌স্ কলিকাতায় আসেন। আত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র আত্ম-বিদ্যার পক্ষপাতী; কারণ এই বিদ্যার দ্বারা ধর্ম্ম উদার হইয়া যাইবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্টতা হইয়াছিল এবং তিনি দেশে ফিরিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতায় মিত্র মহাশয়েরও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ডাঃ পীবল্‌স্ Around the world নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নাম—The Oriental Spiritualists অর্থাৎ প্রাচ্য আত্ম-বিদ্যাবিৎগণ। এই অধ্যায়ে তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে দেখা যায় যে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রথমাবস্থায় আবিষ্ট হইয়া লিখিয়া যাইতেন—অর্থাৎ Writing medium ছিলেন। তাহার পর, তাঁহার আরও উন্নতি হয় এবং তিনি অন্তর্দৃষ্টি (Spiritual insight) লাভ করেন। তিনি তাঁহার মৃত পত্নীকে খুব স্পষ্টভাবে নিতান্ত কাছে দেখিতে পাইতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়, The Development of Female Mind in India নামক স্বলিখিত ইংরাজী গ্রন্থ ডাঃ পীবল্‌সকে উপহার দিয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের রমণীগণের স্বাধীন অবস্থা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

মহেন্দ্রনাথ পাল ও রমানাথ সেন নামক দুইটি ভদ্রলোক, আমেরিকা দেশের আত্মবিদ্যাবিষয়ক ব্যাপার সম্বন্ধে ডাঃ পীবল্‌সের সহিত নানারূপ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়ে কি করিয়া, প্রেতানয়নমণ্ডলী (বা Seance) করিতে পারা যায়, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই দুইটি ভদ্রলোক পীবল্‌সের আসিবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ড হইতে আত্মবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদি আনিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয় আর একজন আত্ম-বিদ্যার অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। প্যারীচাঁদ

মিত্র মহাশয়ের মধ্যস্থতায় পীবল্‌সের সহিত ইঁহার আলাপ হয়। এই পরিচয়ের পূর্ব্বেই, শিবচন্দ্র দেব মহাশয়, আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ডেভিস্, টাটন্, সার্জ্জেণ্ট ডেণ্টন, এড্‌মণ্ডস্ প্রভৃতি বিখ্যাত আত্মবিদ্যা প্রচারকগণের গ্রন্থ হইতে এই সমুদয় বাঙ্গলা গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তিনি ডাঃ পীবল্‌সের Seers of the Ages নামক ইংরাজী গ্রন্থের বহু অংশ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের সহিত ডাক্তার পীবল্‌সের যখন প্রথম পরিচয় হয় এবং পীবল্‌স্ যখন জানিতে পারেন যে, দেব মহাশয় পূর্ব্বেই তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন, তখন পীবল্‌সের আনন্দের ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

কলিকাতা রিভিউ পত্রের ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়, The Psychology of the Aryas অর্থাৎ আর্য্যজাতির মনস্তত্ব নামক প্রবন্ধ লেখেন। আমেরিকার আত্ম-বিদ্যাবিষয়ক Banner of Light নামক পত্রে এই গ্রন্থের সুবিস্তৃত সমালোচনা ও ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে লেখক হিন্দু মনোবিজ্ঞানের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অথবা বহিঃপ্রাজ্ঞ, অন্তঃপ্রাজ্ঞ, উভয়তঃপ্রাজ্ঞ ও তুরীয়—মানব-চৈতন্যের এই চারিটি অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সমুদয় আলোচনা পাঠ করিয়া আমেরিকাবাসী আত্মবিদ্যাবিদ্‌গণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাহা এই সমালোচনা পাঠেই বুঝিতে পারা যায়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের Spiritual Stray Leaves নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা প্রবন্ধগুলির তালিকা দিলাম—

(1) The Psychology of the Aryas, (Published in the Calcutta Review 1877)

(2) The psychology of the Budhists (Spiritualist, August 1877)

(3) God in the soul (Do—7 Septr. 1877)

(4) The spirit Land (Do—16 Nov. 1877)

(5) The spiritual State (Do—23 Nov. 1877)

(6) The Soul Revelations.

(7) The Soul (Spiritualist—30 May, 1878)

(8) Occultism & Spiritualism.

(9) Avedi or the Spiritualists (Banner of Light—August, 1878)

(10) Progression of the Soul (Do—12 January 1878)
(11) Soul Revelation in India (Do—5 April, 1878)
(12) Culture of Hindu females in Ancient Times (Calcutta Review—1878)
(13) The Human & Spiritual.

এই পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলেন—প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস—প্যারীচাঁদের রচনা; প্রথম হাস্যরসের রচনা (satirical work) প্যারীচাঁদের, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রথম বাঙ্গলা গ্রন্থ তাঁহারই রচনা; ঈশ্বরতত্ত্ব (Theism) বিষয়ক প্রথম বাঙ্গলা শৃঙ্খলাবদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার; প্রথম আধ্যাত্মিক উপন্যাস তাঁহার। এখন তিনি আত্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থ লিখিলেন—এ বিষয়ে আমাদের দেশে ইহাই প্রথম গ্রন্থ। Theosophists প্রভৃতি কাগজেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের আত্ম-বিদ্যাবিদ্‌গণের সমিতি সমূহ এই প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাদের সমিতির সম্মানিত সদস্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে Theosophists পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম—The Inner God. এই প্রবন্ধে লেখক আর্য্যজাতির শিক্ষা বর্ণনা করিয়া Theosophists ও Spiritualists দিগকে সম্মিলিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে কলিকাতা সহরে The United Association of Spiritualists নামক একটি সমিতি স্থাপিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার On the Soul নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে এই সমিতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রবিবারে ৩নং চার্চ্চলেনে জে, জি মিউজেন্‌সা-এর আফিসে কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই বন্ধুমণ্ডলী পূর্ব্বোক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মিউজেনস্ সাহেব সভাপতি ছিলেন—নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। বিলাত হইতে মিডিয়ম্ আনিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়, কিন্তু মিডিয়ম্ আসিয়া সময়ে উপস্থিত হইতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে, হাইকোর্টের সলিসিটর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হন। বেলগাছিয়ায় পূর্ণবাবুর একটি বাগান ছিল—সেই বাগানে এই সমিতির অধিবেশন হইত। ইংলণ্ডের British National Association of Spiritualists এর সভাপতি মিঃ আলেক্‌জাণ্ডার কেল্ডার এই সময়ে কলিকাতায় আসেন। তিনি বেলগাছিয়ার বাগানে এই সমিতির কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই সমিতি, নিত্য নিরঞ্জন ঘোষ নামক একটি খুব ভাল মিডিয়ম্ পাইয়াছিলেন। ডাঃ রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই মিডিয়মটিকে আনিয়াছিলেন। এই মিডিয়ম্ একটি যুবা পুরুষ—তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একটি লোক খুন হইয়াছিল—সেই লোকটিই প্রেত হইয়া ইহাকে আবিষ্ট করে। সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক আর একটি মিডিয়ম্ এই সমিতি পাইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার আর, মিত্র, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় 'শোক-বিজয়' নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থে, অনেকগুলি প্রেতানয়নমণ্ডলীর বিবরণ কথিত হইয়াছে। এই সমুদয় মণ্ডলীতে নরেন্দ্রনাথ সেন, আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বিলাতী আত্মবিদ্যা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের দেশে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের ভিতর প্রসার লাভ করিল। যোগ, আত্মবিদ্যা, Theosophy সম্বন্ধে মহারাজা, রাজা, ব্যারিষ্টার, উকীল, হাকিম, কলেজের ছাত্র, এমন কি, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। নানা স্থানে নানা প্রকারে প্রেতানয়নের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এই সময়ে সভাপতি স্বামী নামক একজন মাদ্রাজী সাধু কলিকাতা সহরে আগমন করেন। আলবার্ট হলে আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় সেই সমুদয় সভায় সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা সহরের কতকগুলি ভদ্রলোক আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া মিঃ ডবলিউ এগ্‌লিংটনকে নিমন্ত্রণ করিয়া কলিকাতা সহরে আনয়ন করেন। এগ্‌লিংটন সাহেবের তখন পৃথিবীময় খ্যাতি। তিনি প্রেত আনয়ন করিয়া তাহাকে মূর্ত্তিদানপূর্ব্বক দেখাইতে পরিতেন; অর্থাৎ তিনি একজন physical and materialising মিডিয়ম্ ছিলেন। ১৮৮১ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে তিনি কলিকাতায় আসেন। মাননীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে প্রথম মণ্ডলীর অধিবেশন হয়। তাহার পর বাবু দীননাথ মল্লিকের বাটীতে দুইটি অধিবেশন হয়। এগ্‌লিংটন যাহা দেখাইলেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত ও আত্মবিদ্যায় বিশ্বাসবান হইলেন। এগ্‌লিংটন যে সময়ে কলিকাতায় প্রেতানয়ন-মণ্ডলীতে নানারূপ অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে কর্ণেল অলকট্ ও মেডেম্ ব্লেভেট্স্কি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া পশ্চিম ভারতে থিয়সফি প্রচার করিতেছিলেন। সুতরাং এই সময়টি নব্যভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি খুব বড় উত্তেজনা ও কৌতূহলের সময়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় মিঃ এগ্‌লিংটনের একটি প্রেতানয়ন-মণ্ডলীর ব্যাপার বর্ণন করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

আমাদের দেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, এই সমুদয় আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত করা আবশ্যক। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাতেও, এই সমুদয় বিবরণ আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আত্মবিদ্যা বা Theosophy প্রভৃতির প্রচার-

কার্য্যে, স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা আমাদের সাহিত্যালোচনায়, মিত্র মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করি নাই। একমাত্র "আলালী ভাষা" মিত্র মহাশয়ের কীর্ত্তি নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও মনীষা, এখনও আলোচিত হয় নাই। *

শ্রীশিবরতন মিত্র

যোগসিদ্ধি।

১

যোগসিদ্ধি সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার। এই অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে আটটি শ্রীভগবানের আশ্রিত আর দশটি গুণের কার্য্য দেহের বা মূর্ত্তির সিদ্ধি তিন প্রকার অণিমা, মহিমা ও লঘিমা। "অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা"। যোগিদেহস্য শিলাদাবপি প্রবেশপ্রযোজকোঽণুত্বলক্ষণো গুণোঽণিমা। যোগী তাঁহার দেহকে শিলাপ্রভৃতির ভিতর প্রবেশ করাইবার জন্য অণুর ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে পারেন, এই শক্তির নাম অণিমা। সর্ব্বব্যাপনলক্ষণো মহিমা। অবার যোগী তাঁহার দেহ এত বড় করিয়া প্রসারিত করিতে পারেন যে তিনি সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন। এই শক্তির নাম মহিমা। "যেন সূর্য্যমরীচীরবলম্ব্য দেহস্য সূর্য্যলোকপ্রাপ্তির্ভবতি সলঘুত্বলক্ষণোগুণো লঘিমা।" যোগী সূর্য্যের কিরণ ধরিয়া সূর্য্যলোকে যাইতে পারেন, দেহকে এত বেশী লঘু করিতে তিনি সক্ষম। এই শক্তির নাম লঘিমা। এই তিনটি দেহগত সিদ্ধি।

"প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ" সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দেবতারূপ হইয়া যে সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা তাহার নাম প্রাপ্তি। এই অবস্থায় যোগী অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা চন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারেন। অঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসং। (ক্রমসন্দর্ভ)। সকল ইন্দ্রিয়ে প্রবেশের শক্তি থাকায় যোগী এই সিদ্ধি লাভ করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট বিষয় ইচ্ছানুসারে পাইতে পারেন।

"প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু।" শ্রুতেষু পারলৌকিকেষু দৃষ্টেষু দর্শনযোগ্যষ্বপি সর্ব্বেষু ভুবিবরাদি পিহিতে-ষ্বপি প্রাকাম্যং ভোগদর্শনসামর্থ্যং সিদ্ধিঃ। (শ্রীধর) শাস্ত্রাদিতে পরলোকাদি-সম্বন্ধে যাহা যাহা

শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় লিখিত National Magazine পত্র (১৯১৫ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা) হইতে সঙ্কলিত।

শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সমুদয়ে এবং দৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনের যোগ্য সমুদয় ভূবিবরাদির ভিতর অবস্থিত ভোগদর্শনের যে সামর্থ্য, তাহার নাম প্রাকাম্য। এই সিদ্ধি লাভ হইলে যোগীর ইচ্ছার কোথায়ও অভিঘাত বা বাধা হয় না। জলে যেমন ডুবিতে ও উঠিতে পারা যায়, যোগী সেই প্রকার মাটিতেও ডুবিতে উঠিতে পারেন। যতো ভূমাবুন্মজ্জতি নির্মজ্জিত যথোদকে।

"শক্তিপ্রেরণমীশিতা" মায়া ও তাহার অংশভূত শক্তিসমূহকে প্রেরণ করিবার যে সামর্থ্য, তাহার নাম ঈশিতা। এই সিদ্ধির বলে যোগী জীবসমূহের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। জীবেষু স্বশক্তিসঞ্চারণং ঈশিতা নাম সিদ্ধিঃ। (বিশ্বনাথ)

"গুণেষসঙ্গো বশিতা" গুণে অর্থাৎ বিষয়ভোগসমূহে যে অনাসক্তি, তাহার নাম বশিতা। "যৎকামস্তদবস্যতি" যে যে সুখ কামনা করা যাইবে, তাহার একবারে চরম বা সীমা আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই যে সিদ্ধি ইহার নাম কামাবসায়িতা। এই অষ্টসিদ্ধি অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা, এই গুলি শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী।

অনূর্ম্মিমত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষুধা পিপাসাপ্রভৃতি ছয় প্রকারের ঊর্ম্মি বা তরঙ্গবিহীনতা, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, মনোজব অর্থাৎ মনের বেগে দেহের গতি, কামরূপ অর্থাৎ দেবতাদি যাহার রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই রূপগ্রহণের সামর্থ্য, পরকায়প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, অপ্সরা ও দেবতাগণের সহিত ক্রীড়াকরণ, যথাসঙ্কল্প সংসিদ্ধি, অপ্রতিহত আজ্ঞা ও অপ্রতিহত গতি। এই দশটি সিদ্ধি। ক্ষুদ্রসিদ্ধি পাঁচপ্রকার। ত্রিকালজ্ঞতা, শীত উষ্ণ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত না হওয়া, পরের চিত্ত বুঝিতে পারা, অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতির স্তম্ভন ও তৎকর্ত্তৃক অপরাজয়।

এই সিদ্ধিসমূহ ধারণার দ্বারাই লাভ করা যায়। কিরূপ ধারণায় কিরূপ সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে। ভগবান্ ভূতসূক্ষ্মরূপউপাধিবিশিষ্ট, ভগবানের সেই উপাধিতে যদি কেহ মনের ধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলে অণিমা-নামক সিদ্ধি লাভ হয়। ভগবানের মহত্তত্ত্ব-উপাধিতে মনের ধারণা করিলে মহিমা, আর পরমাণুতে মনের ধারণা করিলে লঘিমা সিদ্ধি লাভ করা যায়। ভগবানের একটি উপাধির নাম বৈকারিক অহঙ্কার, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে তিনি অধিষ্ঠাতারূপে রহিয়াছেন। এই বৈকারিক অহংতত্ত্বে মনের ধারণা করিতে পারিলে, সকল ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারা যায়। ইহার নাম প্রাপ্তি। ভগবান্ সূত্রাত্মা ও মহত্তত্ত্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট, এই উপাধিতে মনের ধারণা করিতে পারিলে প্রাকাম্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ কালের কলয়িতা, ত্রিগুণের ও মায়ার অধীশ্বর, এই যে তাঁহার রূপ ইহার নাম বিষ্ণুরূপ, এই রূপে মনের ধারণা সিদ্ধ হইলে ঈশিত্ব, তুরীয় নারায়ণে ধারণার দ্বারা বশিত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মরূপে ধারণাদ্বারা কামাবসায়িত্ব সিদ্ধিলাভ করা যায়।

শুদ্ধ ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপপতিতে ষড়ূর্ম্মিরাহিত্য, প্রাণরূপ আকাশাত্মায় দূর-শ্রবণ, চক্ষুকে সূর্য্যে আর সূর্য্যকে চক্ষুতে সংযুক্ত করিয়া যিনি তাহার মধ্যে ভগবানকে ধ্যান করেন, তিনি বিশ্বদর্শন-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার কথা উল্লিখিত বা উপদিষ্ট হইয়াছে।

২

আজ কাল পাশ্চাত্য দেশে ইচ্ছাশক্তির সংযম ও অনুশীলনের জন্ত নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। Control and culture of the will-power. আরও Mesmerism, Hypnotism, Clairvoyance, Clairaudience, Thought-Reading, Thought-Transference, Telepathy, Artificial Somnambulism প্রভৃতি সিদ্ধির বিষয়ও অনেকদিন হইতে আলোচিত হইতেছে। এই সমুদয় ব্যাপার ভারতীয় যোগবিদ্যারই বিলাতী সংস্করণ মাত্র।

পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা দেখিলাম, ভগবান্ নানারূপে নানাস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া নানারূপে লীলা করিতেছেন। তাঁহার এক এক রূপ বা এক এক বিভূতি চিন্তা করিলে বা সেই বিভূতিতে মনের ধারণা করিতে পারিলে এক এক প্রকারের সিদ্ধি লাভ হয়। এক ভগবানকে নানামূর্ত্তিতে ও নানাভাবে কেন উপাসনা করা হয়, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যে সমুদয় ভ্রান্ত একেশ্বরবাদী ভগবানের এই বহুরূপের উপাসনাকে বহুদেবদেবীর পূজা বলিয়া, কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন, এই আলোচনায় তাহাদের জ্ঞানোদ্রেক হইতে পারে। এক এক দেবতার পূজা করিলে এক এক প্রকারের অভীষ্ট পূরণ হয়, তাহাও পুরাণাদি শাস্ত্রে নানাস্থানে কথিত হইয়াছে। যেমন, যিনি ব্রহ্মতেজ চাহেন তিনি বেদপতি ব্রহ্মার পূজা করিবেন, যিনি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা চাহেন তিনি ইন্দ্রের পূজা করিবেন। প্রজার জন্য দক্ষাদি প্রজাপতির, সৌভাগ্যের জন্য দুর্গাদেবীর, তেজের জন্য অগ্নির, ধনের জন্য বসুর, বীর্য্যের জন্য রুদ্রের, ভক্ষ্যের জন্য অদিতির, স্বর্গের জন্য দ্বাদশ আদিত্যের রাজ্যের জন্য বিশ্বদেবগণের, প্রজাদের স্বাধীনতার জন্য সাধ্যগণের, আয়ুর জন্য অশ্বিনীকুমার যুগলের, পুষ্টির জন্য পৃথিবীর, পদভ্রংশ নিবারণের জন্য অন্তরীক্ষের, রূপের জন্য গন্ধর্ব্বদিগের, স্ত্রীলাভের জন্য উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণের, আধিপত্য লাভের জন্য পরমাত্মার, যশোলাভের জন্য যজ্ঞনামা বিষ্ণুর, ধনসঞ্চয়ের জন্য বরুণের, বিদ্যার জন্য গিরিশের, দাম্পত্যপ্রণয়ের জন্য উমার, ধর্ম্মের জন্য নারায়ণের, সন্ততিবৃদ্ধির জন্য পিতৃগণের, বিঘ্ননাশের জন্য যক্ষগণের, বললাভের জন্য দেবগণের, রাজকার্য্য লাভের জন্য মনুগণের, শত্রুর উচ্ছেদের জন্য রাক্ষসের, ভোগের জন্য সোমের, বৈরাগ্যের জন্য পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। যিনি নিষ্কাম, সর্ব্বকামী বা মুক্তিকামী তিনি অনন্যভক্তিযোগে পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন। এই তালিকা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ষষ্ঠী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীগণের মন্ত্র, কবচ, ধ্যান, পূজাপ্রণালী প্রভৃতি আছে। বহুদেবদেবীগণের ও শ্রীভগবানের বহুরূপের এই পূজা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্তর্জগতের রহস্য The mysteries of the unseen world যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন। এখন প্রয়োজন, এই সমুদয় যাহাতে লুপ্ত না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা। এই সমুদয় পূজা ও উপাসনা যথাযথ প্রচলিত হইলে প্রকৃত হিন্দু-সংগঠন হইবে। হিন্দুসংগঠনের অন্য কোন উপায় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে পূজা ও উপাসনা-পদ্ধতি যেভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতেও বুঝিতে পারা যায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সকল অঙ্গেরই অনুষ্ঠান রহিয়াছে। সুতরাং এই পদ্ধতিও সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে এবং সাধুসঙ্গে সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিলে মানুষ নিজের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা বুঝিতে পারে। তখন নিজের রুচি ও অধিকারানুযায়ী জ্ঞান, ভক্তি বা যোগের পথ অবলম্বন করিয়া পরমার্থলাভের জন্য চেষ্টান্বিত হয়, কিন্তু কোন অবস্থাতেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করে না।

৩

শ্রীমদ্ভাগবতে যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইল। তাহার উপর আর কোন কথা নাই। পাতঞ্জলদর্শনের নাম যোগদর্শন। পাতঞ্জলদর্শন চারিটি-পাদে বিভক্ত। যোগপাদ, সমাধিপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। তৃতীয়-পাদে অর্থাৎ বিভূতি-পাদে নানারূপ যোগসিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধি আশ্রয় করিলে অর্থাৎ সংযম সাধন করিলে এই সমুদয় বিভূতি লাভ করা যায়। পাতঞ্জলদর্শন-মূলে সূত্রগ্রন্থ, অতিশয় সংক্ষেপে অতি গূঢ় ও গভীর কথা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি সজীবভাবে প্রচলিত ছিল, তখন উপযুক্ত গুরুর অধীনে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছাত্রগণ এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন। এখন যোগসিদ্ধগুরু নিতান্তই দুর্ল্লভ, তাহার উপর অনেক প্রবঞ্চক সহজে যোগ শিখাইব বলিয়া ধর্ম্মের দোকান খুলিয়া অনেক সরলচিত্ত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

যোগশাস্ত্রের অনেক ভাষ্য ও বৃত্তি আছে। ব্যাসভাষ্য, বিজ্ঞানভিক্ষুরচিত যোগবার্ত্তিক, বাচস্পতি-মিশ্রবিরচিত তত্ত্ববৈশারদাখ্য ভাষ্য টীকা, নাগেশভট্টরচিত সূত্রভাষ্যবৃত্তিব্যাখ্যা, অনন্তরচিত যোগচন্দ্রিকা, আনন্দশিষ্যরচিত যোগসুধাকর, উদয়শঙ্কররচিত যোগবৃত্তিসংগ্রহ, উমাপতি ত্রিপাঠিকৃত যোগসূত্রবৃত্তি, ক্ষেমানন্দদীক্ষিতকৃত ন্যায়রত্নাকর, বা নবযোগকল্লোল, গণেশদীক্ষিতকৃত পাতঞ্জলবৃত্তি, জ্ঞানানন্দকৃত যোগসূত্রবিবৃতি, নারায়ণভিক্ষু বা নারায়ণেন্দ্রসরস্বতীকৃত যোগসূত্রগূঢ়ার্থদ্যোতিকা,

ক্ষেমদেবকৃত পাতঞ্জলীয় অভিনবভাষ্য, ভবদেবকৃত যোগসূত্রবৃত্তিটিপ্পণ, ভোজরাজকৃত রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যবিবৃতি বা ভোজবৃত্তি, মহাদেবপ্রণীত যোগসূত্রবৃত্তি, রামানন্দসরস্বতীকৃত যোগমণিপ্রভা, রামানুজকৃত যোগসূত্রভাষ্য, বৃন্দাবনশুক্লরচিত যোগসূত্রবৃত্তি, শিবশঙ্করকৃত যোগবৃত্তি, সদাশিবরচিত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তি, রাঘবানন্দযতিকৃত পাতঞ্জলরহস্য, শ্রীধরানন্দযতিকৃত পাতঞ্জলরহস্য-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়। এই সমুদয় গ্রন্থের কিছু কিছু আলোচনা করিলে আর কিছু না হউক যোগসিদ্ধিসমূহ যে কাল্পনিক নহে, পরন্তু সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, যতদিন আমরা পুনর্ব্বার এই সাধনপথ অবলম্বন না করিব, ততদিন ভারতের যোগিগণ কি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব না।

আমরা সংক্ষেপে পাতঞ্জলদর্শনে কথিত যোগসিদ্ধিসমূহ নিয়ে বর্ণনা করিলাম।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্। ১৬

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে বস্তুমাত্রেরই তিনপ্রকার পরিণাম হইয়া থাকে। এই পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ, সমুদয় বিষয় জানিতে পারা যায়।

শব্দের অর্থ প্রত্যয়াদিতে সংযম করিলে সমুদয় প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারা যায়। সংস্কারে সংযম করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের সমুদয় কথা জানিতে পারা যায়। অন্য লোকের মুখের বিকার প্রভৃতি কোন লক্ষণে যদি সংযম অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে অপরের চিত্তে কি আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার নাম পরচিত্তজ্ঞান। শরীরের রূপে সংযম করিলে অন্তর্ধানবিদ্যা লাভ হয়। এমন করা যাইতে পারে যে যোগী বসিয়া রহিয়াছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

তাহার পর মৃত্যুকাল এবং কখন কি বিপদ ঘটিবে তাহা জানিতে পারা যায়। হস্তী বা সিংহের ন্যায় বললাভ করা যায়। সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। চন্দ্রে সংযম করিলে তারা সকলের ব্যূহ বা সংস্থান-বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম করিলে তারকা-সমূহের গতি জানিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পর্য্যবেক্ষণাদি কার্য্য এই উপায়েই সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। শরীরের মধ্যে নাভিস্থলে ষোড়শদল চক্র আছে, তাহাতে সংযম করিলে দেহের ভিতর নাড়ী প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়। কণ্ঠকূপে অর্থাৎ জিহ্বামূলের গর্ত্তে সংযম করিলে ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কণ্ঠকূপের নিম্নদেশে কূর্ম্ম-নামক নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রে সংযম করিলে সিদ্ধ দিব্যপুরুষগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সর্ব্বজ্ঞতা-লাভেরও উপায় আছে।

আমরা কিছুদিন অতীত ভারতের শাস্ত্র ও সাধনা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন তাহার প্রতি আবার অনুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন কেবল কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক না করিয়া এই সমুদয় সাধনের প্রতি আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে তাহাতে আমাদেরও উপকার, জগতেরও উপকার। ইহাই প্রকৃত উপকার।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র

কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি দেশবন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের অভিভাষণ।

(১)

আজিকার এই সভায় আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি করা উচিত ছিল। কেন না বঙ্কিম-সাহিত্য আমার অপেক্ষা আপনাদের মধ্যে অনেকেই বেশী জানেন। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সভাপতি করিলে আপনারা তাঁহার নিকট অনেক নূতন বিষয় শুনিতে পারিতেন। আমার নিকট আপনারা সে আশা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি এত অধিক ব্যতিব্যস্ত যে আজ আমি আপনাদের নিকট আছি, কিন্তু কাল আমি কোথায় থাকিব তাহার স্থিরতা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন ব্যক্তি নয়,—যদিও তিনি খুব প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই ছিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই ই। দুঃখের বিষয় এইরূপ একটা গভীর ও জটিল বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার মত শুভ অবসর সম্প্রতি আমার নাই। কিন্তু বাংলার একটা যুগ-সাহিত্যের যিনি স্রষ্টা, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যদি আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে আপনাদের সে আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

(২)

দশ বৎসর অতীত হয়, যখন "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদনের ভার আমার উপর ছিল, তখন ঐ পত্রিকার ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা "সচিত্র বঙ্কিম-স্মৃতির সংখ্যা" বলিয়া প্রকাশ করা হয়।

ঐ স্মরণীয় সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৺ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি ১৬ জন বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমসাহিত্যকে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিয়াছিলেন। আজিকার এই সভায় বঙ্কিম সংখ্যার "নারায়ণ" খানিকে পুনরায় মুদ্রিত করিয়া যদি আপনারা বিতরণ করিতেন, তাহা হইলে আমি খুব সুখী হইতাম।

(৩)

সমগ্র এবং সম্পূর্ণ বঙ্কিম সাহিত্যের সমালোচনা একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে আপনারা আশা করিতে পারেন না। তাহার জন্য একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে হয় এবং অদ্যাবধি সেই গ্রন্থের অভাব বাংলা সাহিত্যের দুরপনেয় কলঙ্ক। আপনারা অনেকে হয়ত জানেন অথবা শুনিয়াছেন যে, আমি বাংলার ও বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়া সাহিত্যে আমার একটা দুর্ণাম আছে। এজন্য অনেক সাহিত্য-রথী আমার মধ্যে বিশ্বাত্মবোধের একান্ত অভাব নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং উষ্মার সহিত সে কথা তাঁহারা ভাষায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমি সেজন্য লজ্জিত নই। এমন কি আজ বাংলার যুগ-সাহিত্যের একজন স্রষ্টা, নেতা ও ত্রাতার স্মৃতিশেখরের দিকে ঊর্দ্ধে করজোড়ে তাকাইয়া বাঙ্গালীকে, আবার আমি বলিতে সাহস করিতেছি যে, ভাই বাঙ্গালী,—তুমি তোমার বাংলাকে ভুলিও না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়া গিয়াছেন। যদি তুমি বাংলাকে ভুল, বাংলার অতীতের ইতিহাস খুঁজিয়া না দেখ—বাংলার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝ,—বাংলার ন্যায় দর্শন, বাংলার স্মৃতি, বাংলার তন্ত্র ও দীক্ষা প্রণালী, বাংলার সমাজ-বিন্যাস, বাংলার সাহিত্য—এক কথায় বাংলার সভ্যতাকে প্রাণপাত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা না কর, তবে তুমি বাঙ্গালী হইলেও বঙ্কিম-স্মৃতিকে অপমান করিবার জন্য এ সভায় উপস্থিত থাকিও না। মনে রাখিও —"বন্দে মাতরম্" বাংলার গান—ভারতবর্ষের নহে। তথাপি ভারতবর্ষকে এই মহাগীতি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মনে রাখিও বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালী হইতে না পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই, পৃথিবীর এই মহাপ্লাবনে সে হয়ত বা এবার ভাসিয়া যাইবে, কূল পাইবে না। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযান নয়। (যদিও বাঙ্গালী-প্রধানদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রথমে ইহার অসত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।) ইহা পলাশী-প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার জীর্ণ দ্বারে ক্লাইবের পদাঘাতও নয়। আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি ইহা তাহা অপেক্ষাও নির্ম্মম,—তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ,—তাহা অপেক্ষাও শোণিত-পিচ্ছল। ইহা অহিংসা নহে—কিছুতেই নহে! আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী কি বাঙ্গালী পড়ে নাই? উপন্যাস ও আর্ট হিসাবে ইহার সমালোচনা এখন স্থগিত থাকুক। বঙ্কিমের পরে বাংলাদেশ উপন্যাসে ছাইয়া

গিয়াছে। বাংলার আধুনিক উপন্যাস-সমুদ্র যদি কেহ মন্থন করিতে চান, তবে দেখিবেন রিরংসার বিষে, —এবং তাহাও আমি বলি, ফেরঙ্গ-রিরংসা,—বাংলার তরুণ তরুণী আকণ্ঠ নিমজ্জমান। এত যে বিষ,— তাহা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সত্য হয়, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি—"লাখে না মিলিল এক" একটাও নীলকণ্ঠ আমি বাংলায় পাইলাম না—এই আমার আক্ষেপ। স্বদেশীর আমল হইতে আমি দুই চক্ষে চাহিয়া আছি—এবং সেই হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কেত বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comte এর Positivism থাকিতে পারে, Europe এর দুর্দ্ধর্ষ Nation-idea থাকিতে পারে, Middle Ageএর সন্ন্যাস থাকিতে পারে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপ-কাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনার অপরিহার্য্য ত্রুটী থাকিতে পারে—পারে কি, হয়ত আছে। কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে—এমন বাঙ্গালী আছে যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন কি ভারতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি —বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ (যদিও এই সভার সভাপতিত্বের সম্মান তাঁহার জীবিতকালে একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এবং মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় যে সম্প্রতি কোন মতেই তাঁহার নাগাল আমরা পাইতেছি না) এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের বা বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আজ-কাল কেবল ম্যাপেই বাংলা দেশ আছে। যদি কখনও বাংলা দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন বাংলা সাহিত্য পড়িয়া এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাংলা এমন একটা দেশের সাহিত্য যে দেশ কোনও কালে বর্ত্তমান ছিল না।"

আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, বঙ্কিম-সাহিত্য এইরূপ বক্ষ্যমান আধুনিক বাংলা সাহিত্য নয়। ইহা এমন একটা সাহিত্য যে বঙ্গ দেশ লুপ্ত হইলেও এই সাহিত্য পড়িয়া জ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন যে—হ্যাঁ, বাংলা নামে একটা দেশ ছিল। বঙ্কিম-সাহিত্যের ইহাই গৌরব— ইহাই মস্ত বিশেষত্ব।

(৪)

আমি বঙ্কিম-সাহিত্যকে একটা যুগ-সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু যুগ-সাহিত্যের নানা দিক্ আছে। সেই নানা দিক্—বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে যুগ-সাহিত্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেহের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর Europe এর সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্য—আত্মস্থ,—সমাহিত, তেজঃপূর্ণ, অথচ প্রশান্ত ও গম্ভীর! ইহা সমুদ্র বিশেষ।

বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এবং তাহার সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে বাঙ্গালার ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগের একটা প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে। ধর্ম্ম-সংস্কারে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ; সমাজ-সংস্কারে সিংহ-প্রতিম বিদ্যাসাগর; রাজনীতিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব বঙ্কিম যুগের উপর অস্পষ্ট নহে। বঙ্কিম সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী—এই সমস্ত ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক্‌পাল সংস্কারকদিগকে তখনও ভুলিয়া যায় নাই। ইহাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা তখনও সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন।

বঙ্কিম-সাহিত্য কোন কোন দিকে এই সংস্কারযুগকে বাধা দিয়াছে এবং কোন কোন দিকে ইহাকে উন্নততর এক বিশালক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে বিচক্ষণ সমালোচকগণ—(যেমন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি) বঙ্কিম-সাহিত্য-যুগকে হিন্দুধর্ম্মের এক নব জাগরণের যুগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহারা নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য-গুলি এবং চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনা সাহিত্যকেও অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া বঙ্কিম-যুগ সাহিত্য, বাঙ্গলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার মত দেখা দিয়াছে। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্যকে আমি একটা সমন্বয় যুগের সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। ইহা কেবল প্রতিক্রিয়া যুগের সাহিত্য নহে। বঙ্কিম শুধু গীতার সমন্বয় করেন নাই, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটা সমন্বয় করিয়াছেন।

(৫)

সাহিত্য-ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে যতই পার্থক্য থাকুক;—বঙ্কিম ও গিরিশ যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ প্রতিভার বরপুত্র এই দুই মহাকবিই Europeএর সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও—সাহিত্যের দুইটি বিভিন্নক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত, বাঙ্গালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গালা—এমন কি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঁহারা সুবিধামত পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই। যেমন ইঁহাদের পরবর্ত্তী নাটক নভেলে অন্যান্য ঔপন্যাসিক ও নাটক-রচয়িতাগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহা দুঃখের বিষয় যে তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা পাইতেছেন।

বাঙ্গলা Europe নহে। বাঙ্গালীর সাহিত্য কেবল Europeএর সাহিত্যের প্রতিধ্বনি হইতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের এরকম দুর্ভাগ্য আমি কল্পনাও করিতে পারি না। বাঙ্গালা তাহার সুরে

ও রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সেই প্রস্ফুটিত, পূর্ণ-বিকশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের গন্ধে বাঙ্গালা ও জগৎ ভরপুর হইবে। যদি তাহা না হয়,—যদি বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া কিছু না থাকে তবে,—বাঙ্গালা সাহিত্য লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি?—তবে, বঙ্কিমচন্দ্র লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি—? ভাই, বাঙ্গালী, বঙ্কিমচন্দ্র কি সত্যই অরণ্যে রোদন করিয়া গিয়াছেন?

বঙ্কিম ও গৈরিশ সাহিত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও বাঙ্গালীর সাহিত্য হইয়াছে। এই দুই মহাকবির সৃষ্ট বাঙ্গালীর সাহিত্যের মধ্যে একটা মৌলিক ও যৌগিক সম্পর্ক আছে; বা থাকা সম্ভব বলিয়াই আমি আপনাদের মধ্যে কোন অভিজ্ঞ ও নিপুণ সমালোচককে এই দুই অপূর্ব্ব সাহিত্যের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী যোগ, তাহা সুস্পষ্ট ফুটাইয়া দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার মত অক্ষমের এই অনুরোধ কেবলমাত্র অরণ্যে রোদন বলিয়া অস্বীকৃত ও অগ্রাহ্য হইবে না।

(৬)

বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপপ্রয়োগ হউক,—স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালায় তাহাই করিয়াছে যাহা ফরাসী দেশে, Voltaire এবং Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। এই দিক্ হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমার বিবেচনায়, আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহা আরম্ভ করা উচিত। আমি অনুরোধ করি যে, বাঙ্গালায় বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত, ফ্রান্সের—Voltaire ও Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ, আপনাদের মধ্যে শীঘ্রই কেহ লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। কেন না আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গালার Voltaire ও Rousseau—যদিও এরূপ তুলনা সমস্ত দিক্ দিয়া সমীচিন নয়।

(৭)

বাঙ্গালার ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ এই উভয় শতাব্দীকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। হয়ত বা এই উপন্যাসগুলি তাঁহার অজ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যমূলক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অজ্ঞাতসারেই বা বলি কি করিয়া? যিনি "কৃষ্ণকান্তের উইল" "বিষবৃক্ষ" লিখিতে পারেন—এবং যিনি "কপাল কুণ্ডলা" সৃষ্টি করিতে পারেন—সামাজিক উদ্দেশ্যবাদ তাহার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, তিনি যে কত বড় কারিগর, কত বড় স্রষ্টা, তাহা পরিমাণ করা সহজ-সাধ্য নহে। যদি তাঁহার উপন্যাস-রচনায় কোন উদ্দেশ্যবাদ আসিয়া থাকে, তবে আমি বলিব—তাহারও উদ্দেশ্য ছিল। কেবল ছিল নয়—এখনও আছে।

(৮)

বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব" সম্পর্কে বড় আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। যে মানুষ নয়, সে

বাঙ্গালী হইবে কি করিয়া? ১২০৩ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র দিবস গণনা করিয়া গিয়াছেন। দিবস মাস হইয়াছে,—মাস বৎসর হইয়াছে,—বৎসর শতাব্দী হইয়াছে,—শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার তিনি গণিয়াছেন। কিন্তু যাহা তিনি চাহিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার মিলে নাই। "মনুষ্যত্ব মিলিল কই? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না।" এখন আপনারা বুঝুন বঙ্কিমচন্দ্র কি চাহিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের কি পাইতে হইবে। তিনি আমাদিগকে কেবল 'ঘ্যান্ ঘ্যান্' করিতে নিষেধ করিয়াছেন—আমাদের "মধু সংগ্রহ" করিতে বলিয়াছেন—এবং আবশ্যক মত "হুল" ফুটাইতেও বলিয়াছেন। কথাটা সমীচিন কি না আপনারা প্রণিধান করিবেন। দেশ ও জগতের জন্য—অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আমাদিগকে করিতেই হইবে এবং তাহার জন্য প্রয়োজন বোধে হুলও ফুটাইতে হইবে।

(৯)

যেমন রাজা রামমোহন রায়ের হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামে এক অতিপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরু ছিলেন, তেমনি কিম্বদন্তী আছে যে বঙ্কিমচন্দ্রেরও একজন অখ্যাতনামা তান্ত্রিক গুরু ছিলেন। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসের আদর্শ তাঁহার যে সমস্ত চিত্রাঙ্কনে উজ্জ্বল ও নিখুঁত হইয়া ফুটিয়াছে, তাহা নাকি তাঁহার গুরুর আদর্শে। অবশ্য এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি না! তবে আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ভারতীয় কিম্বা গৌড়ীয় নহে, ইহাই আমার মনে হয়। East India Companyর মাল লুঠিয়া অতর্কিতভাবে কোম্পানীর নিরীহ সিপাহীদিগকে খুন করিয়া,—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশবাসীকে অন্ন দেওয়া; পরোপকারের—বিশেষতঃ দেশাত্মবোধের এই ভয়াবহ উৎকট আদর্শ কেন তিনি অঙ্কিত করিলেন—বুঝিতে পারি না। সন্ন্যাসের যে আদর্শ বাঙ্গালায় আছে তাহা হয় শৈব, না হয় শাক্ত, না হয় বৈষ্ণব। আধার-ভেদে সব আদর্শই এখন মলিন। তথাপি আদর্শ হিসাবে শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের সন্ন্যাস-আদর্শ "আনন্দমঠে" স্থান পায় নাই। উহা পাশ্চাত্যের সংঘাতে গঠিত। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সন্ন্যাসের এক অভিনব মিশ্রন। সমাজ ও রাষ্ট্রে উহার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বাঞ্ছনীয় নহে—আমার এইরূপ বিবেচনা হয়।

(১০)

আমি আর আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিব না। বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় সর্ব্বজন-বিদিত "কমলাকান্তের" দুর্গোৎসবের উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদিগকে অব্যাহতি দিব।

কি স্বপ্ন একদিন এই মহাকবি দেখিয়াছিলেন! তাঁহার ঋষি-কল্প ধ্যানে মাতৃভূমির পূতোজ্জ্বল

আলেখ্যখানি সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সপ্তমী পূজার দিন অহিফেনের নেশায় কমলাকান্ত এই ধ্যানমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিল। কি সে মূর্ত্তি?—

"তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশির উপর সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা! হাঁ এই মা। এই জননী জন্মভূমি—কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি। এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্ন-মণ্ডিত দশভূজ, দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত! * * * আমি এই কালস্রোতে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।"

"এস, ভাই সকল! আমরা অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশকোটি-ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত-মথিত-ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি,—সেই প্রতিম মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

ইহার পর আর আমি অধিক বলিতে পারি না—কোন বাঙ্গালীই বলিতে পারে না। আসুন —আমরা একবার হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া—দেশ-মায়ের পায়ে মাথা নোয়াইয়া সমস্বরে বলি—বন্দে মাতরম্।

(আত্মশক্তি)

নিত্যধামে—আশুতোষ

১

বাঙ্গালার পুরুষব্যাঘ্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান,—বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা! তিনি অসময়ে চলিয়া গেলেন, হঠাৎ চলিয়া গেলেন, জীবনের কাজ যেন অনেক পড়িয়া থাকিল। তাঁহার আসনে বসিতে পারে, এমন বীরসাধক বাঙ্গালায় বা ভারতে আছে বলিয়া মনে হয় না—ভবিষ্যৎ, বিধাতার হাতে।

তাঁহার তিরোধানের সময়টি বেশ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কাজে চীনদেশে গিয়াছেন, ফিরিয়া

আসিতেছেন। এসিয়ার মানসজীবনের ছিন্ন ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, আবার যাহাতে অবাধভাবে জ্ঞানরাজ্যে সকলদেশের ভিতর আদান প্রদান চলে, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ আপাততঃ তাহার ব্যবস্থার জন্য, চীনদেশে গিয়াছেন। বাঙ্গালার ত্যাগবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর মনে ব্যথা দিয়া, মহাত্মাকে নূতন রকমের ভাবনা ভাবাইয়া,—আত্মকলহে পরিপূর্ণ বাঙ্গালায় চারিদিকের বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী আক্রমণের মধ্যে অভিমন্যুর ন্যায় যুদ্ধরত; দেশে সকলই অনিশ্চিত ও সংশয়িত, ঠিক্ এমন সময়ে আশুতোষের অন্তর্ধান! যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা ভাবিয়া আকুল—আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আশুতোষের তিরোধান, আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির মরিবার সূচনা, কি ভাল করিয়া বাঁচিবার সূচনা, কে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে?

বড়লোকের মরণ, আকস্মিক মরণ, অকাল মরণ,—কাজেই অনেকেই, ছাপাইয়া বাহির করার জন্য, অনেক কথা বলিয়াছেন। 'বঙ্গবাণী' কাগজে অনেক ভাললোকের লেখা বাহির হইয়াছে। যিনি যাহা জানেন, ভাল করিয়াই বলিয়াছেন—কিন্তু সাহসের কথা কম—মর্ম্মকথাও কম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের তরঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন যখন ভাঙ্গন লাগিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্‌লাইতে পারেন, আশুতোষ ছাড়া এমন লোক দেশে কেহই ছিলেন না। একথা, সে দিনের কথা। সেদিন, আশুতোষ অনেক উপহাস, অনেক নিন্দা, অনেক বিদ্রূপ সহিয়াছেন। পূর্ব্বযুগে আর একদিন অনেক মহারথী নূতন বিদ্যায়তন গড়িতে গিয়াছিলেন, পারেন নাই। সেও আশুতোষের জন্য। সেদিনের নেতারা অনেকে ফিরিয়া আসিয়া আশুতোষের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, বর পাইয়াছিলেন, অভয়ও পাইয়াছিলেন। সেদিন বাঙ্গালার নববিদ্যা-আয়তনের স্বপ্ন যেটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা আশুতোষেরই জন্য, আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁহাদের বিদ্যালয়ে নহে।

নূতন বাঙ্গালার নূতন লাট একদিন চঞ্চলমতি বাঙ্গালীর শত শত ছেলের লেখাপড়ার পথে চিরকালের মত কাঁটা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পারেন নাই,—আশুতোষের জন্য। আজকার লাটও গায়ে হাত তুলিতে গিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন—কেমন শক্ত চিজ্ ছিলেন, এই পুরুষব্যাঘ্র আশুতোষ! দুদিকেই সংগ্রাম, দেশের সঙ্গে—বিদেশের সঙ্গে। ইহার ভিতর বিজয়ী বীর আশুতোষ দেশকে কাঁদাইয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। আমাদের শক্তি নাই, আশুতোষ সম্বন্ধে ঠিকমত ভাবিতে—তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ, অনেক দূরের কথা! মহতের ভাবনা ভাবুন আজ তাঁহারা, যাঁহারা সত্য সত্য মহৎ। দেশবন্ধু দাস আজ কি করিবেন? তাঁহার অনেক কাজ—সময় নাই। কিন্তু আশুতোষের ভাবনা আজ কে ভাবিবে? অধিকার আছে কয়জনের? বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙ্গার জন্য যে দিন তিনি আশু-তোষের মুখোমুখি হইয়াছিলেন, সেদিনও তিনি ভক্তি করিতেন আশুতোষকে,—অন্তরের সহিত।

কিন্তু সেদিন, তিনি শুনিয়াছিলেন এক আজবদেশের ডাক! আজ তিনি অন্য পথের পথিক। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি দখল করিয়াছেন, তিনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবেন, তিনি কি বিশ্ববিদ্যালয় দখল করিতে চেষ্টান্বিত হইবেন?

পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আজ কোথায়? বহুকাল পূর্ব্বে রোমনগরে বিশ্বমানবের মহাসাধনার যে স্বপ্ন বিবৃত করিয়া বিশ্বপণ্ডিতের সভায় তিনি বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে আশুতোষ প্রাণপাত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার পতাকা কে ধরিবে? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কি খদ্দর লইয়াই থাকিবেন? হীরেন্দ্র নাথ—শান্ত সাধু হীরেন্দ্রনাথ—সরকারী বলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াও মাড়াইলেন না; একাগ্রচিত্তে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অংশ সুবিপুল বাধা অতিক্রম করিয়াও গড়িয়া তুলিলেন। তিনিও তাঁহার দেহ, প্রায় পাত করিয়াছেন, আজ কি তিনি আসিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের পতাকা ধরিতে পারেন না? আশুতোষ যে বাঙ্গালী, আশুতোষ যে এ কালের জ্ঞান-প্রচারক ব্রাহ্মণ! একাধারে ব্যাস ও চাণক্য। কোন্ বাঙ্গালী, কোন্ হিন্দু আজ উদাসীন থাকিবে?

১

ইংরাজের শাসনব্যবস্থা একটা বিরাট্ বিশাল কল। যেমন জটিল, তেম্নি ভারি। ইহাতে হৃদয় নাই, রস নাই। শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত বলেন—There is no human element in it. রেলষ্টেশন, ডাকঘর, কাছারী, আদালত, স্কুল, কলেজ, সবই তাই। এই যন্ত্রে যাহারা চালিত ও তাড়িত, তাহারা নিষ্পেষিত ও মুহ্যমান। এই যন্ত্রের যাহারা চালক তাহাদেরও অবস্থা তথৈব চ। তাহারাও প্রাণহীন কাঠের পুতুল। মহাত্মা গান্ধি বলিতেছেন—'পালাও, পালাও'—ইহার বাহিরে আসিয়া তপস্যা কর, দরকার হয় হাত তুলিও না, কথা কহিও না,—নিঃশব্দে নিষ্পেষিত ও দলিত হইয়া মরিয়া যাও। কি হইবে, ভগবান্ জানেন! কিন্তু আশুতোষ পলান নাই, এই কলের ভিতর ঢুকিয়াছিলেন। অন্ততঃ দুইটি বিভাগে ইহার চালক হইয়াছিলেন:—এক বিশ্ববিদ্যালয়, আর এক হাইকোর্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কি করিয়াছিলেন—সকলেই জানেন। He added the human element in it—বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মানবহৃদয় যোজনা করিয়াছিলেন। এক নম্বরের জন্য ছেলে ফেল হইয়া ধনে প্রাণে মারা যাইত, তাহার অস্তিমের আর্ত্তনাদ কেহ শুনিত না, চোখের জল কেহ দেখিত না—কে শুনিবে? মানুষ নয়—সে যে কল! একদিন বেশী কামাই করিয়া ফেলিয়াছে, গরীবের ছেলে,—ছেলে পড়াইয়া লেখা পড়া শেখে কলিকাতায়,—এবার আর পরীক্ষা দেওয়া হইবে না, আর এক বছর পড়, এই ছিল আগেকার কলের কাজ! আশুবাবু এ সব বদ্লাইয়া কলের ভিতর মানবহৃদয় যোজনা করিয়াছিলেন। কে পারে? রক্তমুখের নীলনয়নের রুদ্রদৃষ্টির সম্মুখে বুক

ফুলাইয়া মাথা তুলিয়া কে এমন পারে? অবারিত দ্বার—প্রবেশের নিষেধ নাই, বিশালবপুতে ভৃত্যের দ্বারা তৈল মর্দ্দন চলিতেছে, আর হাজার লোকের হাজার আব্‌দার হৃদয় দিয়া শুনিতেছেন, কেবল কাণ দিয়া নহে, এমন ধারা কে পারে?

বিচারালয়ে কি তিনি করিয়াছেন, তাহা জানেন বিশেষজ্ঞেরা--নরেশবাবু কিছু বলিয়াছেন। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলিবেন।

৩

সাংসারিকের সুবুদ্ধি, তুলনা করিতে চাহে না—কারণ সব সময়ে তুলনা করা নিরাপদ নহে। আবার যাহারা ভাবুক, তাহারা বলিবে তুলনার সময় নহে। কিন্তু তুলনা না করিলে বুঝিবারই উপায় নাই। যাহারা সামাজিক সৌজন্য হিসাবে শোক করে না, যাহারা কেবল স্রোতে ভাসিয়া চলে না, যাহাদের নিজের বলিতে একটা জীবন আছে,—সে জীবন ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্—তাহারা আজ তুলনা না করিলে বুঝিতে পারিবে না।

আশুতোষ একজন মানুষ বা বড় মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটা বড় জাতির এবং একটা বড় দেশের একটা খুব বড় রকমের সঙ্কট ও সংশয়ের যুগের একটা বিশেষ রকমের সাধনাদর্শের একটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি। ইতিহাসে বিধাতার খেলা আছে—সে খেলার ক্রীড়নক আছে। এই ক্রীড়নকগুলি অতিমানুষ। একটা যুগের গোটা জীবন (The corporate life of the age) তাঁহাদের ভিতর ফুটিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল—বড় বড় মানুষ,—কেহ ভাবে, কেহ জ্ঞানে—কিন্তু তাঁহাদের জীবনে কত পরিবর্ত্তন দেখা গেল! এই পরিবর্ত্তন, বিকাশের ধর্ম্ম এবং স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যকে মিলাইয়া প্রতীচ্যের যন্ত্রের দ্বারা প্রাচ্যকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—এই মতই আজ ইঁহাদের মত। সুতরাং এই মতকেই বাঙ্গলার মত বলিব না তো কি করিব? আশুতোষ এই আদর্শের মূর্ত্তি, তাঁহার জীবন এই সাধনের পথ।

পুরাতন একটি জাতির ঘাড়ের উপর গোটা পৃথিবীর বিচিত্র সাধনা ও সভ্যতা একেবারে হুড়্‌মুড়্ করিয়া চাপিয়া বসিয়াছে—সব ওলট্ পালট্ করিয়া দিয়াছে, এখন এই জাতি বাঁচিবে, কি মরিবে, হিসাব করিয়া কেহই বলিতে পারে না। যাহারা বলে বাঁচিবে, তাহারা জানে না, কেমন করিয়া বাঁচিবে, কোন্ পথে বাঁচিবে। বাঁচিবার শক্তি আছে কিনা, বোঝা চাই—আর কোন্ পথে বাঁচিবে, সেই পথ চেনা চাই। আশুবাবু বাঙ্গালী জাতির শক্তিমত্তার একটি প্রচণ্ড পরিচয়। আরও অনেকে এ পরিচয় দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন--কিন্তু আশুবাবু খুব বড় পরিচয়। আজ যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাহারও সহিত তুলনা না করিয়া বলিতেছি—যাঁহারা গত শত বৎসরে গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে আশুবাবু সকলের অপেক্ষা বড় পরিচয়;—অন্ততঃপক্ষে আজ এইরূপ মনে হইতেছে

তুলনা ঠিক অবশ্য হয় না। আশুবাবু দেখাইলেন—বাঁচিবার শক্তি আছে, খুব আছে। এখন চাই অনুশীলনের ব্যবস্থা—সেই ব্যবস্থাই আশুবাবুর প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতীচ্যকে গ্রহণ কর—সাধনা ও তপস্যার দ্বারা, বিজ্ঞাপনের ফাঁকির দ্বারা নহে, বেদান্তের বুকনির দ্বারা নহে, অলৌকিকের দোহাইএর দ্বারা নহে—গ্রহণ কর, জীর্ণ কর,—ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে; এ সংগ্রামে তুমি ধ্বংস হইবে না,—ইহাই তোমার আত্মরক্ষার পথ।

জীবনের জটিলতা বাড়িয়া চলিতেছে। ভারতবর্ষ এ জটিলতায় অনভ্যস্ত। আবার এ জটিলতা ভারতের নিজের সৃষ্টি নহে, তাহার নিজের ঐতিহাসিক প্রাক্তনের ফলস্বরূপে এই জটিলতা তাহার ভিতর হইতে গজাইয়া উঠে নাই। বাহিরের ধাক্কায় ভারতবর্ষ বাধ্য হইয়াছে, এই জটিলতার আবর্তের মধ্যে পড়িতে। কিন্তু আমরা আর পারি না! কি ভয়ানক প্রতিযোগিতার কুরুক্ষেত্র!! আমরা যে শক্তিহীন। এখন যদি কেহ বলে, এ কুরুক্ষেত্র মায়া, মিথ্যা, তাহা হইলে আমরা অনেকেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। একটা স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সান্ত্বনা পাই। এই প্রকারের একটা অবস্থা দেশে আসিয়াছে। এই মন্ত্রের যাঁহারা ঋষি, তাঁহারা হয়ত একটা পথ সত্য সত্যই দেখিতেছেন, কিন্তু শিষ্যেরা অনেকেই কোন সত্যপথ দেখে নাই, আলস্যের মোহস্বপ্নের মধ্যে সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ খুঁজিতেছে। এ দুর্দ্দশা আসিয়াছে—বেশ সুনিশ্চিত মরণের পথ। গেরুয়া ও ভিক্ষার ঝুলি, (যাহার ভদ্র নাম চাঁদার খাতা), অলৌকিকের দোহাই, আর সাহেবের সার্টিফিকেট, এই একদিক্। আর একদিকে ভিতরে ভোগের বিষানলের দাহ, আর দায়ে পড়িয়া ত্যাগের ধ্বজাবহন—এই সঙ্কট—এই সংশয়। ইহার ভিতর আশুতোষ ছিলেন, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত কুরুক্ষেত্রের বিজয়ী যোদ্ধা। কিন্তু তাঁহার ভিতরে ছিল—কোমল ও মধুর বৃন্দাবন।

৪

বিচারপতি ও আইনজ্ঞ আশুতোষের কথা বিশেষজ্ঞের মুখ হইতে যৎকিঞ্চিৎ বাহির হইয়াছে। পৃথিবীতে নানাদেশ, নানাজাতি,—প্রাচীন ও নবীন। সকলেই অগ্রসর হইতে চায়, বসিয়া থাকিলেই মরিতে হইবে। অতএব "আগে চল্ আগে চল্ ভাই।" এই আগাইয়া চলা কেমন? ইহাতে মারামারি, রক্তারক্তি, কাড়াকাড়ি আছে;—পশুর মত, রাক্ষসের মত। কিন্তু ভিতরে দেবতাও আছে। জ্ঞানে, ভাবে, সামাজিক ব্যবস্থায় অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব কুড়াইতে হইবে; ভাল জিনিস যেথানে যা আছে, সংগ্রহ করিতে হইবে। নূতন, পুরাতন, দেশী বিদেশী ছোট বড় সবই লইতে হইবে। প্রাচীন ভারতে আইন ছিল, অন্যান্য প্রাচীন দেশেও আইন ছিল। কোন দেশ চল্‌তি আইনের নজিরের সম্মান করে বেশী, কোন দেশ আইনের মূল সূত্রের ব্যাখ্যার সম্মান করে বেশী। আশুবাবুর বিচার ছিল, দুদিকের মর্য্যাদা সমানভাবে রক্ষা করিয়া চলা। বিচারপতির আসনে বসিয়া আশুতোষ কেবল

বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে; কেবল ভারতবর্ষ নহে, ইংরাজ সাম্রাজ্যও আশুবাবুকে বিচারপতি করিয়া উপকৃত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। আইনের পণ্ডিত নরেশবাবু একথা বলিয়াছেন। এখন দরকার—আশুবাবুর রায়গুলি একত্র করা, বিশেষজ্ঞের টীকাটিপ্পনি সহ ছাপানো, আর ভারতের আইনের ছাত্রদের পড়ানো।

আশুবাবুর স্মৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা হইতেছে। একটা কলেজের নাম বদ্‌লাইয়া আশুবাবুর নামে তার নাম করা খুবই ভাল কাজ, বিশেষতঃ সেই কলেজ যখন আশুবাবুরই গড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা বড় বাড়ির নাম 'আশুভবন' করাও ভাল—কিন্তু এসব সস্তা কাজ। মর্ম্মর মূর্ত্তিও তাই। শোকের আগুন জ্বলিয়াছে, এ অনল যদি হোমানল হয়, এ শিখা যদি নির্ব্বাপিত না হয়, এ অগ্নি যদি গার্হপত্য অগ্নি হইয়া বাঙ্গালীর ও ভারতের সাধনক্ষেত্রে নিত্য আহুতি পায়, তাহা হইলে আশুবাবু আমাদের জীবনে নিত্যজীবন পাইবেন—তিনি অমর, আমরা তাঁহার অমরত্বে অমর হইয়া উঠিব।

আশুবাবু তাঁহার মর্ম্ম কথা সব বলেন নাই, কিন্তু অনেক বলিয়াছেন। Oriental Conference-এর দ্বিতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা কয়জনে বুঝিয়াছি, কয়জনে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মনীষি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আসিয়া তাহা কি বুঝাইয়া দিতে পারেন না? আর আশুবাবুর কীর্ত্তিরক্ষার জন্য এককোটি টাকা কি বেশী? রাসবিহারী ঘোষ কি আর বাঙ্গালায় নাই, তবে আর ধনের উপাধির সম্মান, দেশের লোক কেন করিবে?

সিউড়ি,
২রা শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল।

মফঃস্বলের কাগজ

আমাদের দেশে মফঃস্বল হইতে যে সব খবরের কাগজ বাহির হয়, সেগুলি যদি বেশ ভাল রকম করিয়া চলে, তাহা হইলে অনেক দিকে অনেক রকমের সুবিধা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় নানারূপ অন্তরায় আছে, যাহার জন্য মফঃস্বলে ঠিক কাগজের মত কাগজ একখানিও নাই বলিলে কাহারও দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি হইতে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করার কথা হয়। যিনি সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী তিনি আমার সুপরিচিত। সেই কাগজখানির জন্য আমি কিছু লেখা দিয়া আসি। সেই লেখাগুলি অবশ্য ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু

কোনদিকেই কাগজখানিকে একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অভিমুখী করা হয় নাই। তবে আশা আছে, ভবিষ্যতে হইতে পারে। সেই কাগজখানির জন্য যে লেখাগুলি দিয়াছিলাম, সেগুলি নীচে ছাপানো হইল. মফঃস্বলের কাগজগুলিকে কাগজের মত কাগজ করার ইচ্ছা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এগুলি পড়িয়া দেখিবেন। এই লেখাগুলি সম্বন্ধে কেবল একটা কথা বলা দরকার। যে কাগজের জন্য এই লেখা দেওয়া হইয়াছিল, সেই কাগজের যিনি কর্ত্তা, তিনি বর্ণাশ্রমব্যবস্থার বিশেষ পক্ষপাতী, সুতরাং তাঁহার যাহা নীতি, ইহাতে সেই নীতিরই অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই স্বাধীনতার যুগে সকলেরই নীতি একরূপ হইবে না। কিন্তু প্রত্যেকেরই, যাহা হউক একটা নীতি থাকা চাই, স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত করা চাই এবং সেই মূলনীতির আলোকে যাবতীয় ব্যাপার বুঝিয়া লওয়া চাই। একজনের নীতির সহিত অপরের নীতি না মিলিতে পারে, কিন্তু সেজন্য বিরোধ হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রত্যেকেই যদি সরলভাবে এক একটা নীতির অনুবর্ত্তন করেন, আর মতসহিষ্ণুতার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে বৈষম্যের মধ্যেও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প

ব্রহ্মণ্যদেবের চরণে প্রণাম! তিনি গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী। এই গো ও ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন আর্য্য-সমাজের দুইটী দিক্। একটী গোলকের যেমন দুইটী মেরু, এই মেরুদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া যেমন গোলকের প্রতিষ্ঠা, তেমনি এই ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজের একদিকে গো, আর একদিকে ব্রাহ্মণ। সমাজদেহ কৃত্রিম নহে, মানবের মনঃ-কল্পিত নহে, মানবের পার্থিব জীবনের সুবিধা-সাধনের একটী সাময়িক চুক্তির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত নহে। বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন সমাজ সেই ব্রহ্মণ্যদেবের মূর্ত্তি। আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং যাবতীয় পুরাণে এই কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। গো-মাতার পূজা যে দিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, গোজাতির রক্ষা ও সেবা, যেদিন আমাদের একটী অবশ্য-পালনীয় প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমাদের সমাজ তাহার প্রকৃত অবস্থায় আসিয়াছে। গো-মাতার দান ঘৃত; বেদ বলিয়াছেন, আয়ুই ঘৃত। যে ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ব্যবহার করিতে পারে, নীরোগ শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া তমঃ ও রজোগুণকে পরাজয় করিয়া সে ব্যক্তি সাত্ত্বিক অবস্থা অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করে। ঘৃতের নাম হবিঃ, ইহা দেবতাদের ভোজ্য. অগ্নির নাম হব্যবাহন; ইনি দেবগণের মুখ। মন্ত্রের দ্বারা এই হব্য, যথাবিধি উৎপাদিত পবিত্র অগ্নিতে সমর্পিত হয়, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। মনুষ্যগণ দেবতার সেবা করে, দেবতারা পুষ্ট ও তুষ্ট হইয়া মানবের সেবা করেন। দেবতায় ও মানবে এই প্রকারের প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ হইয়া বিশ্বব্যবস্থাকে কল্যাণের পথে চালাইয়া লইয়া যাইতে-

ছেন। এই যে সহযোগ, ইহাই বর্ণাশ্রমের প্রাণ। এই কারণে গো-মাতার সেবা ও পূজা বর্ণাশ্রমের প্রথম ও প্রধান কথা।

* * * * *

মানুষ সামাজিক জীব। এই সংসারকে স্বীকার করিয়া, এই সংসারের ও সমাজের কর্ত্তব্য-সমূহ যথাযথ পালন করিয়া মানুষকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে হইবে। মানব অস্ফুট সচ্চিদানন্দ, কর্ম্মের বিধানে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে তাহাকে বিকশিত হইতে হইবে—প্রস্ফুট সচ্চিদানন্দ হইতে হইবে। সুতরাং এই সমাজ ও সংসার,—এই সামাজিক ও সাংসারিক কর্ত্তব্য, পরিত্যাগ করিবার অধিকার সাধারণ মানুষের নাই, এই সংসারে প্রত্যেক মানুষের একটী সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে, এই স্থান ও কর্ত্তব্য তাহার স্বধর্ম। জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মের দ্বারা এই স্বধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে আমরা বাধ্য। মানুষ মাত্রেই ঋণী, পিতৃ লোকের নিকট ঋণ, দেবতার নিকট ঋণ, ঋষিগণের নিকট ঋণ। ইহা ছাড়া পিতা মাতা ভ্রাতা, ভগ্নি, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী সকলের নিকট মানব ঋণী। মানবের অপরাধ পদে পদে। জীবন ধারণ করিতে হইলে, সর্ব্বদাই অসংখ্য জীব জন্তুর প্রাণনাশ করিতে হয়, ঐ এক পাপ। শাস্ত্র তাহাকে পঞ্চসূনা বলিয়াছেন। যথাবিধি স্বধর্ম্ম পালন করিয়া সামাজিক ও সাংসারিক কর্ত্তব্য সমূহ শান্ত ও অনলসভাবে প্রতিপালন করিয়া আমাদিগকে ঋণমুক্ত হইতে হইবে। ঋণমুক্তি ব্যতীত আত্মার উন্নতি নাই। সংসারে থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিয়া এই উন্নতি ক্রমেক্রমে সাধন করিতে হইবে। সাংসারিক জীবনের শেষ উন্নতির নাম ব্রাহ্মণত্ব লাভ। কাজেই বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণ। এই কারণে সনাতন সমাজের একদিকে গো, আর একদিকে ব্রাহ্মণ। এই সমাজ, আদর্শ সমাজ। এখন এই সমাজ নাই, ইহার স্মৃতিমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। একদিন ইহা ছিল; এবং এই সমাজের ব্যবস্থা যখন প্রকৃতির সনাতন বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন সেই সমাজ আবার আসিবে। পুরাণে আছে দেবাপি ও মরু নামক দুইজন রাজা কলাপগ্রামে যোগসমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এই কলিযুগ আর বেশী দিন থাকিবে না। এই কলিযুগের অবসানে সত্যযুগের অভ্যুদয়ে সেই দুইজন রাজা আসিয়া আবার বর্ণাশ্রমাচার প্রবর্ত্তিত করিবেন।

* * * *

বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে স্বার্থের সংঘর্ষ নাই, প্রতিযোগিতা নাই, নানা প্রকারের অধিকারের দাবী লইয়া নিত্য বিসম্বাদ নাই। সেখানে সকলেই আত্মার কল্যাণ সাধনের জন্য তপস্যারত, সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে একনিষ্ঠ। গো-ব্রাহ্মণের হিত বলিতে এই আদর্শ

সমাজের রক্ষা বুঝায়। যিনি ব্রহ্মণ্যদেব ও বেদপুরুষ, এই সমাজ তাঁহার দেহ, এই সমাজের তিনি রক্ষক ও প্রতিপালক। আজ এই সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মানুষে মানুষে হিংসা, ঘৃণা, প্রতিযোগিতা। চারিদিকেই কুরুক্ষেত্র, কিন্তু নিরাশ হওয়ার কারণ নাই; সেই ব্রহ্মণ্যদেব রহিয়াছেন, তাঁহার বাঁশী বাজিতেছে, প্রেমধাম বৃন্দাবনে আবার মিলন হইবে;—এই বৃন্দাবন বর্ণাশ্রমাচার-বৃক্ষের অমৃতময় ফল।

* * * *

ব্রহ্মণ্যদেবের চরণে পুনরায় প্রণাম। এই প্রাচীনতম সমাজ, এই শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও সদাচার তিনি রক্ষা করুন। আমাদিগকে তাঁহার দাস হইবার উপযুক্ত করুন। এই গোব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সনাতন সমাজ আবার তাহার প্রাচীন গৌরব ও সজীবতায় আবার উপস্থিত হইলে, কেবল ভারতের কল্যাণ নহে, সমগ্র পৃথিবীর পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। এই রূপেই তিনি জগতের হিতকারী। আমরা সেই জগতের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবের চরণে প্রণাম করি। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও দেশের ভিতর যে হিংসানল ধূমায়িত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া যাহার সংসার দগ্ধ করিতেছে, সেই অনল চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হউক, যিনি ব্রহ্মণ্যদেব তিনি কৃষ্ণরূপে সকলের মন প্রাণ আকর্ষণ করুন, গোবিন্দরূপে সকলের ইন্দ্রিয়গণকে সুপথে পরিচালিত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রাজবাটী সহর হইতে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইতেছে, তাহার নাম "সংসার"। বর্ত্তমান সময়ে যাহা প্রয়োজন, তাহা সাধন করিতে হইলে নানাস্থান হইতে নূতন নূতন সংবাদ-পত্র বাহির হওয়া আবশ্যক, সুতরাং এই সংবাদ-পত্র-প্রবর্ত্তন একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কর্ম্মের প্রারম্ভে আপনারা সাধুগণ, বন্ধুগণ, দেশের কল্যাণকামিগণ সকলেই করুণা করিয়া বলুন, এই কার্য্যে মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে কেবল পরিচালকগণের মঙ্গল নহে, দেশের, রাজা, প্রজা সকলেরই মঙ্গল। সকলের ভিতরে প্রীতির ভাব বর্দ্ধিত হউক; প্রত্যেকের প্রাণ অপরের হিতসাধনের জন্য, আপনা হইতে ব্যাকুল হউক। ইহাই সংবাদ-পত্র পরিচালনার উদ্দেশ্য, অতএব এই সংবাদপত্রের মঙ্গলে সকলেরই মঙ্গল, আপনারা প্রাণ ভরিয়া সমস্বরে বলুন—ইহার উন্নতি হউক, উন্নতি হউক, উন্নতি হউক। সমাজের জীবনে, ব্যক্তির জীবনে, অনেক গ্লানি ও ভ্রান্তি, পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সংবাদ-পত্রের দ্বারা সমাজ পবিত্র হয়, উন্নত হয়; নিখিল দেবগণ, নিখিল সাধুগণ এই শুভকার্য্যের সহায় হউন, এই সংবাদ-পত্রের পরিচালকগণ যেন, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট না হন, প্রেম হইতে ভ্রষ্ট না হন।

সংবাদ-পত্র পরিচালনা একজনের কর্ম্ম নহে, খুব বেশী শক্তিশালী ও জ্ঞানী লোকও একাকী কখনও সংবাদ-পত্র পরিচালনা করিতে পারেন না। ইহা দশজনের কাজ, দশজনে একতাবদ্ধ হইয়া একটী সাধারণ লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমবেত ভাবে কর্ম্মরত হইলেই সংবাদ-পত্র

পরিচালিত হয়। পৃথিবীতে সঙ্ঘশক্তি বা সমবায়-শক্তি অর্থাৎ দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার সামর্থ্য যত বাড়িতেছে, সংবাদ পত্রেরও তত উন্নতি হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে যে প্রকারের সুবৃহৎ সংবাদ-পত্রসমূহ প্রচারিত হয়, তাহা এখনও আমাদের কল্পনাতীত। বর্ত্তমান যুগের যাহা লক্ষণ, অর্থাৎ জনসাধারণের জাগরণ, তাহা নিরাপদ পথে পরিচালনা করিতে গেলে, সংবাদ-পত্রকে প্রধান শক্তিরূপে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের দেশে সংবাদ-পত্র পরিচালনার প্রধান অসুবিধা, সংবাদ-সংগ্রহ। উত্তমরূপ সংবাদ সংগৃহীত না হওয়ায়, আমাদের দেশের অধিকাংশ কাগজই সংবাদ-পত্র নহে, মতপত্র—News Paper নহে, Opinion Paper। এখন প্রয়োজন, প্রত্যেক গ্রামে কতকগুলি করিয়া সচ্চরিত্র ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি গড়িয়া তোলা, যাহারা প্রকৃত প্রয়োজনীয় সংবাদ যোগাইতে পারিবে। কিন্তু ইহা বড় কঠিন কথা, পাশ্চাত্য দেশে সংবাদপত্র পরিচালনা শিখাইবার জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। স্কুল নহে, কলেজ নহে, একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যাপার কত বড়, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা দরিদ্র, দরিদ্র লোকেই সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া দেশের সেবা করিতে চাহে, তাহারা অর্থ ব্যয় করিতে পারে না, সুতরাং সংবাদ দিবার জন্য ভাল লোকও নিযুক্ত করিতে পারে না। এখন আমাদের দেশে সকল বিভাগেই ত্যাগশীল কর্ম্মীর প্রয়োজন, যাহারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য পরিশ্রম করিবে, এই প্রকারের সংবাদদাতা প্রথম প্রয়োজন, নতুবা প্রকৃত সংবাদপত্র অসম্ভব।

কিন্তু সংবাদ কি? কোন্ সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক? যাঁহারা সংবাদ পাঠাইবেন, তাঁহাদের এই বোধ News-sense থাকা আবশ্যক। নতুবা এমন সংবাদ আসিবে, যাহার প্রচার, ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থমূলক বা নিন্দামূলক। এ প্রকারের সংবাদ প্রচারিত হইলে কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হইতে পারে। সংবাদ পত্র এ যুগে একটী শক্তি—খুব বড় শক্তি। শক্তি সুপথে পরিচালিত হইলে কল্যাণ হয়, কুপথে চালিত হইলে অকল্যাণ হয়। সাধনার দ্বারা শক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু শক্তিকে সংযত করিয়া সুপথে পরিচালনা করা বড়ই কঠিন। সুতরাং সংবাদ-পত্র পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। সকলের কল্যাণ হউক, সকলের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হউক, প্রত্যেকে নিজকে ও অপরকে বুঝিতে শিখুক, এবং এই বোধ ও জ্ঞানের দ্বারা সকলেই উদার হউক, ইহাই এ যুগের প্রার্থনা।

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, ন কশ্চিৎ দুঃখ মাপ্নুয়াৎ ॥

এই মন্ত্র সফল হউক।

সংবাদ-পত্র পরিচালনায় সংবাদ-সংগ্রহ বিশেষতঃ স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ বড়ই কঠিন কথা। তাহার

পর কিছু কিছু মতামত দিতেই হবে, এই মতামত দেওয়া বড়ই কঠিন। পৃথিবীর সকল দেশেই দলাদলি খুব বেশী। অধিকাংশ সংবাদ পত্রই, একটি বিশেষ দলের। কোনও দলের নহে, নিরপেক্ষ ভাবে সত্য ও কল্যাণ চাহে, এই প্রকারের সংবাদ-পত্রই বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজন। সুতরাং, মতামত দিবার সময় ব্যস্ত হওয়া অসঙ্গত। কোন পক্ষের কোনও মত প্রচারিত হইবামাত্র অপর পক্ষ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়,—এই প্রকারের বাদানুবাদ যেন যুগধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। সকল পক্ষের মত ধীরভাবে আলোচনা করিয়া, বিবিধ মতের কুয়াশা ভেদ করিয়া, সত্যের সূর্য্যালোক অন্বেষণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে এখনও সংবাদ-পত্রের গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা খুব বেশী নহে, তবে সুখের বিষয় সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দারিদ্র্য অবশ্য একটী কারণ, কিন্তু লোকের পড়িবার বা শিখিবার প্রবৃত্তিও তেমন নাই, এই প্রবৃত্তি চেষ্টা করিয়া বাড়াইতে হইবে। মফঃস্বলের একখানি কাগজ ঠিকমত চালাইতে হইলে সংক্ষেপে অনেক জিনিষের আবশ্যক। প্রথমতঃ সমগ্র পৃথিবীর সংবাদ প্রয়োজন ; পৃথিবী জুড়িয়া যাহা যাহা হইতেছে, তাহার অনেক কথা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে কোনও লোকই স্বতন্ত্র নহে, প্রত্যেকেই অপর সকলের সহিত নাড়ীর টানে বাঁধা হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের হিতাহিতের সহিত প্রত্যেক দেশের সম্বন্ধ আছে, সুতরাং বিশ্বের সংবাদ চাই। তাহার পর ভারতের সংবাদ ; তাহার পর বাঙ্গালার সংবাদ, তাহার পর জেলার ও মহকুমার সংবাদ। এই সংবাদ নানারূপ ;—সাহিত্যের সংবাদ, বিজ্ঞানের সংবাদ, রাজনীতি ও সমাজের সংবাদ, যুদ্ধ, বিগ্রহ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের সংবাদ, সকলই দরকার। একটি মহকুমার সদরে অনেক লেখাপড়া জানা লোক আছেন, অনেক এম, এ, বি, এ, আছেন, অনেক বড় বড় কাগজও আসে এবং অনেকেই তাহা পড়েন। তাঁহারা ঐ সমুদায় কাগজ পত্র পড়িবার সময় যদি চিন্তা করেন, যাহা যাহা পড়িলাম, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ দেশের লোকের জানা আবশ্যক, এইটুকু চিন্তা করিয়া যদি তাঁহারা বাঙ্গালায় কিছু কিছু লিখিয়া স্থানীয় সংবাদ পত্রে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে মফঃস্বল হইতে খুব ভাল কাগজ বাহির হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এই কার্য্য করিবেন, তাঁহাদেরও সাধনা আবশ্যক ; অর্থাৎ কোন্ কোন্ সংবাদ দেশের লোকের জানা আবশ্যক, তাহা নির্দ্ধারণ করা অনায়াস-সাধ্য নহে। তবে কাজ যদি আরম্ভ করা যায় এবং সকল সময়েই চিন্তা ও চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে অল্প দিনেই আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবেন এবং দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। যাহারা এই কার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহাদের দৃষ্টি (outlook) খুব উদার ও নিরপেক্ষ হওয়া চাই। প্রার্থনা করি, ভগবানের কৃপায় এই সাধু চেষ্টা সফলতা লাভ করুক।

* * * * *

গত বৎসর অর্থাৎ ১৩৩০ সালের মাঘ মাসে আমরা রাজবাড়ী গিয়াছিলাম, সে-সম্বন্ধে 'সংসার' কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল। বক্তৃতার সারসঙ্কলনে যে সমুদয় কথা আছে, পরে তাহার অনেক কথা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে বলিয়াই ঐগুলি স্থায়ীরূপে মুদ্রিত করা গেল।

"বঙ্গদেশের সুপরিচিত ধর্ম্মবক্তা মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি এ ভাগবতরত্ন বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহোদয় স্থানীয় হরি-সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এখানে শুভাগমন পূর্ব্বক গত ১লা, ২রা, ৩রা মাঘ তিনদিন এখানে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন, সকল শ্রেণীর লোকে তাঁহার এই বক্তৃতা শুনিয়া আপ্যায়িত ও আনন্দিত হইয়াছেন। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদের আগমন রাজবাড়ীতে নূতন নহে, হরি-সভার ৩য় বার্ষিক অধিবেশন হইল, এই তিনবারই তিনি আসিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সরস্বতী পূজার উৎসবে রাজা সূর্য্যকুমার বিদ্যালয়ের আহ্বানে তিন বার আসিয়াছেন। এই সহরের সকলেই তাঁহাকে জানেন, তাঁহার এবারের বক্তৃতা কিছু নূতন রকমের, এবং বক্তৃতার প্রারম্ভেই সে কথা তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম দিনের বক্তৃতার প্রধান কথা ছিল—

ধর্ম্ম-সমন্বয়

তিনি বলিলেন—পূর্ব্বকালে হিন্দু যাহা ভাবিত, দায়ে পড়িয়া এখন আর তাহা ভাবে না। এখন অনেক হিন্দু মনে করে—ভরেতবর্ষে যদি সকলেই হিন্দু হইত তা'হইলে কোনও গোলযোগ থাকিত না, মুসলমান মনে করে—ভারতবর্ষে যদি সকলেই মুসলমান হইত তাহা হইলে খুব ভাল হইত। খৃষ্টানও তাহাই মনে করে অর্থাৎ খৃষ্টান ভাবে—সকলেই যদি খৃষ্টান হইত তাহা হইলে স্বার্থ-সামঞ্জস্যে গোলযোগ থাকিত না। কিন্তু যিনি সত্য,—যাঁহাকে আমরা সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর বলি, তিনি বলিতেছেন, তাহা হইবে না,—হইবার নহে। ভারাতবর্ষ কেবল হিন্দুর নহে, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা পার্শীর নহে, ভারতবর্ষ সকলের, ভারতবর্ষ বিশ্ব-মানবের। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝা বড়ই কঠিন। তাঁহার চেষ্টায় ও নেতৃত্বে ভারতে ক্ষাত্র-শক্তি ধ্বংস হইয়াছে, সামরিক শক্তিতে ভারতবর্ষ দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অনায়াসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পর বুদ্ধদেব, তিনি ভারতের বাণী,—আত্মার অমরতা ও অহিংসের বাণী সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। আজ ভারতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের ও জাতির লোক সমবেত। কোনও ধর্ম্ম মিথ্যা নহে, সকল ধর্ম্মই সত্য; কোন ধর্ম্মই ধ্বংস হইবে না, সকল ধর্ম্মই থাকিবে। এক ধর্ম্ম হইতে মানুষকে ধর্ম্মান্তরিত করার চেষ্টা উচিত নহে, প্রত্যেকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হউক, অথচ অন্য ধর্ম্মা-

বর্ণহি লোকের সহিত প্রেমে মিলিত হউক, হিন্দুধর্ম্মের বহু পথ ও বহু মত; কিন্তু প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের ভূমি দেখিতেন; ইহাই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের বা বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। সেকালের ব্রাহ্মণেরা যেমন হিন্দু ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও মত, মানুষের অধিকার ও রুচিভেদে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে ঐক্য দেখিতেন, সেইরূপ একালের প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা কেবল হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা নহে; পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের সার্থকতা বুঝিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য দর্শন করিবেন। ইহাই নবভারতের সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু এই আদর্শই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের তিনি অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু সেই বৈষ্ণবকে নিজের মতে আনেন নাই, পূর্ব্বে তাহার যে মত ছিল, সেই মতেই তাহাকে দৃঢ় করিয়াছেন। যবন হরিদাসের যখন বিচার হয়, সে সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও এই সমন্বয়ের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লেখা অসম্ভব। সমুদায় বক্তৃতাটী লিখিয়া না হইলে বুঝিতে পারা যায় না, তিনি কি বলিয়াছেন।—প্রথম দিনের বক্তৃতাতেই তিনি বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, সে বিষয় আলোচনা করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য মানিতে চাহে না, এ বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং বহু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন য়িহুদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহাও খৃষ্টান ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যেমন জন্মান্তর-বাদ, কর্ম্ম, মন্ত্র, দেবতা, পিতৃলোক প্রভৃতি। বেদ কি, মন্ত্র কি, বেদ সম্বন্ধে মীমাংসকগণের মত; নৈয়ায়িকগণের মত, পানিনীর মত ও বেদান্তের মত আলোচনা করিয়াছিলেন।

* * * * * *

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি আয়র্লণ্ড দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈট্‌স, যিনি এ বৎসর নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন, তাঁহার জীবনের উপর ভারতবর্ষের সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত অধিক, ইহা তিনি নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সূক্ষ্ম জগতে যে সমুদয় দেবযোনী রহিয়াছে, কবি ঈট্‌স তাহাদের দেখিতে পান, তাঁহার ভিতরে এই সমুদয় শক্তি বিকশিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক কনাণ্ডয়েল দেবযোনীগণের ফটোগ্রাফ তুলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, মানব জাতির চিন্তা ও সাধনা কোন্ দিকে চলিতেছে। আমরা দেবতায় বিশ্বাস করি, দেবতার সহিত মানবের সম্বন্ধ আছে, মানুষ দেবতার সেবা করিবে, দেবতা মানুষের সেবা করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থা। অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে দেবকৃত্য, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি করিতে চাহে না, ইহা অন্যায়। ত্রিগুণের সীমা ছাড়াইয়া

গেলে দেবঋণ বা পিতৃঋণ থাকে না, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই গুলি যথা-নিয়মে করা আবশ্যক; না করিলে পতন হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক সময় বাদানুবাদ হয়, কিন্তু ভগবদ্গীতা ভাল করিয়া পড়িলে বুঝিবেন, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ নাই। গীতার ১৩শ অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, ১২শ অধ্যায়ে ভক্তির কথা বলিয়াছেন। এইস্থানে, বক্তা গীতার অনেক গুলি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। গীতার এই অংশগুলি পড়িলে বুঝিবেন, জ্ঞানই বলুন আর ভক্তিই বলুন তর্ক করিবার বিষয় নহে, নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করিবার জিনিষ। গীতায় সকল প্রকারের সাধনার কথাই আছে, কিন্তু গীতা পড়িলে বুঝিতে পারিবেন নৈতিক জীবনের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাই গীতা-ধর্ম্মের প্রধান কথা। ধর্ম্ম কেবল একটী পারলৌকিক ব্যাপার নহে. পরলোক সত্য কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন গঠনে অলৌকিকের বা অদৃষ্টের দোহাই দিবেন না, তাহা হইলে পতিত হইবেন। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় শেষে তিনি বলিলেন যে ধর্ম্মে-সাধন বা ভগবত- অন্বেষণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এক নিত্য ও পারমার্থিক সত্যের জন্য মানবাত্মার যে আকুলতা তাহা একটী মৌলিক বৃত্তি, ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা ও বাংলা বৈষ্ণব কবিতা আবৃত্তি করিয়া, এই কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিলেন।

* * * * * *

তৃতীয় দিনের বক্তৃতা। মানুষের চৈতন্য বা জ্ঞান এখন যতটুকু বিকশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা বৃহত্তর চৈতন্য রহিয়াছে। বক্তৃতার প্রারম্ভেই বক্তা মহাশয় বিলাতের নানারূপ পরীক্ষার ফলের দ্বারা তাহা বুঝাইলেন। একজন লোককে হিপনোটাইজ্ করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহার ভিতর হইতে পর পর দুইটি দুইরকমের মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে উন্নততর মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে এই সব বিষয়ের অলোচনা চলিতেছে। মানুষের এই বৃহত্তর চৈতন্যই ধর্ম্ম সাধনার প্রধান কথা। আত্মায় বিশ্বাস না হইলে, ভগবানে বিশ্বাস হয় না। বৈষ্ণব গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তি বড় এবং ভক্ত বড়, একথার অর্থ ইহাই। তাহার পর তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি, শ্রীবৃন্দাবন কি, তাহা বিস্তারিত রূপে বুঝাইলেন।

বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধা

ভূমিকা

ক। গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ও দানকেলিকৌমুদী। শ্রীরাধাতত্ত্বের আলোচনায় এই নাটক তিনখানির আলোচনা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম দুখানি নাটক-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা আছে। উভয় নাটকের অনেকগুলি শ্লোক তথায় উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যা যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সত্যভামাপুর নামক এক গ্রামে একরাত্রি ছিলেন। রাত্রিকালে এক দিব্যমূর্ত্তি নারী তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন—"আমার পৃথক্ নাটক রচনা কর।" নীলাচলে যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বলেন—

> কৃষ্ণকে বাহির নাহি করহ ব্রজ হৈতে।
> ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাঁতে॥

পূর্ব্বে স্বপ্নযোগে সত্যভামা দেবীর আদেশ পাইয়াছেন, এখন আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ পাইলেন। ফলে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় দুখানি নাটক রচনা করিলেন। এই দুখানি নাটকই ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব। ১৮৮০ সম্বতে অর্থাৎ ১৫৮৯ শকাব্দায় —শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রকট হইবার একবৎসর পূর্ব্বে—বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের রচনা গোকুলে সমাপ্ত হয়। ইহার পাঁচবৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯৪ শকাব্দায় ললিতমাধব সমাপ্ত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু,—সার্ব্বভৌম, রায় রমানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির সহিত একত্রে বসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর মুখে তাঁহার নাটক দুইখানির অনেকগুলি শ্লোক শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম অধ্যায়ে বিদগ্ধমাধবের পঁচিশটি শ্লোক আর ললিতমাধবের তেরটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী অল্পদিনের ভিতর নাটক রচনা সমাপ্ত করেন নাই। তিনি বহু-বৎসর এই নাটক দুখানির বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে অনেকদিন ধরিয়া শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রবণ করেন, তখন বিদগ্ধমাধবের শ্লোকগুলি প্রায়ই রচিত হইয়াছিল। ললিতমাধবেরও অনেকগুলি শ্লোক রচিত হইয়াছিল। নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় অল্প-দিনেই বিদগ্ধমাধব শেষ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-নিবন্ধন ললিতমাধব সম্পূর্ণ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল।

বিদগ্ধমাধব নাটক সপ্তাঙ্কে বিভক্ত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। প্রেমলীলার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা অতি ধীরভাবে অস্বাদনীয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শ্রীরাধা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাই তাহারই আলোচনা করিতেছি।

খ। পৌর্ণমাসী ও ঐতিহাসিক সংবাদ

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রধান পাত্রী, দেবী পৌর্ণমাসী। তাঁহারই কথা সর্ব্ব-প্রথমে আলোচনা করা আবশ্যক। বিদগ্ধমাধব নাটকে পৌর্ণমাসী দেবী এইভাবে বর্ণিত হইয়াছেন।

বহন্তী কাষায়াম্বরমুরসি সান্দীপনিমুনেঃ
সবিত্রী সাবিত্রীসমরুচিরলং পাণ্ডুরকচা।
সুরর্ষে শিষ্যেয়ং পরিজনবতী নন্দভবনা—
দিতো মন্দং মন্দং স্ফুটমুটজবীথিং প্রবিশতি॥

সাবিত্রীর তুল্য রুচিশালিনী, সান্দীপনি মুনির জননী, বক্ষঃস্থলে রক্তবসন এবং মস্তকে

পাণ্ডুর অর্থাৎ শুক্লবর্ণ কেশভার লইয়া পরিজন-সহ মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে নন্দভবন হইতে পর্ণশালার পথে প্রবেশ করিতেছেন।

বিদগ্ধমাধব নাটকে আছে, শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই গুরুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশে দেবী পৌর্ণমাসী গোকুলে আসিয়া বাস করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মধুমঙ্গল সান্দীপনি মুনির পুত্র। পিতামহী পৌর্ণমাসীর সেবার জন্য পিতা সান্দীপনি তাঁহাকে গোকুলে রাখিয়াছেন।

নৃশংস কংস নৃপতির ভয়ে শ্রীরাধিকাকে এক সময়ে গোকুল হইতে সরাইয়া সন্তসুবাস নামক তীর্থস্থানে গোপনে রাখিতে হইয়াছিল। শ্রীরাধিকার লোকাতীত সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণাবলীর কথা কংস শুনিয়াছিলেন সেই জন্যই ভয়।

যশোদা দেবীর ধাত্রীর নাম মুখরা। শ্রীরাধা তাঁহার নপ্ত্রী। জটিলার পুত্র অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হয়। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বড় আশ্চর্য্য কথা, আপনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাকে মিলিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনি অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ অনুমোদন করিলেন কিরূপে?" পৌর্ণমাসী হাস্য করিয়া বলিলেন—

তদ্বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকং। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলুতাঃ কৃষ্ণস্য। এই বিবাহ মিথ্যা। তাঁহাদের অর্থাৎ শ্রীরাধা প্রভৃতির মিথ্যা বিবাহাদি স্বয়ং যোগমায়া সত্যের ন্যায় প্রত্যায়িত করিয়াছেন। বঞ্চনা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন। কাহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন? উত্তর, কংস প্রভৃতি বহিরঙ্গ-জনকে। কারণ, এ কথা নিশ্চিত যে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদগ্ধমাধব নাটকের টিকা করিয়াছেন। তাঁহার টিকার এই অংশটুকু আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবমতের একটি সংবাদ জানা আবশ্যক। 'পরকীয়াবাদ' বাঙ্গালার বৈষ্ণবমতের একটি প্রধান কথা। এই পরকীয়া কিরূপ, সে সম্বন্ধে সম্প্রদায়ের ভিতরেও মতভেদ আছে। মনে রাখিতে হইবে, পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় 'চরমপন্থী' পরকীয়বাদী। তিনি এই মত লইয়া অনেকের

সহিত বিচার করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং রস-উদ্ঘাটনের ক্ষমতা, তাঁহার রচনা-বলীতেই প্রকাশিত ; তাহার তুলনা নাই। তিনি যেখানেই সুবিধা পাইয়াছেন, পরকীয়-বাদ-সম্বন্ধে নিজের মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের টিকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলিলেন—যোগমায়া মিথ্যাকে প্রত্যায়িত করিলেন, অর্থাৎ সত্যের ন্যায় বুঝাইয়া দিলেন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে এই সত্যবোধ একটা সাময়িক ব্যাপার। সর্ব্বকালস্থায়ী সত্যের ন্যায় প্রত্যায়িত করিলেন—কারণ ইহা যে যোগমায়ার কল্পনা। যদি মায়ার কল্পনা হইত তাহা হইলে উহা বাস্তবে মিথ্যা হইত, কিন্তু যোগমায়ার কল্পনা সেরূপ নহে। যোগমায়ার কল্পনা যদি সেরূপ হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তক্ষণাদি লীলা অবাস্তব হইত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই অংশের বিচার বড়ই সূক্ষ্ম ও দুরূহ, কিছুদিন ধরিয়া বিশিষ্টরূপ চিন্তাপ্রণালীর অনুশীলন না করিলে ইহার রহস্য ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু এই রহস্য আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে, কঠিন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না, কারণ ইহা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, আমাদের জাতীয় সাধনার ফল।

কংসের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ। এই বিবাহের পূর্ব্বে সন্তনুবাস তীর্থে শ্রীরাধাকে গোপনে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ভয়ের যে শেষ নাই! অভিমন্যু শ্রীরাধাকে গোকুল হইতে সরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অগম্য স্থান মথুরায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যাহা হউক পৌর্ণমাসী দেবী চেষ্টা করিতে-ছেন, যাহাতে শ্রীরাধার মথুরা যাওয়া না হয়। শ্রীরাধিকার কথার আলোচনা করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচন্দ্রাবলীর কথারও আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীরাধার সহিত যেমন অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছে, চন্দ্রাবলীর সহিত সেইরূপ গোবর্দ্ধন মল্লের বিবাহ হইয়াছে। গোবর্দ্ধন মল্ল কংসের গোমণ্ডলের অধ্যক্ষ। তিনি রাজকর্ম্মচারী, কাজেই নিজেকে একজন সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ লোক বলিয়া বিবেচনা করেন।

আমরা যাহাকে ঐতিহাসিক সংবাদ বলি, বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধাসম্বন্ধে তাহার কেবল এইটুকুই পাওয়া যায়। তাহার পর যাহা আছে সমস্তই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা,—মিলন ও বিরহের কথা। শ্রীরাধা তাঁহার দুই সখী ললিতা ও বিশাখার সহিত সূর্য্যের আরাধনা করিতেছেন। আর চন্দ্রাবলী তাঁহার দুই সখী পদ্মা ও শৈব্যার সহিত চণ্ডিকার অর্চনা

করিতেছেন। পৌর্ণমাসী দেবী বলেন—ব্রজসুন্দরীগণের এই দেবপূজা কিছুই নহে, বাড়ীর লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া বনে যাইবার ইহা কেবল ছলনামাত্র।' ইঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহজপ্রেম জাগরিত হইয়াছে।

১। বেণুনাদবিলাস

বিদগ্ধ মাধবের প্রথম অঙ্কের নাম বেণুনাদবিলাস। কিশোর কিশোরীর হাট—আনন্দ-কানন শ্রীবৃন্দাবন। পৌর্ণমাসী ও নান্দীমুখী নেতৃত্ব লইয়াছেন, সখাসখীগণের সাহায্যে কিশোরশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও কিশোরীর শিরোমণি শ্রীরাধা, এই দুইজনের হৃদয় লইয়া প্রেমের খেলা খেলিতেছেন। আমাদের মনে হইতে পারে, ইহার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তরে যাহা বলা সঙ্গত, তাহা সংক্ষেপে বলা কঠিন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক। উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থের লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতে আছে "পিবত ভাগবতং রসম্" ভাগবত রস পান করুন। বেদের উপদেশে বুঝা যায় ভগবানই রস। "ব্যঙ্গ ব্যঞ্জকয়োরভেদঃ" যাহা ব্যঞ্জিত হয় এবং যাহা ব্যঞ্জনা করে, এ দুইয়ের মধ্যে ভেদ নাই। রসের মধ্যে মুখ্যরস উজ্জ্বলরস। ইহা দুরূহ এবং রহস্য। সকলের নিকট ইহা বলা নিষেধ। কিন্তু এখন লোকে অধিকারীভেদ মানে না, সুতরাং বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা ব্যতীত উপায় নাই।

প্রথম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শুনিয়া শ্রীরাধার কি অবস্থা হইয়াছে তাহাই নাট্যকার বর্ণনা করিযাছেন। আমরা কেবল একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধার করিতেছি।

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্ন জানে।
হা হা কুলীন গৃহিণীগণ গর্হণীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাসি॥

কদম্ববিটপীর অন্তর হইতে অর্থাৎ কদম্ববনের ভিতর হইতে কি এক শব্দ বিসর্পিত হইয়া আমার কর্ণপদবীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানি না। হায়, হায়, কুলীনগৃহিণীগণের নিন্দনীয় এক দশা আমি তদ্দারা প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীযদুনন্দন দাস এই শ্লোকটির নিম্নরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

কদম্বের বন হইতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া পেলি, সুমাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে॥
হাহা কুলরমণীর, গ্রহণ করিতে ধীর,
যাতে কোন দশা কৈল মোহে॥
শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হৈলে তুমি বিমোহনে,
রহ তুমি চিত্তে বাঁধি থেহ॥

বাঙ্গলার বৈষ্ণবপদাবলীর সম্যক্‌রূপ আলোচনা করিতে হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী ও অন্যান্য পূজ্যপাদ গোস্বামীপাদগণের গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত আস্বাদন করা একান্তভাবে আবশ্যক। বিদগ্ধমাধবের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, সেই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি আমরা উদ্ধবদাসের নিম্নের সুপরিচিত পদটিতে শুনিতে পাই।

কদম্বের বনে, থাকে কোন্‌জনে, কেমন শবদ আসি।
এ কি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি॥
সান্ধাঞা মরমে, ঘুচাঞা ধরমে, করিলে পাগলী পারা।
চিত থির নহে, সোয়াথ না রহে, নয়ানে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন, সেই কোনজন, এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে॥
পরাণ না ধরে, ধক ধক করে, রহে দরশন আশে।
যবহুঁ দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধবদাসে॥

২। মন্মথলেখ

বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের নাম "মন্মথলেখ" শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণয়পত্র লেখেন। এই অঙ্কে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের অবস্থাগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমতী রাধিকার শরীর অতিশয় অসুস্থ হইয়াছে, মুখরা হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন। পৌর্ণমাসী দেবীর আদেশে নান্দীমুখী তত্ত্ব লইতে গিয়াছেন। মুখরা কাঁদিয়াই আকুল, বাছা শ্রীরাধা বাতুলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে। নান্দীমুখী অবশ্য বুঝিলেন, কিজন্য শ্রীরাধার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। নাট্যকার এইরূপ ভূমিকা করিয়া ললিতা ও বিশাখাসহ শ্রীরাধাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং শ্রীরাধার অবস্থা কি, তাহা দেখাইলেন। নান্দীমুখী শ্রীরাধার অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহার সহিত কথা কহিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রোগ সারিয়া যাইবে। এদিকে দেবী পৌর্ণমাসী মুখরাকে বলিলেন, শ্রীরাধার ব্যাধি দুঃসাধ্য, দানবকুলাবতংস কংসাদি শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতেছে, সেই কারণে কোন স্ত্রীগ্রহ আসিয়া এই বালাতে প্রবেশ করিয়াছে। এখন প্রতিকার? পৌর্ণমাসী ব্যবস্থা দিলেন, দানবারি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্রেই ইহার প্রতিকার হইবে। মুখরা বুঝিলেন, পৌর্ণমাসী যাহা বলিতেছেন, তাহাই একমাত্র ব্যবস্থা। কিন্তু জটিলাকে লইয়াই বিপদ। যাহা হউক পৌর্ণমাসী মুখরাকে বলিলেন, তুমি আমার নাম করিয়া জটিলাকে বল, তাহা হইলেই জটিলা স্বীকার করিবে। তাহার পর পৌর্ণমাসীর উপদেশে শ্রীরাধিকা একখানি পত্র লিখিলেন, ললিতা গিয়া সেই অনঙ্গলেখ শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। পত্র দিয়া ললিতা শ্রীকৃষ্ণের গলার মালা লইয়া আসিলেন, সেইমালার গন্ধে শ্রীরাধার মূর্চ্ছা অপনোদন হইল। তাহার পর এই অঙ্কে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের দশমীদশা অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্থানের শ্লোকগুলি বড়ই মধুর, আমরা কেবল একটি উদ্ধার করিতেছি।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং।
মুধা মারোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥

সখি! কৃষ্ণ যদি আমার উপর অকরুণ হইয়াই থাকেন, তাহাতে তোমার দোষ কি? অকারণ কাঁদিও না। তমালবৃক্ষের শাখায় আমার হাত দুটিকে এমন করিয়া বাঁধিও, যাহাতে আমার এই দেহ চিরকাল অবিচলভাবে এই বৃন্দাবনে থাকে, এই শেষকার্য্যটি আমার করিও।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের একটি সুপরিচিত পদ, এই শ্লোকের অনুবর্ত্তনে রচিত।

নিজ সখি-বদন, হেরি সুধামুখি, বুঝি কহে গদ গদ ভাত।
রসিক সুনাহ, মোহে যদি উপেখল, কাহে তাপায়সি গাঁত॥
মঝু লাগি যতন করলি দুখ পায়লি, দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুঁহু কাহে বিরস বদন ঘন রোয়সি কিয়ে পুন করলি অকাজ॥
শুন সখি কর তুহুঁ পর উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব মৃততনু রাখবি হামার॥
কবহুঁ শ্যামতনু পরিমল পাওব তবহুঁ মনোরথ পূর।
ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই রহু রাধামোহন দূর।

শ্রীরাধিকাকে সখিগণ সূর্য্যপূজার জন্য ফুলবনে আনিয়াছেন, শ্রীরাধা জবাফুল চয়ন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণও সখা মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া জবাফুল তুলিতে আসিয়াছেন। শ্রীরাধার পত্রের জবাব দিতে হইবে, কাজেই জবাফুলের রসের প্রয়োজন। সেইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া শ্রীরাধার হৃদয়ের কথা শুনিলেন। তাহার পর, ললিতার দেওয়া অপক্ক গুঞ্জাফলের মালার পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে নিজের রঙ্গণমালা দিয়া ফেলিয়াছেন, এখন সেই মালা ফিরাইয়া লইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা ও তঁাহার সখীগণের নিকটে আসিলেন ও মালা চাহিলেন। মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—সখে, রঙ্গণমালা শ্রীরাধার কণ্ঠে দেখিতেছি, তুমি উহা নিজেই টানিয়া কাড়িয়া লও।

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন—সখে তুমিত সকলই জান, আমাকে তুমি অন্যায় কার্য্য করিতে বল কেন? আমি যে স্বপ্নেও কামিনীস্পর্শ স্মরণ পর্য্যন্ত করি না।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিশখা হাস্য করিয়া বলিলেন—তুমি বরাঙ্গনা-তরঙ্গিনীগণের মহাসাগর। নদী-সমূহ যেমন মহাসাগরে গিয়া সঙ্গতা হয়, তেমনি, হে নাগর, যাবতীয় শ্রেষ্ঠনারী তোমাতেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে। তুমি সাধু সাজিতেছ, কিন্তু তোমার অঙ্গে সেই সমুদয় কামিনীগণের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

বিশাখার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ রহস্যালাপ হইতেছে, এমন সময়ে দূরে শব্দ হইল—"নপ্ত্রি, বিশাখে।"

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন বৃদ্ধা জটিলা উপস্থিত, ভাবিলেন অসময়ে এখানে জটিলা

কেন ? জটিলা নিকটে আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, কৃষ্ণ এখানে কেন ? বিশাখাকে বলিলেন—বিশাখে তুমি যে ধূপ, গন্ধ, রক্তচন্দন সব ভুলিয়া আসিয়াছ !

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিতেছেন—

চন্দ্রিকাং চন্দ্রলেখায়াশ্চকোরে পাতুমুদ্যতে ।
পিধানং বিদধে হন্ত শরদম্ভোধরাবলী ॥

চকোর চন্দ্রকলার চন্দ্রিকা পান করিতে যেমন প্রবৃত্ত হইয়াছে, অমনি শারদীয় শ্বেত মেঘমালা আসিয়া চন্দ্রকলা আচ্ছাদন করিল ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ্যে জটিলাকে বলিলেন—মাতৃমাতুলানি ! প্রণাম করি ।

জটিলা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এই কিশোরীগণের উপর তোমার দৃষ্টি অবক্র হউক । মধুমঙ্গল জটিলাকে একটু গালি দিলেন, বলিলেন, তোমারই চক্ষু বক্র আর তুমি বজ্রের মত কর্কশ । আমার বয়স্যের দৃষ্টি সর্ব্বদাই উদার ।

জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এখানে কেন ? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—প্রস্ফুটিত জবাফুলের শোভার আকর্ষণে এখানে আসিয়াছি । জটিলা মনে মনে ভাবিলেন, শ্রীরাধার উন্মাদরোগ সারাইবার জন্য পৌর্ণমাসী দেবী তাঁহার বিদ্যার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এখানে আনাইয়াছেন ।

শ্রীকৃষ্ণ জটিলাকে বলিলেন—আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনি কেন ব্যাকুল হইতেছেন ?

জটিলা বলিলেন—ব্যাকুল হইব না ! আমার এই নবোঢ়া বধূ, ইহার রূপের তুলনা নাই, আর তুমি তোমার নেত্র-প্রান্ত নৃত্য করাইয়া নির্ভয়ে গোকুলমধ্যে ভ্রমণ করিতেছ । ইহাতে আমরা কেন ব্যাকুল হইব না ।

আজ এই পর্য্যন্তই হইল । শ্রীরাধিকা যাইবার সময় ভাবিতে ভাবিতে গেলেন—

পীতং ন বাগমৃতমত্র হরেরশঙ্কং
ন্যস্তং ময়াস্য বদনে নদৃগঞ্চলঞ্চ ।
রম্যে চিরাদবসরে সখিলব্ধমাত্রে
হা দুর্বিধির্বিরুরুধে জরতীচ্ছলেন ॥

যদুনন্দন দাস এই শ্লোকটির নিম্নরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ।

অমৃত বদন, মধুর বচন, শ্রবণ যুড়ায় যাতে।
হেন বাণীগণ, ভরিয়া শ্রবণ, না শুনিল ভালরীতে ॥
সই গো চিরদিন অবসরে।
এ হরি মিলিল, বিধি বৈরী ভেল, দারুণ জরতীছলে ॥
মুখ নিরমল, জিনিয়া কমল, হাসির অঙ্কুর তায়।
এ মোর নয়ান, হইতে বয়ান, বিধি কৈল অন্তরায় ॥
মরকত মণি, দরপণ জিনি, ও গণ্ডযুগল শোভা।
তাহাতে সুন্দর, মকর কুণ্ডল, দোলে মনমথ লোভা ॥
ও ভাঙ ভঙ্গিম, নয়ান বঙ্কিম তেরছ সন্ধানে চায়।
এ যদুনন্দন, কহে ধনী পুন, মিলায়ব শ্যাম রায়

৩। রাধাসঙ্গ

তৃতীয় অঙ্কের নাম রাধাসঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার হৃদয়ের অতিসূক্ষ্ম ও অতিগভীর প্রত্যেক স্পন্দনটি পর্য্যন্ত দেবী পৌর্ণমাসী আস্বাদন করিতে চাহেন। ইহাই রসব্রহ্মের আরাধনা। এই জন্যই দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন, এই জন্যই যোগমায়া শ্রীবৃন্দাবনে লীলা প্রকট করিয়াছেন। পৌর্ণমাসীর সহিত ললিতা, বিশাখা আদি সখিগণও আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহাদের এই আস্বাদন ভক্তপরম্পরায় জগতে প্রবর্ত্তিত ও প্রসারিত হইতেছে।

তৃতীয় অঙ্কে দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তনসমূহ দর্শন করিতেছেন।—যাহাকে নায়কের পূর্ব্বরাগ বলে, তাহাই তৃতীয় অঙ্কের প্রধান কথা। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-তারা ঘূর্ণিত, উষ্ণ নিশ্বাসে গলদেশের মল্লিকামালা মলিন হইয়াছে। পৌর্ণমাসী ভাবিতে-ছেন, সেই ধন্যা রমণী কে, যিনি নাগরশেখর শ্যামসুন্দরের ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন? চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, শ্রীরাধাই ইহার নিদান। পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করি-লেন—হে কৃষ্ণ, তুমি গোপরাজনন্দন এবং ন্যায়পরায়ণ। তুমি শত শত লীলা বিস্তার করিয়া ভুজঙ্গলে গোকুলে বিখ্যাত হইয়াছ; তুমি কুলরমণী শ্রীরাধাকে উন্মাদ দশা প্রাপ্ত করাইলে কেন? ললিতাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিল। মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন করিয়া উভয়ের সহিত

পরিহাস আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পরিহাসবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের অবস্থাই পরিব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের ভাব দেখিয়া পৌর্ণমাসী বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাম্যভাব নাই। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—গোকুলানন্দ, তুমি অগ্রবর্ত্তী হও, অদূরে ঐ আম্রবেদিকায় তুমি বসিয়া থাকিও। সূর্য্য অস্তমিত হইলে ললিতা কিম্বা বিশাখা তোমাকে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হইলেন। এখন দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধিকার প্রেমোক্তিমুদ্রা উদ্‌ঘাটন করিতে চাহেন অর্থাৎ শ্রীরাধার মুখে শ্রীরাধার হৃদয়ের অবস্থা জানিতে চাহেন। পৌর্ণমাসীর ইহাই সাধন। তিনি ললিতাকে বলিলেন, ললিতে তুমি কিছু বলিও না। ললিতাকে সাবধান করিয়া পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার নিকটে গেলেন এবং ভাব গোপন করিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন, খঞ্জনাক্ষি, মাধবের নিকট গিয়াছিলাম, প্রার্থনাও করিলাম, কিন্তু মাধব অসম্মত, এখন হৃদয়ের ব্যথা নিবারণ করিতে অন্য উপায় কর। পৌর্ণমাসীর কথায় শ্রীরাধা তাঁহার হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রাণের কথা বলিতে বলিতে একেবারে বিবশ হইয়া পড়িলেন। বিশাখা ও পৌর্ণমাসীর ভয় হইল। তাঁহারা সমস্তই বুঝিলেন। তখন পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন, রাধে, শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা কিরূপ শ্রবণ কর।

তদ্বার্ত্তোত্তরগীতিগুম্ফিতমুখো বেণুঃ সমন্তাদভূৎ
তদ্বেশোচিতশিল্পকল্পনময়ী সর্ব্বা বভূব ক্রিয়া।
ত্বন্নামানি বভূবুরস্য সুরভীবৃন্দানি বৃন্দাটবী
রাধে ত্বন্ময়বল্লিমণ্ডলঘনা জাতাস্য কংসদ্বিষঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী সর্ব্বদাই তোমার চরিত্রগানে স্ফীতমুখ। তোমার সদৃশ বেশ-রচনায় শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় শিল্পকর্ম্ম নিয়োজিত। গাভী সকলকে আহ্বান করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ তোমারই নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব লতাসমূহশোভিত শ্রীবৃন্দাবন কংসারির নিকট রাধাময় হইয়াছে।

যদুনন্দন এই শ্লোকটির নিম্নরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

তোমার চরিত, গায়ে অবিরত, বেণুকরি নিজমুখে।
তোমার সমান, করে বেশগণ, তোমা মানে আপনাকে॥

ডাকে ধেনুগণে, ভরমে সেখানে, লইয়া তোমার নাম।
শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে, তোরে নিরখয়ে শ্যাম ॥
এ ভূমি গগন, তরুলতাগণ, তোমায় মানয় হরি।
এ যদুনন্দন, কহয়ে নবীন, অনুরাগ বলিহারি ॥

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ সেই আম্রবেদিকায় অপেক্ষা করিতেছেন। ললিতা কিম্বা বিশাখা আসিয়া তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। মনের ভিতর নানারূপ দুশ্চিন্তা জাগিয়া উঠিতেছে। একবার ভাবিতেছেন, শ্রীরাধা কি ধর্ম্মচিন্তা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন; আবার ভাবিতেছেন গুরুজনের কঠোর তাড়নায় কি নিবৃত্ত হইলেন; অথবা কি আমি হঠাৎ কোন ব্যাধি হয় নাই ত? চন্দ্রদেব উদিত হইলেন, কিন্তু দূতী এখনও আসিলেন না কেন?

বিশাখা আসিয়া লতার অন্তরালে দাঁড়াইয়া গ্রীবা উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন। দেখিয়াই বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত পথপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং এ অবস্থায় যাহা আবশ্যক, কিঞ্চিৎ পরিহাস করিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহাতিশয়পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে বিশাখা মলিনমুখে বলিলেন—রাজপুত্র, কি আর বলিব, অভিমন্যু হতাশ হইয়া প্রিয়সখীকে মথুরানগরীতে—। বিশাখাকে সকল কথা বলিতে হইল না বা মনের দুঃখে বলিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ ব্যথার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—কবে লইয়া গেল।

বিশাখা—ভগবতী পৌর্ণমাসী যে সময়ে তোমার নিকট আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ—কেন লইয়া গেল?

বিশাখা—তোমার ভয়ে।

কৃষ্ণ—সে কিরূপে জানিল?

বিশাখা—তোমার ভাব দেখিয়াই তাহার সন্দেহ হইল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

প্রপন্নাত বপুর্দ্ধুলিলো মে বলান্মলয়ানীলো
বিকিরতিকরৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুষারাগ্নিভরং কৃষা।
মদমহতকণ্ঠর্জত্যেষ স্ফুটৈরলিহুঙ্কৃতৈ-
স্তুটিরপি বিনা রাধাং নেতুং ময়া নহি শক্যতে ॥

একে দুষ্ট মলয়ানিল দেহকে সজোরে ক্লিষ্ট করিতেছে, চন্দ্রদেব যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আগুনের চূর্ণের মত তুষার বর্ষণ করিতেছেন, এ দিকে হত মদনদেব মধুকর-ঝঙ্কারে তর্জ্জন করিতেছেন, শ্রীরাধা-বিহনে আমি ক্ষণকালও যাপন করিতে পারিতেছি না।

যদুনন্দনের অনুবাদ।

মলয় পবন, এ নব কুসুম, বহয়ে সৌরভ যত।
সুখ দিয়াছিল, দুঃখদায়ি ভেল, এ দুঃখ সহিব কত॥
সখি হে কি আর কহিব তোরে।
সে রাধা বিহনে, আমার জীবনে, শরীরে না রহে জোরে॥
চন্দ্রের কিরণ, কৈল প্রসারণ, দেখিতে জ্বলয়ে তনু।
আমারে দহন, করিতে মদন, তুষানল জ্বালে জনু॥
দারুণ মদনে, করে তরজনে, ভ্রমর ঝঙ্কার করি।
কহত কেমতে, তিলেক ইহাতে, রহিবে ধৈরয ধরি॥
এতেক কহিতে, হঞা মুরছিতে, পড়িল সেখানে হরি।
বিশাখা দেখিয়া, সংভ্রম হইয়া, কহয়ে আশ্বাস করি॥
শুনহ গোবিন্দ, গোকুল আনন্দ, ধৈরয ধরহ চিত।
পরিহাস তোহে, কৈল কেন তাহে, মরমে বাসহ ভীত॥

শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তখন বিশাখা তাঁহাকে সমুদায় কথা বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে বিশাখা শ্রীরাধার প্রেমচিহ্ন বর্ণনা করিলেন। সেই শ্লোকের প্রাচীন বঙ্গানুবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অনুসঙ্গ দূর হইতে, তুয়া নাম শুনাইতে, খঞ্জন-নয়নী ধনী রাই।
অতি উন্মত্ত হইয়া, কান্দে বহু বিলপিয়া, পুন পুন কাঁপে ক্ষমা নাই॥
শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে।
অখণ্ড কুলের নারী, কৈলে তুমি সুবাউরী, যেন ভেল কুলটা চরিতে॥
বহু কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল, উড়িবারে চাহে পাখা করি।
দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে ঝড়এ আঁখি, শ্যামা-সখী নিজ কোরে করি॥
গহন বনেতে যাঞা, তমালেরে কোলে লঞা, মনে মানে তোমা কৈল কোর।
অতিশয় হরষিতে, গাঢ় আলিঙ্গন রসে, ধনী রহে হইয়া বিভোর

সুনীল বসন পরে, নীলমণি হার ধরে, নেহারয়ে কালিন্দীর নীর।
এইরূপে অনুক্ষণ, নাহি হয়ে অন্যমন, তিলেক না রহে গৃহে স্থির॥
সদাই কদম্ব বন, করাইতে নিরীক্ষণ, পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে।
বদন না তেজে হাত, সঘন অবনী মাথ, অকারণে হাসে কত ভঙ্গে॥
অঙ্গে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত, বরণ হইল যেন আন।
কেহ দেখিবারে নারে, কি ব্যাধি হইল বোলে, কেবা জানে নিগূঢ় বিধান॥
কি গুণ করিলে তুমি, জানিলাঙ এবে আমি, তেঁঞিসে তাঁহার হেন কাজ।
কতেক কহিব আর, যতেক দেখিল তার, দুকুলে হইল্যা গেল লাজ॥
না করে ভোজন পান, নিন্দ গেল অন্যস্থান, না শুনয়ে বচন কাহার।
এ যদুনন্দন ভণে, না জানিয়ে এতক্ষণে, কি জানি হইয়া রহে যার॥

এদিকে শ্রীরাধাও উৎকণ্ঠিতভাবে চিন্তা করিতেছেন, বিশাখা এখনও আসিল না কেন? পথে তাহার কোন বিঘ্ন হয় নাই ত? অন্য কেহ কি শ্রীকৃষ্ণকে নিরুদ্ধ করিল? অথবা আমি উদ্ধত হইয়াছি বলিয়া কি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করিলেন? চন্দ্রকিরণে জগৎ পরিপূর্ণ হইল, লতামন্দিরে নন্দনন্দন ত আসিলেন না? তাহার পরেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন—শ্রীকৃষ্ণের সর্পঘট-পরীক্ষা হইল। অদ্যকার মিলনে ললিতা শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন—এমন সময়ে নেপথ্যে শব্দ হইল—নপ্ত্রি ললিতে, তোমার প্রিয়সখী রাধা কোথায়?

মুখরা আসিয়া উপস্থিত। মুখরা রাত্রিতে ভাল করিয়া দেখিতে পান না, তাঁহাকে লইয়া বেশ কৌতুক চলে। মুখরার আবার ঘূর্ণারোগও আছে। মুখরা কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া গেল—তাহার পর মিলন।

৪। বেণুহরণ

বিদগ্ধমাধবের চতুর্থ অঙ্কের নাম বেণুহরণ। এই অঙ্কে আমরা শ্রীরাধিকার প্রতিযোগিনী চন্দ্রাবলীর ও তাঁহার ভাবের পরিচয় পাইব। বৈষ্ণব রসগ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী শ্রীরাধাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে চন্দ্রাবলীকে বুঝিতে হইবে। তৃতীয় অঙ্কের শেষাংশে ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—কৃষ্ণ! চাতুরী-বিস্তার পরিত্যাগ কর, চন্দ্রাবলী বাক্যমাত্রেই প্রসন্না হয়, আমাদের প্রিয়সখীর প্রসাদ সেরূপ সুলভ নহে। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার সখীর প্রসাদ কি করিয়া লাভ করা যায়?

ললিতা বলিলেন—নিরন্তর সেবা করিলে।

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিতে সম্মত হইলেন।

এইখানেই রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে ভাবগত প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীরাধা প্রখরা, চন্দ্রাবলী মৃদু। শ্রীরাধা বামা, চন্দ্রাবলী দক্ষিণা। শ্রীরাধার মধু স্নেহ আর চন্দ্রাবলীর ঘৃত স্নেহ।

চতুর্থ অঙ্কের টিকার ভূমিকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রসতত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম তিনস্কন্ধে পূর্ব্বরাগ, অসম্ভোগাদি স্বপক্ষগত রস বিবৃত হইয়াছে। এখন বিপক্ষভেদ-মিশ্রিত হওয়ায় রসের যে বিলাস বা বৈচিত্র্যময় পুষ্টি হয়, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ এবং স্বেচ্ছাবিলাসী। শ্রীরাধার সহিত তিনি যাহাতে সর্ব্বদা মিলিত থাকেন, ইহারই ব্যবস্থা করা পৌর্ণমাসীর তপস্যা। এইজন্যই তিনি বৃন্দাবনে। আজ পৌর্ণমাসী সুবলের উপর ভার দিয়াছেন, সুবল যেন তাঁহার প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ওদিকে আজ শ্রীরাধিকা অভিসারিকা ললিতাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। সকল দিকেই অতি ঘোর অন্ধকার। আজ তিমিরাভিসার। শ্যামবর্ণ বসন ভূষণে অঙ্গ ভূষিত করিয়া ললিতার সহিত শ্রীমতী রাধিকা চলিয়াছেন। বকুলকুঞ্জ ছাড়াইয়া বামদিগ্‌বর্ত্তী কদম্বকুঞ্জে আসিয়া শ্রীমতী উপস্থিত। কৃষ্ণানুরাগে শ্রীমতী রাধিকা দেখিতেছেন, বনসমূহ কৃষ্ণময়। তখন বলিতে লাগিলেন,—বিদগ্ধনাগর তোমাকে দেখিয়াছি। ললিতা বলিলেন—আর অন্বেষণ করিতে হইবে না, এস আমরা ক্রীড়াকুঞ্জ রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করি। এই অবস্থার নাম বাসকসজ্জা। ক্রীড়াকুঞ্জ রচিত হইল। বকুল পুষ্পের বহির্দ্বার, কমলের শয্যা, শয্যাপার্শ্বে মধুপাত্র। কিন্তু কৈ কৃষ্ণ আসিলেন না। এই অবস্থার নাম উৎকণ্ঠিতা। তাহার পরে বিপ্রলব্ধা। শ্রীরাধা ও ললিতা ভগ্নহৃদয়ে চলিয়া গেলেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। রাত্রি বুঝি অবসানপ্রায়। শ্রীরাধা কোপবতী হইয়াছেন, তাঁহাকে কি প্রকারে তুষ্ট করিব? শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, নাগকেশর পুষ্প চয়ন করি,

শ্রীরাধাকে প্রদান করিব। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিলেন, বকুলকুঞ্জ দেখিলেন। দেখিলেন, শ্রীরাধা কর্পূররসসংস্কৃত তাম্বুল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছেন, নীলকান্তমণিগুচ্ছহার ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে, কিছুদূরে নখের দ্বারা ছিন্নভিন্ন ফুলের চূড়া মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। সমগ্র বকুলকুঞ্জ প্রিয়তমার সুগভীর অন্তর্বেদনা প্রকাশ করিতেছে।

এই সময়ে ললিতা ও বিশাখার সহিত শ্রীরাধিকা উপস্থিত। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া চেষ্টা করিয়া কঠোর হইলেন। সখীদ্বয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমাকে ফুল দিতে চাহিলেন। শ্রীরাধিকা ফুল লইবার জন্য বস্ত্রাঞ্চল বিস্তৃত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নয়নযুগলে দৃষ্টিপাত করিয়া এমনি আত্মহারা হইলেন যে ফুল দিতে গিয়া ফুলের সহিত নিজের মুরলীটিও দিয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে মধুমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণ ধরা পড়িয়া গেলেন। চন্দ্রাবলীর সহিত তিনি রজনী যাপন করিয়াছেন, এখন নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য নানারূপ চাতুরী করিতেছেন। শ্রীরাধার এই অবস্থার নাম খণ্ডিতা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মুখরা উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইবেন, কিন্তু দেখিলেন, বংশী নাই। বাঁশির খোঁজ পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন, তুমিই আমার বাঁশি লইয়াছ! শ্রীরাধা বলিলেন—মিথ্যা কলঙ্ক দিও না। কে জানে তোমার বংশী কোথায়? ললিতা বলিলেন—গোপীরা কখন পরবিত্ত হরণ করে না। আমরা সতী নারী মিথ্যা অপবাদ দিও না। শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তখন শ্রীরাধা মুখরাকে বলিলেন—তোমার নাতির (শ্রীকৃষ্ণের) চরিত্র দেখিলে? আমাদের বলেন, আমরা চোর। মুখরা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিলেন। মধুমঙ্গল মুখরাকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন। মুখরা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন অভিমন্যুপত্নী তোমার বন্দনযোগ্যা, তুমি উহার সহিত কেন পরিহাস করিতেছ। মধুমঙ্গল যজ্ঞোপবীতের শপথ করিয়া বলিল, আমি দেখিয়াছি, আমার বয়স্য ভূমিসংলগ্নমস্তকে শ্রীরাধাকে প্রণাম করিয়াছে। মুখরা আনন্দের সহিত বলিলেন—তবে কৃষ্ণের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে।

মধুমঙ্গল অবশ্য মিথ্যা বলে নাই। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সত্যই প্রণাম করিয়াছিলেন।

আজ আর বাঁশি পাওয়া গেল না। মুখরা, গোপীদের পক্ষ হইয়া কৃষ্ণকে ভয় দেখাইলেন—বলিলেন, আমি মথুরার রাজসভায় চলিলাম।

৫। রাধাপ্রসাদন

পঞ্চম অঙ্কের নাম—'রাধাপ্রসাদন'। এই অঙ্কে ও ইহার পূর্ব্ব অঙ্কের ঘটনা বৈশাখী-পূর্ণিমার পরের পঞ্চমী তিথির লীলা। এই অঙ্কে বৃন্দা-প্রতারণা, মানভঞ্জন ও বনবিহারাদি লীলা আছে। এই অঙ্কে আমরা বৃন্দাদেবীর পরিচয় পাইব। এই বৃন্দাদেবীর শাসনে বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সকলেই চালিত, বৃন্দাদেবী সকল প্রাণির শব্দ বুঝিতে পারেন।

পৌর্ণমাসী দেবীর আজ অতিশয় দুশ্চিন্তা উপস্থিত, অভিমন্যু সপরিবারে মধুপুরী চলিয়া যাইবেন এবং সেইখানেই বাস করিবেন। শ্রীরাধার জন্যই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আজ একেবারে নিরানন্দ, যমুনাতীরে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বৃন্দা আসিয়া পৌর্ণমাসীকে এই সংবাদ দিলেন। ললিতা আসিয়া পৌর্ণমাসীকে সংবাদ দিলেন, শ্রীরাধার অবস্থাও অতি ভয়ানক। এই অবস্থার নাম—কলহান্তরিতা। যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত বল্লভকে উপেক্ষা করিয়া শেষে অনুতপ্ত হন, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ প্রভৃতি কলহান্তরিতা নায়িকার চেষ্টা।

শ্রীরাধিকা আজ বলিতেছেন—

> কর্ণান্তে ন কৃতা প্রিয়োক্তিরচনা ক্ষিপ্তং ময়া দূরতো
> মল্লীদামনিকামপথ্যবচসে সখ্যৈ রুষঃ কল্পিতাঃ।
> ক্ষৌণীলগ্নশিখণ্ডিশেখরমসৌ নাভ্যর্থয়ন্নীক্ষিতঃ
> স্বান্তং হন্ত মমাদ্য তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহ্যতে॥

হায়! আমি প্রিয়বাক্য কর্ণে গ্রহণ করি নাই, মল্লিকামালা দূরে ফেলিয়া দিয়াছি, সখীরা ভাল কথা বলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপর ক্রোধ করিয়াছি। শিখণ্ডশেখর শ্রীকৃষ্ণ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করি নাই, এখন আমার অন্তঃকরণ খদিরকাষ্ঠের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে।

যদুনন্দন দাসের অনুবাদ।

কৃষ্ণপ্রিয়বাণী, অমৃতদমনী, না কৈল শ্রবণ অন্তে।
এবে পিককুল, শবদে জারিল, শ্রুতিমন পরমন্তে॥
হায় হায় কেন বা করিলু মান।
নবীন পিরিতি, নিরসলুঁ অতি, তাপিত করিলু প্রাণ॥
সে করকমল, রচিত বিমল, উপেক্ষলুঁ মল্লিমালা।
সহচরীগণ, সহিত বচন, অহিত সমান ভেলা॥
সে হরি শিখণ্ড, শেখর অখণ্ড, ধরণী লোটায় কত।
মিনতি করিল, তাহা না দেখিল, এ মোর নয়নপথ॥
খদির অঙ্গার, ধরি নিজকর, আপন হৃদয়ে দিলুঁ।
এ সব ভাবিতে, ভাবিতে এ রীতে, পুড়িয়া পুড়িয়া মইলু॥
ভগবতী শুনি, এ সব কাহিনী, ললিতারে কহে পুতা।
এথানে তিলেক, কথা পরতেক, শুনি পিরিতের কথা॥
পুনঃ রাই হিয়া, চপলা হইয়া, কহয়ে মরম বাণী।
এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, ধৈরয ধরহ প্রাণী॥

শ্রীরাধার কখন শঙ্কা, কখন উৎকণ্ঠা, কখন বা ক্রোধ হইতেছে। বৃন্দাবনের সমুদয় প্রাণিকেই দূতী বলিয়া মনে করিতেছেন। ললিতা ও পৌর্ণমাসী গোপনে থাকিয়া তাঁহার ভাব দেখিতেছেন ও সমুদয় কথা শুনিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে; ইহা অনুরাগের পরাকাষ্ঠা। হঠাৎ ললিতা আসিয়া শ্রীরাধার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সুবলের নিকট হইতে ললিতা একখানি পত্র আনিয়াছেন, পত্রখানি পড়িলেন। তাহার পর বিশাখা আসিলেন, পৌর্ণমাসী ও নান্দীমুখী আসিলেন। সকলে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি, মাধব তো সুখে আছেন?

নান্দীমুখী উত্তর করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত পরিহাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, চম্পকপুষ্পের দ্বারা চূড়াবন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছেন, যোগির ন্যায় ভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়া তোমার মুখচন্দ্র মাত্র চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ সুখানুভব করিতেছেন।

বিদগ্ধমাধবের শ্লোকটি এই—

ক্ষণমপি ন সুহৃদ্ভির্নর্ম্মগোষ্ঠীং বিধত্তে
রচয়তি ন চ চূড়াং চম্পকানাং চয়েন।
পরমিহ মুরবৈরী যোগীবন্মুক্তভোগ—
স্তব সখি মুখচন্দ্রং চিন্তয়ন্নির্বৃণোতি ॥

কবি চন্দ্রশেখরের একটি পদে আমরা এই শ্লোকটির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

সুন্দরি, বচনে করবি আশোয়াস।
সজল-নয়নে হরি, পন্থ নেহারই, চিত্রা কহল মঝু পাশ ॥
ধেনু-বেণু ছোড়ি, সকল সখাগণ, পরিহরি নীপমূলে বসই।
রাই রাই করি, শিরে কর হানই, তুয়া নাম ধরই নিশসাই ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশী তখন শ্রীরাধার নিকটেই আছে। বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিলেন—বায়ুপ্রবাহের দিকে মুখ করিয়া রাখিলে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি আপনিই বাজে।

শ্রীরাধা বলিলেন—একবার পরীক্ষা করিব।

এই বলিয়া শ্রীরাধা বায়ু প্রবাহের দিকে মুখ করিয়া যেমন বাঁশি ধরিয়াছেন, অমনি বাঁশি বাজিয়া উঠিল। জটিলা আসিয়া উপস্থিত। বাঁশি যখন বাজিয়াছে, তখন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে আছে। জটিলা আসিয়াই দেখেন—শ্রীরাধার হাতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি। জটিলা বাঁশিটি কাড়িয়া লইলেন। জটিলা বলিলেন,—পৌর্ণমাসী আমার কথায় বিশ্বাস করেন না, এই বাঁশিটি দেখাইলেই তিনি বিশ্বাস করিবেন। জটিলা বাঁশি লইয়া পৌর্ণমাসীর কুটিরের দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে সুবল আসিয়া জটিলাকে বলিলেন, এক বানরী আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেছে। জটিলা দেখিলেন, সত্যই এক বানরী ননী চুরি করিবার জন্য তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। জটিলা বানরী তাড়াইবার জন্য বাঁশিটি ছুড়িয়া মারিলেন, আর বানরী বাঁশিটি লইয়া পলাইয়া গেল। পৌর্ণমাসী বুঝিলেন, বৃন্দাদেবী এই কার্য্যটি করাইলেন। জটিলার দুঃখের সীমা নাই, বাঁশিটি চলিয়া গেল। সুবল জটিলাকে পরামর্শ দিলেন, আপনার ভগিনীর পুত্র বিশালকে ঐ বানরী ভয় করে, বিশাল এখন গোবর্দ্ধনে খেলা করিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া আনুন, তাহা হইলে বাঁশি পাইবেন। জটিলা চলিয়া গেলেন। পৌর্ণমাসী ভাবিলেন, বেশ চাতুরী হইয়াছে।

জটিলা চলিয়া গেলেন। ললিতা ঈঙ্গিত করিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন—এস, সখি,

আমরা বেণু অন্বেষণ করি। শ্রীরাধা ভাবিলেন, পরম সৌভাগ্য, ললিতা আমাকে অভিসার করাইতেছে, শ্যামসুন্দরের সন্নিধানে লইয়া যাইবে। এই সময়ে মুখরা আসিয়া সংবাদ দিলেন, জ্যোতির্বিবিদ্গণের ব্যবস্থানুসারে অভিমন্যু আদেশ করিয়াছেন, আজ গোমঙ্গলানাম্নী চণ্ডীর পূজা করিব। পূজার উপকরণাদিসহ শ্রীরাধাকে চৈত্যবৃক্ষের তলে লইয়া যাইতে হইবে। মুখরা, বিশাখাকে এই কার্য্যটি করিতে বলিলেন। শ্রীরাধার প্রতি অভিমন্যুর এই আদেশে ললিতা ও বিশাখা বিশেষ দুঃখিত হইলেন।

এইবার শ্রীরাধাবিরহখিন্ন শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনার জন্য এবং অন্য কোন এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি কৌতুককর কার্য্য সাধিত হইল। সুবল সাজিলেন শ্রীরাধা, আর বৃন্দা সাজিলেন ললিতা, আর তাঁহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গেলেন। পুন্নাগতরুতলে শ্রীকৃষ্ণ তখন উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। উৎকণ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের তখন জগৎ রাধাময়--

রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভুব কুতস্ত্রিলোকী ॥

নয়ন পুতলী রাধা মোর।
মনোমাঝে রাধিকা উজোর ॥
ক্ষিতিতলে দেখি রাধাময়।
গগনেহ রাধিকা উদয় ॥
রাধাময়ী ভেল ত্রিভুবন।
তবে আমি করিব কেমন ॥
কোথা সেই রাধিকাসুন্দরী।
না দেখি ধৈরয হইতে নারি ॥
এ যদুনন্দন মনে যাগ।
কি না করে নব অনুরাগ ॥

মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আছেন। এমন সময়ে সুবল ও বৃন্দা, শ্রীরাধা ও ললিতার বেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত। সারঙ্গী—একটি বালিকা, সে বিশালের ভগিনী। সে

সেখানে ছিল, শ্রীরাধাকে দেখিয়াই সে বলিল, আমার ভ্রাতা অভিমন্যু তোমাকে চৈত্য-বৃক্ষের মূলে অন্বেষণ করিতেছেন, তুমি সেখানে কেন যাও নাই। ললিতা, সারঙ্গীকে তিরস্কার করিলেন। সারঙ্গী তাহাদের বলিয়া গেল, দাঁড়াও, জটিলাকে বলিয়া দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বংশী পাইলেন। কিন্তু হঠাৎ শ্রাবণমাসী কৃষ্ণভুজঙ্গিণীর ন্যায় ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে করিতে জটিলা আসিয়া উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের দুর্ভাবনার সীমা নাই, হায়! শ্রীরাধার কি হইবে? জটিলা শ্রীরাধাকে ধরিয়া লইয়া পৌর্ণমাসীর নিকট লইয়া গেলেন, সেখানে গিয়া দেখা গেল,—রাধা নহে সুবল, আর ললিতা নহে বৃন্দা। জটিলা অপদস্থ হইলেন. শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের নিকট এই সংবাদ পাইলেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইলেন ও সত্যকার শ্রীরাধা ও ললিতা আসিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।

এই স্থানে প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণিত হইয়াছে।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

প্রেমোৎকর্ষের এক অবস্থায় এমন হয় যে প্রেমিকা প্রেমিকের নিকটে থাকিয়াই অনুভব করেন বিরহ হইয়াছে, এবং নিরতিশয় আর্ত্তি হইয়া পড়েন। এই অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

মধুমঙ্গল একটি ভ্রমরকে তাড়াইয়া দিলেন। ভ্রমরের নামও মধুসূদন, শ্রীকৃষ্ণের নামও মধুসূদন। ভ্রমরটিকে তাড়াইয়া দিয়া মধুমঙ্গল বলিলেন—মধুসূদন, চলিয়া গিয়াছে, আর দেখা যাইতেছে না। এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য অবস্থা উপস্থিত হইল।

শ্রীরাধা বলিলেন—

সমজনি দশাবিস্রস্তানাং কিমান্তরবো গণাং
ময়ি কিমভবদ্বৈগুণ্যং বা নিরঙ্কুশমীক্ষিতং।
ব্যরচি নিভৃতং কিম্বাহূতিঃ কয়াচিদভীষ্টয়া
যদিহ সহসা মামত্যাক্ষীদ্বনে বনজেক্ষণঃ॥

বনে কি আগুণ লাগিয়াছে? গোসকল কি সেজন্য আর্ত্তরব করিয়া উঠিল? অথবা শ্রীকৃষ্ণ কি আমাতেই কোন বৈগুণ্য দর্শন করিলেন? কোন প্রিয়তমা কি সঙ্কেত করিয়া নির্জ্জনে লইয়া গেল? নতুবা পদ্মলোচন সহসা এই বনে কেন আমায় পরিত্যাগ করিবেন? যাহা হউক শ্রীরাধা আশ্বস্ত হইলেন।

জটিলা যখন শ্রীরাধাবেশধারী সুবলকে ধরিয়া লইয়া যান, তখন তাড়াতাড়িতে তাঁহার লাঠিগাছটি ফেলিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই জটিলা লাঠিগাছটি লইয়া যাইবার জন্য সেখানে উপস্থিত। জটিলাকে দেখিয়া শ্রীরাধার ভয়ের সীমা নাই। তিনি ললিতা ও বৃন্দার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তোমরা আমাকে রক্ষা কর।

জটিলা শ্রীরাধাকে দেখিলেন, কিন্তু মনে করিলেন, রাধা নহে সুবল। কাজেই সেখানে দাঁড়াইলেন না। লাঠি লইয়া চলিয়া গেলেন, সুবলকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, তুই আমার বধূর বেশ ধরিয়া কেন আমাকে বিড়ম্বিত করিস্? শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া জটিলাকে বলিলেন—জটিলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—সুবল নহে সত্য শ্রীরাধা। জটিলা একবার অপদস্থ হইয়াছেন, কাজেই আর ধূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

৬। শরদ্বিহার

বিদগ্ধমাধবের ষষ্ঠ অঙ্কের নাম—"শরদ্বিহার"। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রিতে শ্রীরাধা বিহার করিয়াছেন; নিশিশেষে যখন চলিয়া আসিয়াছেন, তখন ভুল করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পীতবর্ণের বস্ত্রখানি গায়ে দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। রাত্রি জাগরণের পরে শ্রীরাধা, বিশাখা প্রভৃতি সকলে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। জটিলা পদ্মার নিকট সংবাদ পাইয়াছেন, বধূ পীতপট্টবস্ত্রে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। কাজেই জটিলা দেখিতে আসিয়াছেন, ব্যাপার কি? পূর্ব্বে জটিলা কোন কারণে শ্রীরাধাকে সখীগণসঙ্গে দেবগৃহে জাগিয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহারা যে বেলা-পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছেন, সেজন্য জটিলার কিছুই বলিবার নাই। তাহার পর শ্রীরাধাকে ডাকা হইল। জটিলা দেখিলেন, সত্যই শ্রীরাধার অঙ্গে পীতবসন। ব্যাপার এই,—গতরাত্রিতে জটিলা ক্রীড়াপুলিনে গিয়াছিল, কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, অন্যান্য সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। কাজেই

জটিলা সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরাধাকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু অঙ্গে পীতবর্ণের বসন দেখিয়া জটিলা সন্দিহান হইয়াছেন। বিশাখা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—পর্ব্বোপলক্ষে ব্রজের চঞ্চলা যুবতীগণ হরিদ্রাময় জল পরস্পরের অঙ্গে সেচন করিয়াছিল, তাহারই জন্য শ্রীরাধার অঙ্গবস্ত্র পীতবর্ণ হইয়াছে। জটিলা বিশ্বাস করিলেন। দীপান্বিতা-পর্ব্বোপলক্ষে এই সব উৎসব হইয়া থাকে। যাহা হউক, জটিলা অতিশয় সতর্ক, তিনি বিশাখাকে বলিয়া গেলেন—দেখ বিশাখে, তুমি অতিশয় বিশুদ্ধচরিত্রা, তুমি কৃষ্ণহস্তে আমার বধূটিকে রক্ষা করিও।

জটিলা চলিয়া গেলেন। পদ্মা ও ললিতা আসিলেন। পদ্মা চন্দ্রাবলীর সখী। পদ্মা ললিতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের একখানি পত্র আনিয়াছেন। সেই পত্রে শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

ত্বয়া মুক্তগিরিঃ পাণৌ মমাহত্তুচ্ছ পদস্থিতিঃ।
নিধীয়তামধীরাক্ষি রাগিধাতুপরিচ্ছদঃ।

ইহার বাহিরের অর্থ—হে অধীরাক্ষি (চঞ্চলনয়নে ললিতে), ত্বয়া তোমাকর্ত্তৃক মম পাণৌ আমার হস্তদ্বয়ে রাগিধাতু পরিচ্ছদো নিধীয়তাং রক্তবর্ণ ধাতুপরিচ্ছদ সমর্পিত হউক—কেমন রাগিধাতু ?—মুক্তগিরিঃ পর্ব্বতবিচ্যুত শৃঙ্গস্থ।

আর এক অর্থ তুমি আমাকে রাগিধাতুপরিচ্ছদ দাও, তাহাতে গি, রি, তু, চ্ছ, প, দ, থাকিবে না। অর্থাৎ আমার করে রাধা সমর্পণ কর। ললিতা চিন্তা করিয়া পত্রের অর্থ বুঝিলেন।

পদ্মার সহিত ললিতার ও বিশাখার যে কথোপকথন হইল, তাহাতে চন্দ্রাবলী ও রাধা, ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, তাহারই আলোচনা হইল। বিরহের সময় সখীরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করেন তাহাতে চন্দ্রাবলী সুখ পান, কিন্তু শ্রীরাধার নিকট তাহা করিবার উপায় নাই। বিরহের সময় শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলেই শ্রীরাধিকা ক্ষুব্ধা হইয়া পড়েন, তাঁহার গীত শ্রবণের শক্তিই থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে চন্দ্রাবলী সুলভ, শ্রীরাধিকা দুর্ল্লভ। শ্রীরাধার চরণতলে শ্রীকৃষ্ণ লুণ্ঠিত।

এইবার ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন,—সখি রাধে, আইস, আমরা পুষ্প চয়ন করিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেবের পূজা করিব। শ্রীরাধিকা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা হইতে পারে।

মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ শরতের বনশোভা দর্শন করিতেছেন। ললিতা ও বিশাখার সহিত শ্রীরাধা প্রবেশ করিলেন। মধুমঙ্গল ললিতাকে বলিলেন—তোমারা আমার প্রিয়বয়স্যের বনে ফুল চুরি করিতেছ আর বনধ্বংস করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সখে, ইহারা যে ফুল চুরি করিয়াছে, তাহা গণনা কর। প্রত্যেক ফুলের জন্য ইহাদের গলার হার হইতে একটি একটি করিয়া মণি কাড়িয়া লইব। মধুমঙ্গল বলিলেন,—প্রত্যেক লালফুলের জন্য এক একটি পদ্মরাগমণি, আর প্রত্যেক পাণ্ডুরবর্ণ ফুলের জন্য এক একটি হীরক ও মৌক্তিক লইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সখে, ইহাদের রত্ন আমার ফুলের তুল্য মূল্য নহে। ইহার পর নিভৃতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। এখানে শেষে জটিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৭। গৌরীতীর্থবিহার

সপ্তম অঙ্কের নাম—গৌরীতীর্থবিহার। এই অঙ্কের টীকার প্রারম্ভে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলিতেছেন—ছয় ঋতুর মধ্যে বসন্ত, শরৎ ও বর্ষা এই তিনটি ঋতু রসোদ্দীপনকার্য্যে শ্রেষ্ঠ। প্রথমে বসন্ত, তাহার পর শরৎ ঋতুর লীলা বর্ণিত হইয়াছে, এখন বর্ষার লীলা অর্থাৎ শ্রাবণ-পূর্ণিমার লীলা প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছেন—

এই অঙ্কের প্রারম্ভেই বৃন্দা, তিনি বর্ষার বৃন্দাবন-শোভা দর্শন করিতেছেন—

কদম্বালীজৃম্ভাপরিমলভরোদ্গারিপবনা
স্ফুটদ্যূথীযূথীকৃতমধুপগানপ্রণয়িনী।
নটৎকেকীস্তোমা মৃদুলযবসশ্যামলিতভূ
স্তপান্তেঽস্যা স্বান্তং মম রসয়তি দ্বাদশবনী॥

বাতাস বহিয়া হাঁই তুলিয়া প্রফুল্ল কদম্বফুল সকলকে যেন উদ্গীর্ণ করিতেছে। যূথী ফুল ফুটিয়া ভ্রমরগণের প্রণয়িনী হইয়াছে। ময়ূরময়ূরী নৃত্য করিতেছে। কোমল নবীনতৃণে ভূমি শ্যামবর্ণ। গ্রীষ্ম শেষ হইয়াছে, অদ্য দ্বাদশবন আমার অন্তঃকরণে সুখ দিতেছে।

এই একদিক্। আর একদিকে পৌর্ণমাসীর সহিত অভিমন্যুর কথোপকথন হইতেছে। অভিমন্যু বলিতেছেন,—আমি আর এখানে থাকিব না, সপরিবারে মথুরায় গিয়া থাকিব। রাধা ও মাধবের চপলতাই ইহার কারণ। অনেকের মুখেই একথা শুনিয়াছি। প্রিয়বয়স্য গোবর্দ্ধন আমাকে মথুরায় গিয়া বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছে।

পৌর্ণমাসী বলিলেন, পরের কথায় বিশ্বাস করিও না, আর কংসের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী গোবর্দ্ধন মল্লের পরামর্শে মথুরা যাইও না। ইহার ভিতর কংসের ষড়যন্ত্র আছে। অতএব তুমি স্বচক্ষে দেখিবার চেষ্টা কর।

অভিমন্যু সম্মত হইলেন। গোবর্দ্ধনমল্লের যে উন্নতি, তাহার কারণ তাহার স্ত্রী চন্দ্রাবলী চণ্ডিকার পূজা করে। অভিমন্যু পৌর্ণমাসী দেবীকে বলিলেন,—আপনি শ্রীরাধাকে মঙ্গলচণ্ডিকার পূজায় দীক্ষাদান করুন। পৌর্ণমাসী সম্মত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বদিন বৃন্দাদেবীকে আদেশ করিয়াছেন,—গৌরীতীর্থে বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত ফুলদলের সহিত বসন্তের বনশোভা একত্র কর, প্রিয়ার সহিত তথায় মিলন হইবে। শ্রাবণী পূর্ণিমা, ইহার নাম সৌভাগ্য-পূর্ণিমা—আজ কুসুম সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মিলন হওয়া চাই। কিন্তু চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা অনুমান করিয়াছে, যে শ্রীকৃষ্ণ আজ গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হইতে চাহেন। এজন্য তারা আয়োজন করিতেছে। ললিতার ধারণা হইয়াছে, আজ চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যের দিন, আজ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের সম্ভাবনা নাই। এজন্য ললিতা মনের দুঃখে কাঁদিতেছে। কাঁদিবার আরও এক কারণ ঘটিয়াছে। শ্রীরাধিকা গৌরবর্ণ পট্টসূত্রে একগাছি মালা গাঁথিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন; সেই মালা ললিতা পদ্মার মাথায় দেখিয়াছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পৌর্ণমাসীও ইহাতে দুঃখিত হইলেন; সত্যই গোবিন্দ বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। বৃন্দা তাঁহাদের বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ পদ্মাকে মালা দেন নাই, পদ্মা তাহা চুরি করিয়া হইয়াছে, আমি বানরীর মুখে একথা শুনিয়াছি; আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, ইহাই সত্য কথা। বৃন্দা আজ সাহস করিয়া ভার লইলেন, চন্দ্রাবলীর সখীদের চেষ্টা সফল হইবে না। পৌর্ণমাসীকে বলিলেন,—আপনি বিশাখার সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া গৌরীতীর্থের সমীপবর্ত্তী লবঙ্গকুঞ্জে গমন করুন, আমি ললিতার সহিত মাধবকে তথায় লইয়া যাইব।

চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা ও শৈব্যাকে করালা আদেশ করিলেন, তোমরা চন্দ্রাবলীকে গোবর্দ্ধনের পার্শ্বে লইয়া যাও, তাহার কুসুমসজ্জা সমাপ্ত হইয়াছে। করালার অভিপ্রায় চন্দ্রাবলীকে গোবর্দ্ধনমল্লের পার্শ্বে লইয়া যাইতে হইবে। পদ্মা শৈব্যাকে বুঝাইল,

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পার্শ্বেই গৌরীতীর্থ। আসল কথা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য পদ্মা পূর্ব্বেই চন্দ্রাবলীকে গৌরী তীর্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী যাইতেছেন, পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পথ অবরোধ করিয়া দাড়াইলেন। তাঁহাদের কথা হইতেছে, এমন সময়ে পদ্মা ও শৈব্যা উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণও চিন্তায় পড়িলেন, আজ শ্রীরাধার সহিত মিলন হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, কিন্তু চন্দ্রাবলী উপস্থিত। চন্দ্রাবলীকে উপেক্ষাও করিতে পারেন না। ললিতা এবং বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। নানারূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে করালা উপস্থিত। করালাকে দেখিয়া সকলেই সম্ভ্রমযুক্ত হইলেন। করালা ক্রোধপ্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কুসুমতৈলের কাজলের মত কৃষ্ণের চক্ষু, সেই কৃষ্ণের ব্যাপার দেখ, গোপাঙ্গনাগণকে বিপথগামিনী করিয়াছে। কৃষ্ণ, তুমি জান এই চন্দ্রাবলী কে? গোবর্দ্ধনমল্ল কংসরাজের অদ্বিতীয় আত্মা। তুমি আর তোমার পিতা নন্দ, রাজদণ্ডে পতিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—করালে! আমি কি করিব? চন্দ্রাবলীকে দেখিয়াই আমার ভয় হইয়াছে।

করালা চন্দ্রাবলীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ললিতা করালাকে বলিলেন,—আর্য্যে! শ্রীকৃষ্ণেরও দোষ নাই, চন্দ্রাবলীরও দোষ নাই। এই পদ্মাই দোষী। পদ্মাও তিরস্কৃত হইলেন। পদ্মা বলিলেন—আর্য্যে! আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহাই করিয়াছি। আমরা আপনার আদেশে চন্দ্রাবলীকে গোবর্দ্ধনপার্শ্বে লইয়া যাইতেছি। করালা চন্দ্রাবলী ও শৈব্যাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

আজিকার লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হওয়ার পর বৃন্দা এক নূতন ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্ত্রীবেশে সাজাইলেন। ঠিক্ তাহার পূর্ব্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কলহ হইয়াছিল। শ্রীরাধিকা রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়া ললিতা ও বিশাখাকে সকল কথা বলিলেন। তাঁহারা দুইজনেই শ্রীরাধাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—আজ সৌভাগ্য-পূর্ণিমার দিন, কাজ ভাল হয় নাই। বিপক্ষীয়াগণ, ইহা শুনিলে উল্লসিত হইয়া পরিহাস করিবে। শ্রীরাধা দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। বৃন্দা আসিলেন, তিনিও তিরস্কার করিলেন। শ্রীরাধা বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মোহন শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায়? বৃন্দা বলিলেন,—তিনি গৌরীতীর্থে নিকুঞ্জবিদ্যার সহিত আলাপ করিতেছেন।

নিকুঞ্জবিদ্যা কে, কেহই জানেন না। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কে? বৃন্দা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন—তাঁহাকে জান না, তিনি আমার ভগিনী, তিনি ভাণ্ডীর দেবতা। শ্রীরাধিকাকে বৃন্দা বলিলেন—আজ এই নিকুঞ্জবিদ্যাদেবীর আরাধনা কর, তিনি গোকুলানন্দের অন্তরঙ্গা। এই বলিয়া সকলকে লইয়া বৃন্দা গৌরীমণ্ডপে গেলেন।

জটিলা আজ অভিমন্যুকে আনিয়া বধূর কীর্ত্তি দেখাইবেন, স্থির করিয়াছেন। তিনি অভিমন্যুকে লইয়া গৌরীমণ্ডপে উপস্থিত। বৃন্দার উপদেশে শ্রীরাধা তখন নিকুঞ্জবিদ্যা বা নিকুঞ্জবিদ্যাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। অভিমন্যু আসিয়া দেখিলেন—শ্রীরাধা গৌরীর পূজা করিতেছেন, আর দেবী গৌরী আবির্ভূতা হইয়াছেন। বৃন্দা গৌরীর আদেশে অভিমন্যুকে বলিলেন—কংস তোমাকে পরশ্ব সন্ধ্যাকালে ভৈরবের নিকট বলি দিবে।

এই কথা শুনিয়া জটিলা ব্যাকুলা হইলেন। শ্রীরাধা গৌরীর আরাধনা করিতেছেন, যাহাতে অভিমন্যু রক্ষা পান। দেবী সকলের সমক্ষে প্রসন্না হইয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন,—তুমি যদি গোকুলে অবস্থিতি কর, আর নিত্য আমার আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, অভিমন্যু পরিত্রাণ পাইবে। দেবীর কথায়, অভিমন্যু বলিলেন—তাহাই হইবে। জটিলা শ্রীরাধাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বৃন্দা অভিমন্যুকে বলিলেন—পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দিলে পুরুষের পরমায়ু কমিয়া যায়। দেবী, অভিমন্যুকে বলিলেন—তুমি ধন্য, তোমার এই রাধিকা কল্যাণসাধিকা, তুমি ইহাকে অবিশ্বাস করিও না। অভিমন্যু বলিলেন—রাধাবেশধারী সুবলকে দেখিয়া আমার মায়ের মনে সন্দেহ হইয়াছে, সেই জন্যই এই কলঙ্ক। আমি এখন সব বুঝিলাম।

অভিমন্যুর আর মথুরা যাওয়া হইল না। জটিলা ও অভিমন্যু, বাড়ী গেলেন। নাটকও শেষ হইল।

পৌর্ণমাসীর নয়নে আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন—

প্রথয়ন্ গুণবৃন্দমাধুরীমধিবৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরং।
সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা শুভমভ্যস্যতু কেলিবিভ্রমং।

হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার সদ্‌গুণ সমূহের মাধুরী বিস্তার করিয়া বৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরে শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বদা শুভ কেলিবিভ্রম অভ্যাস কর।

অন্তঃকন্দলিতাদরঃ শ্রুতিপুটীমুদ্ঘাটয়ন্ সেবতে
যস্তে গোকুলকেলিনির্ম্মলসুধাসিন্ধুস্থবিন্দুমপি।
রাধামাধবিকামধোর্ম্মধুরিমস্বারাজ্য মস্তার্জয়ন্
সাধীয়ান্ ভবদীয় পাদকমলে প্রেমোর্ম্মিরুন্মীলতু॥

যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ মধ্যে সমাদরে শ্রুতিযুগল উদ্ঘাটন করিয়া তোমার এই গোকুল-কেলির নির্ম্মল সুধাসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও সেবা করিবে, তাহার রাধামাধবের মাধুরীরূপ স্বারাজ্য অর্জ্জন-কারী দৃঢ়তর প্রেমতরঙ্গ তোমার পদকমলে উদিত হউক।।

যদুনন্দন দাসের অনুবাদ—

১

বৃন্দাবন নিকুঞ্জকন্দর মনোহর। বিস্তারয়ে গুণবৃন্দমাধুর্য্য সকল॥
রাধিকার সঙ্গে কেলি বিভ্রম তোমার। অভ্যাস করহ সদা মঙ্গল বিচার॥

২

গোকুলনির্ম্মলকেলিসুধাসিন্ধুকণা। হৃদয় শ্রবণস্নিগ্ধে সেবে যেইজনা॥
হে রাধামাধবমধুমাধুরি স্বারাজ্য। এই নিবেদন মোর করহ সাহায্য॥
তুয়া পাদপদ্মে অতি প্রেম উদ্দীপনে। সদাই উদয় তার হউক মরমে॥

হিন্দু-সংগঠন ও হিন্দু-মহাসভা

এক বৎসর হইল, আমাদের দেশে হিন্দু-মহাসভার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় একবৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রচার করেন। সমগ্র হিন্দুসমাজ একতাবদ্ধ হইয়া যাহাতে নিজেদের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। মালব্য মহাশয়ের আবেদন পত্রে এই কথা লিখিত

ছিল। মালব্য মহাশয় যে সময়ে এই আবেদনপত্র বাহির করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হিন্দু ও মুসলমানে এমন কতকগুলি বীভৎস ঘটনা ঘটে, একতাবদ্ধ মুসলমানগণের হস্তে—হিন্দুগণ এমনভাবে নিগৃহীত হয়; যে হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা সংবাদপত্র পড়েন, তাঁহারা সকলেই আতঙ্কিত এবং নিজেদের দুর্ব্বলতা ও ঐক্যহীনতা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া পড়েন। মালাবার, মুলতান, আজমীঢ়, পাণিপথ, আগরা, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে, পর পর হিন্দুমুসলমানে এই সব বিভ্রাট ঘটে। মালকানা রাজপুতগণের শুদ্ধি ও হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণ লইয়াও হিন্দু মুসলমানে মনোমালিন্য হইয়াছিল। হিন্দু-সংগঠনের কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর, সাহাবাদে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা ও ভয়ানক বিরোধ হয়। বাঙ্গলা-দেশে ফরিদপুরের ঘটনা তাহার অল্পদিন পরেই হয়। হিন্দুমুসলমানে এই প্রকারের বিরোধ ও একতা-বদ্ধ মুসলমানদিগের হস্তে হিন্দুদিগের লাঞ্ছনা প্রায়ই হইয়া থাকে। মহরমের সময়, ইদের সময়, গোহত্যা লইয়া এবং মস্‌জিদের সম্মুখে বা নিকটে হিন্দুরা বাজনা বাজায় বলিয়া এই প্রকারের বিরোধ প্রায়ই হইয়া থাকে। স্বদেশীর যুগে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুমুসলমানে অনেক বিরোধ ও মারামারি হইয়া গিয়াছে। জাতীয় মহাসমিতি রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে হিন্দুমুসলমানের এই বিরোধ মিটাইতে, হিন্দুমুসলমানের ভিতর মৈত্রী স্থাপন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে, তাঁহার সহিত মৌলানা মহম্মদ আলি, সৌকত আলি প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবর্গের মিলন হওয়ায়, এবং খিলাফৎ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য হিন্দুনেতৃগণ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করায় অনেকে ভাবিয়া-ছিলেন এইবার বোধ হয় হিন্দমুসলমানের বিরোধ মিটিয়া গেল। কিন্তু সকলে তাহা মনে করেন নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের মত এই,—মুসলমানগণ, যেমন সংঘবদ্ধ ও প্রবল, হিন্দুগণ নিজেদের ছোট ছোট বিরোধ ও বৈষম্য ভুলিয়া যতদিন ঠিক্ সেইরূপ সংঘবদ্ধ ও প্রবল না হইবে, ততদিন হিন্দু-মুসলমানে মৈত্রী একেবারে অসম্ভব। ইহা বেশ সঙ্গত কথা। হিন্দুসংগঠান ও হিন্দমহাসভার ইহাই ভিতরের কথা।

আর একটি কথা—হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস! চিন্তাশীল ডাক্তার লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুজাতির এই ক্রমিক সংখ্যাহ্রাস ও অপরদিকে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করেন। হিন্দুর সংখ্যা কেন কমিয়া যাইতেছে, আর মুসলমানের সংখ্যা কেন বাড়িতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি নানারূপ হেতু প্রদর্শন করেন। তাঁহার প্রত্যেক কথা সকলে গ্রহণ করিতে না পারেন, কিন্তু তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, বহু চিন্তা ও আলোচনা করিয়া এবং অর্থব্যয় করিয়া এ বিষয়ে চিন্তাশীল হিন্দুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া হিন্দু-জাতির মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজি ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারিতে দেখা গিয়াছিল, ভারতবর্ষে শতকরা ৭৪ জন হিন্দু। ১৯১১ অব্দে দেখা গেল শতকরা ৬৯

জন। ত্রিশ বৎসরে শতকরা ৫ জন কমিয়া গিয়াছে। ১৯২১ সালে হিন্দু আরও কমিয়া শতকরা ৬৮ জন হইয়াছে। এইভাবে হিন্দুর সংখ্যা কমিলে, ১১০ বৎসর পরে হিন্দুস্থানে আর হিন্দু থাকিবে না, ইহাই পণ্ডিতগণের হিসাব। এই হিসাব সমগ্র ভারতবর্ষের; বাঙ্গালা দেশের অবস্থা আরও শোচনীয়! হিন্দুজাতির এই দুরবস্থা ও ধ্বংসোন্মুখীনতা অনেকেই বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন। একতাবদ্ধ হইতে হইবে, প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, আর উদাসীন ও নিশ্চেষ্টভাবে সুখস্বপ্ন দেখিলে চলিবে না, এ বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ নাই। কিন্তু কি করিলে সকল দিক্ রক্ষা পাইবে ও যথার্থ প্রতিকার হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা আবশ্যক। হিন্দুমহাসভা সেই সব বিষয়েরই আলোচনা করিবেন। হিন্দুমহাসভা অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালার প্রাদেশিক সভা, সেই সমুদয় নির্দ্ধারণ অনুসারে চলিতেছেন কিনা, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের আবেদনপত্র প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে গত ভাদ্র মাসে কাশীধামে হিন্দুমহাসভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মালব্য মহাশয়ের আবেদনপত্রে হিন্দুগণকে যে অনুরোধ করা হইয়াছিল, সেই অনুরোধ অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে যাহাতে রীতিমত কার্য্য চলে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। কাশীর অধিবেশনের পর প্রয়াগে মহাসভার একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনগুলিতে যে সব মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি অতিশয় সুন্দর এবং সেই মন্তব্যগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সেজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু মন্তব্যগুলি কি এবং কি প্রকারে সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা যায়, সেজন্য বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতে হইবে। হুজুগে মাতিয়া যাহা হউক একটা কিছু করিয়া খবরের কাগজে বাহবা লইয়া দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিলে উপকার হইবে না, অপকার হইবে; কল্যাণ হইবে না,—দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। এই কারণে হিন্দুমহাসভার কার্য্য কি প্রকারে হইতে পরে, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিতেছি। আপনারা উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন না, সংঘবদ্ধভাবে চিন্তা করিবেন ও চিন্তাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবেন। বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত হইয়াছে, দেশের কল্যাণের নামে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতা যথেচ্ছাচার, পেশাদারী ও মতলববাজী জাগিয়া উঠিয়াছে; অতএব সকলে সাবধান হউন।

জ্ঞানহীন কর্ম্ম,—কর্ম্ম নহে বিকর্ম্ম, তাহাতে কল্যাণ হয় না, অকল্যাণ হয়। সুতরাং উত্তমরূপে চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন। আর চিন্তা করিতে হইলে, চিন্তা করিবার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রজ্ঞান চাই, ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা চাই, চরিত্র চাই, সংযম ও উদারতা চাই, সর্ব্বদা সৎসঙ্গ ও সদালোচনা চাই। এতগুলি গুণ, অভ্যাস ও সুবিধা না থাকিলে, মানুষ কোনও জটিল ও গভীর বিষয়ে রীতিমত চিন্তা করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। হিন্দুমহাসভার কার্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত

হউক, সমগ্র হিন্দুজাতি একতাবদ্ধ হউক, ইহাই সকলের কামনা, কিন্তু চিন্তাপূর্ব্বক কর্ম্ম না করিলে বিপর্য্যয় হইবার সম্ভবনা।

হিন্দুমহাসভার নূতন কথা এই যে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আর্য্য-সমাজি ও ব্রাহ্ম ইহারা সকলেই হিন্দু। ভারতবর্ষে যে সমুদয় ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সেই সমুদয় ধর্ম্ম যাঁহারা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু। কথাটি উত্তম এবং কিছুদিন হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এমন অনেক উদার মত প্রচারিত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে এই সমুদয় সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র মুখের কথায় হইবে না, সভায় মন্তব্য করিয়া "আমরা এক হইলাম" বলিলেও তাহা হইবে না, এজন্য রীতিমত সাধনা চাই, সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা চাই। যাহারা মোটেই কোন ধর্ম্ম মানে না, যাহারা কখনও শাস্ত্রচর্চ্চা করে নাই, তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনা কাহাকে বলে যাহারা তাহা জানে না এবং বলিলেও বুঝিতে পারে না, এইপ্রকারের কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দায়িত্ববোধহীন তরলচিত্ত লোকের চীৎকারে ও আস্ফালনে এই মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে না। যাহারা ধর্ম্ম মানে না, ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া অন্য প্রকারের মতলব সিদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের নিকট ধর্ম্মসমন্বয় বা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, নিতান্তই সহজ কার্য্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। পূর্ব্বে যে সমুদয় সম্প্রদায়ের নাম করা হইল, সেই সমুদয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, সাধনা ও ইতিহাস লইয়া উদারভাবে আলোচনা করিতে হইবে। আলোচনা করিতে করিতে প্রকৃত মিলনের ভূমি আবিষ্কৃত ও নির্দ্ধারিত হইবে। এই কার্য্য কি প্রকারে যথার্থভাবে হইতে পারে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা অবধারণ করুন।

হিন্দুমহাসভার উদ্দেশ্যসমূহ ধীরভাবে আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, গ্রাম হইতে এই কার্য্য বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। কেবল সহরে সভা করিয়া খবরের কাগজে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ও পেশাদার ভাড়াটীয়া লোকের নামের বিজ্ঞাপন জাহির করিলে হইবে না। প্রত্যেক হিন্দু-গ্রামে সভা করিয়া প্রত্যেক হিন্দুর যাহাতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, এজন্য বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এজন্য ব্যায়ামাগার চাই, জাতীয় বিদ্যালয় চাই, পাঠাগার ও পুস্তকাগার চাই, মঠ মন্দির প্রভৃতি দেবস্থানের সংস্কার করিয়া সেই সমুদয় কেন্দ্র হইতে ধর্ম্মকথা ও নীতিকথা সংশাস্ত্রের সাহায্যে প্রচার করা চাই, মানুষকে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ করা চাই। হিন্দুমহাসভা হইতে এই কার্য্য করিতে হইবে। দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অন্য লোকের হাতে চলিয়া যাইতেছে, স্বাস্থ্যের অভাবে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে, হিন্দুজাতি জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া প্রতিদিন দুর্ব্বল ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখনও যাহারা আছে, তাহারা পরস্পর মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া দলাদলি করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। প্রকৃত সমাজসেবক

প্রস্তুত করিয়া গ্রামে গ্রামে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। হিন্দুমহাসভা এত বড় কার্য্যের ভার লইয়াছেন। এই কার্য্য সফল হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, প্রকৃত কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই এবং আরম্ভ করিবার কোন আয়োজনও নাই।

হিন্দুমহাসভা কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই অধিকারের দাবী করিতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় এবং নিষ্ফলতার অকাট্য প্রমাণ। গ্রাম্যসভা, তালুকসভা, জেলাসভা প্রভৃতি কিছুই হইল না, নিয়মিতভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইল না, সমাজে যাহাদের কোনরূপ প্রতিপত্তি বা সন্মান নাই, এই প্রকারের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া বক্তৃতা করিল, আর খবরের কাগজে তাহার খবর বাহির হইল। ইহারই নাম সভা—ইহারই নাম দেশোদ্ধার! রাজনীতির নামে এই প্রকারের চালাকি অনেকদিন চলিয়াছিল, এইবার ধর্ম্মের নামে আরম্ভ হইল। ভগবান এই হতভাগ্য জাতিকে বন্ধুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করুন!

কাজের দিকে সভা করিয়া কিছু করিবার পূর্ব্বেই, বাঙ্গালার প্রাদেশিক হিন্দুসভা অন্যান্য রাজনীতিকদলকে অধিকারচ্যুত করিতে চাহে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অখ্যাতনামা ও অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি সভা করিয়া বলিতেছে—ব্রাহ্মণ-সভার হিন্দুসমাজের উপর কোন অধিকার নাই, কারণ ব্রাহ্মণ-সভার সভ্যগণ বা শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নহেন। হিন্দুমহাসভার যাঁহারা সভ্য, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি কাহারা, ভাল করিয়া চিনিয়া লওয়া দরকার। সামান্য ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া চাকুরীর জন্য দুয়ারে দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়া যাহারা বিফলকাম হইয়াছে, তাহার পর মহিনা লইয়া রাজনৈতিকদলে আসিয়া কয়েকমাস জেল খাটিয়াছে, পুলিশবিভাগে চাকুরী পাইলে এখনও গ্রহণ করিতে সম্মত,—এই প্রকারের বহু বহু মহারথী আজ হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি হইয়া, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অধিকার চ্যুত করিতে চাহে,—ইহা কি সমাজবিপ্লব নহে?

সমাজ-সংস্কারক হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার ব্যবসায়। কিন্তু এই প্রকারের সংস্কারক ও সংহারক একই কথা; ইহা এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিয়াছেন। হাড়ী ডোমের পৈতা দিয়া পেট চালাইতে গিয়া জেলখাটা পর্য্যন্ত, এই বাঙ্গালা দেশে হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানহীন, চরিত্রহীন, ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচিত অনেক আত্মমর্য্যাদাহীন লোক যেখানে সেখানে কদর্য্য ভাষায় ব্রাহ্মণের ও শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া সকল জাতির সহিত একপাতে খাইয়া পয়সা রোজগার করিতেছে। চাকুরীর দুর্লভতা ও জীবিকার দুর্মূল্যতা-নিবন্ধন নিরুপায় হইয়া অনেক চরিত্রহীন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকে সমাজ-সংস্কারের ব্যবসায় করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিধবার বিবাহ দেওয়া, অসবর্ণ বিবাহ দেওয়াও ব্যবসায়। এই সমুদয় ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত তাহারাই কি হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি হইয়া হিন্দুসমাজ

পুনর্গঠিত করিবে? পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় এ বিষয় কি বলেন আমরা তাহা জানিতে চাই। বাঙ্গালা দেশে হিন্দুমহাসভার নামে ঢাক বাজাইয়া এই সব ব্যাপার চলিতেছে, খবরের কাগজে খবর পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত। ইহার নাম কি গঠন? ইহার নাম ব্যাভিচার, ইহার নাম বিপ্লব। সুধীগণ ধীরভাবে চিন্তা করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ, কি কর্ম্মকাণ্ড ও সদাচার পরিত্যাগ করিবেন? আজ কি জাতিভেদ ভুলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণবংশ লুপ্ত করিতে হইবে? হিন্দুর সংস্কার, মন্ত্র, দেবতা, ঋষিলোক, পিতৃলোক, দীক্ষা পুরশ্চরণ, মন্দির, তীর্থ, উপবাস, তন্ত্র, পুরাণ, কর্ম্মবাদ, জন্মান্তর—এ সমুদয় কি মিথ্যা? আর্য্যসমাজ, বৌদ্ধসমাজ এই সমুদয় নষ্ট করিবার জন্য বহুকাল চেষ্টা করিয়াছেন, আড়াইহাজার বৎসরেও পারেন নাই। আজ তাঁহারা মিলিত হইতে ইচ্ছুক, সুখের বিষয় আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি না, প্রত্যুত সম্মান করি। তাঁহারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হউন। তাঁহাদের ধর্ম্মের ভাল ভাল কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে প্রস্তুত, কিন্তু আজ জাতিগঠনের নামে তাঁহারা যদি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ ধ্বংস করিতে মতলব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সংগঠনের কার্য্য আপাততঃ স্থগিত থাকুক। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা এখনও উদারতা শিখি নাই এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-সমন্বয় বুঝি নাই। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে হিন্দুজনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছি, আর সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য যুক্তকরে ও বিনীতভাবে আহ্বান করিতেছি।

সম্প্রতি 'বঙ্গবাসী' পত্রে পূজ্যপাদ পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধটির প্রথমাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শেষাংশটি তিনি কেন লিখিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। উদ্ধৃত অংশে হিন্দুত্ব-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক কথাই আছে।

"প্রসিদ্ধ হিন্দুত্ব এখন অস্বামিক; গবরমেণ্টের সেন্‌সসে যে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, সেই হিন্দু হইয়া যায়—এই ত এক প্রকার হিন্দু; আর এক প্রকার হিন্দু, হিন্দু মহাসভার কল্যাণে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় না দিলেও 'হিন্দু' হওয়া যায়, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতিও এই হিন্দু নামে অভিহিত। হিন্দু সাধারণের আর কোনই লক্ষণ বর্ত্তমান সময়ে দেশে বিকায় না। যাহারা হৈ চৈ করে, কাগজে লেখে, সভা সমিতি করে—তাহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু নামে পরিচিত, তাহারা প্রায়ই ঐরূপ হিন্দু, সুতরাং ঐ হিন্দুত্ব অস্বামিক। তীর্থ দেবতা, পরকাল এবং শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র না-মানিলেও হিন্দু, খাদ্যাখাদ্য বিচারবর্জ্জিত ব্রাহ্মণদ্বেষী ও ব্রহ্মণ্যদ্বেষী হইলেও হিন্দু, আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেই হিন্দু, সে পরিচয় না দিলেও হিন্দু—সুতরাং হিন্দুত্ব এখন বেওয়ারিশ মাল অস্বামিক বস্তু। হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় যিনি দেন তিনি ত সেই অস্বামিকের স্বয়ংসিদ্ধ অধিস্বামী, তাঁহার

হিন্দুত্ব মারে কে ? তিনি যতই অনাচারী হউন অত্যাচারী হউক, 'যৌগ' সম্বন্ধ 'স্রৌব' সম্বন্ধ ও 'যৌন' সম্বন্ধে যতই গর্হিতাচরণ তাঁহার হউক না তাঁহার হিন্দুত্ব মারে কে ? কেননা হিন্দুত্ব যে অস্বামিক। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, একটা অপ্রসিদ্ধ হিন্দুত্ব এখনও আছে যাহা অস্বামিক নহে, শাস্ত্র তাহার স্বামী ; তাহাকে কেহ মনে করিলেই আমার বলিতে পারে না, শাস্ত্র অনুমতি প্রদান না করিলে, সে হিন্দুত্ব লইয়া ব্যবহার করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। এ হিন্দুত্ব অপ্রসিদ্ধ ; কেননা গবরমেণ্ট লোকগণনা বা সেন্‌সেসে এ হিন্দুত্ব গ্রহণ করেন না। মালবীয় মহোদয়ের হিন্দুমহাসভাও এ হিন্দুত্বের সন্ধান পান নাই, বা ইহাকে গ্রাহ্যই করেন নাই। তথাপি এই অপ্রসিদ্ধ হিন্দুর সংখ্যা এখনও অধিক ।"

হিন্দুমহাসভা এখন কি কার্য্য করিতে পারেন, সে-সম্বন্ধে আমরা একটি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দয়া করিয়া সে প্রস্তাবটি ছাপাইয়াছিলেন। আরও কয়েকটি প্রস্তাব আছে, মহাসভার পরিচালকগণের প্রয়োজন হইলে তাহা নিবেদন করিব, সম্প্রতি দুইটি প্রস্তাব নিম্নে দেওয়া গেল। এই প্রস্তাব দুইটি গত ফাল্গুন মাসে 'বীরভূমবার্ত্তা' কাগজে বাহির হইয়াছিল।

প্রকৃত মন্দির

(শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন-লিখিত)

আমি, পূর্ব্বে কয়েক বৎসর "ব্রহ্মবিদ্যা" নামক মাসিক পত্রের জন্য প্রত্যেক মাসে কতকগুলি করিয়া বিবিধ প্রসঙ্গ লিখিতাম। সেই সময়ে আমি একটা বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানের বিষয়,—প্রাচীন কালে আমাদের দেশে দেবমন্দিরগুলি কিরূপ ছিল এবং দেবমন্দিরে কি কি কাজ হইত। অনুসন্ধানের ফলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যায়। পুরাতন 'ব্রহ্মবিদ্যা' হইতে তাহারই দু'একটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রাচীন ভারতে জনসেবা—ব্যাংকক্ হইতে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা বাহির হয়। শ্যামদেশের "রেড্‌ক্রস্" মণ্ডলী এই পত্রিকা পরিচালনা করেন। এই

পত্রিকায় সম্প্রতি একটি প্রাচীন কালের সংবাদ বাহির হইয়াছে; এই সংবাদটি আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্যামদেশে জয়বর্ম্মন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। এই রাজা তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আরোগ্যশালা বা হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; এই শিলালিপি ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দের। এই শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা যায়, তাঁহার রাজ্যে অন্ততঃপক্ষে ১০২টী আরোগ্যশালা ছিল। এই সমুদয় ব্যবস্থা কত বড় ছিল, তাহাও ঐ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়। দরিদ্রদিগকে অন্নদান করা হইত। এই জন্য যে চাউল প্রয়োজন হইত, তাহা প্রস্তুত করার জন্য ৮১,৬৪০ জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক আরোগ্যশালায় ৩২ জন করিয়া বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী ছিল, তাহা ছাড়া প্রত্যেক আরোগ্যশালায় ৬৬ জন করিয়া সেবক কোনরূপ বেতন না লইয়া, এমন কি নিজ ব্যয়ে থাকিয়া স্বেচ্ছায় সেবা করিত। প্রত্যেক আরোগ্যশালায় দুই জন করিয়া চিকিৎসক থাকিতেন; প্রত্যেক চিকিৎসকের অধীনে একজন সেবক ও দুইজন সেবিকা কার্য্য করিত। ইহা ছাড়া, ঔষধ বিতরণের জন্য দুইজন ভাণ্ডার রক্ষক, দুইজন পাচক, বুদ্ধদেবের পূজার জন্য দুইজন পূজক ও ১৪ জন শুশ্রূষাকারী থাকিত। দুইজন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা জল গরম করিয়া ঔষধাদি প্রস্তুত করিত, আর দুইজন স্ত্রীলোক ধান ভানিত।

ইহার নাম আরোগ্য দান। বৌদ্ধযুগে চৈত্য ও বিহারে ইহার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধযুগের পর এই সমুদয় চৈত্য ও বিহারের অনুবর্ত্তনে হিন্দু-মন্দির নির্ম্মিত হয়, সুতরাং সেই সমুদয় মন্দিরাদিতেও এই সব ব্যবস্থা ছিল। তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের মন্দির—এভ্‌রিম্যানস্ রিভিয়ু (Every Man's Review) নামক পত্রে, রাও সাহেব অধ্যাপক এস্, কৃষ্ণ স্বামী আয়েঙ্গার এম, এ, মহোদয় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটীর নাম—"মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান" (Educational Foundations in Medieval South India)। এই প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত এনাইরাম নামক গ্রামে রাজেন্দ্র চোল নৃপতির খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়েরও সুব্যবস্থা ছিল। একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও তিনটি জলসত্র এই মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আর একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ঐ চোলবংশীয় বীর রাজেন্দ্র দেব নামক একজন নৃপতির। ইহাতে দেখা যায়, মন্দিরের সম্পত্তি হইতে একটি আরোগ্যশালা বা হাঁসপাতাল, একটি বিদ্যালয় ও একটি ছাত্রনিবাস পরিচালিত হইত। মন্দিরের মধ্যেই জগন্নাথ-মণ্ডপ নামে একটি স্থান ছিল, তাহাতে বিদ্যালয় হইত। সেই বিদ্যালয়ে বেদ, ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত।

ছাত্রদিগকে আহার দেওয়া হইত, রাত্রিতে পড়িবার জন্য তৈল ও শনিবারে স্নান করিবার জন্য তৈল দেওয়া হইত। "বীর সোলেন" নামে আরোগ্যশালা ছিল, তাহাতে রোগীদের ১৫টি শাখা, একজন চিকিৎসক, একজন অস্ত্র চিকিৎসক, ভৈষজ্য আলয়ের জন্য দুইজন ভৃত্য ছিল। দুইজন সেবিকা রোগীদের সুশ্রূষা করিত।

এই প্রকারের ব্যবস্থা প্রাচীনকালে ছিল। এখনও দেশে অনেক মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি রহিয়াছে, এখনও অনেকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কিন্তু আরোগ্যশালা, বিদ্যাপীঠ ব্যতীত প্রকৃত মন্দির হয় না, ইহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

* * * * * *

এই গেল ইতিহাসের কথা। প্রাচীন পুরাণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে আমরা সুস্পষ্ট উপদেশ পাই, মন্দিরে আরোগ্যশালা, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক। নতুবা সে মন্দির, মন্দির নামেরই যোগ্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আমি "দানতত্ব" নামক একখানি গ্রন্থ একজন বড় পণ্ডিতকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া ছাপাইয়া অধিকাংশ পুস্তক বিতরণ করাইয়াছিলাম। পুস্তকখানির নাম—'দানতত্ত্ব'। এই পুস্তকে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে অসংখ্য বচন উদ্ধার করিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে, শাস্ত্রানুসারে মন্দির কিরূপ হওয়া উচিত। এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি হিন্দু সমাজে প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক, আর আবশ্যক সংঘবদ্ধভাবে তীর্থস্থানসমূহের সংস্কার করা, দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহ উদ্ধার করা, আর যে সব মন্দিরের তেমন সম্পত্তি আছে, সেই সব দেবমন্দিরে শাস্ত্রগ্রন্থের লাইব্রেরী, অবৈতনিক বালক-বালিকা বিদ্যালয়,—আরোগ্যশালা প্রভৃতি স্থাপন করা, হিন্দুসমাজের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

দেবোত্তর উদ্ধার

জেলা খুলনা, বাগেরহাট মহকুমা, বাগেরহাট সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে লাউপালা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রামটি যাত্রাপুর নামক বৃহৎ গ্রামের সহিত সংযুক্ত ছিল, অর্থাৎ লাউপালা যাত্রাপুরের একটি পল্লী ছিল। তখন ভৈরব নদ লাউপালা গ্রামের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব—এই তিন দিক্ দিয়া প্রবাহিত থাকায় গ্রামটি ছিল একটি উপদ্বীপ। আমরা লাউপালা গ্রামের যে মন্দিরের কথা বলিব, হাণ্টার সাহেব তাঁহার যশোহর ও নদীয়া জেলার বিবরণে, সেই মন্দিরটিকে যাত্রাপুরের মন্দির

বলিয়াছেন। এখন যাত্রাপুর ও লাউপালা সম্পূর্ণরূপে পৃথক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, একটি খাল কাটা হয়, সেই খালের ফলে লাউপালা গ্রাম এখন একটি দ্বীপ। ভৈরব নদেরও গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কাজেই পূর্ব্বের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত।

এই লাউপালা গ্রামে একটি অতিশয় বিখ্যাত ও বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরটি যে খুব বেশী-দিনের, তাহা নহে। কিন্তু খুলনা, বরিশাল, যশোহর প্রভৃতি জেলায় এই মন্দিরের খুব নাম, মন্দিরে প্রায়ই যাত্রী সমাগম হয়; আর রথযাত্রার সময়ে এখানে যেরূপ যাত্রী সমাগম হয়, বাঙ্গালাদেশের আর কোনও স্থানে রথযাত্রার ঐরূপ সমারোহ হয় না।

বালকদাস নামক একজন বৈষ্ণব সাধু ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বালকদাস একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। বালকদাস ঐ অঞ্চলেরই লোক। অনুমান ১১৭৫ সালে লাউপালার নিকটবর্ত্তী খরকোটি গ্রামে মাহিষ্যকুলে বালক-দাসের জন্ম হয়। বালকদাস শৈশবেই নকুল ব্রহ্মচারী নামক ঐ প্রদেশের একজন বৈষ্ণব গুরুর সহিত দেশত্যাগ করিয়া বহুদিন নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন, এবং সাধন ভজন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার গুরুর সহিত স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

তাঁহারা ফিরিয়া আসার পর স্বপ্নাদেশে একটা গোপাল-বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, একটি গোপাল-বিগ্রহ ভৈরব নদে জালিয়াদের জালে আবদ্ধ হন। তখন রাত্রিকাল জালিয়ারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও জাল তুলিতে পারে নাই। নদীর ধারে খুঁটি পুঁতিয়া জাল বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। সেই রাত্রিতেই নকুল ব্রহ্মচারী স্বপ্নাদেশ পান, পরদিন প্রাতে জালিয়াদের লইয়া গোপালকে তুলিয়া আনেন। তাহার পর এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরে বালকদাসের ও নকুল ব্রহ্মচারীর সমাধি আছে। বালকদাসের সাধুতার ফলে মন্দিরের বিশেষ উন্নতি হয়; বৃহৎ মন্দির, নাটমন্দির, ভোগমন্দির, অতিথিশালা ক্রমশঃ সমস্তই নির্ম্মিত হয়। তাহা ছাড়া, গোপালের অনেক সম্পত্তিও হয়। ইহাই মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কালক্রমে যেমন হইয়া থাকে, মন্দিরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়ে। সম্পত্তি কে কোথায় বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়, খাজনা পত্র আদায় হয় না, জমিদারের কর্ম্মচারীগণ অন্যায়ভাবে কর্ত্তৃত্ব করে। বিগ্রহের সেবা অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে—মন্দিরের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া যায়। তাহার পর ক্রমশঃ আবার মন্দিরের অবস্থা ভাল হইয়াছে—কি করিয়া ভাল হইল, তাহার সকল কথা এখনও বলিবার সময় হয় নাই। এক কথায়, অনেকগুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হইয়াছে। আমি কয়েকবার লাউপালা গিয়াছি, সমুদয় বিবরণ আমার নিকট আছে, প্রয়োজনমত তাহা প্রচারিত হইবে। ব্যাপারটা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত

বিবরণ, গত ১৫ই মাঘ তারিখের "খুলনাবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। এইটুকু পড়িলেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইবে।

লাউপালার শ্রীশ্রীগোপাল বাড়ীর মোকদ্দমা

ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে, ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন তীর্থ-স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সেবা-কার্য্যের মালিন্য ঘটিয়াছে। সেবাইতগণ অনেকস্থলে দেবোত্তর সম্পত্তিকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করিয়া, উহার দ্বারা নিজের নিজের ইন্দ্রিয়-বাসন চরিতার্থ করিয়া ভারতভূমিকে কলুষিত ও নিজের এবং জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। খুলনা জেলার অন্তঃপাতি বাগেরহাট মহকুমার সন্নিকটে ভৈরব নদের উপকূলে শ্রীশ্রীপাট লাউপালা গ্রামে সিদ্ধ মহাত্মা বালকদাস স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপালজীউ, এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। এই সেবার জন্য বহু দেবোত্তর সম্পত্তিও ছিল; কিন্তু সেবাইতগণের সদাচারের অভাবে, ত্রুটিতে ও অবহেলার ফলে ও অন্যান্য কারণে, এ সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির বহুলাংশ অন্যের হস্তগত হইয়াছিল। সেবাকার্য্যে ব্যভিচার দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সাধারণেরও ইহার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছিল। স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু সাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা যদি কমিটি গঠিত হয়, তবে ঐ সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং সর্ব্ব কার্য্যের মূলীভূত সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তিভূমির দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতে পারে। ইহা বাগেরহাটের কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে ও বাগেরহাটের সুযোগ্য ধর্ম্মপ্রাণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে, ১৯১৫ সালে একটি সেবা-কমিটি গঠিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা সেবাদি চলিয়া আসিতেছিল। গত ১৯২১ সাল হইতে ঐ স্থানের জমিদার বাবুরা কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক ভুলধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, কমিটির সহিত নানাপ্রকার মোকদ্দমাদি করিয়া আসিতেছিলেন। বাগেরহাট খুলনা ও কলিকাতার অনেক মহাপ্রাণ উকিল ও মোক্তার এ সম্বন্ধে নিঃস্বার্থভাবে শ্রীশ্রীগোপালজীউর সেবা-কমিটিকে সাহায্য করিয়া কমিটির ও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সম্প্রতি ১৯০০০৲ হাজার টাকার দাবীতে খুলনার সবজজ কোর্টে এক উইলের মোকদ্দমা সেবা কমিটির বিরুদ্ধে চলিতেছিল। উইলের মোকদ্দমায়, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে ও সেবা-কমিটি মোকদ্দমা খরচার ডিক্রী পাইয়াছেন। এই মোকদ্দমায় ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কোন দেবোত্তর সম্পত্তিতে কোন মহান্তের উইল করিবার অধিকার নাই, উইল করিলেও তাহা উইল বলিয়া গণ্য হইবে না। খুলনা বারের প্রায় সমস্ত উকিলগণই বিশেষভাবে সহানুভূতি করিয়াছেন। এজন্য কমিটি তাঁহাদের নিকট চির ঋণী ও বাগেরহাটের হিন্দু সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আনন্দের বিষয়, জমিদার বাবুরা সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, তাঁহাদের সমস্ত মোকদ্দমাদি তুলিয়া লইয়াছেন ও কমিটির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।

পল্লী মা

শ্রীদ্বিজপদ কুণ্ড

স্বচ্ছ সুনীল নদীর তটে দাঁড়িয়ে আমার পল্লীমাতা,
স্নিগ্ধ শ্যামল দর্শন তার সরিৎ-সলিল শীকর স্নাতা।
বন্দি তোমায় পল্লীমাগো হৃদয়ভরা-ভক্তি-ভরে,
তোমার মতন পল্লীমা আর দেখি না দেশ দেশান্তরে।

ঐ যে তোমার আম্র কানন, বল্লীপাদপ পল্লীশোভা,
রৌদ্রছায়ে প্রকৃতি মা কোথায় এমন মনোলোভা।
শ্যামল তোমার ইক্ষুক্ষেত্ আর শষ্প শ্যামল কাননবীথি,
কুঞ্জে তোমার কোকিলকূজন জাগায় প্রাণে পরমপ্রীতি

ঐ যে তোমার বুকটি ঘেঁসে তটিনী যায় এঁকে বেঁকে,
বক্ষে বারাণসীর ছবি কল্লোলিনী দিচ্ছে এঁকে।
সাধ্য কাহার পল্লীমাগো তোমার মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে;
তোমায় ছেড়ে যেতে হ'লেই ভাসি আকুল অশ্রুনীরে।

তৃণশ্যামল নদীর তটে দূরে দূরে চরছে ধেনু,
তটের 'পরে অশথ্ছায়ে হর্ষে রাখাল বাজায় বেণু।
মাঠের 'পরে কৃষক ভায়া আস্তে চলে কাস্তে হাতে,
অদূরে ঐ কল্লোলিনীর কলস্বরে হর্ষে মাতে।

কলসী কাঁখে পল্লীবধূ জল নিয়ে যায় নদীর ঘাটে,
গৃহিনীরা গৃহের কোণে আপন মনে চরখা কাটে।
বৃদ্ধেরা সব পল্লীমাঝে দিনটা কাটায় গোষ্ঠী সুখে,
প্রৌঢ়েরা সব কর্ম্মনিপুণ, খেলছে বালক হাস্যমুখে

শান্তরসের আস্পদ হেন কোথায় এমন সরলতা,
কোথায় আছে শান্তি অপার কোথায় এমন নীরবতা।
কোথায় এমন নদীর তটে দেখ্‌তে পাবো শ্যামল ক্ষেতে,
তোমার মতন পল্লীমাতা নাই বুঝি আর ভুবনেতে।

ঐ দেখা যায় কুটির তোমার সান্ধ্য মৃদুল দীপালোকে,
কি জানি কি শান্তি বারি দেয় সে ঢেলে আমার চোখে।
শ্যামল স্নেহে এলিয়ে পড়া মঞ্জু এমন পল্লী কোথা,
সে যে আমার ধাত্রী ওগো স্নেহময়ী পল্লীমাতা।

যখন ফিরি দেশবিদেশে ভাবি কেবল তোমার ছবি,
স্মৃতি মাঝে গাথর গাথে তোমার কুটির তোমার সবই।
স্নেহশীতল কক্ষ তোমার ছাড়্‌তে দারুণ পাই যে ব্যথা,
কোথাও না পাই বিশ্বখুঁজে তোমার কোলের স্বাধীনতা।

হো'ক না কেন অট্টালিকা রম্য নগর যতই আছে,
তুমি আমার আপন ব'লে তা'র্‌ মানে সব তোমার কাছে।
হই যদি মা পরবাসী থাকি যদি দেশবিদেশে,
ম'র্‌তে যেন তোমার কোলে পাই মা আমি অবশেষে।

কাজ বা কি আর দেশবিদেশে থাক্‌বো আমি তোমার কোলে,
'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌লে তোমায় সব দুঃখ যায় দূরে চলে।
ভক্তিভরে পূজতে তোমায় হৃদয়কমল উঠুক্‌ ফুটি ;
বন্দি তোমায় পল্লীমাগো, বন্দি তোমার চরণ দুটি।

(রাঢ়দীপিকা)

রথযাত্রা

(১)

বর্ত্তমান মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র নাটক "রথযাত্রা" বাহির হইয়াছে। ইহার কথা এইরূপ। প্রত্যেক বৎসর মহাকালের রথযাত্রার উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবের উপর লোকের খুব ভক্তি। লোকের ধারণা, এই উৎসবের যদি কোনরূপ অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে রাজ্যের অমঙ্গল। এ বৎসর রথ আর চলে না। নাগরিকগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে. তাহাদের মধ্যে নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। পূর্ব্বে পুরোহিত ঠাকুরেরা দড়ি ধরিয়া টানিতেন, এখন আর তাঁহারা দড়ি ধরেন না, বসিয়া বসিয়া কেবল মন্ত্র পড়িয়া নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করিতে চাহেন। রাজা আসিলেন, সেনাগণ আসিল, রথের দড়ি ধরিয়া টানিল—কিন্তু রথ অচল। ধনপতি সদাগর রাজ্যের প্রধান বৈশ্য, সব চেয়ে বড় ধনী। তাহাকে তলব হইল, ধনপতি রথের দড়ি টানিল, তাহার দলের লোকেরা টানিল—কিন্তু রথ চলিল না। এইবার শূদ্রেরা আসিল, তাহারা রথ টানিতে চায়। কিন্তু ইহারা যে শূদ্র, ইহারা এতদিন রথের চাকার তলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, (এবং সম্ভবতঃ স্বর্গেই গিয়াছে), কিন্তু রথ টানিবার অধিকার তাহাদের ছিল না, তাহারা যে অস্পৃশ্য। এখন তাহারা বলিতেছে, কেহই রথ টানিতে পারিল না, আমরা রথ টানিব। সৈনিকগণের ইহাতে বিষম আপত্তি, শূদ্রেরা রথ টানিবে কি? পুরোহিতেরও বিষম আপত্তি। সৈন্যেরা উত্তেজিত হইয়াছে, হুকুম পাইলেই খুনোখুনি, রক্তারক্তি আরম্ভ করে। মন্ত্রী ধীর প্রকৃতির লোক, কাজেই গোলমাল তেমন হইল না। শূদ্রেরা দড়ি ধরিল, রথ চলিল। রথ প্রথমেই রাজপথ ছাড়িয়া বৈশ্যের ধনাগার লক্ষ্য করিয়া চলিল। তাহার পর ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রাগার। সকলই চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিয়া মহাকালের রথ চলিল। সৈনিক, পুরোহিত সকলকেই শূদ্রের সহিত মিশিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে হইবে। ইহা ছাড়া উপায় নাই। শাস্ত্রের বচনে আর কুলাইতেছে না; কবি, যিনি সত্যের দ্রষ্টা ও গায়ক, তিনি আসিয়া এই মহাকালের রথযাত্রার মঙ্গলগীতি গাহিলেন।

(২)

নাটিকাখানি রূপক। মানবজাতির উন্নতি এই রথ—The Car of progress। পৃথিবীর

সর্ব্বত্রই মানবজাতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। প্রথম যুগে, ব্রাহ্মণের প্রভুতা। ব্রাহ্মণ যখন নিজের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের দ্বারা, ব্রাহ্মণের অধিকার-ভোগের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হয় নাই, ভাল হইয়াছে। তাহার পর সামরিক শক্তির বা ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে দ্বন্দ্ব। তৃতীয় যুগ বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলেই ধনের বশীভূত। শেষযুগ শ্রমিকের যুগ, শূদ্রের যুগ, জনসাধারণের যুগ। প্রত্যেক মানুষ নিজেকে চিনিবে, প্রত্যেক নরনারী আত্মশক্তির পরিচয় পাইবে। এতদিন যাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া নিষ্পেষিত হইতেছিল, তাহারা জাগিবে, সংঘবদ্ধ হইবে, সর্ব্বপ্রকারের অমিত ও অন্যায্য সুবিধাভোগ,—তাহা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাই হউক, আর সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারাই হউক, দূরীভূত হইবে; ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

(৩)

ইহাতে হিন্দুসমাজের কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ আমাদের পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ যাঁহারা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন—সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশের ইহাই বিধান। এই বিধানকে মানিতেই হইবে, কারণ ইহা অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধনীয়। জগন্নাথ ক্ষেত্রের ব্যবস্থা বুঝিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশে জগন্নাথের রথই সুপরিচিত, সুতরাং 'রথযাত্রা'র রূপকটি ব্যবহৃত হওয়ায়, কাব্যের ব্যঞ্জনা-শক্তি (suggestiveness) খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বিমলাদেবীর প্রভাবেই হউক, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবেই হউক, আর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবেই হউক, জগন্নাথ ক্ষেত্রের ব্যবস্থা এইরূপ। আর বাঙ্গালা দেশে যিনি যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার জীবনের শেষ অংশ জগন্নাথধামে যাপন করিলেন। সুতরাং, এই যুগ যে জনসাধারণের জাগরণের যুগ, তাহা আমরা স্বীকার না করিলে, আমাদিগকে বঞ্চিত ও বিপন্ন হইতে হইবে।

(৪)

এই পুস্তকে এমন অনেক গভীর কথা আছে; যাহার একটু টিকা দরকার। একজন নাগরিক বলিতেছে—"আমরা ওকে (রথকে) নিজে চালাই বলেইত ওর চাকার তলায় পড়িনে"। এই অংশটুকু বুঝিবার জন্য সমগ্র মানবসমাজের অবস্থা চিন্তা করুন। সমগ্র মানবজাতি চলিতেছে। নূতন নূতন চিন্তা, আবিষ্কার ও কর্ম্ম,—বিরাম নাই। যাহারা দলবদ্ধভাবে সমগ্র মানবজাতির এই চিন্তা-ক্ষেত্রে অগ্রণী হইবে, তাহারাই বাঁচিয়া যাইবে, আর যাহারা তাহা পারিবে না, তাহারা মরিয়া যাইবে। এই প্রকারে অনেক

দেশ, অনেক জাতি, অনেক সাম্রাজ্য উঠিয়াছে ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইতে সাড়া উঠিয়াছে, হিন্দু ধ্বংসোন্মুখ জাতি, হিন্দু ডুবিল। চলিতে না পারিলে,—বিশ্ববিধান বুঝিয়া তদনুযায়ী নিজেদের গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, আমাদের নিস্তার নাই।

অনেক লোক আছে (আমাদের দেশে সে প্রকারের অলস লোকের সংখ্যা খুবই বেশী), তাহারা মনে করে, মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলেই সকল গ্লানি দূরীভূত হইবে। মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্য; কিন্তু সেজন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে। মানুষ যে নিজেকে অকর্ম্মণ্য ও পাপাত্মা বলিয়া মনে করে, ইহাই তাহার সর্ব্বনাশের হেতু। এই মোহ প্রত্যেক নরনারীর হৃদয় হইতে দূর করিয়া সকলকেই অমৃত-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হইবে।

ধনীদের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ। ধনপতি বলিতেছেন—"এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে বড় হয়েচি। আজ রথের সাম্‌নে এসে পড়ে আমাদের সঙ্কট ঘটেচে, আশে পাশে লোকের দাত কিড়্‌মিড়্‌ অনেকদিন থেকে শুনচি। এখন যদি স্পষ্টই সবাই দেখ্‌তে পায় যে, রশি ধরে' আমরাই রথ চালাচ্ছি, তা হলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগ্‌বে যে বেশীক্ষণ টিক্‌বনা।" ইহার অর্থ ও তত্ত্ব সকলে চিন্তা করিবেন। আমরা অন্য প্রবন্ধে ইহার ব্যাখ্যা করিব।

শূদ্রেরা যখন রথ চালাইবে, এইরূপ কথা উঠিল, তখন সৈন্যেরা বলিল, আমরা তাহা হইলে উহাদের মারিয়া ফেলিব। চর সৈন্যদের বলিল—"তোমরা ক'জনই বা আছ। তাদের মারতে মারতে তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে' যাবে—তবু এত বাকী থাক্‌বে যে রথতলায় তোমাদের আর জায়গাই হবে না।"

সৈন্য চায় তলোয়ারের দ্বারা শূদ্রদের বাধা দিতে। মন্ত্রী বিচক্ষণ লোক। তিনি বল্লেন—"ওদের কোনো বাধা না দেওয়াই হচ্চে সৎ-পরামর্শ। বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিন্‌তে পারে। সেই চিন্‌তে দিলেই আর রক্ষে নেই।"

সার কথা—সংসার শূদ্রেরাই চালায়। কিন্তু যাহারা চালক, তাহারা যে তাহা স্বীকার করে না। এইখানেই বিপদ, তবে দায়ে পড়্‌লে স্বীকার করে, আজ শূদ্রদের দলপতি মন্ত্রীকে বলিল—"আমরাই ত জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ, আমরাই বুনচি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।" মন্ত্রী বুঝিলেন ও বলিলেন—"মহাকালের বাহন তোমরাই।" বুঝিলেই রক্ষা, না বুঝিলেই সর্ব্বনাশ। কিন্তু বুঝাটা কেবল কথা নয়, চিন্তা নয়—কর্ম্ম,—ইহাও বুঝা চাই।

(১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩০, বীরভূমবার্ত্তা)

চণ্ডীদাসের নূতন গান

গত ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষ পত্রে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "চণ্ডীদাসের নূতন গান" শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে গ্রহণীয় ও আলোচ্য বলিয়া সেই সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১। বাঙ্গালার দুইটী গ্রাম চণ্ডীদাসের সহিত সম্বন্ধ-গৌরবের দাবী করে। এই দুইটী স্থানের একটি বীরভূম জেলায়, নাম—নান্নুর, আর একটি বাঁকুড়া জেলায়—নাম, ছাতনা। চণ্ডীদাসের ভিটা, বাসুলীর মন্দির ও মূর্ত্তি, রামীর ভিটা ও ধোপা পুকুর, উভয় স্থানেই আছে। রামীর সঙ্গে সম্বন্ধের প্রবাদ উভয় স্থানেই একরূপ। কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে পার্থক্য যাহা রহিয়াছে তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে। নান্নুরের বাসুলীমূর্ত্তি চতুর্ভুজা,—দুইটী হস্তে বীণাখানি ধরিয়া আছেন, এক হস্তে বাজাইতেছেন, আর এক হস্তে জপমালা লইয়া যেন জপে নিযুক্তা। ছাতনার বাসুলীমূর্ত্তি কিন্তু অন্যরূপ—দ্বিভুজা, খড়্গ-খেটক ধারিণী, অসুর-মর্দ্দিনী। তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীর যে ধ্যান আছে, তাহার সহিত এই দুইটী মূর্ত্তির কোনও মিল নাই। * * * * নানা কারণে আমাদের অনুমান হয় চণ্ডীদাসের জন্মভূমি ছিল নান্নুর, উত্তর কালে রামীর সংস্রবে, সামাজিক গোলযোগে, অথবা প্রবাদ-কথিত মুসলমান বেগমের অনুরাগ হেতু নবাবের ক্রোধ বহ্নি হইতে রক্ষা পাইবার আশায় তিনি ছাতনায় গিয়া বাস করেন। ছাতনার তদানীন্তন জমিদার তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ছাতনায় বাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

২। ইহা নিঃসন্দেহ যে সাহিত্যপরিষদ্ প্রকাশিত তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামধেয় পুঁথিখানি অনন্ত নামা কোনো গায়েনের পুঁথি, এবং সেই অনন্ত ঝুমুর দলের ওস্তাদ বা মূল গায়েন ছিলেন। সেই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অথবা পুরাণবিরুদ্ধ মামী ভাগিনেয় সম্বন্ধ লইয়া অশ্লীল উত্তর প্রত্যুত্তর, সেই গ্রাম্য ভাষায়, গ্রাম্য উচ্চারণে নিতান্ত গ্রাম্য রসিকতায় কৃষ্ণ রাধিকায় একটা পাল্লাপাল্লি ভাব—একেবারে ঝুমুর। তবে যে দুই চারিটী ভাল গান তাহার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহার কারণ ঝুমুর গায়কেরা নিজেদের বাঁধা গান গাহিলেও অপর পাঁচ জনের বাঁধা গানও গাহিয়া থাকে। * * কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানিও সন্দেহ-সংকুল, ইহাতে তিন প্রকারের হস্তাক্ষর পাওয়া যায়।

৩। স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর সংগ্রহগ্রন্থে ও চণ্ডীদাসের নামে অনেক বাজে পদ স্থান পাইয়াছে।

ছত্রিশ অক্ষরের পদাবলিতে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদে এবং সহজিয়া সাধনের নামে প্রচলিত পদগুলির মধ্যে এইরূপ গলদ আছে। অনেক পদে "রূপের" নাম আছে—

"রূপ করুণাতে পারিবে জানিতে"

"শ্রীরূপ করুণা যাহার হয়েছে"

ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদগুলি কখনই চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই "রূপকে" ব্যাখ্যা করিয়া যে শ্রীরূপ মঞ্জরীতে রূপান্তরিত করা যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। আর সে ব্যাখ্যা করিতে গেলেও চণ্ডীদাসের সময়ে তাহার সামঞ্জস্য মিলিবে না। ঐরূপ ব্যাখ্যা মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী-কালেই প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ "রূপ" যে সহজিয়া গণের তথা কথিত গুরু প্রভুপাদ "রূপ গোস্বামী" তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই।

আলোচ্য প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের চারিটী নূতন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকারের অনেক-গুলি পদ হরেকৃষ্ণ বাবু অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছেন, সেগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইবে। নিম্নে প্রকা-শিত পদগুলির প্রথম পদটী অতি মূল্যবান। কারণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা তৃতীয় পরি-চ্ছেদে ইহার চারিটী লাইন উদ্ধৃত আছে। মহাপ্রভু শান্তিপুরে এই গান শুনিয়াছিলেন।

১

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনুমন জারে॥
দিবা নিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই।
যথা গেলে কানু পাই তথা উড়ি যাই।
হেদেরে দারুণ বিধি তোরে যে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা॥
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল॥

২

একদিন আমি গিছিলাঙ যমুনা
সকল সখির সনে।

আচম্বিতে হেদে আমারে দেখিঞা
হাসিল নয়ান বাণে ॥
সে জন কে বটে না দেখি তাহাকে
আমারে না দেখে সে।
তাহার লাগিঞা সদা প্রাণ কান্দে
এ কথা বুঝিবে কে ॥
সে দিন অবধি হেদে নিরবধি,
আন নাহি মোর মনে।
কে কহ সে জনা ঘুচুক বেদনা
বল দেখি কোন্ জনে ॥
কহে এক নারী শুন বিনোদিনী
যতনে শুনহ রাধে।
নন্দের নন্দন ব্রজের জীবন
জগতে এ নাম সাধে ॥
এ নাম শুনি রাই বিনোদিনী
অমিয়া ভরল দেহা।
কহ কহ পুন মধুর বচন
কিবা সে তাহার লেহা ॥
চণ্ডীদাস কহে সেই যে বটয়ে
নন্দের নন্দন কানু।
তরুয়া কদম্বে সে জন বসিঞা
পুরএ মোহন বেণু ॥

৩

সখি কি কহব নিশির রঙ্গ।
যো নব নাগর রসিক শেখর
হইব তাহার সঙ্গ ॥
বিনোদ জলদ বরণ যেজন
চূড়াটি বান্ধিঞা টানে।

নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
মুকুতা প্রবাল সনে ॥
মধু মৃদু হাসি ঝরে কত রাশি
কটাক্ষ কি তার ভাতি।
হেন মনে করি গাগরি গাগরি
ভরিঞা ভরিঞা রাখি ॥
মোহন মুরলী বদন সেজন
নিশিতে আসিঞা সেই।
ধর ধর পর অতি মনোহর
হার পরাইঞা দেই ॥
হেন বেলায় জাগে পাপ নোনদিনী
উঠিল রাগিনা মাঝে।
আস্তে বাস্তে হেদে তাহারে উঠাতো
পাইল বড়ই লাজে ॥
তরাসে তখনি কবাট ঘুচাঞা
কানু উঠাইঞা দিল।
চণ্ডীদাসে কয় হেন মোনে লয়
ননদি জানিঞাছিল ॥

S

সই কে জানে এমনি হব।
পরিণাম সারা ভাবিতে সংশয়
তাহারে পরাণ দিব ॥
হাসিতে হাসিতে শ্যামের সহিতে
করিলাঙ প্রেমের লেহা।
জাতি কুল ছিল সকলি মজিল
কবে হারাইব দেহা
কালিয়া বরণ ধরয়ে যেজন
কেবল বিষের রাশি।

কুটিল হৃদয় জানিল সদয়
মুখেত অমৃত হাঁসি ॥
সকল ছাড়িঞা সরল জনএ
তাহারে করয়ে হেন
কে বলে দয়ার ঠাকুর সেজন
বিষের সমান জেন ॥
যাবত জীবন যে নারি ধরয়ে
পাছে করে পর প্রেমা।
সে জনা মরিঞা যাউক তখনি
বুঝিঞা দেখিলাও য়ামা ॥
বিশেষে কালিয়া মারিল ভাঙ্গিঞা
কালিয়া প্রেমের ফান্দে।
তাহার লাগিঞা এ দুটী নয়ান
নিরবধি কেনে কান্দে ॥
ছারেখারে যাউক কুলের গরিমা
মরিঞা যাউক সে।
পরবশ হঞা যে নারি থাকয়ে
পিরিতি করয়ে যে ॥
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরিতি
অই ছল কি রীতি তার।
প্রেমের পাথার য়াপার সাঁতার
নাহিক উপায় পার ॥

ললিতমাধবে শ্রীরাধা

১। নাটকের ইতিহাস ও অভিনয়

দেবাদিদেব মহাদেবের লীলা অতিশয় অদ্ভুত। আমরা জানি তিনি শ্মশানবাসী, ভূত প্রেত লইয়াই তাঁহার খেলা। তিনি বিভূতিভূষণ ও দিগম্বর, তাঁহার গলায় হাড়ের মালা। তিনি জ্ঞানী ও যোগীশ্বর। কিন্তু তিনি গোপীশ্বর; ব্রহ্মকুণ্ডের তীরদেশ প্রফুল্ল কমলসমূহে নিরন্তর শোভিত, তিনি সেই ভূমির অধীশ্বর। বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবন রস-সদন, তিনি সেই রসের তত্ত্ববিৎ। ব্রজগোপীর প্রেমের খেলা, আনন্দের মেলা জগতে যাহাতে প্রচারিত হয়, রসজ্ঞ ভক্তগণ যাহাতে তাহা আস্বাদন করেন, সেজন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত। শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনিই স্বপ্নে আদেশ করিলেন। সেই আদেশে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় এই ললিতমাধব নাটক রচনা করিয়াছেন।

আজ দীপান্বিতা মহোৎসব। গোবর্দ্ধনের আরাধনার জন্য রাধাকুণ্ডের তটবর্ত্তী মাধবীমাধব-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন। সেই ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ-বিধানের জন্য এই নাটকের অভিনয়।

২। বিন্ধ্যগিরির তপস্যা

হিমালয় পর্ব্বতের সম্মানের সীমা নাই। পর্ব্বতগণের মধ্যে তিনি যে কেবল মস্তকের উচ্চতায় সকলের বড় তাহা নহে, তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীকে বিবাহে দান করিয়া তিনি মহাদেবকে জামাতা করিয়াছেন। ত্রিলোকে তাঁহার গৌরবের সীমা নাই। বিন্ধ্য-পর্ব্বতও ইচ্ছা করিলে উচ্চতায় হিমালয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতেন। একদিন তিনি সুমেরুপর্ব্বতকে জয় করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্যের সম্মান

রক্ষা করিবার জন্য তাহা করেন নাই। ইহা বিন্ধ্যপর্ব্বতের মহত্ত্বের পরিচায়ক। হিমালয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মার নিকট বিন্ধ্য এই বর পাইলেন, "হে বিন্ধ্য, তুমি অভিলাষানুরূপ দুইটি বালিকা পাইবে। সেই দুই বালিকার যিনি পতি হইবেন, তিনি যুদ্ধে মহীদেবকে পরাজিত করিবেন, আর সমুদয় জগৎ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইবে।

৩। কংসের প্রতি দৈববাণী

দেবকীর কন্যাকে কংস যখন বধ করিতে চেষ্টা করে, তখন সেই কন্যা আকাশে উত্থিত হইয়া এইরূপ দৈববাণী করিয়াছিলেন।

যস্তঙ্গেন পুরোত্তমাঙ্গমহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গরে
যং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দং বিদুঃ।
আনন্দামৃতসিন্ধুভিঃ প্রণয়িনাং সন্দোহমানন্দয়ন্
প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেষ জগতী কন্দোঽহত্য চন্দ্রোদয়ে॥
মত্তঃ সত্তমমাধুরীভিরধিকাঃ শ্বোবা পরশ্বোঽথ বা
গন্তারঃ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রকটতামষ্টৌ মহাশক্তয়ঃ।
বৃন্দিষ্ঠে গুণবৃন্দমন্দিরতয়া তত্র স্বসারাবুভে
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্য চ জয়ী পাণৌ গৃহীতা যয়োঃ॥

হে কংস, পূর্ব্বজন্মে তুমি কালনেমি ছিলে, উন্নত চক্রের দ্বারা পূর্ব্বজন্মে যিনি তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, যাঁহার চরণপদ্ম দেবগণসেবিত বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন, এবং যিনি জগতের মূল, তিনি আজ চন্দ্রোদয়ের সময় আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার আবির্ভাব নিবন্ধন যাঁহারা প্রণয়ী, তাঁহাদের আনন্দামৃতসমুদ্র উল্লসিত হইয়াছে।

আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মাধুর্য্যশালিনী অষ্ট মহাশক্তি অর্থাৎ রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা ও ভদ্রা, ইঁহারা কল্য হউক আর পরশ্ব হউক, ক্ষিতিমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন। ঐ অষ্ট মহাশক্তির মধ্যে সদ্‌গুণমণ্ডিতা বলিয়া দুইটি ভগিনী অতিশয় প্রসিদ্ধা হইবেন। ঐ দুই ভগিনীকে যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি রাজেন্দ্র হইবেন এবং যুদ্ধে মহাদেবকেও পরাস্ত করিতে পারিবেন।

ইহাই যোগমায়ার দৈববাণী। কংস ইহাই শুনিয়াছিলেন। দৈববাণী শ্রবণের পর

কংস জাতহারিণী পূতনাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়াছে। পূতনা সদ্যোজাত শিশু-গণকে বিনাশ করিতেছে।

৪। রাধা ও চন্দ্রাবলী

শ্রীমতী চন্দ্রাবলী মূলে চন্দ্রভানু রাজার কন্যা, আর শ্রীমতী রাধিকা বৃষভানু রাজার কন্যা। ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভগমন্মায়া ভগবতী, এই কন্যা দুইটিকে তাঁহাদের প্রথম মাতার গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের মহিষীর গর্ভে স্থাপন করেন। প্রথম কন্যা চন্দ্রাবলী, আর দ্বিতীয়া শ্রীরাধা। কন্যা দুইটি ভূমিষ্ঠ হইলে পূতনা তাহাদের অপহরণ করিল। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পুরোহিত এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করিলেন। পূতনা বিত্রস্ত-বুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে চন্দ্রাবলী নামক কন্যাটি এক নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল। এই নদী বিদর্ভদেশের অভিমুখে ধাবিত। দেবী পৌর্ণমাসী পূতনা রাক্ষসীর ক্রোড় হইতে শ্রীমতী রাধিকাকে লাভ করিলেন। কেবল শ্রীরাধিকা নহেন, দেবী পৌর্ণমাসী আরও পাঁচটি কন্যা পাইলেন। এই পাঁচটি কন্যা ললিতা, ইনি শ্রীরাধার সখী; পদ্মা, ইনি চন্দ্রাবলীর সহচরী; মঙ্গল-চরিত্রসম্পন্না ভদ্রা, কল্যাণদায়িনী শৈব্যা আর শ্যামকান্তি-বিশিষ্টা শ্যামা। দেবী পৌর্ণমাসী এই পাঁচটি কন্যাকে গোপীগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি যশোদার ধাত্রী মুখরাকে কহিলেন—"বৃদ্ধে, এই কন্যাটির নাম শ্রীরাধা, ইহার গুণের তুলনা নাই। এটি তোমার জামাতা বৃষভানুর কন্যা, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।" এই বলিয়া দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে মুখরার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধার দ্বিতীয়া সখী বিশাখা যমুনার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, জটিলা তাহাকে লাভ করিল। চন্দ্রাবলীর কথা এখনও বলা হয় নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে তিনি বিদর্ভ-দেশগামিনী নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। বিদর্ভদেশের রাজা ভীষ্মক তাঁহাকে লাভ করিলেন। এই কন্যার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবকীকন্যা যোগমায়াদেবীর আদেশে, গোবর্দ্ধন ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের গৃহবাসী জাম্ববান্ এই কন্যাকে কোন প্রকারে লইয়া আসিলেন। ইনিই করালার নপ্‌ত্রী চন্দ্রাবলী।

দেবী পৌর্ণমাসী ও গার্গী, এই দুই জনের কথোপকথন হইতে আমরা পূর্ব্বের রহস্য-

ময় ইতিহাস জানিতে পারি। এই ইতিহাস কেবল অলীক কল্পনা নহে, ইহার ভিতর অনেক গভীর তথ্য নিহিত রহিয়াছে, যাঁহারা যথাযথ চিন্তা করিবেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। আমরা আপাততঃ এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিব না।

বৃন্দাবনে যে সকল গোপকন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, আর দ্বারকাপুরে রাজরাজেশ্বর হইয়া যাঁহাদিগকে মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চন্দ্রভানু, বৃষভানু প্রভৃতি গোপদিগের কন্যাগণ, আর ভীস্মক, সত্রাজিৎ প্রভৃতি রাজন্যগণের কন্যাগণ, ইঁহারা তত্ত্বতঃ অভিন্ন, দেহের দ্বারা ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণলীলার এই চরম রহস্য আমাদের ধ্যানের বিষয়। রুক্মিণী = চন্দ্রাবলী, সত্যভামা = রাধা, জাম্ববতী = ললিতা, পদ্মা = নাগ্নজিতী, শ্যামলা = লক্ষণা, মাদ্রী, ভদ্রা =   , শৈব্যা = মিত্রবৃন্দা, বিশাখা =   ; ইহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

৫। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ

ললিতমাধব নাটকের আলোচনা করিতে হইলে, প্রারম্ভে রসতত্ত্বের দুএকটি কথা আলোচনা করিতে হইবে। এই নাটকের টীকার প্রারম্ভেই পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন,—শ্রীরূপগোস্বামী মহোদয় শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি-গ্রন্থে, "সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ" কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই 'সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ' উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য এই ললিতমাধব নাটকের রচনা।

বৈষ্ণবদর্শনের রসতত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, এখানে ভাব লইয়া কারবার। পূজ্যপাদ গোস্বামীগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি লাভ করিয়া যে রসের ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সেই রস পরমহংসগণের ও আত্মারাম মুনিগণের সেব্য। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামীপাদগণের জীবন, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন আলোচনা করিলেই একথা বুঝিতে পারা যাইবে। এখানে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপার সত্য সত্য নাই। আত্মসুখের বা কামের গন্ধমাত্রও এখানে নাই।

পার্থিব ব্যাপারসমূহকে তাহাদের ভাবের দিক্ হইতে দেখা যায়। পারমার্থিক জগতে প্রত্যেক ব্যাপারেরই একটি নিত্য সত্তা আছে, তাহার নাম ভাব। ভাব ও তত্ত্ব

একই কথা। ভাব যখন সহৃদয়জনের হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তখন তাহার নাম রস। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ভাবুক ও রসিক হইয়া এই ভাগবতরস পান কর। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বলিয়াছেন, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এই লীলা শ্রবণ করিতে হইবে।

এইবার শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিগ্রন্থে কথিত 'সম্ভোগ' এর লক্ষণ আলোচনা করা যাইতেছে—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥

দর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতির আনুকূল্যময় নিষেবনের দ্বারা যুবক যুবতীর যে উল্লাস হয়, সেই উল্লাসের উপর সম্যক্‌রূপে আরোহণ করিয়া যে ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই ভাবের নাম সম্ভোগ।

এই সংজ্ঞার সাহায্যে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে দর্শন বা আলিঙ্গন সম্ভোগ নহে। তজ্জাত যে উল্লাস, তাহাও সম্ভোগ নহে। সেই উল্লাসকে অবলম্বন করিয়া যে ভাবের খেলা হয়, তাহাই সম্ভোগ। ললিতমাধব নাটকের আলোচনায় আমরা দেখিব স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন ও আলিঙ্গন যেখানে নাই, সম্ভোগের সেইখানেই পূর্ণতা।

এই সম্ভোগ দ্বিবিধ। মুখ্য ও গৌণ। জাগ্রদাবস্থায় মুখ্যসম্ভোগ চারি প্রকার। পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানে সংকীর্ণ সম্ভোগ, কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসে সম্পন্ন সম্ভোগ, সুদূর প্রবাসে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণ এইরূপ—

দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥

পরাধীনতা-প্রযুক্ত নায়ক নায়িকার বিয়োগ ঘটিলে—এবং সাক্ষাৎ অতিশয় দুর্ল্লভ হইলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

স্বপ্নাবস্থায় যে সম্ভোগ হয়, তাহা গৌণ। স্বপ্ন আবার দ্বিবিধ, সামান্য ও বিশেষ। পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় গৌণ সম্ভোগের সকল কথা বলেন নাই। কারণ উহা অতিশয় উল্লাসপ্রদ। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণে আমরা দেখিলাম উহা স্থূল দেহেন্দ্রিয়ের সম্ভোগ নহে। এখানে ত্যাগই ভোগ।

৬। পরকীয়বাদ

দেবী পৌর্ণমাসী তাঁহার গুরুদেব নারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণলীলার যাবতীয় রহস্য পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয় শ্রীমতী রাধিকাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু সেই বিবাহ মায়ার বিবর্ত্তমাত্র। "মায়াবিবর্ত্তোহয়ং"—টীকা—অন্যধর্ম্মস্যান্যত্রারোপো বিবর্ত্তঃ। সাদৃশ্যজ্ঞানেন শুক্তৌ রজতবন্মায়ায়াং শ্রীরাধায়া আরোপোহয়ং কৃতঃ। শুক্তি বা ঝিনুক দেখিয়া মনে হয় উহা রৌপ্য বা রজত। শুক্তির সহিত রজতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্য-জ্ঞানের দ্বারাই এইরূপ হইয়া থাকে। একের ধর্ম্ম এই প্রকারে অন্যত্র আরোপিত হইয়া থকে। ইহারই নাম বিবর্ত্ত। এই প্রকারে মায়াতে শ্রীরাধার আরোপমাত্র করা হইয়াছে।

নচোদ্বিরিঞ্চে-র্বরামৃতেন সমৃদ্ধের্বিন্ধ্যনগস্য তপঃপ্রসূনৈ-র্গুম্ফিতাং মাধবহৃন্মেদুরতা-কারি-মাধুরী-মকরন্দাং রাধিকা-বৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্‌জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত।

নতুবা ব্রহ্মার অত্যুৎকৃষ্ট বরের প্রভাবে সৌভাগ্যশালী, পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের তপস্যা-কুসুম-গুম্ফিতা, মাধবহৃদয়ের স্নিগ্ধতাবিধায়িনী মাধুরী-মকরন্দ-স্বরূপা বৈজয়ন্তী-সদৃশী শ্রীমতী রাধাকে কি মাধবব্যতীত অন্য কেহ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে?

শ্রীরাধার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ যেমন মায়ার বিবর্ত্তমাত্র, অর্থাৎ সত্য করিয়া বিবাহ হয় নাই, অথচ লোকে মনে করিল বিবাহ হইয়াছে, সেইরূপ চন্দ্রাবলী-প্রভৃতি অন্যান্য ব্রজবালিকার বিবাহও মায়ার বিবর্ত্ত।

পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষা কুমারীষু দারতা যদেষাং প্রেক্ষণমপি তাভিরতিদুর্ঘটং॥

গোপেরা মনে করিতেন আমরা এই সকল কুমারীদিগের পতি। কিন্তু কেবল-মাত্র তাহা মনেই করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গোপীদিগের এই দারতা বা ভার্য্যাত্ব ঐ মমতামাত্রেই পর্য্যবসিত। সত্য করিয়া কিছুই নহে। গোপেরা অর্থাৎ ঐ কুমারীদিগের পতিরা কখন ইঁহাদিগকে ভার্য্যা বলিয়া নিরীক্ষণ করিতেও পারিতেন না।

গোপীদিগের সহিত তাঁহাদের পতিদিগের এই যে সম্বন্ধ, ইহা অতিশয় রহস্যময়।

কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য যে খুব কঠিন, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্, তিনি প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছেন। ইহাই মূল কথা। এই কথাটি হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া যদি স্থিরচিত্তে ও শান্তভাবে ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বের কথাটি বুঝিয়া উঠা, কঠিন নহে। আমরা এই সংসারে যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে করিতেছি, তাহারা কেহই সত্য করিয়া নাই, কেবল আছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই মনে হওয়ার মূলে, সত্য করিয়া শ্রীভগবান্ই আছেন। শ্রীভগবান্ আছেন ইহা যতক্ষণ না বুঝিব, ততক্ষণ মনে হইবে সংসারের যাবতীয় পদার্থ সত্য করিয়াই আছে, আর তিনি আছেন ইহা যখন সত্য করিয়া বুঝিব, তখন দেখিব আর কিছু সত্য করিয়া নাই, সকলই মায়ার বিবর্ত্ত আর এই মায়া-বিবর্ত্তে সত্য করিয়া তিনিই কেবল আছেন। একমাত্র কৃষ্ণই পতি, সকলেরই পতি, ইহাই পারমার্থিক সত্য। অপর কাহারও সত্য করিয়া পতিত্ব নাই, কেবল মায়ার বিবর্ত্তে ঐরূপ মনে হয়। যেখানে ভগবান্ নাই সেখানে ঐ ব্যবহারই সত্য, আর ভগবান্ যেখানে আছেন সেখানে ব্যবহার কেবল ব্যবহার অর্থাৎ কেবল মনে-হওয়া মাত্র। শ্রীবৃন্দাবনে তাহাই হইয়াছে। শ্রীভগবান্ প্রকট হইয়াছেন, অতএব ব্যবহারকে আর সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না। পরকীয়বাদ কি, তাহা এই প্রকারের চিন্তাপদ্ধতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

পূর্ব্বে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যে অষ্ট কুমারীর কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বভাবতঃই গরিষ্ঠ অনুরাগ। শতাধিক ষোড়শ সহস্র ব্রজ-কুমারীর সহিত গমন করিয়া চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পঞ্চকুমারী "হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে অধিশ্বরি, নন্দগোপসুতকে আমার পতি করুন, আপনাকে প্রণাম করি" এই মন্ত্র জপ করিয়া চণ্ডিকার অর্চ্চনা করেন। কামরূপদেবী কামাখ্যাকে যদি কুমারীগণ পূজা করেন তাহা হইলে তাহাদের কামনা সিদ্ধ হয়, গর্গাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন। এই কারণেই ব্রজবালাগণ কামাখ্যাদেবীর পূজা করেন। শ্রীরাধিকা গর্গাচার্য্যেরই উপদেশানুসারে সূর্য্যদেবের পূজা করেন।

শ্রীরাধা ও ব্রজগোপী সম্বন্ধীয় এই সমুদয় কথা ললিতমাধব নাটকের প্রারম্ভেই আছে। তাহার পর ঐ নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে যে সব কথা আছে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

৭। সায়ং উৎসব—প্রথম অঙ্ক

বিচলিতুমসমর্থং ব্যোম্নি মুক্তপ্রতিষ্ঠে
সময়-বিপরিণামাদ্বীর্য্যবিধ্বংসনেন।
শিথিলতরকরেণালম্ব্যভাণ্ডীরচূড়াং
চরমগিরিশিখায়াং লম্বতে ভানুবিম্বং ॥

দিবা অবসানপ্রায়। ক্ষীণবল সূর্য্যমণ্ডল শিথিল করে ভাণ্ডীরবনের বৃক্ষচূড়া অবলম্বন করিয়া আশ্রয়শূন্য গগনমণ্ডলে অস্তাচলশিখা আশ্রয় করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাখালবালকসঙ্গে গাভীপাল লইয়া গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বদিকে ধূলি উড়িতেছে, সেই ধূলিতে পূর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন। গোপীগণের চিত্ত উৎকণ্ঠিত, কৃষ্ণদর্শনের জন্য হৃদয় নিরতিশয় আকুল। এই অবস্থায় নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত, এমন সময়ে দূরে যেন এক ধ্বনি উঠিল—

মঞ্চস্তাদুত্তিষ্ঠ পদ্মে মুকুটবিরচনং মুঞ্চ পিঞ্ছেন ভদ্রে
শ্যামে দামানুবন্ধং পরিহর ললিতে পিন্‌ঢি মা জাগুড়াণি।
শারিপাঠাদ্বিশাখে ব্যুপরম কবরীসংক্রিয়া মুজ্ঝ শৈব্যে
পূর্ব্বাং বেবেষ্টি কাষ্ঠাং সুরভিখুরপুটী পাংশুপিষ্টাতপঞ্জঃ ॥

পদ্মে, উঠ, উঠ, ক্ষুদ্রখট্টা হইতে গাত্রোত্থান কর; ভদ্রে আর ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা মুকুট রচনা করিও না; শ্যামে, মালা রচনা হইতে ক্ষান্ত হও; ললিতে, আর কুঙ্কুমচূর্ণ করার প্রয়োজন নাই; বিশাখে, শারিকাকে আর পাঠ করাইতে হইবে না, বিরত হও; শৈব্যে, কবরী-সংস্কার শেষ কর; ঐ দেখ গাভীগণের ক্ষুরোদ্ধূত সৌরভযুক্ত ধুলিরাশি পূর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে।

গোপীগণ নিজ নিজ কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া পথিপার্শ্বে সারিসারি দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও গাভীপাল তখনও অনেক দূরে, কিন্তু গোপীগণের উৎকণ্ঠার যে সীমা নাই। গোপীগণ কিরূপভাবে আসিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন।

ধন্যে কজ্জলমুক্তবামনয়না পদ্মে পদোঢ়াঙ্গদা
সারঙ্গি ধ্বনদেকনূপুরধরা পালি স্খলন্মেখলা।

গণ্ডোগুস্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রার্পিতালক্তকা
মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মুরলী দূরে কলং কূজতি ॥

ধন্যে, তুমি যে বামনয়নে কজ্জল দাও নাই; পদ্মে, তুমি যে দেখিতেছি চরণে অঙ্গদ পরিধান করিয়াছ; সারঙ্গি, তুমি কেবল একপদে নূপুর দিয়াছ; পালি, তোমার যে মেখলা স্খলিত; লবঙ্গি, তুমি একগণ্ডে তিলক দিয়াছ; কমলে, তুমি চক্ষুতে অলক্তক দিয়াছ; তোমরা এমন করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিও না, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী এখনও অনেক দূরে বাজিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের এখানে আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আসিতেছেন। মাথুরচন্দ্র বলরামের পরিধানের বসনখানি গগনমণ্ডলের ন্যায় নীল, তাঁহার চারিদিকের রাখাল বালকগণ, নক্ষত্রমালার মত, আর সম্মুখে গাভীপাল ধবলবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের কান্তি নীলবর্ণ, হস্তাগ্রে সরল যষ্টি, কটিতটে পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র, তিনি গোপিকাগণের প্রেমলক্ষ্মীর পরিপাকস্বরূপ। গাভীগণ বেগে দুই চারি পদ অগ্রে গমন করিয়া পুনরায় গ্রীবা বাঁকাইয়া পশ্চাতে চাহিতেছে। বৎসগণের প্রতি ইহাদের যত ভালবাসা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদপেক্ষা অধিক, এই কারণেই পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিতেছে। বলরাম তাঁহার সখাগণকে লইয়া স্নান করিবার জন্য যমুনায় চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন—সখে, দেখ দেখ

দ্রবন্নববিধুপল-প্রকরদত্ত-পাদ্যঃ শশী
সরত্নতরলোচ্ছলজ্জলধিকল্পিতার্ঘক্রিয়ঃ।
উড়ুল্লসিত-দিগ্বধূগণবিকীর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ
স্ফুরত্তনুরুদঞ্চিতস্মররসোর্ম্মিরুন্মীলতি ॥

কন্দর্পরসতরঙ্গে ভূষিত হইয়া চন্দ্রদেব মনোহর মূর্ত্তিতে উদিত হইতেছেন। চন্দ্রকান্তমণি-সকল দ্রবীভূত হইয়া তাঁহাকে পাদ্য দিতেছে, সমুদ্র উথলিত হইয়া রত্নযুক্ত তরঙ্গের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিতেছে, দিগ্বধূগণ সমুদিত নক্ষত্রসমূহের দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে।

মধুমঙ্গল বলিলেন,—সখে, আকাশের ঐ চাঁদ কলঙ্কপূর্ণ, উহা দেখিয়া কি হইবে? ঐ দেখ লতাজালের মধ্যে ষোলহাজার অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দেখা যাইতেছে। (ইহারা ব্রজগোপী।)

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, ও মধুমঙ্গলের কথা স্বীকার করিলেন। মধুমঙ্গল বলিতেছেন

কদম্বকুঞ্জের দক্ষিণদিকে নিকটেই এক রমণী আকর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

সেয়ং দীব্যতি শৈব্যায়াঃ পাবিকা বিশ্বপাবিকা।
বেণুর্যদ্বিভ্রমারম্ভে স্তম্ভমালম্বতে মম।

শৈব্যা বেণু বাজাইতেছে। ঐ বেণুর নাম পাবিকা, উহা বিশ্বপাবিকা অর্থাৎ বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক। ঐ বাঁশির বাদ্যে আমার বাঁশি স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার পর কৃষ্ণ শুনিতেছেন, ভদ্রা, বল্লকী অর্থাৎ বীণা বাজাইতেছে। বীণার স্বরে শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন বল্লবী ভদ্রাও যেমন তাহার বল্লকীও তেমনি, উভয়েই আমার মন হরণ করিতেছে। শ্যামলাও বীণা বাজাইতেছে। পদ্মার প্রকোষ্ঠে অতিমধুর বলয়া-সকল বাজিতেছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দতরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট যাইবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন, এমন সময় উপনন্দের পুত্র সুভদ্রের স্ত্রী কুন্দলতিকা আসিয়া উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট যাইবার জন্য আকুল। কুন্দলতিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—সুন্দর, ভারুণ্ডার গৃহমধ্যে চন্দ্রাবলী অবরুদ্ধা ছিলেন, আমি কৌশল করিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছি। এমন সময়ে পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রাবলী পদ্মাকে বলিতেছেন—

"ভারুণ্ডা আমার প্রতি তর্জ্জনই করুক, আর কুলে কলঙ্কই হউক, আমার এই চক্ষুদুটি ভৃঙ্গরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-দর্শনের লোভ, ইহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত বলিলেন—কুরঙ্গি, তোমার মুখচন্দ্রের ভ্রূভঙ্গিলীলায় পরাস্ত হইয়া উজ্জ্বল চন্দ্র সভয়ে আকাশে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেখানে থাকিতে না পারিয়া তোমার ঐ বদনের সেবা করিবার জন্য তোমার দন্তশ্রেণীতে আসিয়াছে, এই কারণেই তোমার নাম চন্দ্রাবলী।

চন্দ্রাবলীর সহিত নানারূপ আলাপ হইতেছে, এমন সময়ে বিঘ্ন উপস্থিত। ক্রোধ প্রকাশ করিতে করিতে ভারুণ্ডা আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রাবলী ও পদ্মা পলায়ন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, মাতা যশোদার নিকট গেলেন। কুন্দলতা পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছেন। যশোদা চিন্তা করিতেছেন, বিলম্ব হইয়া গেল, এখনও শ্রীকৃষ্ণের দেখা নাই কেন?

কুন্দলতা যশোদাকে সংবাদ দিলেন, গগনচারিণী দেবরমণীগণ হাস্য-কুসুম বর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন, এইজন্যই তাঁহার বিলম্ব হইতেছে। রোহিণী বলিতেছেন রাধাও চন্দ্রাবলীর সৌন্দর্য্য দেবরমণীগণ অপেক্ষাও অধিক। যশোদা রোহিণীর কথা শুনিয়া বলিতেছেন চন্দ্রাবলী নবমালিকা আর শ্রীরাধা মাধবী। ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠা রাধা স্বকীয় সৌন্দর্য্য-মকরন্দ-দ্বারা সর্ব্বদা আমার নেত্রভৃঙ্গের আনন্দ বিধান করিতেছে। পৌর্ণমাসী ও গার্গী সেখানে রহিয়াছেন। গার্গী কুন্দলতাকে বলিতেছেন—কুন্দলতে, তোমরা প্রতিদিন শ্রীরাধাকে গোকুলেশ্বরীর (যশোদা) গৃহে লইয়া আইস কেন? যশোদা বলিলেন—দেবি, দুর্ব্বাসা ঋষি শ্রীরাধাকে বর দিয়াছেন যে শ্রীরাধা আমার প্রস্তুত সামগ্রী উপভোগ করিলে দীর্ঘায়ু হইবে, এই কারণেই আমরা তাহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসি। পৌর্ণমাসী বলিলেন—জটিলা একন্য বড়ই অসন্তুষ্ট, সে শ্রীকৃষ্ণকে ভয় করে।

যশোদা হাস্য করিয়া বলিলেন—আমার বাছা দুগ্ধমুখ, তাহার জন্য আবার শঙ্কা!

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার ইহাই প্রধান রহস্য। ভাবভেদে রসভেদ, আর শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশভেদ। যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণ সত্যই দুগ্ধমুখ বালক, কিন্তু অন্যের নিকট অন্যরূপ। তাই যশোদার কথা শুনিয়া কুন্দলতা মৃদুস্বরে বলিলেন—রাজ্ঞীর সন্তান সত্যই দুগ্ধমুখ। তিনি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে ক্রীড়নকের মত হস্তে ধারণ করিয়াছেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। যশোদা ও রোহিণীর বাৎসল্য-রসের খেলা আরম্ভ হইল। রোহিণী দীপমালার দ্বারা সস্নেহে নির্ম্মঞ্ছন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়ের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া বাল্য-বিলাস প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—মা, আমাকে মণির অলঙ্কার দাও। কুন্দলতা ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাসের সহিত কৃষ্ণকে বলিলেন—তুমি কুঞ্জগৃহে বহুপ্রকার ক্রীড়া করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, এখন স্তনামৃত পান কর। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন। যশোদা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; বাৎসল্য পর্য্যন্ত যাঁহার অধিকার, তাঁহার মাধুর্য্যরসের রাজ্যে প্রবেশ নাই। কাজেই যশোদা ভালমানুষের মত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"বৎস! হাসিতেছ কেন? দেখ, আজও তোমার কৌমারকাল অতীত হয় নাই, স্তনপান করায় দোষ কি?

কুন্দলতা যশোদাকে বলিলেন—ভগবতি, আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। আজ

আপনার এই বালক, বালিকাদিগের সহিত মণ্ডল রচনা করিয়া মহারাসে ক্রীড়া করিতেছেন।

মহারাস কি, যশোদা তাহা জানেন না। কাজেই তিনি কুন্দলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাস কাহাকে বলে ?

শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়াছেন। মায়ের নিকট মহারাসের কথা কেন? কাজেই ভ্রূভঙ্গি করিয়া কুন্দলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কুন্দলতা মহারাস-সম্বন্ধে বেশী কিছু যশোদাকে বলিলেন না, এইমাত্র বলিলেন যে, উহা একপ্রকার নৃত্যলীলা।

কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণপ্রান্তে গিয়া বলিলেন—রাধেশ, পিঞ্জরবদ্ধ তৃষ্ণাকুল চকোরিকা দগ্ধ হইতেছে, শীঘ্র অশোককুঞ্জের অভিমুখী হও। শ্রীকৃষ্ণ ঈঙ্গিত করিয়া কুন্দলতার অনুরোধ স্বীকার করিলেন। এইবার নন্দ মহারাজ আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। বাৎসল্যের লীলা এখনকার মত শেষ হইল, এইবার অন্য লীলা।

ললিতা শ্রীরাধাকে বকুলকাননে লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীরাধিকা ললিতাকে বলিতেছেন,—সখি, এই রাত্রির প্রশংসা কর, এই রাত্রিতে তোমরা কোনরূপ বিশেষ সুখলাভ করিবে। কুন্দলতা আসিয়া ললিতাকে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই শ্রীরাধা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, ঐ নাম শুনিবামাত্র আমি যে উন্মত্ত হইলাম।

কুন্দলতা বলিলেন—সখি, অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এইরূপ। সর্ব্বদা উপভোগ করিলেও মনে হয় যেন কখন তাহা ভোগ করি নাই।

ললিতা বলিলেন—কেবল অলৌকিক বস্তুর গুণ নহে, গাঢ় অনুরাগেরও ঐরূপ স্বভাব। অনুরাগ যেখানে গাঢ়, সেখানে ঐ অনুরাগের প্রভাবে নিতান্ত অনুগত জনও ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্বের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই বলিয়া ললিতা বলিতে লাগিলেন—

নবাম্বুধরমণ্ডলী মদ-বিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যোযুবা।
সখি স্থিরপতিব্রতা নিকরনীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥

নবীন মেঘসমূহের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, এমন দেহের কান্তি ; ঐ ব্রজেন্দ্র-কুল-নন্দন নবীন যুবা

বিরাজ করিতেছেন! হে সুন্দরি, যাহাদের পাতিব্রত্য স্থির, এমন রমণীদিগেরও নীবিবন্ধের অর্গলছেদন-কার্য্যে কৌতুকী তাঁহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ দেখিতেন, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি। তিনি দেখিতেন, দুগ্ধমুখ বালক। নন্দ মহারাজাও সেইরূপ দেখিতেন। কেবল নন্দ যশোদা রোহিণী নহেন, তাঁহাদের যাঁহারা 'গণ' অর্থাৎ তুল্যাধিকারী বা একভাবের ভাবুক, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ঐভাবে দেখেন। কিন্তু ললিতা অন্যভাবে দেখিয়া থাকেন। ললিতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'নব্যযুবা' দেখিয়া থাকেন। সখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপের অন্যপ্রকার আকর্ষণ। তাই ললিতা পূর্ব্বপ্রকারের কথা বলিলেন। ললিতা যাহা বলিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা বহুস্থানেই কথিত হইয়াছে ;—যথা—

কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, তা'-সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে হেন লক্ষ্মীগণ॥

অন্যত্র—

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে, সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে, ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিগে ধায়, অণ্ডভেদি বৈকুণ্ঠে যায়, জগতের বলে পৈশে কাণে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি, বিশেষত যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত, পতিকোল হৈতে কাঢ়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে॥
নীবি খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে, বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে।
লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়, ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্ফুরে, অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন্ বুলিতে বোলায় আন্, এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥

ব্রজগোপীর ভাবে হৃদয় ভাবিত করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলি আস্বাদন করিতে হইবে। তাহা না করিলে ঐ কথাগুলির তাৎপর্য্য বা রস, কেবল যে বুঝিতে বা আস্বাদন করিতে পারিব না, তাহা নহে, বিপরীত বুঝিয়া ফেলিব। ভাব-রাজ্যের কথা, আগে ভাব, পরে রস ; অতএব—সাধু, সাবধান।

শ্রীবৃন্দাবন পঞ্চভাবের খেলা। প্রথম ভাবের নাম শান্তভাব। ইহার দুইটি গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ। "শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।" সেখানে কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান হয়, ভক্ত কৃষ্ণকে প্রধানতঃ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে দেখেন। দাস্যভাবে ভক্ত কৃষ্ণকে পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রভুরূপে দর্শন করেন। সেখানে প্রচুর পরিমাণে সম্ভ্রমের ও গৌরবের বোধ হইয়া থাকে। শান্তভাবের গুণগুলি দাস্যভাবে আছে, তাহা ছাড়া শান্ত অপেক্ষা দাস্যে একটি গুণ অধিক। তাহার নাম 'সেবন' বা সেবা। তৃতীয় ভাবের নাম সখ্য, ইহাতে শান্ত ও দাস্যের গুণ আছে; তাহা ছাড়া একটি নূতন গুণ আছে—

"দাস্যে সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।" সখ্যেও সেবা আছে, কিন্তু এ সেবা অন্যরূপ।

কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ। কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য,—গৌরবসম্ভ্রমহীন। অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন॥
মমতা-অধিক কৃষ্ণে—আত্মসম জ্ঞান। অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্।

বাৎসল্যে, শান্ত, দাস্য ও সখ্য, এই তিনের গুণ ও লক্ষণগুলি আছে। তাহা ছাড়া একটি গুণ আছে; তাহার নাম পালন। অসঙ্কোচ ও অগৌরব সখ্যের গুণ, বাৎসল্যেও ইহা আছে, কিন্তু বাৎসল্যে মমতা অধিক। মমতা অধিক বলিয়া বাৎসল্যে "তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার"।

আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান। চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান॥

তাহার পর মধুর, ইহাই চরম ও পরম। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের সমুদয় গুণ ও লক্ষণগুলি বিদ্যমান। তাহা ছাড়া ইহার একটি নিজের গুণ আছে।

কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ॥

এই পঞ্চভাব ও ভাবানুযায়ী রসাস্বাদন চিন্তা না করিলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বুঝিতে পারা যাইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন। ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে। কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥

এই কারণেই আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিলাম। এইবার মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

শ্রীরাধা, ললিতা ও কুন্দলতা, বকুলকাননে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের নাম করিলেন, ললিতা শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিলেন। শ্রীরাধা অশ্রুমোচন করিয়া ললিতাকে বলিলেন—সখি, তুমি যাহার নাম শুনাইলে, আমি কি একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব? কুন্দলতা বলিলেন—সখি তুমি তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছ, গতকল্য সন্ধ্যাকালে বিশাখা তোমাকে তাঁহার সহিত মিলিত করিয়াছিল।

শ্রীরাধার অবস্থা এই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যতই দেখা হউক, যতই মিলন হউক না কেন, তাঁহার সকল সময়েই মনে হয়, দেখা হইল না। কাজেই কুন্দলতার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন,—প্রিয় সখি, ভাল কথা মনে পাড়াইয়া দিলে, তোমাদের গোকুল-যুবরাজ, বিদ্যুৎবিলাসের মত, শুধু একবার অতি অল্পক্ষণের জন্য এই অভাগিনীর নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিলেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। তিনি প্রথমে ললিতার কঙ্কণধ্বনি, তাহার পর শ্রীরাধার কিঙ্কিনীধ্বনি শুনিয়াছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দূরে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিত দীর্ঘাপাঙ্গ-টঙ্ক চ্ছটাভি।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥

[এই শ্লোকটি পরিভাবনা-নামক মুখসন্ধির অঙ্গ। শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনা]

শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধ্য ও সৌন্দর্য্যাদি গুণ দর্শন করিয়া শ্রীরাধা চমৎকৃত হইয়া বলিতেছেন, সুমুখি, সম্মুখে এ কোন্ বিশ্বকর্ম্মা! ইনি আপনার সুশাণিত ও দীর্ঘ-কটাক্ষরূপ টঙ্ক বা পাষাণ দারণ-যন্ত্রের দ্বারা কুলললনাগণের ধর্ম্মসমূহ ভেদন করিতেছেন, আর আপনার মরকতমণির ন্যায় শ্যামল সৌন্দর্য্যের দ্বারা গোষ্ঠ প্রদেশের সজ্জা করিতেছেন।

ললিতা বলিলেন,—সখি, ইনিই তোমার প্রাণনাথ। শ্রীরাধা উন্মাদসহকারে বলিতেছেন,—

এষ কিমু গোপিকা-কুমুদিনী-সুধাদীধিতিঃ
স এষ কিমু গোকুল স্ফুরিত যৌবরাজ্যোৎসবঃ।
স এষ কিমু মন্মনঃ- পিকবিনোদপুষ্পাকরঃ
কৃশোদরিদৃশোদ্বয়ীমমৃতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ॥

সখি, ইনি কি সেই গোপীকুমুদিনী-বিকাশক সুধাদীধিতি চন্দ্র ? ইনি কি সেই গোকুলের যৌবরাজ্যোৎসবের স্ফুরণকারী ? ইনি কি সেই আমার মানসকোকিলের আনন্দদায়ক বসন্ত ? হে কৃশোদরি, ইনি আমার চক্ষুদুটিকে অমৃতরসে সিঞ্চিত করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া চিন্তা করিতেছেন—

অসকৃদসকৃদেষা কা চমৎকারবিদ্যা
মম রসলহরীভিস্তর্ষমন্তস্তনোতি।
বিদিতমহহ সেয়ং ব্যায়তাপাঙ্গলীলা-
মধুরিমপরিবাহা কাপি কল্যাণ-বাপী ॥

এ কোন্ চমৎকারিণী বিদ্যা ? যিনি বারম্বার রসতরঙ্গদ্বারা অন্তরে অভিলাষ বাড়াইয়া দিতেছেন ? বুঝিলাম, ইনি বিস্তৃত অপাঙ্গ-লীলার মাধুরী-উচ্ছাস-ময়ী কল্যাণ-দীর্ঘিকা।

শ্রীরাধার প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিয়া, যেন ভাল করিয়া তত্ত্ব নিরূপণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—সত্যই ত—

যস্যাং শৈবলমঞ্জরী বিরচিতা সঙ্গং রথাঙ্গদ্বয়ং
ফুল্লং পঙ্কজ-পঞ্চকঞ্চ বিসয়োর্যুগ্মং চ মূলেন তং।
উন্মীলত্যতি চঞ্চলঞ্চ শফরীদ্বন্দং ব্রজে ভ্রাজতে
সেয়ং শুদ্ধতরাঽনুরাগ পয়সা পূর্ণা পুরোদীর্ঘিকা ॥

লোমাবলী শৈবালস্বরূপ ; কুচযুগল চক্রবাকমিথুন ; হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ, এই পাঁচটি পদ্ম, বাহুদুইটি মৃণালযুগলের সদৃশ ; চক্ষুদুইটি চঞ্চল মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সম্মুখবর্ত্তী ঐ দীর্ঘিকা শুদ্ধতর অনুরাগবারিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ব্রজপুরে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন—সখি, আমার শরীর ঘুরিতেছে; আমাকে হাত দিয়া ধর।

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়া শ্রীরাধার রূপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন,—সখি, আমায় রক্ষা কর। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে তাঁহার (শ্রীরাধার) অপাঙ্গের প্রভাব বলিতেছেন। শ্রীরাধা গদ্গদস্বরে কুন্দলতাকে বলিতেছেন,—কুন্দলতে, এই সুন্দরশেখরকে নিবারণ কর, আমি হতভাগিনী, আমাকে সর্ব্বদা গুরুজনের অধীনে থাকিতে হয়।

এমন সময়ে জটিলা আসিয়া উপস্থিত। জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—ওরে তুই মনমোহন, গোকুলের কুলবালাদের তুই ধর্ম্মপথ হইতে পতিত করিয়াছিস্। আমার পুত্রের পুণ্যবলে কেবল এই বধূটি বাকি আছে।

শ্রীরাধার হস্ত ধারণ করিয়া ললিতা ও কুন্দলতা জটিলার সহিত প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আর কি করিবেন? প্রিয়তমা চলিয়া গেলেন, কাজেই তিনিও গো-সকলকে একত্র করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

৯। শঙ্খচূড়বধ

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। গোকুলের নারীগণ দধিমন্থন করিতেছে। তাহার শব্দ দেবগণকে সমুদ্রমন্থন স্মরণ করাইতেছে। পালী নামক গোপী অতিশয় দুঃখিতচিত্তে মাথা নত করিয়া, মুখ আবরণ করিয়া চকিতভাবে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে গমন করিতেছে। শ্যামলা শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বর পরিধান করিয়াছে, তাহার গলায় শ্রীকৃষ্ণের গলার হার, কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাহার গণ্ডদেশে যে পত্রাবলী আঁকিয়া দিয়াছেন, সেই পত্রাবলী তাহার গণ্ডদেশে রহিয়াছে, এই অবস্থায় সে স্বাধীন-ভর্তৃকার ভাবে গোকুলে গমন করিতেছে। পদ্মার অবস্থা বড় মলিন; তাহার কবরী শিথিল হয় নাই, বিম্বাধরের রাগ উজ্জ্বল দেখাইতেছে, তিলক যেমন তেমনই রহিয়াছে, মুখ অতিশয় মলিন, অঙ্গ অলস, পদ্মা বিপ্রলব্ধা হইয়া গৃহে গমন করিতেছে। পদ্মার সখী-সকল শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছে। বৃন্দাদেবী এই সমুদয় দেখিতেছেন। ভগবতী পৌর্ণমাসী আসিতেছেন। আপন মনে বলিতে বলিতে আসিতেছেন—

অহমুল্মুখপুঞ্জধর্ম্মিণা হৃদি চিন্তানিচয়েন চর্চ্চিতা।
ভুবি হন্ত নিবিশ্য জাগ্রতী কথমপ্যক্ষয়ং ক্ষপামিমাং ॥

আমি হৃদয়ের মধ্যে অঙ্গারসমূহের ন্যায় দুশ্চিন্তারাশি ধারণ করিয়া ভূমিশয্যায় জাগ্রত অবস্থায় অতিশয় কষ্টে এই রাত্রি যাপন করিলাম!

বৃন্দাদেবী তাঁহার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার এই দুশ্চিন্তার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রিবর উদ্ধব মথুরা হইতে আসিয়া পৌর্ণমাসী দেবীকে এক ভয়াবহ সংবাদ দিয়া গিয়াছেন। ভোজবংশের কুলাঙ্গার দুষ্টভূপতি কংস পূতনাকে নন্দগোকুলে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন তাহার নিকট সংবাদ গিয়াছে, এক দিব্যবালক পূতনাকে সংহার করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া কংস, বৃষাসুর ও কেশীদানবকে বলিয়াছে, দেখ লোকপরম্পরায় শুনিলাম সেই বালক দুইটি গোকুলে বাস করিতেছে। গোকুলের এখন নাম হইয়াছে বৃন্দাবন। তোমরা সেখানে গিয়া সমুদয় তত্ত্ব জানিয়া আসিবে। কেশী আসিয়া সমুদয় দেখিয়া কংসকে গিয়া খবর দিয়াছে। শ্রীরাধাকে অপহরণ করিবার জন্য কংস গোকুল অবরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে বৃষাসুর গিয়া সংবাদ দিল, শ্রীরাধার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে কংস আর গোকুল অবরোধ করিল না। এখন কংস তাহার পরম সুহৃৎ শঙ্খচূড়কে কুমারী-হরণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছে।

বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কুন্দলতা আসিয়া উপস্থিত। কুন্দলতা ভীতিসহকারে পৌর্ণমাসীকে জানাইল বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছে। গোবর্দ্ধন মল্লের বাড়ীর নিকটে সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া বৃন্দা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আর চিন্তা নাই, শ্রীরাধা ভক্তিসহকারে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন, সেই আরাধনায় তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব আসিয়াছেন। সূর্য্যদেব শ্রীরাধাকে রক্ষা করিবেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন—কুন্দলতা যাহা দেখিয়াছে, তাহা সূর্য্য নহে। কংসের মিত্র সেই যক্ষই আসিয়াছে। যক্ষের এই তেজঃ স্বাভাবিক নহে, সাংক্রেমিক। শঙ্খচূড় কুবেরের কোষাধ্যক্ষ ছিল, সে একটি মহামণি চুরি করিয়াছে। পৌর্ণমাসীর কথায় সকলেই চিন্তিত হইলেন। আজ শ্রীরাধার সূর্য্যপূজার দিন, তিনি অনেকক্ষণ মণ্ডপে গমন করিয়াছেন। বিপদের সম্ভাবনা, এখন

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। সেই উপায় করিবার জন্য তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলেন।

ললিতমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ইহাই বিষ্কম্ভক অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের সূচনা।

এইবার প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইতেছে। জটিলা, ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতির সহিত শ্রীরাধা আসিতেছেন। কুন্দলতার সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। শ্রীরাধার একই ভাব; তিনি মনে মনে বলিতেছেন, হৃদয়, তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না—প্রিয়দর্শন অতি দুর্ঘট। কুন্দলতা, শ্রীরাধাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া মৃদুস্বরে আশ্বাস দিলেন, বলিলেন, মিলনের সুসময় উপস্থিত, চিন্তা করিও না। জটিলা অতিশয় সাবধান, তাঁহার সর্ব্বদাই ভয়, কৃষ্ণ কখন আসিয়া পড়ে। কাজেই তিনি কুন্দলতাকে বলিলেন—রাধে, রাধে, বলিও না। ঐ নাম উচ্চারণ করিলে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইবে। কুন্দলতা ঈষৎ হাস্য করিয়া জটিলার কথা স্বীকার করিলেন। জটিলা চলিয়া গেলেন। সূর্য্যের পূজা হইবে, পূজার মণ্ডপ লেপন করিবার জন্য জটিলা অগ্রে চলিয়া গেলেন। অবসর পাইয়া শ্রীরাধা কুন্দলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কুন্দলতে, তোমার দেবর দুর্ল্লভদর্শন শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায় ক্রীড়া করিতেছেন? কুন্দলতা বলিলেন,—তুমি সকল সময়েই তাঁহার সহিত বিহার করিতেছ, তথাপি এত উৎকণ্ঠিত কেন?

শ্রীরাধা বলিলেন—সখি, কেন উপহাস করিতেছ? তোমরাই ধন্য; কারণ, সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছ। আমার এমনই অবস্থা যে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করাও আমার পক্ষে সাতিশয় দুর্ল্লভ।

জটিলার মণ্ডপ-লেপন শেষ হইল। ললিতা শ্রীরাধাকে মণ্ডপে লইয়া গেলেন। উভয়ে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিলেন। পূজা করাইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণের দরকার। জটিলা কুন্দলতার উপর ব্রাহ্মণ আনিবার ভার দিয়াছেন। মধুমঙ্গল ও কুন্দলতার সহিত বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিতেছেন—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।

উরোম্বরতটস্য চাভরণ চারু-তারাবলী
ময়োন্নত মনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥

আমার মনোরূপ করীন্দ্রের বিহারের জন্য গঙ্গার ন্যায়, আমার লোচন-চকোর-যুগলের শরৎকালীন অমন্দ চন্দ্র-প্রভাস্বরূপ, আমার বক্ষঃরূপ গগন-তটের আভরণস্বরূপ মনোহর তারাবলী বা হারস্বরূপ, আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীরাধিকা ভাবিতেছেন, এই শ্যামবর্ণ নবীন যুবক কে, ইনি কোথা হইতে বৃন্দাবনে আসিলেন? ইঁহাকে দেখিয়া আমি অধীর হইলাম! ললিতে, ধিক্, ধিক্, কি প্রমাদ, ব্রহ্মচারিকে দেখিয়া আমার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইতেছে, আমার যে পাপ হইতেছে! এই মহা-পাপের জন্য জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

আবার ভাল করিয়া দেখিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া ললিতাকে বলিতেছেন—সখি, ইনি স্বয়ং হরি। ব্রাহ্মণ-বেশ ধরিয়া আসিয়াছেন, নতুবা আমার অন্তরাত্মা বিগলিত হইত না। চন্দ্রের কিরণ ব্যতীত চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয় না।

কুন্দলতা, মধুমঙ্গল ও ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া জটিলার নিকট উপস্থিত করিলেন ও বলিলেন—এই দুইটি ব্রাহ্মণ আনিয়াছি, ইঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ। জটিলা মধুমঙ্গলকে বেশ ভাল করিয়াই জানেন, আর মধুমঙ্গলও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি জটিলাকে বলিলেন,—জটিলে, আমি সূর্য্যপূজায় সুপণ্ডিত। শীঘ্র খণ্ডলড্ডুক লইয়া আইস।

মধুমঙ্গলকে দেখিয়া জটিলার বিরক্তির সীমা নাই। জটিলা বলিলেন—তুই কে, চঞ্চল ব্রাহ্মণ। তুই যে কৃষ্ণের সহচর! দূর হ'। ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া জটিলা বলিলেন—এই ব্রাহ্মণবালকটি বেশ, সৌম্য মূর্ত্তি ও শ্যামবর্ণ; ইনিই বধূকে পূজা করাইবেন।

ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ জটিলাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন—গোপরাজনন্দন বড়ই দুর্শীল, আর এই ব্রাহ্মণবালক তাহার সখা, অতএব ইহাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই উচিত। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ জটিলার নিকট শ্রীরাধার নাম জানিয়া লইয়া শ্রীরাধার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে পূজার মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। মন্ত্র শুনিয়া জটিলা খুব খুসী হইলেন। মধুমঙ্গল জটিলাকে

বলিলেন, এই মন্ত্র কোথাকার মন্ত্র জান? ইহা, কৌসুমেষবী শাখার তৃতীয়বর্গের ললনা-শুভকারী মন্ত্র।

ইহার পর কুন্দলতার কথামত জটিলা মধুমঙ্গলকে ভোজন করাইবার জন্য লইয়া গেলেন। কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। কুন্দলতার কথায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন। এদিকে মুখরা আসিয়া উপস্থিত। মুখরার ভিতরে একরূপ বাহিরে একরূপ। মুখরা শ্রীরাধামাধবকে একত্র দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে তর্জ্জন করিতেছে। মুখরার কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ লুক্কায়িত হইলেন, আর মুখরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। শঙ্খচূড় গোপনে লুকাইয়াছিল, অবসর পাইয়া রত্নসিংহাসনসহ শ্রীরাধাকে মাথায় করিয়া লইয়া পলায়ন করিল। সকলে কাতরতার সহিত কাঁদিয়া উঠিল—হা কৃষ্ণ, তুমি কোথায়? মুখরা কাঁদিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও যক্ষকে বিনাশ করিলেন। সখাগণ-সঙ্গে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্খচূড়ের মাথার মণি কাড়িয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দিয়াছিলেন, বলরাম আবার মধুমঙ্গলের দ্বারা ঐ মণি শ্রীরাধিকাকে দিলেন।

১০। উন্মত্ত রাধিক

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৃষাসুর ও কেশী নিহত হইয়াছে। এখন কংস গান্দিনীনন্দন অক্রূরকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছে। রথ লইয়া অক্রূর আসিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত। কংসের আজ্ঞায় অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবে।

পৌর্ণমাসী দেবী বড়ই ব্যথিত ও কাতরহৃদয়ে বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন। বৃন্দার দুঃখের সীমা নাই। বৃন্দা বলিলেন—

বনভুবি নবকুঞ্জং কস্য হেতোর্বিধাস্যে
কৃত-রুচিরচয়িষ্যাম্যত্র বা পুষ্পতল্পং।
সুরভিমসময়ে বা বল্লিমুৎফুল্লয়িষ্যে
যদি নয়তি মুকুন্দং গান্দিনেয়ঃ পুরায়॥

গান্দিনী-নন্দন অক্রূর যদি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরাপুরে লইয়া যায়, তাহা হইলে আর কাহার

জন্য বনভূমিতে নূতন কুঞ্জের ব্যবস্থা করিব ? কাহার জন্যই বা আর সেই কুঞ্জে মনোহর পুষ্পশয্যা রচনা করিব। অসময়ে সুরভিময়ী লতাকে প্রফুল্লিত করিয়াই বা কি করিব ?

ব্রজাঙ্গনাগণ রোদন করিতেছে, অক্রূরের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। সারা-রাত্রি তাহাদের একেবারেই নিদ্রা হয় নাই। যশোদার বুদ্ধি একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, নিরন্তর রোদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, যাত্রার মঙ্গলাচরণ করিতে হইবে, সঙ্গে পাথেয় দিতে হইবে, কিন্তু যশোদার সেদিকে জ্ঞান নাই। শৈব্যা, শ্যামলা, ভদ্রা প্রভৃতি গোপীগণ জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদময়ী উদঘূর্ণা-দশা উপস্থিত ; তিনি অসম্বন্ধ প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি রথের উপর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, আর তাঁহার দেহ স্খলিত হইতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, কদম্ববৃক্ষসকল নৃত্য করিতেছে। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, সখি রাধে বিষণ্ণা হইও না, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করার এই প্রারম্ভমাত্র, এখনও অনেক বাকি আছে। শ্রীরাধা একবার মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, আবার ক্ষণকাল চীৎকার করিতে করিতে রথের অগ্রে গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন, ক্ষণকাল পরে উঠিয়া বাস্পাকুললোচনে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিতেছেন। শ্রীরাধা পূর্ব্বে প্রিয় সখীগণের সমক্ষে কখনও প্রকাশ্যভাবে ও স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিতে পারিতেন না, সেই শ্রীরাধা আজ গুরুজনের অগ্রেও লজ্জা ত্যাগ করিয়াছেন, বিস্ফারিতনেত্রে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল নিরীক্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও অশ্রুবিন্দু মোচন করিতেছেন। যেরূপ ব্যাপার, তাহাতে মনে হয় ব্রজগোপীগণ প্রাণত্যাগ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে আশ্বাস দিতেছেন, আবার ফিরিয়া অসিব, আবার মিলন হইবে। ভৃঙ্গগণ মকরন্দ পান করিতেছে না, ময়ূরসকল নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, চক্রবাকেরা স্বীয় রমণীগণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা পর্যান্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। ধীরপ্রকৃতি শ্রীরাধা অতিশয় অধীরা হইয়াছেন, একবার সম্মুখে দৌড়িয়া যাইতেছেন, একবার স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছেন, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন প্রলাপ আবার কখন বা মৌনাবলম্বন করিতেছেন।

শ্রীরাধার উক্তি—

ক নন্দকুলচন্দ্রমা ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্র-মুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।

ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব নু সখি মম জীবরক্ষৌষধি
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং ॥

সখি, নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? ময়ূরপুচ্ছভূষণ কোথায়? সেই মধুর মুরলীরব কোথায়? যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ, তিনি কোথায়? সেই রাসরসের নাটুয়া কোথায়? তিনি যে আমার জীবন রক্ষার ওষধিস্বরূপ, তিনি কোথায়? তিনি আমার সুহৃত্তম, তিনি আমার অমূল্য রত্ন, তিনি কোথায়? হায় বিধি, তোমাকেই ধিক্।

এই শ্লোকটির অতিমধুর ও গভীর আস্বাদন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু, জন্মি কৈলা জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে, ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন। ক্ষণেক যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত করি দান। প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥ কাহাঁ সে চূড়ার ঠাম, শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু। পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥ একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা। নারীর মনে পৈশে যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসমকান্তি,
যেই কান্তি জগত মাতায়। শৃঙ্গাররস ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি,
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্র-গর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার। উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥ মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি, তোর তেঁহো সুহৃত্তম। দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ সেই জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক। বিধির করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥

পূর্ব্বোক্ত অংশ তৃতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের আংশিক সূচনা।

এইবার প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইতেছে। ললিতা ও বিশাখা সান্ত্বনা দিতেছেন, আর শ্রীরাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। শ্রীরাধার উক্তি—

নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্মভণিতি-
র্ন দৃষ্টা নিঃশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ।
হরের্বক্ষঃ-পীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ-
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্মম মনঃ॥

সুমুখি, আমি স্বাধীনভাবে প্রাণভরিয়া (স্বৈরং) কর্ণপুটের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্য-সকল শ্রবণ করি নাই, নির্ভয়ে তাঁহার মুখকমলের মনোহর কান্তি সন্দর্শন করি নাই, তাঁহার বিশাল বক্ষঃ আমা-কর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হয় নাই, সখি, এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার মন ও অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

বিশাখা শ্রীরাধাকে বুঝাইতেছেন, সখি, শ্রীকৃষ্ণ আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন, কেন তুমি অধীর হইতেছ? কিন্তু একথা কে শোনে? তাহার পর শ্রীরাধার উন্মাদ। এই অবস্থা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় একবার চক্রবাকীকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বায়সকে বলিতেছেন, তুমি যাও, শ্রীকৃষ্ণকে আমার কথা নিবেদন কর, শারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কি শত্রুসংহারকার্য্য শেষ হইয়াছে, তিনি কি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন? হায়! এখন সে বংশীগানামৃত কোথায়? সে পরিহাসভঙ্গীই বা কোথায়? আমি কি করিয়া ধৈর্য্যধারণ করি? আমার প্রাণনাথই বা কোথায়? ললিতা সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন, সখি, এসব কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণ আমোদ করিবার জন্য এই মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কি কখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে পারেন? অতএব চল অন্য কুঞ্জে আমরা তাঁহার অন্বেষণ করি। নিশ্চয়ই ধরিতে পারিব।

হরিণীগণকে দেখিয়া শ্রীরাধা সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? ময়ুরিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কুটিলতা ত্যাগ করিয়া সত্য করিয়া বল, শিখিপিঞ্ছমৌলি কোন্ কুঞ্জে লুকাইয়া রহিয়াছেন? গুঞ্জামালা আঘ্রাণ করিয়া কাঁপিতেছেন, যেন চন্দ্রাবলীকে দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পর্ব্বতের গুহায় তাঁহার নিজের কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে,

প্রতিধ্বনি শুনিয়া বলিতেছেন—একি চন্দ্রাবলী রোদন করিতে করিতে আমাকেই যে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্ফটিকশিলায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে হইতেছে, বুঝি চন্দ্রাবলী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মোহের সহিত চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। বিদ্যুৎশোভিত-মেঘ পর্ব্বতগাত্রে শোভা পাইতেছে, দেখিয়া মনে হইতেছে—ঐ কৃষ্ণ। শ্রীরাধার পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হইতেছে। পদ্মদলের দ্বারা বীজন করিয়া সখীরা চেতন করাইতেছেন। চেতন হইয়া শ্রীরাধা মনে করিতেছেন--তিনি ললিতা, আর নিকটে উপবিষ্টা ললিতাই শ্রীরাধা। তাই ললিতাকে বলিতেছেন—সখি রাধে, মিথ্যা মান পরিত্যাগ কর। ললিতা অবস্থা দেখিয়া মাথা নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। শ্রীরাধা পুনরায় ললিতাকে রাধা জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন—সখি রাধে, তোমার পদশব্দ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। তুমি কেন অকারণ মানময়ী হইয়া রহিয়াছ ? এই বলিয়া ললিতার চরণে ধরিয়া বলিতেছেন—

মুকুন্দোঽয়ং কুন্দোজ্জ্বলপরিসরং কুঞ্জময়তে
লতালী চ স্মেরা মধুপবিরুতৈস্ত্বাং ত্বরয়তি।
ততস্তিষ্ঠোন্মত্তে ন তুদ পদলগ্নাং সহচরীং
দুরাপস্তে মৌগ্ধ্যাদ্বিরমতি বরীয়ানবসরঃ॥

সখি! মুকুন্দ, কুন্দকুঞ্জে গমন করিতেছেন, লতাসকল হাস্যবদনে মধুকর-ঝঙ্কার-ধ্বনি দ্বারা তোমাকে ত্বরান্বিত হইবার জন্য বলিতেছে। অতএব হে উন্মত্তে! গাত্রোত্থান কর, চরণে পতিতা সহচরীকে আর ব্যথিত করিও না, তোমার মুগ্ধতার জন্য দুর্ল্লভ উৎকৃষ্ট অবসর ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে!

তাহার পর শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখার সহিত পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মল্লিকা-কলিকা-সকল স্খলিত হইতেছে, কদম্বমঞ্জুরি-সকল চতুর্দ্দিকে ত্রুটিত হইতেছে, জাতিপুষ্পসকল শ্যামকান্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রীহরির বৃন্দাবনে সকল দিকেই দুর্গতি উপস্থিত! মহাদাবানলের জ্বালায় বনস্থলী যেন দগ্ধ হইতেছে। আবার শ্রীরাধার মনে হইতেছে, দূরে যেন গোমণ্ডলী দেখা যাইতেছে, তবে গোপেন্দ্র-নন্দন আসিতেছেন—আর অধিক দূরে নহে। আবার দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের ধেনুগণ সম্মুখের তৃণ ভোজন করিতেছে না; বৎসগুলি নিকটে আসিতেছে, কিন্তু ধেনুগণ তাহাদের লেহন

করিতেছে না, কেবল হাম্বারবে কাঁদিতেছে। শ্রীরাধা যমুনা-পুলিনে লুণ্ঠিতা হইয়া বলিতেছেন—এই সেই যমুনা-পুলিন, পদ্মবদন, তুমি কোথায়? আবার মূর্চ্ছা হইল। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য তাঁহার নাসিকাগ্রে ধারণ করিলেন, বহুক্ষণ পরে চৈতন্য হইল। চেতনা পাইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—"সখি স্বপ্নে দেখিলাম এক দুরাত্মা রাজদূত বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রথে তুলিয়া—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। বলিলেন—'চল সখি, দুঃস্বপ্ন-জনিত পাপক্ষয়ের জন্য যমুনায় স্নান করিব, তাহার পর মুকুন্দকে দর্শন করিব।'

বিশাখা বলিলেন—সখি চল আমরা কালিয়হ্রদে খেলাতীর্থে যাই, মুকুন্দ সর্ব্বদাই সেখানে খেলা করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তাঁহারা সকলেই প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর কি হইল তাহা মুখরা ও বৃন্দার কথোপকথন হইতে আমরা জানিতে পারিব। শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখা, খেলাতীর্থে কালিন্দী-হ্রদে গমন করিলেন, তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ নীলপদ্মের বনে সাঁতার কাটিয়া খেলা করিতেছেন। বিশাখা ও শ্রীরাধা সেই জলে অবতরণ করিলেন, আর উঠিলেন না। ললিতা এই দৃশ্য দেখিয়া জলে নামিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে মুখরা ও বৃন্দা গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ললিতা জলে নামিতে পারিলেন না, কিন্তু মুখরা ও বৃন্দা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না।

আকাশে দৈববাণী হইল, শ্রীরাধার মহিমারাশি কে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে, সেই নবতড়িদ্বিলাসিনী গোপসুন্দরী আজ সখীর সহিত মুনীন্দ্রকুলদুর্ল্লভ সূর্য্যমণ্ডলকেও ভেদ করিলেন। তাহার পর আবার আকাশবাণী হইল, শ্রীরাধার জীবন-স্বরূপ দাড়িম্ব-দশনা ললিত পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইলেন। বৃন্দা যমুনায় প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, দেববাণী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—এ কাজ করিও না। আবার প্রমোদ-সুধাদ্বারা তোমার মহোৎসব পরিপূর্ণ হইবে, আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের দেখা পাইবে।

ভূয়স্তে ভবিতা প্রমোদসুধয়া পূর্ণো মহানুদ্ভবঃ॥

ললিতামাধব নাটক দশ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম তিন অঙ্কে ব্রজলীলা, তাহার পর পুরলীলা। চতুর্থ অঙ্কে পুরলীলা আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। ভক্ত উদ্ধব দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞদিগের গুরু হইয়াও অজ্ঞের

ন্যায় ব্যবহার করেন, প্রভুসকলের চূড়ামণি অর্থাৎ পরমপ্রভু হইয়া অনেক সময়ে নিতান্ত জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময় বিগ্রহ অথচ সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইতেছেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। উদ্ধব অনুমান করেন, মুকুন্দ প্রণয়িজনের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবেন।

কংস বিনষ্ট হইয়াছে। উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন হইয়াছে। রোহিণী মথুরায় আসিয়াছেন, গার্গী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গুরুগৃহে বাস করিয়াছেন, গুরুদেব সান্দীপনিকে দক্ষিণা দিবার জন্য যমালয় হইতে তাঁহার মৃতপুত্র মধুমঙ্গলকে আনিয়া দিয়াছেন। উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। চন্দ্রাবলীকে লইয়া আসিবেন, এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। কারণ রুক্মী, তাহার সখা শিশুপালের মুখে সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রাবলীকে তাহার পূর্ব্বেই কুণ্ডিলনগরে লইয়া গিয়াছিল। শিশুপাল শ্রুতশ্রবার নিকট গোকুলের রহস্যকথা শুনিয়াছিল, শ্রুতশ্রবা আবার মথুরানগরে গার্গীর নিকট এসকল কথা শুনিয়াছিলেন। ভীষ্মকতনয় রুক্মী যখন চন্দ্রাবলীকে গোকুল হইতে লইয়া আসিল, তখন কেহই বাধা দেয় নাই। কে বাধা দিবে? শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল সবান্ধবে মথুরায় অবস্থিতি করিতেছেন। গোবর্দ্ধনমল্লও হত হইয়াছে। পদ্মা নগ্নজিৎ রাজার কন্যা, ইঁহার নাম নাগ্নজিতী; শ্যামলা মদ্ররাজের কন্যা, ইঁহার নাম মাদ্রী; ভদ্রা কেকয়রাজের কন্যা, ইঁহার নাম লক্ষ্মণা; শৈব্যা, শৈব্যরাজের কন্যা, ইঁহার নাম মিত্রবৃন্দা। নগ্নজিৎ, মদ্রেশ্বর, কেকয় ও শৈব্য, ইঁহারা নারদের মুখে সমুদয় কথা জানিতে পারিয়া গোকুলে গিয়াছিলেন এবং গোপপতিগণকে প্রসন্ন করিয়া কন্যাদের লইয়া গিয়াছেন। কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা ষোলহাজার একশত গোপকন্যা কামাখ্যাদেবীর স্তব করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রচণ্ডস্বভাব নরকাসুর বলপূর্ব্বক ঐ সমুদয় কন্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ষোলহাজার একশত আট কুমারীর মধ্যে একজনও গোকুলে নাই।

এই গেল গোকুলের সংবাদ। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার দারুণ দশা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার একেবারেই সুখ নাই। ভগবতী পৌর্ণমাসী সঙ্গীতবিদ্যার বিধাতা ভরতমুনিকে ধরিয়া এক নাটক রচনা করাইয়াছেন। তুম্বুরু গন্ধর্ব্বগণকে

ঐ বিদ্যা শিখাইয়াছেন। সেই গন্ধর্ব্বেরা ঐ নাটকের অভিনয় করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ অভিনয় দর্শন করিতেছেন, মধুমঙ্গল তাঁহার নিকটে আছেন। নাটকের বিষয় "শ্রীরাধার অভিসার"। নট ও নটীরা এমন অভিনয় করিতেছে, যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতেছেন। গোপবেশধারী অভিনেতা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিতেছেন, 'ইহাকে দেখিয়া আমার যে শ্রীরাধার সারূপ্য-লাভের ইচ্ছা হইতেছে।' শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভুলিয়া যাইতেছেন; তিনি যেন বুঝিতেই পারিতেছেন না তিনি কে, তিনি কি নট হইয়া অভিনয় করিতেছেন, না সভ্য হইয়া অভিনয় দেখিতেছেন? এদিকে অভিনয় চলিতেছে। শ্রীরাধার বিরহে ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইয়া ললিতাকে আহ্বান করিতেছেন। ললিতার সহিত শ্রীরাধা আসিতেছেন। অভিনেত্রী-শ্রীরাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমনই ব্যাকুল হইয়াছেন, যে আসন হইতে উঠিয়া উৎকণ্ঠার সহিত আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিলেন। মুখরাও অভিনয় দেখিতেছেন। অভিনেত্রী শ্রীরাধাকে দেখিয়া তিনিও আত্মহারা হইয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছেন; ভগবতী পৌর্ণমাসী মুখরাকে নিবারণ করিলেন। মুখরা বলিতেছেন—দৈববাণীতে শুনিয়াছি, শ্রীরাধা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আমার বোধ হয় গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে সেই লোকান্তর হইতে লইয়া আসিয়াছে। অভিনয় চলিতেছে। শ্রীরাধা ললিতার সহিত বাহিরে আসিয়াছেন, ইহা জটিলা ও মুখরা উভয়েই জানিতে পারিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা অনাবৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া কদম্ব-বৃক্ষাচ্ছন্ন যমুনাতীরের পথ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতেছেন। পদচিহ্ন দেখিয়া জটিলাও আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ অভিসারিকা শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইয়াছেন, আর মিলনের বিলম্ব নাই, এমন সময়ে জটিলা আসিয়া উপস্থিত। জটিলা আসিয়া ললিতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ললিতা বলিলেন, গার্গী বলিয়া দিয়াছেন, আজ বড় শুভদিন, আজ যাদ মাধবীপুষ্পের দ্বারা সূর্য্যের পূজা করা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যদেব এককোটি গাভী দান করিবেন। আমি সেইজন্য শ্রীরাধাকে মাধবীমণ্ডপে লইয়া যাইতেছি। আজ যে অভিসারের অভিনয় হইল, তাহার বিষয়টি এই। জটিলা ফিরিয়া আসিতে আসিতে বৃন্দাদেবীর কৌশলে শারিকার মুখে শুনিয়া আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁহার পুত্র অভি-

মন্যুর বেশ ধারণ করিয়া জটিলার গৃহে যাইবেন। এই কথা শুনিয়া জটিলা অতিশয় সতর্ক হইয়া থাকিলেন। এদিকে সত্যই জটিলার পুত্র অভিমন্যু প্রয়োজনবশতঃ গৃহে আসিয়াছেন। জটিলা ভাবিলেন, এই ত শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যুর সাজে সাজিয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে আসিয়াছে। তিনি তাহাকে ধরিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণের অশিষ্টতা দেখাইবার জন্য লোক ডাকিতে লাগিলেন। অভিমন্যু বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। শেষে জটিলা যখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলেন, তখন আর তাঁহার লজ্জার সীমা নাই। এদিকে কুন্দলতা আসিয়া অভিমন্যুকে বুঝাইয়া দিলেন—শ্রীরাধা অতিশয় পুণ্যবতী, সরলা, সত্যবাদিনী ও স্নিগ্ধা ; আর, জটিলার উন্মাদরোগ হইয়াছে। অভিমন্যু তাহাই বুঝিলেন। তিনি গরু কিনিবার জন্য স্বর্ণ লইতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। কাজ সারিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর সাজে সাজিয়া জটিলার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। জটিলা আর কোন আপত্তিই করিলেন না, তাঁহার সহিত চৈত্যবৃক্ষের মূলে যাইতে অনুরোধ করিলেন। নিরাপদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।

১১। চন্দ্রাবলী-লাভ

তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে শ্রীরাধার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এখন চন্দ্রাবলীর চরিত্র অর্থাৎ রুক্মিণীর বিবাহ বর্ণনা করিতেছেন।

আরও অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। কালযবন, মহাদেবের বরে মথুরাবাসিগণের অবধ্য ছিল। সে আসিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে ঐ যবনকে এক পর্ব্বতের গুহায় লইয়া গেলেন। সেই গুহায় মুচুকুন্দ রাজা ছিলেন, তাঁহার নয়নাগ্নিতে কালযবন ভস্মীভূত হইল। তাহার পর কুটিলবুদ্ধি জরাসন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ। এখন শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রতটবর্ত্তী পর্ব্বত-শালিনী দ্বারকানগরে গমন করিয়াছেন।

ব্রজলীলায় যিনি চন্দ্রাবলী তিনিই পুরলীলায় রুক্মিণী, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভীষ্মক ইহা জানিতেন। রুক্মি একথা গোপন করিতে চাহেন, এইজন্য নাম বদলাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য অঙ্কে দেবর্ষি নারদের একটি স্বগতঃ উক্তি স্মরণীয় "নন্বেতাঃ ব্রজপুররমণ্যঃ সমানতত্ত্বা অপি বিগ্রহাদিভিন্না এব, মধ্যে তু মায়য়া পরমভিন্নাঃ কৃতাঃ, সম্প্রতি ব্রজ এব, তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে, কিন্তু যোগমায়য়ৈব, বিপ্রয়োগে-

হপি প্রিয়সঙ্গসুখসঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছাদ্য পুররমণীষু স্বাঃভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্ন ইব। যাস্তূদ্ধবযান-কুরুক্ষেত্র-যাত্রয়োর্নিবৃত্তবৎ সমানচরিত্রাস্তাঃ খল্বষ্টোত্তরৈকশতষোড়শসহস্র-তস্তস্মা দন্যা এব, তদলং তদ্রহস্যোদঘাটনেন।"

একথা নিশ্চয় যে এই সমুদয় ব্রজরমণী ও পুররমণী একই, তত্ত্ব; কেবল বিগ্রহ বা দেহ-প্রভৃতিতে ভিন্ন। মধ্যে কেবল মায়া বা যোগমায়া কর্তৃক পরমভিন্না বা পৃথকীকৃতা হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রজমধ্যে সেই সকল ব্রজরমণী প্রেমে মূর্চ্ছিতা হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু যোগমায়া কর্তৃক এই বিচ্ছেদের সময়েও প্রিয়সঙ্গসুখলাভ করাইবার জন্য সেইখানেই তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া পুররমণীসকলে অভেদাভিমানদ্বারা দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করান হইতেছে। উদ্ধব-আগমনে ও কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় যেসকল ব্রজরমণীগণের কথা বলা হইবে, সেই ষোল হাজার একশত আট গোপী, তাঁহারা পৃথক, যাহা হউক এই রহস্য উদঘাটনের প্রয়োজন নাই।

ভীষ্মকের ইচ্ছা, তাঁহার কন্যাকে যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করেন। ভীষ্মকের পুত্র রুক্মির ইচ্ছা চেদিরাজ শিশুপালের সহিত ভগ্নীর বিবাহ দেন। রুক্মি একটি শ্লোক লিখিয়া তাহার ভগ্নির নিকট পাঠাইয়াছে—

প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে শিশুপালে তব যৌবনাঞ্চিতে।
নরদেববরে শ্রুতশ্রবো হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাং॥

পৌর্ণমাসী দেবী এই শ্লোকের পাঁচটি অক্ষর বদলাইয়া দিয়াছেন। শ্লোকটি হইয়াছে—

প্রণয়ো মমঘোষনন্দনে পশুপালে নবযৌবনাঞ্চিতে।
পরদেববরে শ্রুতশ্রবো হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাং॥

কাজেই শ্লোকের অর্থ একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। প্রথমে অর্থ ছিল—দমঘোষের পুত্র শিশুপাল যৌবনান্বিত, রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুণের দ্বারা স্বকীয় জননী শ্রুতশ্রবার হৃদয়ে আনন্দবিধান করিয়া থাকেন, অতএব এই শিশুপালে তোমার প্রণয় বৃদ্ধিশীলা হউক।

পৌর্ণমাসী-কর্তৃক শ্লোকের অক্ষর পাঁচটি পরিবর্তিত হওয়ার পর অর্থ দাঁড়াইল—যিনি গোপালন-তৎপর, নবযৌবন-ভূষিত, পরদেবতোত্তম, যাহার গুণ শুনিলেই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই নন্দনন্দনে আমার প্রণয় বৃদ্ধিশীল হউক।

পৌর্ণমাসী-কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত শ্লোক রুক্মি দেখিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন। শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিবার জন্য রুক্মি ক্ষত্রিয় রাজাদের নিমন্ত্রণ করিয়া কুণ্ডিনে লইয়া আসিয়াছে। এদিকে রুক্মিণী এক পত্র লিখিয়া সুনন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই পত্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এদিকে ক্রথ ও কৌশিক নামক দুইজন ভক্তরাজা শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়-সহ নটবেশে গোপনে দুর্গা-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, ইনিই সেই চন্দ্রাবলী। ভীস্মক গোপনে শ্রীকৃষ্ণের করে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বলরাম আসিলেন, বাহিরে ভীষণ যুদ্ধ হইল, বিপক্ষ ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ পরাভূত ও বিতাড়িত হইলেন।

১২। ললিতা-প্রাপ্তি—ষষ্ঠ অঙ্ক

মণিহরণ শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি অপূর্ব্ব উপাখ্যান। এই মণির নাম স্যমন্তক। যক্ষ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে মণি বলরামকে দিয়াছিলেন এবং বলরাম যে মণি মধুমঙ্গলের দ্বারা শ্রীরাধাকে দিয়াছিলেন, ইহা সেই মণি। শ্রীরাধা যমুনা-জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যমুনা সূর্য্যের কন্যা। পিতার আদেশে যমুনা শ্রীরাধাকে সূর্য্যলোকে লইয়া যান। এই মণি শ্রীরাধার সঙ্গে ছিল, তিনি এই মণি দিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করেন।

সত্রাজিৎ রাজা অপুত্রক ছিলেন, তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন। সূর্য্যদেব এই স্যমন্তক মণি ও সত্যভামা-নামা কন্যা সত্রাজিৎকে দান করেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে আদেশ করেন, নারদের আদেশানুসারে এই কন্যার বিবাহ দিও, আর এই মণিটিকে গৃহে স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ইহার পূজা করিও, এই মণি প্রত্যহ অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করিবে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইয়া সত্রাজিতের নিকট এই মণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ তাহা দেন নাই। তাহার পর সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন এই মণি লইয়া চলিয়া যায়। এক সিংহ বনমধ্যে প্রসেনকে বধ করিয়া এই মণি হস্তগত করে। ভল্লুক জাম্ববান আবার এই সিংহকে বধ করে, সুতরাং এই মণি জাম্ববানের হস্তগত হয়। শ্রীকৃষ্ণের দুর্ণাম হইল, শ্রীকৃষ্ণই মণিহরণ করিয়াছেন। সত্রাজিৎ-কর্ত্তৃক এই দুর্ণাম প্রচারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ দুর্ণাম-ক্ষালনের জন্য মণি-অন্বেষণে বনযাত্রা করেন।

শ্রীরাধা যখন যমুনায় প্রবেশ করেন, তখন বিশাখা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং বিশাখাও জলে প্রবেশ করেন। ধর্ম্মরাজের কনিষ্ঠা ভগিনীই গোকুলে বিশাখা নামে পরিচিতা ছিলেন। বিশাখা শ্রীরাধার সখী, সেই কারণে যমরাজের মাতা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাও শ্রীরাধাকে অতিশয় ভালবাসিতেছেন। সংজ্ঞার পিতা 'শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা। সংজ্ঞার প্রার্থনায় বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকায় নববৃন্দাবন রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার জন্যই এই নববৃন্দাবন রচিত হয়। সূর্য্যদেবের অপর পত্নীর নাম ছায়া, তিনি শনির জননী। তিনি শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন,—নববৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়া কি হইবে? তোমার যিনি বল্লভ, তিনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, অতএব তুমি তাঁহার সহিত সূর্য্যমণ্ডলে বাস কর। এই কথা শুনিয়া বিশাখা হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—একদিন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন, তাহাতে গোপীদের অনুরাগ কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বৃন্দাবন ও গোপেন্দ্রনন্দন-ব্যতীত গোপীদের উপায় নাই।

সত্রাজিৎ, না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক রটনা করিয়াছেন। নারদ তাহার নিকট গিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। মণিহরণের যথার্থ ব্যাপার নারদের মুখে শুনিয়া সত্রাজিৎ অনুতপ্ত। তিনি ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর উপায় নাই। নারদের আদেশে সত্রাজিতের মাতা সত্যভামা বা শ্রীরাধাকে লইয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সত্যভামাকে রুক্মিণীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধাকে স্নেহসহকারে গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ভয় হইয়াছিল। শেষে রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলী, সত্যভামা বা শ্রীরাধাকে নববৃন্দার হস্তে অর্পণ করিলেন ও নববৃন্দাবনে রাখিতে বলিয়া দিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মণি-অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ব্বতগুহায় জাম্ববানের নিকট উপস্থিত। প্রথমে ভীষণ যুদ্ধ, শেষে জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিনিলেন এবং তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন। ললিতা যখন পর্ব্বতচূড়া হইতে লম্ফপ্রদান করেন, তখন জাম্ববান্ তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন। এখন ললিতার নাম জাম্ববতী। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতিমা গড়িয়া দিবারাত্রি তাহার পূজা করেন। ললিতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইল। জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তকমণি দিলেন আর কন্যারত্ন উপহার দিলেন। ভীষ্মক রাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সর্ত্ত আছে, রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলীর অনুমতি-ব্যতীত তিনি অন্যপত্নী গ্রহণ

করিতে পারিবেন না। কাজেই রৈবতক পর্ব্বতের কন্দরে ললিতাকে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিলেন। তিনি শ্রীরাধার বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন, নববৃন্দাবন ব্যতীত তাঁহার শান্তি নাই।

১৩। নববৃন্দাবন-সঙ্গম—সপ্তম অঙ্ক

শ্রীমতী রাধিকা বা সত্যভামা সূর্য্যদেবের আদেশে দ্বারকাপুরে রাজেন্দ্র-ভবনে আসিয়াছেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন—"সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বারকাপুরীর গর্ভে যে নববৃন্দাবন নির্ম্মিত হইয়াছে তুমি সেইখানে যাও, সেখানে তুমি তোমার প্রাণনাথের সহিত বিহার করিবে।" কিন্তু তিনি দ্বারকাপতির পরিচয় কিছুই জানেন না। এখানে যে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এখানে তিনি পরাধীন। শ্রীরাধা জানেন, হরি মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন; কাজেই তিনি ভাবিতেছেন, আমি দ্বারকাপুরে অবরুদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি, কাজেই প্রিয়সঙ্গম অসম্ভব।

বকুলা ও নববৃন্দা শ্রীরাধার সেবা করিতেছেন। একদা বকুলা বলিলেন—আমাদের রাজেন্দ্র ত্রিলোক শাসন করিতেছেন, যদি আপনি আদেশ করেন তাহা হইলে আপনার কথা তাঁহার নিকট নিবেদন করি।

শ্রীরাধা বলিলেন—তোমাদের দ্বারকানাথ সকল সৌন্দর্য্যের আধার, তিনি ত্রিজগৎ শাসন করিতেছেন, করুন। তাঁহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমাকে আর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করিও না, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্ম হইতে আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী রুক্মিণীকে মাল্য ও বস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিয়াছেন। রুক্মিণীদেবী তাহা আবার সখীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। নববৃন্দা রুক্মিণীর নিকট গিয়াছিলেন শ্রীরাধা বা সত্যভামার জন্য ঐ মাল্য ও বস্ত্র লইয়া আসিয়াছেন। ঐ উপহার দেখিয়া শ্রীরাধার দুঃখ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এসকল লইয়া আমি কি করিব? নববৃন্দা বলিলেন—এসকল দ্রব্যের দ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিতে পার। কথায় কথায় নববৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিয়া ফেলিলেন—ব্রজেন্দ্রই রাজেন্দ্র। নববৃন্দা পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত ছিলেন, একথা শ্রীরাধাকে বা সত্যভামাকে বলিবেন না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া

গেলেন। শ্রীরাধা উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি সত্য? নববৃন্দা উত্তর দিলেন না। বকুলা সুযোগ পাইয়া শ্রীরাধাকে বলিল—সখি, এই জন্যই বলিতেছি, রাজেন্দ্রকে আনন্দিত কর।'

শ্রীরাধা বলিলেন—

> যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছ প্রণীতো
> হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূল-গুঞ্জাবলীভিঃ।
> বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত! চেতস্ততো মে
> রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরের্নান্যদঙ্গী-করোতি॥

যাঁহার মাথার চুলে ময়ূরের পাখা শোভা পায়, গলায় মোটা মোটা গুঞ্জাফলের হার, আর মুখে বাঁশি, সেই রূপ ছাড়া হরির অন্য অলৌকিক রূপকে আমার মন অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করে না

বকুলা বলিল—সখি তোমার বুদ্ধি বড় সরল, সেইজন্য সেই কঠোরেই অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছ।

শ্রীরাধা বলিলেন—মুগ্ধে, এমন কথা আর বলিও না—

> ঔদাসিন্য-ধুরাপরীতহৃদয়ঃ কাঠিন্যমালম্বতাং
> কামং শ্যামলসুন্দরো ময়ি সখি! স্বৈরী সহস্রং সমাঃ।
> কিন্তু ভ্রান্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভ্যঃ প্রিয়ে
> চেতো জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতা-দাস্যং নমে হাস্যতি॥

শ্যামসুন্দর স্বেচ্ছাবিলাসী, তিনি যদি আমার প্রতি হাজার বৎসর উদাসীন ও কঠিন হইয়া থাকেন, থাকুন, তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আমার দেহ, প্রাণ ও জীবন অপেক্ষাও প্রিয়, আমি ভ্রান্তিক্রমে ক্ষণকালের জন্যও সেই শ্রীকৃষ্ণে প্রণয়-দাস্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না।

এইবার শ্রীরাধা, বকুলা ও নববৃন্দার সহিত নববৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতেছেন। ঠিক একরূপ! বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ, যেমন বৃন্দাবন, তেমনি নববৃন্দাবন। সেই নিকুঞ্জকানন, সেই যমুনার তটভূমি। কিন্তু গোকুল-নাথ কৈ? শ্রীরাধার দেহ সন্তপ্ত হইয়াছে—তাঁহাকে কালিন্দী কূলে, কদম্বমূলে, নলিনী-নবদলে শয়ন করান হইল। এই সময়ে

নববৃন্দা তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—ললিতা কোথায়? শ্রীরাধা ললিতার ভৃগুপতনের কথা স্বর্গারোহণের সময় খেচরগণের নিকট শুনিয়াছেন।

শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, শ্রীরাধা তাহার পূজা করিতে গেলেন। ভ্রম হইতেছে, সত্যই শ্রীকৃষ্ণ। আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—সত্যই প্রতিমা। তাহার পর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাল্যের গন্ধ পাইলেন।

পূজা করিয়া শ্রীরাধা চলিয়া গিয়াছেন, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তিনিও শ্রীরাধা-বিরহে আত্মহারা। তিনি নিজের প্রতিমা দেখিলেন, মালা ও চন্দন দিয়া শ্রীরাধা পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও দেখিলেন। তিনি মধুমঙ্গলের দ্বারা প্রতিমাকে অন্য কুঞ্জে সরাইয়া, নিজে ঠিক্ প্রতিমার মত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সখীদ্বয়ের সহিত শ্রীরাধা আবার আসিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নববৃন্দাবনে আবার মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন-কে—এ কল্পলতিকা? ইনি যে আমার চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন! ইনি কি আমার সেই প্রাণবল্লভা রাধা? ইহাও বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ?

শ্রীরাধা আসিয়া অশ্রু-সজল-নয়নে যুক্তকরে বলিতেছেন—প্রতিবিম্ব, তোমার স্বীয় বিম্ব সেই পদ্মালোচনের কুশল ত?

শ্রীকৃষ্ণ উল্লাসের সহিত বলিতেছেন—মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে! কৃষ্ণ উপস্থিত কুশলে আছেন, কারণ এখন তুমি সেই উর্দ্ধলোকগামিনী শ্রীরাধার অনুকরণ করিয়া ইঁহার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতেছ!

শ্রীরাধা—নববৃন্দে! একি প্রতিমা বেশ মধুর কথা বলে? শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন—বিশ্বকর্ম্মার নাট্যের কি চমৎকারিতা—এই নাট্যের শ্রীরাধা ঠিক্ শ্রীরাধারই মত।

শ্রীকৃষ্ণের নয়নে অশ্রুপাত হইতেছে। শ্রীরাধা মুছাইয়া দিলেন। শ্রীরাধার অঙ্গ-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ আরও আকুল হইলেন। 'প্রতিমা যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল' শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইলেন। নববৃন্দার আদেশে বকুলা মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর পরিবারসহ চন্দ্রাবলী বা মাধবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাবলী

শেষে শ্রীকৃষ্ণের উপর কোপ প্রকাশ করিয়াই বলিয়া গেলেন—আপনি আপনার হৃদয়ঙ্গম প্রণয়িজনের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন, আমি অন্তঃপুরে যাইতেছি।

১৪। নববৃন্দাবন বিহার—অষ্টম অঙ্ক

সত্যভামাকে দেখিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম হইয়াছিল, 'ইহা সত্যভামার প্রতিমা', আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সত্যভামার ভ্রম হইয়াছিল, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা, এই যে ভ্রম, ইহা কি বিশ্বকর্ম্মার মায়া? বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন, ইহা ভ্রম না হইতেও পারে—ইহা বিচ্ছেদরূপ অনুরাগামৃতের বিলাসস্বরূপ। "বৈশ্লেষিকানুরাগামৃতবিভ্রমোঽয়ং"

শ্রীরাধাসঙ্গমকামী পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলীর প্রসন্নতালাভের জন্য নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন। সুরসৌগন্ধিক নামক অদৃষ্টচর পদ্ম আনিয়া দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা এমন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, যাহা ইন্দ্রালয়েও নির্ম্মিত হয় নাই। সত্যভামা, সূর্যদেবের সম্পর্কে বিশ্বকর্ম্মার নাতিনী; এই কারণে বিশ্বকর্ম্মা কেবল রুক্মিণীর জন্য নহে, রুক্মিণী ও সত্যভামা উভয়েরই জন্য দুই পেটিকা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলীকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বন্যবেশে নববৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমভিক্ষা করিলেন, তখন শ্রীরাধা নববৃন্দাকে বলিতেছেন—নববৃন্দে ইহা নিশ্চয়ই স্বপ্ন! নববৃন্দা শ্রীরাধাকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শোভা ও বৃন্দাবনে ষড়ঋতুর একত্র সমাগম দেখাইতেছেন। শ্রীরাধা বিষণ্ণহৃদয়ে নববৃন্দাকে বলিয়াছেন—হায় আমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ বিশাখার কথা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—প্রিয়ে আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। আমি সুরসৌগন্ধিক নামক পুষ্প আনিবার জন্য অর্জ্জুনের সহিত খাণ্ডববনে গিয়াছিলাম। গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুন সেখানে মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ দুইটি বাজপাখী আসিয়া দুইটি পাখীকে আক্রমণ করিল। নিগৃহীত পাখী দুইটির ভিতর একটি অপরটিকে বলিল, 'বন্ধু শুক! প্রাণের আশা প্রাণেই থাকিয়া গেল; শ্রীরাধার কন্দযজ্ঞে, নূতন চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও মধুর মৃণাল-খণ্ড আর আমি খাইতে পাইলাম না।' এই কথা শুনিয়া শুক

বলিল—'সখে রাজহংস, আমারও তাই, শ্রীরাধার ফলযজ্ঞে লোহিতবর্ণ নাগরঙ্গফল আর খাইতে পাইলাম না।' পাখী দুইটির এই কথোপকথন শুনিয়া আমি বাজপাখীর আক্রমণ হইতে পাখী দুইটিকে রক্ষা করিলাম। তাহার পর বেড়াইতে বেড়াইতে এক বৃদ্ধার সহিত দেখা হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কে?'

বৃদ্ধা উত্তর করিল—এই যে দীর্ঘিকা, ইহাতে সুরসৌগন্ধিক-পুষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আর এই বৃক্ষ-বাটিকায় অমৃতপূর্ণ মনোহর ফল পাখীরা আনন্দে ভোজন করিতেছে। এই সমুদয় তপস্যার দ্বারা উৎপাদিত। আমি এই দীর্ঘিকার ও বৃক্ষবাটিকার পালিকা পুলিন্দী। এই বৃক্ষবাটিকায় পক্ষিদিগের জন্য যজ্ঞ হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এই যজ্ঞ কে করিতেছে? বৃদ্ধা উত্তর করিল—'এক তপস্বিনী ব্রতধারণ করিয়া দীর্ঘকাল জলের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। সে ব্রত শেষ হইয়াছে—এখন তিনি শ্রীরাধার অভীষ্ট-সাধন-নামক এক বন্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।' আমি তপস্বিনীকে দেখিতে চাহিলাম। বৃদ্ধা আমাকে এক পর্ব্বতগুহা দেখাইয়া দিল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, পরিধানে অতি মলিন বল্কল, সর্ব্বাঙ্গে ধূলিমাখা, মাথায় জটা, এক তপস্বিনী পদ্মরাগমণির এক মালা লইয়া জপ করিতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র সেই তপস্বিনী কাতরস্বরে কাঁদিতে লাগিল—

হা গোকুলেন্দ্রনগরী-যুবরাজলীল
হা বল্লবীহৃদয়পঙ্কজ চঞ্চরীক!
হা রাধিকাকুচকুরঙ্গমদাঙ্গরাগ
ভূয়োঽপি হা মম দৃশোঃ পদবীং গতোঽসি॥

তুমি কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইলে?

আমি চিনিতে পারি নাই, ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? তিনি গদ্গদস্বরে বলিলেন,—আমি তোমার হতভাগিনী দাসী বিশাখা। বিশাখাকে আমি তাহার পূর্ব্ব দেহ দিয়াছি, আর তোমার কুশলবার্ত্তা বলিয়া তাহাকে সুসজ্জিতা করিয়া দ্বারকায় লইয়া আসিয়াছি।

শ্রীরাধিকা বিশাখাকে দেখিতে চাহিলেন। নববৃন্দা বলিলেন—বিশাখাকে তাঁহার পিতা সূর্য্যদেব বলিয়া দিয়াছেন, যতদিন স্যমন্তকমণির বিচ্ছেদ থাকিবে ততদিন তুমি তোমার

প্রিয়সখীর সহিত সাক্ষাৎ করিও না। নববৃন্দার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—একথা সত্য, মাতা সংজ্ঞা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন—স্যমন্তকমণি যখন তোমার হস্তগত হইবে, তখন তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ নববৃন্দাবনের বনশোভা দেখিতেছেন, ও শ্রীরাধাকে দেখাইতেছেন। নববৃন্দা সঙ্গে সঙ্গে আছেন। বৃন্দাবনের সেই বিহারের আনন্দ সম্পূর্ণরূপেই হইতেছে—কিন্তু শ্রীরাধা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। তাহার পর চন্দ্রাবলী আসিলেন।

১৫। চিত্রদর্শন

নরকাসুর ব্রজপুর হইতে ষোলহাজার একশত রোরুত্থমানা গোপকুমারী হরণ করিয়া আনিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার করিয়াছেন। এখন সেই গোপকন্যাগণের জন্য রৈবতক-পর্ব্বতে ষোলহাজার একশত গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। নরকাসুর প্রচার করিত যে এই কন্যাগুলি রাজপুত্রী। নরকাসুরের ব্যবহারে কামাখ্যাদেবীও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নরকাসুর বধের জন্য অনুরোধ করেন। পশুপালশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তবৃষকে বন্ধন করিয়া, নগ্নজিৎ-দুহিতা মিত্রবৃন্দাকে লইয়া আসিয়াছেন, ইনিই পদ্মা। শৈব্যা ও ভদ্রাকে আর মদ্রেশ্বর-নন্দিনী লক্ষ্মণা-নাম্নী শ্যামলাকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া আসিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী বা রুক্মিণীর অনুমতি-ব্যতীত এখন শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করিতে পারেন না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ অনুমতি লইলেন। 'সত্যাখ্যলোক দর্শনের জন্য আত্মভূ (ব্রহ্মা বা কাম) কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াছি— অতএব সেখানে যাইতে অনুমতি দাও।' এই প্রকারে অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য নববৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নব-বৃন্দাবনের শোভা দেখাইতেছেন, এমন সময়ে একটি বাণী শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিলেন ও শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে মলয়ানিল, শ্রীরাধা কোথায় বলিয়া দাও। হে কুরঙ্গি, তোমার নয়নযুগল শ্রীরাধার নিকটেই এই চঞ্চল নেত্রলীলা শিখিয়াছে। শ্রীরাধা কোথায় বলিয়া দাও। তাহার পর দাড়িমি বৃক্ষকে

জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই সময়ে সুকণ্ঠি আসিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আলেখ্য দর্শনের জন্য একরূপ বাধ্য করিলেন। পর্ব্বত-গুহায় এই আলেখ্য আছে, একজন বিদ্যাধরী তাহা আনিয়াছেন। রাত্রিকাল, কৌস্তুভমণির আলোকে সেই চিত্রপট দেখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, মধুমঙ্গল ও নববৃন্দা আছেন। চিত্রপট দেখা হইতেছে। নন্দোৎসব, পূতনামোক্ষণ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্ত্তবধ, গোকুলেশ্বরীর দধিমন্থন, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, বৎসাসুর বধ, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মার স্তব, ধেনুকাসুর বধ, বলদেব-কর্ত্তৃক প্রলম্বাসুর বধ প্রভৃতি চিত্রপটে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীরাধার খেদ উৎপন্ন হইবে বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা কালিয়দমনলীলা প্রকাশ করেন নাই। তাহার পর দাবানলপান ও বস্ত্রহরণ। এই চিত্র দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপও হইতেছে। তাহার পর দ্বিজপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষালীলা, গোবর্দ্ধনধারণ। এই স্থানে পর্ব্বতগুহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে তাঁহাদের পণ রাখিয়া যে পাশা খেলা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাহার পর রাস। 'রাস' এই কথাটি শ্রবণমাত্রেই শ্রীরাধা উদ্‌ঘূর্ণাগ্রস্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ উৎসুক্যের সহিত বলিলেন—

> নিমজ্জতি নিমজ্জতি প্রণয়কেলিসিন্ধৌমনো বিঘূর্ণতি বিঘূর্ণতি প্রমদচক্রকীর্ণং শিরঃ।
> অহো! কিমিদমাবয়োঃ সপদি রাস নামাক্ষরদ্বয়ী-জষুষি নিস্বনে শ্রবণবীথিমারোহতি ॥

রাস, এই নামের অক্ষর দুইটি যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই শব্দ শুনিবামাত্রই আমাদের দুইজনের মন প্রণয়কেলিসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল, আনন্দচক্রে মস্তক পরিব্যাপ্ত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

তাহার পর অম্বিকাবন ও তথায় সর্পদেহ হইতে সুদর্শনের মুক্তিলাভ। তাহার পর শঙ্খচূড় বধ, বৃষাসুরবধ, ব্যোমাসুর বধ। এইবার অক্রূরাগমন। অক্রূরের নাম শুনিয়াই শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভ্রমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—কোমলে কাতর হইও না, ইহা চিত্র। তাহার পর মথুরাগমন, রজকবধ, কুব্জার লীলা, কংসবধ।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এস আমরা সকলে কালিন্দীতীরে যাই।

এইবার মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট অনুমতি

লইয়া সত্যলোকে গিয়াছেন—ইহাই চন্দ্রাবলী জানেন। চন্দ্রাবলী বিরহে কাতরা হইয়া নববৃন্দাবনে আসিয়াছেন। চন্দ্রাবলী জানেন নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত প্রতিমা আছে। মাধবী চন্দ্রাবলীকে বলিতেছে,—শুনিয়াছি রাজেন্দ্র, এখনও ব্রহ্মলোকে যান নাই, এইখানেই আছেন। চন্দ্রাবলী বলিতেছেন, সত্য, আমি তাঁহার অঙ্গের সৌরভ পাইতেছি। চন্দ্রাবলী দেখিলেন এক কুঞ্জের দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—বিদর্ভ-নন্দিনী এখন দ্বারকায়, আমি নির্ব্বিঘ্নে এই উপবনে বিহার করিব। চন্দ্রাবলী কেবল 'বিদর্ভনন্দিনী' এই কথাটি শুনিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একরূপ বলিতেছেন, চন্দ্রাবলী অন্যরূপ বুঝিতেছেন। এইবার উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই, ইনি চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধাকে দেখিলেন, কিন্তু ভাবিলেন, ইহা বোধ হয় মায়া-নির্ম্মিত। চন্দ্রাবলী বুঝিলেন ও শেষে বলিলেন,—দেব, আপনার সঙ্কোচ দেখিয়া আমি বিদীর্ণ হইতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া নির্ভয়ে ক্রীড়া করুন, আমি অন্তঃপুরে চলিলাম। এই বলিয়া চন্দ্রাবলী সঙ্গিনীগণসঙ্গে চলিয়া গেলেন।

১৬। দশম অঙ্ক—পূর্ণ-মনোরথ

চিত্রদর্শনের দিন দেবী রুক্মিণী প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া সত্যাকে বা শ্রীরাধাকে অন্তঃ-পুরে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কামরূপ দেশের যে শুকপক্ষী মধুমঙ্গলের নিকট ছিল, দেবী রুক্মিণী তাহাও চাহিয়া লইয়া গেলেন। শ্রীরাধাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, নববৃন্দা তাঁহাকে বলিলেন, উহা অসম্ভব। এই সময়ে সত্রাজিৎ রাজা পিঙ্গলানাম্নী এক দাসীর দ্বারা সত্যভামার নিকট স্যমন্তকমণি পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল ও নববৃন্দার সহিত পরামর্শ করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। মধুমঙ্গল রুক্মিণীদেবীকে জানাইলেন যে সত্রাজিৎ রাজা স্যমন্তকমণিসহ দুইজন দাসী পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা অন্তঃপুরে সত্যভামার নিকট যাইবেন। রুক্মিণীদেবী অনুমতি দিলেন, কিন্তু শ্যামবর্ণা ও অবগুণ্ঠনবতী দাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। সত্যভামা বা শ্রীরাধা অবশ্য তাঁহাকে চিনিয়াছেন। নিভৃতে অন্তঃপুরে তাঁহাদের মিলন হইল। দেবী-রুক্মিণী হঠাৎ স্যমন্তকমণি দেখিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ ধরা পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি রুক্মিণীকে বা চন্দ্রাবলীকে বলিলেন—দেবি আজ আমাকে চিনিতে পারিবে কি না, ইহার পরীক্ষার নিমিত্ত আমি এই নাট্য অঙ্গীকার করিয়াছি।

শ্রীরাধার মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইলেন, পৌর্ণমাসী ও যশোদার সহিত ব্রজবাসী বন্ধুগণ দ্বারকায় আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী তাঁহাদের নিকটে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলেশ্বরী যশোদার ক্রোড়ে বসিয়াছেন। যশোদা পুত্রের মস্তক আত্রাণ করিয়া বলিতেছেন—'পুত্র, তুমি আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ, বহুকাল দেখা দাও নাই।' শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মা কেন লজ্জা দিতেছ? আমি কি তোমাদের ভুলিতে পারি। তাঁহার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শুকপাখীর কথা, হরিণ-শিশুর কথা, ময়ূরের কথা ও রাখালসখাগণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যশোদা বলিলেন, রাখালসখাগণ আসিয়াছে—বাহিরে সুধর্ম্মায় বসিয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। চন্দ্রাবলী আসিলেন। যশোদা তাঁহাকে কোলে লইলেন, আনন্দের সীমা নাই। মুখরা চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাধার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। রোহিণীও কাঁদিতেছেন, পৌর্ণমাসীও কাঁদিতেছেন। এদিকে ললিতা ও পদ্মা আসিলেন, আনন্দ আরও বাড়িয়া গেল। দেখাশুনা ও পরিচয় হইল। চন্দ্রাবলী জানেন না যে সত্যভামাই শ্রীরাধা। শ্রীরাধার জন্য তাঁহারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এই সময়ে সংবাদ আসিল সত্যভামা কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিতেছে, আর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উদ্ধার করিতে ধাবিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে উদ্ধার করিলেন। মহাদেব দ্বারকায় উপস্থিত। এইবার সকলে বুঝিলেন শ্রীরাধাই সত্যভামা। চন্দ্রাবলী তখন শ্রীরাধার কণ্ঠ জড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন অনুভব করিতেছেন তিনি গোকুলেই বাস করিতেছেন। বিশাখাও নির্ঝর হইতে উঠিয়া আসিলেন। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের করে শ্রীরাধাকে অর্পণ করিলেন। চন্দ্রাবলী প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিলেন। রৈবতপর্ব্বতের সহিত পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য ও গোবর্দ্ধন আসিলেন, যদুবীরগণসহ বলরাম ও যদুকুলরমণীগণসহ রেবতী আসিলেন। নন্দ, শ্রীদাম, সুদাম সকলেই আসিয়াছেন। কেহই বাকি নাই। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী, অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা, ইন্দ্র-শচী, কুবের ঋদ্ধি, যম-ধূমোর্ণা, বরুণ-গৌরী, সূর্য্য-সংজ্ঞা, মরুৎ শিবা, অগ্নি-স্বাহা, চন্দ্র রোহিণী, সকলেই আসিলেন। সত্যভামার বিবাহ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গম মহোৎসব।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

[আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী 'বীরভূমি'তে অপ্রকাশিত পদাবলী প্রকাশিত করিতেছিলাম। এখন পুনরায়, যে সকল অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদাবলী সংগৃহীত হইতেছে, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিব। 'পদকল্পতরু', 'পদকল্পলতিকা', 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'গৌরপদতরঙ্গিণী', 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' প্রভৃতি বহুলপ্রচারিত পদসংগ্রহগ্রন্থে যে সকল পদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় নাই, আমরা সেই সকল পদ প্রকাশিত করিব।]

১। পদকর্ত্তা—ভাগবতানন্দ

'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থে, এই পদকর্ত্তার কুঞ্জভঙ্গবিষয়ক একটি মাত্র পদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা একখানি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে (রতন-লাইব্রেরী পুথি, নম্বর - ২০৮৮), ভাগবতানন্দের আরও দুইটি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই পদ দুইটি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

(রসোদগার)

(১)

সহচরি সবহু মিলিল ধনী মন্দিরে শুনইতে কানুক লেহা।
রাই সুচন্দ্র বদন হেরি ভুলল পুলক কদম্বিত দেহা॥
সো সব হেরি আকুল ভেল সুন্দরী গর গর প্রেম ভরে।
পিয়ে কি পিরীত রভস রস মাধুরী শোঙরি নয়ন ঝুরে॥
কহইতে চাহ থেহ নাহি বান্ধই গদগদ ভাব হি ভাস।
কত কত ভাব উঘাতই অন্তহি মধুর মধুর খেলে হাস॥
প্রেম পসার পসারল রঙ্গিনী বচন অমিয়া রসপুর।
ভাগবতানন্দ কহ ইহ সুন্দরী শুনিতে শ্রবণ সব ঝুর॥

(২)

কহব কি কানু চরিত বর-মাধুরী এক বয়ান বিধি দেল।
দরশনে মোরে অথির ভেল নাগর আদরে আগুসারি নেল॥
কহইতে চাহ অধর যুগ ঝাপই অনক্ষণে আধভাস।
আগমন বাত পুছত পদ পুরত পুছত সেই নিজ বাস॥

কাহা হামে খোয়ব থেহ না লাগই খোই চাহসি নিটির।
বদন হি হেরি ঢুলাও কর পঙ্কজ নয়ান নিমিখ করু স্থির॥
দরশ প্রেম সাগরে ভেল আকুল তনু তনু পসারি না পারি।
চরণ সুভাতি মরম মিটাওই ভাগবতানন্দ বলিহারি॥

২। পদকর্ত্তা—যাদবেন্দু

এযাবৎ প্রকাশিত প্রধান প্রধান পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে যাদবেন্দুর পদ প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। আমরা (রতন-লাইব্রেরী—২০৮৮ সংখ্যক পুথি) এই পদকর্ত্তার ৪টি মাত্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই-স্থলে তিনটি পদ উদ্ধৃত হইল—একটি পদের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়াছে।

(গোষ্ঠ-লীলা)

(১)

দিছে রাণী বাম করে শ্যাম। দক্ষিণ করে বলরাম॥
হের আয়রে বলরাম, হাত দে মোর মাথে।
প্রাণের অধিক শ্যাম সঁপে দি তোর হাতে॥
রামের হাতে শ্যাম দিয়া বলে নন্দরাণী।
লঞা যেছো আমার গোপাল, এনে দিও তুমি॥
যমুনার তীরে যখন গোপাল ধেঞা যায়।
আড়ুড় বিষম বড় সামালিও তায়॥
গোধনে গোধনে যখন লাগে হুলাহুলি।
সেখানে সামালো আমার পরাণ পুতলি॥
নবনব তৃণাঙ্কুর যেথানে দেখিবে।
সেইখানে গোপালে আমার কান্ধে করি লবে॥
রবির কিরণে যখন ঘামিবেক গা।
নূতন পল্লব লঞা দিও মন্দ বা॥
কাল যমুনার জল, কাল নীলমণি।
কালজলে কালরূপ মিশায় পাছে জানি॥
প্রাণধন তোরে দিঞা আমি ঘরে যাই।
যাদবিন্দু বলে রাণী, কিছু ভয় নাই॥

(২)

রৈয় রৈয়   রৈয় রৈয় রে।
নেহারি বয়ান,   জুড়াক পরাণ,   তবে মা'য়ে ছেড়ে যেও রে ॥
আগে ধেঞা রাণি,   যশোদা রোহিণী,   নেহারে চান্দ মুখ খানি।
অন্তরে কাতরে,   আঁখে জল ঝরে,   মুখে নাহি সরে বাণী ॥
শ্রীদাম সুদাম,   শোন বলরাম,   তোমা সভাদিকে কই।
মৃত তনু এই,   ঘরে লঞা যাই,   পরাণ পুতলি ঐ ॥
কল্যাণ কুশলে,   গোসাঞী রাখুক তোরে,   মায়ের সনে এই দেখা।
যাদবেন্দু সুখী,   তবে প্রাণ রাখি,   নন্দ ঘুচায় ধেনু-রাখা ॥

(৩)

গোঠ বিজই রাম কানু।
আগে পাছে শিশু ধায়, সাথে সাথে ধেনু ॥
নপুরের ধ্বনি শুনি মুনির মন ভুলে।
ঢাকিল রবির রথ গোক্ষুরের ধুলে ॥
সুরঙ্গ চাহনি বিনোদ পাগুড়ি।
কারু নীল, কারু পীত, কারু রাঙ্গা ধড়ি ॥
কারু হাতে রাঙ্গা লাঠি, গলে গুঞ্জাহার।
কারু কারু কান্ধে শোভে ভোজনের ভার ॥
কেহ কেহ ধেঞা গিঞা ধেনু বাহুড়ায়।
যাদবেন্দু এক পাশে দাঁড়াইয়া চায় ॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

সতীশচন্দ্রের গান

বীরভূম জেলার অন্তর্গত চহট্টা-গ্রামে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই, ৩০।৩২ বৎসর হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে আমরা এইটুকু খবর পাইয়াছি। বীরভূম অঞ্চলে তাঁহার গান, লোকের মুখে মুখে ও ভিখারী বৈরাগীদিগের দ্বারা বিশেষভাবে সুপ্রচলিত এবং সমাদৃত হইয়াছে। 'বীরভূম-অঞ্চল' বলিতে কাটোয়ার পশ্চিমাংশ, যাহাকে 'মধ্য-রাঢ়' বলা যায়, সেই অঞ্চল বুঝিতে হইবে।

সতীশচন্দ্রের সঠিক্ পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। এইটুকু জানা গিয়াছে, তিনি সাধক-শ্রেণীর লোক ছিলেন, জপ ধ্যান পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান লইয়া থাকিতেন। তারাপুর, কঙ্কালীতলা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী পীঠস্থান ও তীর্থস্থানে যাতায়াত করিতেন, আর ধর্ম্মপ্রিয় লোকজনের সঙ্গ করিতেন, তাঁহাদের অনুরোধে অনেক সময়ে গান রচনা করিয়া তাঁহাদের শুনাইতেন। বাউল বৈরাগী কেহ কেহ তাঁহাকে গুরু বলিয়া দাবী করেন। এই গুরু, কি প্রকারের তাহা বলা যায় না; গানের গুরুও হইতে পারে।

বাঙ্গালার কবিতাকাননে সাধকের গান বলিয়া পরিচিত বহু সঙ্গীত আছে। সৌরভে, পবিত্রতায় এই গানগুলি অতুলনীয়, আর এই গানগুলির সমাদরও খুব বেশী। বিনা-চেষ্টায় অল্পদিনেই এই গানগুলি লোকের মুখে মুখে সমগ্র দেশে প্রচারিত হইয়া যায়। কিগুণে এই গানগুলির এত আদর ও প্রসার হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

সতীশচন্দ্রের গান ভিখারী বৈরাগীর মুখে অনেকগুলি শুনিয়াছি। এই গানে এমন একটা আন্তরিকতা, স্বাভাবিকতা, ও স্বচ্ছন্দতা আছে যে ঐগুলি সাধকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইবার উপযুক্ত। তাঁহার সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইতেছে, পরে আরও আলোচনা হইবে।

বর্দ্ধমান জেলার শ্রীগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট নিম্নের চারিটি সঙ্গীত আমরা পাইয়াছি।

(১)

কহরে মন তারা তারা, রহরে মন তারাপুরে।
কেন বৃথা এ দুঃখ ভোগরে, এ ভব ঘোরে ঘুরে ঘুরে ॥
দ্বারকা নাম ধারিণী, পাপ-হারিণী, প্রবাহিনী কূলে,
মহাশ্মশান মাঝারে তারা, বিহরে শাল্মলী মূলে,

উন্মিলিত করি নেত্র, দেখরে এই মহাতীর্থ,
যে ক্ষেত্রে পুণ্যিমাত্র, কর্ম্মসূত্র যায় দূরে ॥
বশিষ্ঠারাধিতা তারা, যত্র তারা শিলাময়ী,
তত্র বসি বিহরসি, এক্ষেত্র বারাণসী জয়ী ;
তারা-চরণে তারা দিয়ে, রহরে শমনে তাড়া দিয়ে,
ডাকরে মায়ে, নিরুপায়ে, রাখিবে পায়ে কৃপা করে ॥
ধন্য রাজা রামকৃষ্ণ, ধন্য মহা পুণ্যবান,
যাঁর কীর্ত্তি অদ্যাপিও, তারাপুরে বিদ্যমান ;
সাধন করি স্বকীয়েষ্ট, সাধকজন মাঝে শ্রেষ্ঠ,
যাঁর কীর্ত্তি করি দৃষ্ট, শুভাদৃষ্ট বলে নরে ॥
বিরিঞ্চি বাসব ভব, যাঁর মহিমা না জানে,
অক্ষম অধম দ্বিজ, সতীশ তাঁর গুণ গানে ;
বিষয়-বিষ বিসর্জ্জিয়ে, তারানাম পীযূষ পিয়ে,
প্রেমে ঢলিয়ে, তারা গলিয়ে, তারা বলিয়ে নাচ নারে ॥

[বীরভূম জেলার অন্তর্গত তারাপুর গ্রামে দ্বারকানদীর তীরে তারাপীঠে বসিয়া এই গানটি রচিত হয়]

(২)

আড়ম্বরী ঘটায়, কপাল-জোড়া ফোঁটায়,
মদের বোতল পাঁঠায়, ভুলবে নাক মা।
মা মা বলে যত, চেঁচাও, ডাক, মাথা ঠোক,
কাজেও কথায় সেত, কাড়বে নাক মা ॥
মর নেশার ঘোরে, চ কার ব-কার ক'রে,
ম-কারে বিকার মলে, অহঙ্কারে এমন চক্র করে,
তাঁর চক্রে পড়ে শেষে, কুলাল চক্রে ঘুরে, প্রাণে বাঁচবে না
তাঁরে ধররে হয়ে বীরাচারী, কিম্বা হয়ে বামাচারী,
বামন ধরবে চাঁদ, বামুন হবে হাড়ী,
লম্বা কোচাধারী, কৌপীন আঁটা দাড়ী,
আসনজারী ভারী, কাজে ফুরুৎ-ধা ॥

সাধ মহামন্ত্র, চল তন্ত্রপথে, গুরু বই ভুলোনা কারো মন্ত্রণাতে,
তবে জয়ী হবি, সেই যম-যন্ত্রণাতে, সাধন দরিয়াতে, পেতে পারবি না ॥
দ্বিজ সতীশ কয় যেদিন ঘরে ঢুকবে জগৎ ভ্রমি,
সেদিন ভক্তি নিক্তি কাঁটায় মরবে বেশী কমি,
যেদিন প্রেম-সিন্ধু মথি, হতে পারবে প্রেমী,
সেদিন জানবে তুমি, কোথায় তোমার মা ॥

[কোনও গ্রামে কতকগুলি লোক তান্ত্রিক বীরাচারের নামে তাঁহাকে সুরাপান করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেন। তিনি তাহা অস্বীকার করেন এবং বীরাচারের ব্যাভিচারিগণ প্রকৃতিস্থ হইলে, তাঁহাদের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি রচনা করিয়া তাঁহাদের শুনাইয়াছিলেন।]

(৩)

জয় মা কঙ্কালী কালী, কাল-ভয়ে মা রাখ দাসে।
বড় ভীত হয়ে এসেছি তারা, দাঁড়াতে তব পদপাশে ॥
কোপাই-তটিনী-তট নিকটে পীঠমাঝে কি মহামেলা,
স্বহর কুলকুণ্ডলিনী, কুণ্ডমাঝে কর খেলা,
(আমার) বয়ে গেল জীবন-বেলা, চরণ ভেলা পাবার আশে ॥
কাঞ্চিদেশে বিরাজ কর মা', কয়কাঞ্চিবিভূষিণী,
ঈশান সনে শ্মশান মাঝে, খেল সুখে মা ত্রিনয়নী,
ভৈরব নামেতে রুরু ভৈরব করিছে ধ্বনি,
শুনি সে ধ্বনি, সাধক যিনি, লভেন সিদ্ধি অনায়াসে ॥
তুষিতে জীবন দেহ কেহ কেহ তুষিছে শ্রুতিপাঠে,
কত সাধক দণ্ডী, পড়িছে চণ্ডী, বসি কুণ্ডের ঘাটে ঘাটে,
মহামায়া তোর মহামেলায়, কি আনন্দ মহাপীঠে,
নিরখি প্রেমে আঁখি ফোটে, কার ধারা না পড়ে ভেসে ॥
হে শিব-আদরিণী শিব-পুরাণেতে আছে জানা,
জীবে দাও শিবত্ব-পদ, করিলে পদ উপাসনা,
তোর নাম নিলে মা শবাসনা, কার না পুরে স্ব-বাসনা,
তাই বাসনা যেন রসনা, ভাসে গো কালী নাম রসে ॥

রাখিতে মনবেদনা, নিবেদি জননী তব পায়,
চরম দিনে চরম-ধ্যানে, যেন সতীশের জীবন যায়,
পাপী বলে ঠেল না পায়, অনুপায়ের নাহি উপায়,
স্থান দিতে ঐ রাঙ্গা পায়, বঞ্চিত করোনা শেষে ॥

[বীরভূম জেলার বোলপুর চৌকীমধ্যে কোপাই নদীর তীরে কঙ্কালীপীঠের মহামেলার সময় রচিত

(৪)

হওরে প্রেমানন্দে চিত, রাধাগোবিন্দ চরণাশ্রিত।
অকারণ দহিছ কেন, চিন্তাচিতানলে চিত ॥
যাইবে দুঃখ, পাইবে সুখ, দেখ সে সুখময়ে ডেকে,
পড় বিপাকে, পাকে পাকে, সেই বাঁকা সখাকে ভুলে থেকে,
যাবে, পাবে আনন্দ, রাধাগোবিন্দ বল মুখে,
রসে ভাসায়ে রসনাকে, পান কর নাম রসামৃত ॥
ত্যজ কনক, ত্যজ কামিনী, ত্যজ বিষয়, ত্যজ মায়া,
মজ মুরারির পদ-রাজীবে, জগতজীবে কর দয়া,
পাবে শ্রীগুরুকৃপাতে, চারুশান্তি-তরুতলে ছায়া,
(তোর) সন্তাপিত জীবনকায়া, জুড়াবে জনমের মত ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম, সমর্পণ করিতে তাঁকে,
বলে ডাক, হা গোবিন্দ, যেন কামগন্ধ নাহি থাকে,
দ্বিজ সতীশ ভাষে, হৃদয়ে এসে, কবে হেসে হেসে, দাঁড়াবে বেঁকে,
দেখে হৃদি-গোলকে, গোপবালকে, পুলকে হব পুলকিত ॥